গান্ধী পরিক্রমা

সম্পাদনা

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭৬

—পনেরো টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

সম্পাদকের নিবেদন

মহাত্মা গান্ধী বর্তমান যুগের এক পরম বিস্ময়। বাল্যকালে অপরাপর শিশুর মত অতীব সাধারণ এক শিশু পরবর্তীকালের লাজুক মুখচোরা স্বভাবের যুবক যে ভাবে আফ্রিকা ও ভারতের নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা-লাভের অহিংস যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে উঠলেন—এ আমাদের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়। ঈশ্বরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি এবং সত্য ও অহিংসারূপী অতীব সনাতন অথচ পরম শক্তিশালী আয়ুধকে সম্বল করে মানবীয় বিভূতির অত্যুচ্চ অভিব্যক্তির নিদর্শন উপস্থাপিত করেন গান্ধীজী। এই জন্য কেবল ভারত অথবা ভারতবাসীর বন্দনীয় তিনি নন, হিংসা ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার একটা কার্যকরী পথ বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে দেখাবার জন্য সমগ্র মানবজাতিরই তিনি পূজনীয়। নরদেহ বিসর্জন দেবার পর মহাত্মা গান্ধী তাই বিশ্বপথিক এবং ইতিহাসের অগ্রনায়কের শ্রেণীভুক্ত হয়ে চিরকালের মনীষীদের সারিতে স্থান পেয়েছেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে কিঞ্চিৎ মাত্রাতে হলেও এই মহাপুরুষের জীবনায়ন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আরও সৌভাগ্যের কথা, তাঁর শতবার্ষিকী আমাদের জীবনকালে পালিত হচ্ছে যখন তাঁর স্বদেশের কোণে কোণে তো বটেই বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেরই মানুষ এই অনুষ্ঠান পালন করে তাঁর জীবনী ও বাণী থেকে নিজেদের চলার পথের প্রেরণা সংগ্রহের প্রয়াস করছেন। সেই বিশ্বব্যাপী প্রয়াসেরই এক ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র অঙ্গ 'গান্ধী পরিক্রমা' প্রকাশন। বাঙলা দেশ ও ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে এযুগের এক মহামানবের জীবন ও কর্মের পরিক্রমা প্রকাশিত হল বাঙালী পাঠকদের জন্য।

পরিক্রমার প্রথমভাগ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, দ্বিতীয় অংশে গান্ধীজীর মত ও পথের মূল কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙলা দেশ ও বাঙালীর সঙ্গে প্রথমাবধি মহাত্মা গান্ধীর এক নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক ছিল—তৃতীয় অংশে তারই পরিচয় দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী মহাজীবনের ভিন্নমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকবর্গ যদিও সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা উচ্চকোটির প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন কিন্তু যাঁর পরিক্রমা, তিনি এত বিরাট

যে সম্পাদকের আশঙ্কা রয়ে গেল হয়ত এই পরিক্রমা কতকটা শাস্ত্রোক্ত অন্ধের হস্তি দর্শনের মতই হল। আসল মানুষটি ও তাঁর কৃতি পরিক্রমার সামগ্রিক ফলের চেয়ে অনেক বড়। তবে মানুষের প্রচেষ্টার একটা সীমা আছে বলে আপাততঃ বর্তমান প্রয়াসেই তৃপ্তি মানতে হল।

'গান্ধী পরিক্রমার' সম্পাদকের দায়িত্ব ঘটনাক্রমে আমার উপর পড়লেও বহু গুরুজন ও শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ পদে পদে পেয়েছি যার কারণ পরিক্রমা এই ভাবে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছি। এর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় এর লেখকবৃন্দের কথা, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। পরিক্রমার লেখকবর্গের সঙ্গে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষ করে গান্ধীচর্চার সুযোগ পাওয়া গেছে বলে আমি তাঁদের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এর পর নাম করব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের যাঁর কাছ থেকে প্রথমাবধি আমি গান্ধী-ভাবধারা প্রচারের ব্যাপারে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়ে আসছি। পরিক্রমার অংশ বিভাজন এবং বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরই পরামর্শে গ্রন্থ-শেষে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী সঙ্কলন করে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজন বোধ করা মাত্র পাঠক সেটির সহায়তা নিতে পারেন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকেও লেখক নির্বাচন এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে পদে পদে সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। প্রত্যুত তাঁরই নাম এই পরিক্রমার সম্পাদক ও বর্তমান সম্পাদকের নাম তাঁর সহায়করূপে থাকলেই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত হত। 'গান্ধী পরিক্রমা' নামটি স্থির করে দেবার জন্য শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মী শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি সম্পাদনার কাজে আমাকে প্রভূত ভাবে সহায়তা দিয়েছেন। তাঁকে এই পরিক্রমার যুগ্ম-সম্পাদক আখ্যা দেওয়া অনুচিত হবে না। আমার অপর এক সহকর্মী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সরকারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি তৈরীর ব্যাপারে বহু সাহায্য পেয়েছি। আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবল যত্ন সহকারে এই গ্রন্থের প্রুফই দেখেন নি, নানা বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই তাঁকে 'গান্ধী পরিক্রমাকে' সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে সন্দেহ নেই। সর্বশেষে পরিক্রমা প্রকাশনের ব্যাপারে বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান "মিত্র ও ঘোষের" ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠার কথা

সম্পাদক হিসাবে আমি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি। বাঙলা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা ছাড়া অপর কেউ এ রকম বিপুল ব্যয়ে এত বড় একটি গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিতেন না। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে তাঁদের প্রকাশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভানু রায় ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান নৃপেন চক্রবর্তীর অক্লান্ত সহযোগিতার কথা উল্লেখ করছি।

পরিক্রমায় প্রকাশিত ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মূল হিন্দি রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন সহকর্মী বন্ধু ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। অপরাপর অবাঙালী লেখকদের ইংরাজী বা হিন্দি রচনার বঙ্গানুবাদ সম্পাদক কৃত।

'গান্ধী পরিক্রমা' এযুগের তরুণ তরুণীদের সর্বকালের এক মহামানবের জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করলে গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

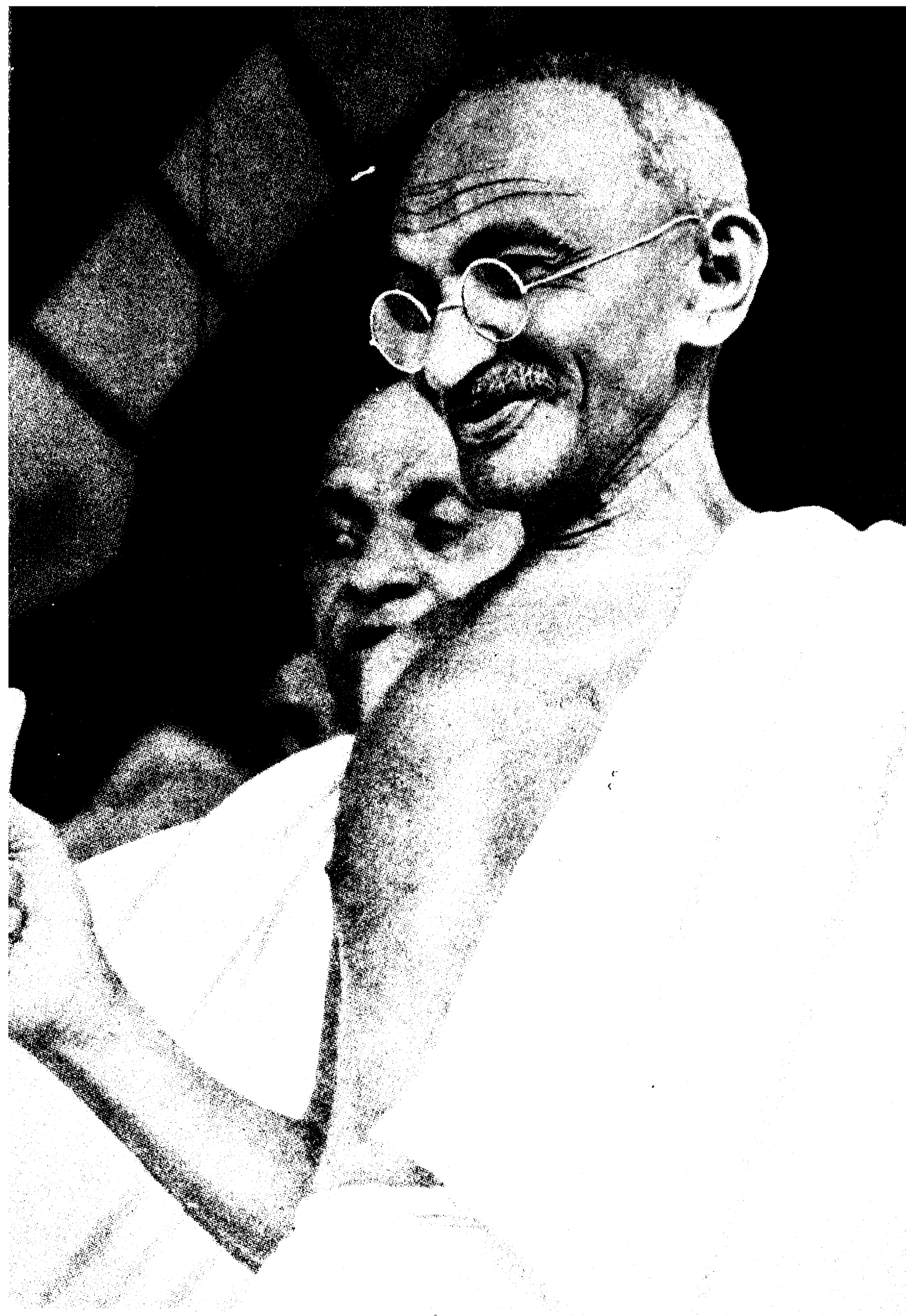
শ্রদ্ধাঞ্জলি

গান্ধী—মত ও পথ

বাঙলা বাঙালী ও গান্ধীজী

বর্ণালী

পরিশিষ্ট



শ্রদ্ধাঞ্জলি

শতবার্ষিকীর অনুচিন্তন

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

১৯৬৯ সনের দোসরা অক্টোবর, আততায়ীর হস্তে ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী নিহত হবার প্রায় বিশ বৎসর পরে গান্ধীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী পড়েছে। এই অবকাশে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের উপর তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ছিলেন বিপ্লবী। মানবপ্রকৃতির বড় রকমের একটা পরিবর্তন সাধনের জন্ম তিনি কাজ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর বিলীয়মান যুগের বা যে যুগ বিলীন হওয়া উচিত তার নয়—তাঁর বাণী আগামী যুগের। বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না, ভবিষ্যৎকে আমাদের একটা নূতন উদ্দেশ্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে—তাকে দিতে হবে একটা নবীন দিশা। বিপ্লবের মূলে থাকে উদ্দেশ্যের তীব্রতা—জাড্য বা ঔদাসীন্যের সেখানে কোন স্থান নেই।

বর্তমানে আমরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে রয়েছি। মানুষের প্রবলতম শত্রু ব্যাধি দুর্ভিক্ষ বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নয়। মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিপক্ষ হল পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধকালে এ সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বংস করতে পারে এবং শান্তির সময়ও মানবজাতিকে প্রচণ্ড ও স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষমতা এর আছে।

গান্ধী আমাদের নিরস্ত্র পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সংঘাত ও বিদ্বেষ পরিহার করে আমাদের সহযোগিতা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে কাজ করতে প্রস্তুত হতে হবে। সত্যাগ্রহ তাঁর দেওয়া যুদ্ধের বিকল্প এবং এর ভিত্তি হল সত্যের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ও সংঘর্ষ উপস্থিত হলে প্রতি-রোধকারী কর্তৃক প্রেম ও আত্মনিগ্রহের পন্থানুসরণ করা।

চতুর্দিকের পরিবেশ যখন সর্বাপেক্ষা শোচনীয় বিপ্লবীর ইচ্ছাশক্তি তখনই হয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে মানবের অস্তিত্ব কী সর্বনাশাভাবে সংকটাপন্ন সে সম্বন্ধে পণ্ডিত বুদ্ধিমান ও সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিরা ভালভাবেই জানেন। কোন সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি এ জাতীয় যুদ্ধ না চাইলেও আজ আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এ রকম যুদ্ধ সৃষ্টি করারই কাজ করছি। মানব

স্বভাবের স্ববিরোধের কারণ—আমরা সচেতন ভাবে একটা জিনিস না চাইলেও অজ্ঞাতসারে ও অযৌক্তিকভাবে তারই জন্য কাজ করে চলেছি। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস পাবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন না করলে একে ব্যবহার করার লোভ থেকেই যাবে।

সর্বাত্মক ধ্বংসের বিপদের বিরুদ্ধে আজও আমরা দৃঢ়, যুক্তিযুক্ত বিরোধিতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের মনোভাব ও আচরণের দ্বারা আমরা একে ত্বরান্বিত করছি। মনে হয় যেন আমরা সত্যের বাণীর প্রতি চক্ষু উন্মীলিত কিন্তু শ্রবণদ্বার রুদ্ধ করে বিশ্ব প্রলয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি।

পুণ্যস্য ফলম্ ইচ্ছন্তি পুণ্যাম্ নিচ্ছন্তি মানবঃ
ন পাপফলম ইচ্ছন্তি পাপম্ কুর্বন্তি যত্নতঃ

॥ ২ ॥

মানুষ আজ যা এবং যা হতে চায় তার মধ্যে মারাত্মক একটা অসামঞ্জস্য আছে। এই বৈসাদৃশ্যই আমাদের অস্থিরতার জন্য দায়ী। আমরা কথা বলি জ্ঞানীর মত কিন্তু কাজ করি পাগলের মত। একই সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং বিশ্ব-কুটুম্ব গঠনের প্রয়াস চলতে পারে না। কভুর (Cavour) বলেছিলেন, "দেশের জন্য আমরা যা করি নিজেদের বেলাতেও যদি তাই করতাম তাহলে আমাদের কত বড় দুরাত্মাই না হতে হত।" আভ্যন্তরীণ অস্বস্তি ও বিবেকদাহের দ্বারা আমরা পীড়িত হই। আমাদের ভিতরকার ভ্রাতৃঘাতী প্রবণতাকে পরাভূত করতে হলে আমাদের স্বভাবের যুযুধান প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করতে হবে। আমাদের জীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত স্বেচ্ছাচারী ও অহঙ্কারী বৃত্তির বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। মানুষের ভিতর বরাবরই একটা নিজের ক্ষুদ্র অহং-এর ঊর্ধ্বে ওঠার প্রবণতা বিদ্যমান। তার এই প্রবণতা সম্পূর্ণ মাত্রায় স্বার্থরহিত না হওয়া পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ আনুগত্য ও ধ্বংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থেকেই যাবে। বিশ্বের অশান্তি আমাদের আভ্যন্তরীণ বিসংগতিরই প্রতিফলন।

কোন জাতির ত্রাণকর্তা, সে দেশের সমরনায়ক, শিল্প ব্যবসায়ের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা পুরোহিত ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নন। এ ভূমিকা হল সেই জাতির নিষ্কলুষ সাধুতার প্রতিমূর্তি সন্তপুরুষদের। ধর্মরূপী শিক্ষার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির অসংগতির নিরাকরণে সহায়তা হয় এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব এক সূত্রে গ্রথিত হয়। গান্ধী মূলতঃ ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং উপবাস ও প্রার্থনা

ইত্যাদির দ্বারা তিনি এমন এক নূতন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা হবে নির্ভীক নির্লোভ ও ঘৃণাভাব বিবর্জিত। মানুষের অভিব্যক্তি এখনো হচ্ছে।

ধর্মীয় বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে চিন্তা করলে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করব যে, পরমাত্মার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কী পরিমাণ বৌদ্ধিক উদ্ভাবনী শক্তি, মানসিক আবেগ ও উদ্যমের বিনিয়োগ করা হয়েছে। অথচ সম্ভবতঃ পরমাত্মার সর্বাপেক্ষা সমীচীন ব্যাখ্যা হল নীরবতা অথবা কাব্য। ধর্মগুভমান থেকে ধর্মান্ধতার জন্ম হয়। এক মাত্র মূর্খ ও ধর্মান্ধ ছাড়া অপর কেউ নিজেদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় নন। ধর্মযুদ্ধকারীদের সঙ্গে যুক্তি তর্কের কোন অবকাশ নেই।

ভগবানের সামনে আর্য বা ম্লেচ্ছ, ধনী অথবা নির্ধন, প্রভু কিংবা ভৃত্যের কোন ভেদাভেদ নেই। এরা সবাই একই রাষ্ট্রসমবায়ের নাগরিক। একই পরিবারের সদস্য। গান্ধীর কাছে ধর্ম ছিল ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের উপায়। চল্লিশ বৎসরের উপর সত্যের এই অন্তরঙ্গ দর্শন লাভের জন্য তিনি বিপুল প্রয়াস করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ঈশ্বরকে কেবল এক পরম তত্ত্ব মনে করতেন না। এ ছিল তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ঈশ্বর। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি অনির্বাণ বিশ্বাসযুক্ত যথার্থ ভক্ত।

সত্যের আলো পবিত্র জীবনযাত্রায় প্রতিভাত হয়। যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে দমন করা যায় না। তিনি নেতৃত্ব করবেনই। কথা বলার সময় এলে তিনি নীরব থাকতে পারেন না। রুখে দাঁড়াবার সময়ে তিনি আপস করবেন না। সৌভ্রাত্রের নীতিতে গান্ধীজীর বিশ্বাস কোন চরমারাধ্য পরমতত্ত্ব ছিল না, প্রাত্যহিক জীবনে একে মূর্ত করার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি পরাজিত বা হতাশের পরামর্শ নয়। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গতি বিদ্যমান। পাপ অহমিকা ও প্রলোভনের কদর্য বাস্তবতার প্রতি আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। মানবপ্রকৃতি মূলতঃ সৎ এবং অত্যাচার অবিচার ও কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরোধী। ভয় অপরাধ ও দৈহিক শক্তির উপর আস্থা বর্জন করার জন্য গান্ধী মানব-হৃদয়ের কাছে আবেদন করেন। নিজের ধর্মকে তিনি নিজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যেসব বিবিধ সমস্যার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন তার নিরাকরণের জন্য এই ধর্মের প্রয়োগ করেছিলেন।

বহু শতাব্দী ধরেই কেবল নেতিবাচক অর্থে নয়, সদর্থক অর্থেও অর্থাৎ অপরাপর মতবাদে বিশ্বাসীদের কথা বোঝায় প্রয়াসের মাধ্যমে সহনশীলতার ঐতিহ্য

আমাদের ভিতর রয়েছে। সহনশীলতার অর্থ অপরের প্রতি ঔদাসীন্য নয়। এ হল অনুকম্পা ব্যতিরেকে বিশ্বাস। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসাদে দেশ-কালের দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। গভীরভাবে বিভক্ত হলেও মানবতা অন্তরঙ্গভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ মানবজাতির কল্যাণের জন্য মানুষের একমুখী হবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকেন। সাধারণ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হওয়াই ভবিষ্যতের আশাস্থল।

॥ ৩ ॥

বর্তমান বিশ্বে যেসব দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদ্যমান তার অনেকগুলির মূলেই রয়েছে স্বার্থের গুরুতর সংঘাত। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ এবং সরকারের মনোভাব, আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থেকেই এ সবের সৃষ্টি।

শান্তির অর্থ সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়, সংঘর্ষের সঙ্গে পাল্লা দেবার যোগ্যতার নামই শান্তি। সত্যাগ্রহের ভিত্তি ঘৃণা নয়, প্রেম—প্রতিপক্ষকেও ভালবাসা ও তার হৃদয় পরিবর্তনের জন্য নিগ্রহ বরণ করা। এ হল পাপের প্রতিরোধ, পাপীর নয়। আক্রমণাত্মক মনোভাব মানব-স্বভাবের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। যুযুধান বৃত্তির বদলে বিনম্রতা ও ভদ্রতার অনুশীলন করা যেতে পারে। সত্যাগ্রহ করতে হলে শৃঙ্খলা অপরিহার্য এবং এর জন্য প্রয়োজনে আত্মবলিদান, কৃচ্ছ্রবরণ, প্রায়োপবেশন, কারাগমন, এমন কি মৃত্যু বরণও করতে হতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই উচ্চতম আদর্শ সাধনের উপযুক্ত পন্থা পাবার অনন্য শক্তি রয়েছে। ক্রুশ এই সত্যেরই দ্যোতক যে নিগ্রহবরণকারী প্রেম নিগ্রহকারী শক্তির চেয়ে অধিকতর বলশালী।

॥ ৪ ॥

বর্ণবৈষম্য আজকের প্রবলতম সমস্যা। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ আজ এমন ভাবে কাছাকাছি এসে গেছে যার তুলনা অতীত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে জীবনের প্রথম ভাগে গান্ধীকে এই বর্ণবিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়। নিজ প্রতিবেশীদের ভিতর তিনি একটা উচ্চতর মানবিকতাবোধ—বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের ভিতর সামঞ্জস্য বিধানের মনোবৃত্তি জাগাবার প্রয়াস করেন। তিনি কুসংস্কার পরাভূত করার চেষ্টা করেন এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা স্বেচ্ছায় বর্জন করার আহ্বান জানান। বর্ণগত পক্ষপাত ও ভেদভাববৃত্তি সামাজিক ব্যাপার।

বর্ণবৈষম্যের সমস্যা মানবসৃষ্ট। বর্ণবৈষম্য কোন স্বতঃপ্রসূত ব্যাপার নয়—সামাজিক শিক্ষার পরিণাম। জাতিসমূহকে উচ্চ নীচ—এই ভাবে ভাগ করার মনোবৃত্তি সাম্প্রতিক ইতিহাসের ব্যাপার। মানবীয় অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র সকল জাতির ভিতর সাম্যের কথা বলে। মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তির মূল্যের উপর পূর্বোক্ত ঘোষণাপত্র জোর দেয়।

১৯৬৮ সনের ৫ই এপ্রিল শুক্রবার মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর শোচনীয় হত্যার সংবাদ শুনে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অহিংসার মাধ্যমে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতিগত ঐক্য স্থাপনার কাজ করার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৬৩ সনের মার্চ মাসে লিঙ্কনের সমাধিস্তম্ভের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর এক স্বপ্নের কথা বলেছিলেন :

"তাই আজ এবং আগামী কালের দুঃখকষ্ট আমরা ভোগ করা সত্ত্বেও আমি একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি, যে এক দিন এই জাতি উঠে দাঁড়িয়ে তার আদর্শের যথার্থ অর্থ অনুযায়ী জীবনযাপন করবে···এবং বুঝবে যে, সৃষ্টিলগ্নে সব মানুষই সমান। যে মিসিসিপি রাজ্য আজ অত্যাচারের অনল-তাপে হতচৈতন্য আমি স্বপ্ন দেখি যে, একদিন সেই রাজ্যও স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের মরুদ্যানে রূপান্তরিত হবে। স্বপ্ন দেখি যে, আমার ছোট ছোট চারটি সন্তান একদা এমন এক রাষ্ট্রে বাস করবে যেখানে গায়ের রং দিয়ে তাদের বিচার না করে তাদের গুণাগুণের মানদণ্ড হবে তাদের চরিত্র। এ স্বপ্ন আজ আমি দেখি এবং আমেরিকাকে যদি মহান জাতি হতে হয় তাহলে এ স্বপ্নকে সত্য হতেই হবে।"

হিংসার জয় স্বীকার না করে মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) তাঁর জীবন ও মরণে যে পদ্ধতিকে পবিত্র করে গেছেন, যদি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে আমেরিকা তার আত্মা ফিরে পাবে ও এক মহান জাতি হয়ে উঠবে। আর মানবতাও সত্যকার স্বাধীনতার অভিমুখে বহু ধাপ অগ্রসর হবে।

ভারতবর্ষে গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বিপুল প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বাঞ্ছিত সাফল্য অর্জন করেন নি। ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যর্থ হবার স্বীকৃতি। ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সময় দেশ বিভাজন সম্বন্ধে আমি তাঁর মনোভাবের কথা জানতে চাই। অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করে তিনি বললেন, "এটা কোন খুঁটিনাটির প্রশ্ন নয়, নীতিগত প্রশ্ন। সুতরাং মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোন রকম আপসের স্থান নেই।" নিজের

ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বললেন, "এখন কোন আন্দোলন শুরু করার মত বয়স আর আমার নেই এবং আমার বিশ্বাসভাজন সহকর্মীরা দেশবিভাজন স্বীকার করে নিয়েছেন।"[১]

জীবনের শেষ অঙ্কে তিনি হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ ও নৈরাশ্যপীড়িত। আততায়ীর গুলি তাঁর দেহে বিদ্ধ হবার পূর্বে প্রচণ্ড হতাশা তাঁর আত্মাকে ভর করেছিল।[২] দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে আজও সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঘটে থাকে। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখনও আমাদের বহু পথ চলতে হবে।

ধনী ও দরিদ্র জাতিদের বৈষম্য অশান্তির আর একটি কারণ। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জাতিসমূহের অনটন ব্যাধি অজ্ঞান ও নিরক্ষরতা অসন্তোষের নিত্য উৎস। দরিদ্র ও নূতন জাতিগুলি নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সচেতন হচ্ছেন এবং এর উন্নতি বিধানের জন্য তাঁরা উৎসুক। অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে আর কেউ রাজী নন এবং কেউ আর এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, এ অবস্থা তাঁদের বিধিলিপি। দরিদ্রদের যদি ক্ষুধার তাড়নায় মরতে না হয় তাহলে তারা অপরের সম্পদ গায়ের জোরে নিতে বাধ্য হবে। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হবে প্রতিহিংসা। এমন ভাবে সমাজের পুনর্গঠন করতে হবে যাতে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস পায়। গান্ধী ভারতবর্ষের বুভুক্ষু জনগণের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানবজাতির দরিদ্রতম ব্যক্তিটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়া এবং তার থেকে উচ্চমানের জীবন যাপন না করা। দরিদ্র দেশগুলিতে যে অপমান ও আক্রোশের ভাব বিদ্যমান তার নিরাকরণ করতে হলে মানবজাতির সমস্ত অংশের আর্থিক উন্নয়ন করা অপরিহার্য।

অশান্তির ভীষণ কারণগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষও পড়ে। গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা করেছিলেন।

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ যুক্তিযুক্ত মতবাদের চেয়ে বরং একটা আবেগপূর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক। ভারতীয় জনসাধারণের কয়েকটি সদ্‌গুণের উপর গান্ধীজীর আস্থা থাকলেও তিনি বলতেন যে, ভারতবর্ষ নিশ্চিহ্নে মুছে গেলে যদি পৃথিবীর কল্যাণ হয় তাহলে তিনি তাতে রাজী। কলকাতার রোটারী ক্লাবের সদস্যদের সম্বোধন করে ১৯২৫ সনের ১৮ই আগস্ট তিনি বলেন :

"আমাদের দেশের জন্য আমরা স্বাধীনতা চাই বটে কিন্তু অপরের ক্ষতি করে বা আর কাউকে শোষণ করে নয়—অপর কোন দেশকে অপমান করে আমাদের

স্বাধীনতা চাই না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলতে পারি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ যদি ইংলণ্ড বা ইংরেজ জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া হয় তাহলে সে স্বাধীনতা আমি চাই না। আমার দেশের স্বাধীনতা আমি এই জন্য চাই যাতে অপরাপর দেশ আমার স্বাধীন দেশের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে—যাতে আমার দেশের সম্পদ মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। আজ যেমন স্বদেশপ্রেমের নীতি আমাদের এই কথা শেখায় যে, গ্রামের জন্য ব্যক্তিকে, জেলার জন্য গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে এবং দেশের জন্য প্রদেশকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে, তেমনি কোন দেশের স্বাধীন হওয়া এই জন্য প্রয়োজন যাতে দরকার পড়লে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সেই দেশ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। সুতরাং স্বদেশপ্রেম বলতে আমি এই কথা বুঝি যে, আমার দেশ যেন স্বাধীন হয় এবং প্রয়োজন হলে যেন সমগ্র দেশ মৃত্যু বরণ করে মানবজাতির বাঁচার পথ প্রশস্ত করতে পারে।”[৩]

ইংরেজরা তাঁকে মনে করতেন গোলযোগ সৃষ্টিকারী। অক্সফোর্ডের সেণ্ট মেরীর ছাদের ভিতর দিকে যে কারুকার্য করা আছে তার স্থপতি মধ্যযুগের ঐতিহ্য অনুযায়ী কিছু সমসাময়িক ঘটনাকে রূপায়িত করেছেন যাতে ঐ কারুকার্যের কাল নির্ধারণে সহায়তা হয়। হাই স্ট্রীটের একটু দূরের দিকে যেখানে কয়েকটি সিঁড়ির উপর জিহ্বা প্রসারিত ব্রিটিশ সিংহের মূর্তি বিরাজিত, সেখানে একটি ক্ষেপা আয়ারল্যাণ্ডবাসী, রুশ ভল্লুক এবং কটিবাস পরিহিত চশমাযুক্ত গান্ধীরও মূর্তি রয়েছে। যাঁরা সেযুগের ব্রিটিশ সরকারকে খুব হয়রান করেছেন এঁরা তাঁদেরই কয়েকজন। অহিংস অসহযোগের আন্দোলন ব্রিটিশ অহমিকাকে আহত করেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা ঘটে।[৪] আর এর পরই আরও বহু রাষ্ট্র স্বাধীন হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আফ্রিকার কোন কোন অংশে এখনও সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলছে।

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের কারণ আজ বিশ্ব বিভক্ত। মানুষ নিজের আদর্শকে ষোল আনা সত্য এবং অপর পক্ষের আদর্শকে ষোল আনা মিথ্যা মনে করে। গ্রীক ও বার্বারিয়ান, রোমক ও কার্থেজবাসীদের আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই সব সংঘর্ষ ধর্মীয় বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করে আসছে। প্রধান সমস্যা হল অপরের এবং নিজেদেরও মধ্যেকার অবিশ্বাসের ভাব দূর করা। আমরা যদি মনে করি যে, আমরা যা বিশ্বাস করি তা পুরোপুরি সত্য তাহলে

অপরের বক্তব্য বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়। সত্য ও প্রচারকার্যের মধ্যে আমাদের পার্থক্য করতে শিখতে হবে।

হরিজন ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে এবং পুরুষ ও নারীকে সম মর্যাদা দিয়ে গান্ধী ভারতবর্ষে এক সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সংহতির এই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, অদ্যাবধি এ ক্রিয়াশীল। অজ্ঞান মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে এবং তারা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ধন সম্পত্তির ক্ষতি করে থাকে। এ সমস্যার মূলে রয়েছে অজ্ঞান, পারস্পরিক অবিশ্বাস, ভেদভাব ও কর্ম সংস্থানের সুযোগের অভাব। বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে এই সব সমস্যার সমাধানে লেগে পড়তে হবে। ক্রুদ্ধ প্রতি-ক্রিয়ার সময় এটা নয়। হিংসার শরণ নিয়ে আমরা নিজেদেরই নিজেরা আঘাত করি। উচ্ছৃঙ্খল জনতার রাজত্বে ও বেআইনী আচরণের পরিবেশে স্বাধীনতা, সমান সুযোগ ও সামাজিক ন্যায়-বিচার ইত্যাদি কোন কিছুরই অবকাশ থাকে না।

তথাকথিত যুব আন্দোলন, ছাত্রদের আচরণ এবং ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি দুর্ভাগ্যক্রমে সংযমের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট জোর দেয় না। কিছু কিছু লোকের অভিযোগের কারণ থাকলেও সেই অভিযোগের অজুহাতে পূর্বোক্ত আন্দোলনসমূহ স্বৈরাচারের পোষকতা করে এবং বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করার মনোবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করে। এ সব হল নবজাগ্রত জাতির প্রতিবাদাত্মক মনোভাবের প্রতীক। জাতিসমূহকে যদি নিজ নিজ আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয় তাহলে তাঁদের জনজীবনের ক্রমবর্ধমান অসাধুতা ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রের নিত্যবর্ধমান দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা যে ধর্মমতেরই অনুগামী হই না কেন আত্মসংযম তার প্রাথমিক দাবি। উপনিষদে বলা হয়েছে—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। আত্মোৎসর্গের বৃত্তি চালিত হয়ে আমাদের বৈপ্লবীক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করতে হবে।

ইতিহাস থেকে আমাদের এই পাঠ নিতে হবে যে, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলেই মহৎ সংস্কৃতির জন্ম হয়। ইহুদী ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রীক চিন্তাধারা ও রোমান সংগঠনের সংমিশ্রণের ফলে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার আবির্ভাব হয়। আজ মহান সংস্কৃতিগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তাই মানুষকে তার বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে। চৈতন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে মানবজাতির ঐক্য ও মুক্তি সংসাধিত হবে।

॥ ৫ ॥

এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে যেখানে যোগাযোগ, পরিবহন ব্যবস্থা ও মহাশূন্য অভিযানের পদ্ধতিতে নিত্য নূতন উন্নতি ঘটছে! মানুষ সেখানে হয়ে পড়ছে পরিত্যক্ত। আজকের জগতে সে নিছক একটি বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। তার আশা-আকাঙ্খা বর্ধিত উৎপাদন ও উপভোগ-রূপী ভৌতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হলেও অতীব দুরূহ। আমাদের জীবনচর্যায় ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন স্থান নেই। ব্যক্তিগত জীবনের অভীপ্সা আমাদের ভিতর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। আমরা এমন এক অসহায় বস্তুতে পরিণত হয়েছি যার কোন স্বাধীনতা বা পদক্ষেপের স্বাতন্ত্র্য নেই। বিশাল এক যন্ত্রের আমরা ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র কলকব্জায় পরিণত হই এবং এই যন্ত্রদানবের হিতসাধনের উল্লাসে সোৎসাহে আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিই।

বর্ণ জাতি বা ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে মানবজাতির প্রতি আনুগত্য-চালিত হয়ে তার নিরাকরণ করতে হবে। কারণ বর্ণ জাতি বা মতবাদ সংক্রান্ত তাবৎ আনুগত্যের তুলনায় এই মানবীয় আনুগত্যের স্থান উর্ধ্বে।

গান্ধীজীর অহিংসা মানবপ্রকৃতির উচ্চতর বিভূতির উপর নির্ভরশীল যা অত্যাচার অবিচার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই মূল্যবোধের উৎস মানুষের হৃদয় ও তার ইচ্ছাশক্তি। গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, মানব-স্বভাবে শান্তি ও স্বাধীনতার উদগ্র প্রেরণা আছে। যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়া তাঁর লক্ষ্য মানব-হৃদয়ে এখনই তা সার্বজনীন ভাবে বিদ্যমান—তবে হয়ত বা প্রচ্ছন্ন ভাবে। রাজনৈতিক সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রস্থ অনিষ্টকারক শক্তিসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ করে একে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে হবে। গান্ধীর কাছে অহিংসার তাৎপর্য হল একটা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ যার পরিণামে ভয় লোভ ক্রোধ ও অপরাধকে পরাভূত করতে হবে। যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তিনি আমাদের ভিতরকার চৈতন্যশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা নিছক পশু নই—আমরা মানুষ। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল এক যুক্তি-নির্ভর বিশ্ববিধানের অভিমুখে মানুষের প্রগতিকে এগিয়ে দেওয়া। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব-সমাজ গড়তে পারি। এতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াকে আমাদের ভীতি ঘৃণা ও যুদ্ধবিহীন পৃথিবী রচনায় অভিমুখী করতে হবে। সাফল্য

লাভ করার পক্ষে এটা অত্যন্ত উচ্চাশা ছিল। গীতায় ভগবান বলছেন, "তোমার ব্যর্থতা আমাকে দাও।" ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করার ঘটনা দিয়ে বিচার করলে যীশুর প্রয়াস ব্যর্থ বলতে হয়। কিন্তু তার পরিণামে ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে।

ঘুরে ফিরে প্রায়ই একটি সনাতন প্রশ্ন শুনতে হয়: কোন অপ্রতিরোধ্য শক্তি যদি কোন স্থাবর দেহের সম্মুখীন হয় তাহলে কি হবে? যতক্ষণ না চৈতন্যশক্তি পরিবেশকে পরাভূত করে নিজের মত করে গড়ে নিতে পারছে ততক্ষণ এর পরিণামে এক অচিন্তনীয় ওলট-পালট ঘটবে। উদ্‌বেলতা হবে নব সৃষ্টির জননী। গান্ধীর "ব্যর্থতা" প্রকৃতিস্থতা ও শান্তি ভিত্তিক বিশ্বের আদর্শকে সন্নিকটবর্তী করেছিল।

আদর্শের রূপায়ণ সম্ভবপর মনে করে আমাদের কাজ করতে হবে। যতটুকু সম্ভবপর হোক না কেন, অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। শান্তি করায়ত্ত হয় না, তার জন্য নিরন্তর অভীপ্সা পোষণ করতে হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রতীয়মান হলেও গান্ধী গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি ও স্বাধীনতার যুগকে মূর্ত করা সম্ভবপর এবং এটা আমাদের আয়ত্তাধীন। ঈশ্বরের রাজ্য হাতের কাছেই। বিশ্বাসী ও আত্মোৎসর্গকারী মানুষ এবং যাঁদের মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা আছে ও যাঁদের মানসিক সুস্থতা বিদ্যমান, তাঁরা গান্ধীর আদর্শের অনুগামী এবং তাঁরাই নূতন ভবিষ্যতের স্রষ্টা। তাঁরাই ভবিষ্যতের আশা ও সম্ভাবনা। সামাজিক নববিধান গড়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষে উন্মাদ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশ্বে গান্ধী প্রেম ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অমর প্রতীক। তিনি যুগ যুগের। তিনি ইতিহাসের।

১. ১৪ই জুলাই ১৯৪৭; প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন, "আমার অন্তরঙ্গতম বন্ধুরা যা করেছেন বা করছেন তার সঙ্গে আমি সহমত নই।"

২. ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭; তাঁর শেষ জন্ম দিবসে সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, "অভিনন্দনের কথা কোথা থেকে ওঠে? একে বরং শোকের সান্ত্বনাবাক্য বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমার অন্তরে দুঃসহ যাতনা ছাড়া আর কিছু নেই।"

৩. টেণ্ডুলকর লিখিত "মহাত্মা", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩।

৪. ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে লর্ড এটলী চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আমেরিকার জনৈক সাংবাদিক এটলীকে বলেন, "ভারত ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আপনার কর্মসূচীর সঙ্গে আমি নীতিগত ভাবে সহমত। কিন্তু এ কথা না ভেবে আমি থাকতে পারছি না যে, আপনি বড় তাড়াহুড়া করেছেন। আর কয়েক বছর দেরি করে এ জাতীয় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আরও ধীরে ধীরে আনলে ভাল হত না?" এর উত্তরে লর্ড এটলী বলেন, "ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে আমরা আরও দুই তিন বছর আমাদের অধীনে রাখতে পারতাম এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু অর্থ ও মানবজীবন ব্যয় করেই তা সম্ভবপর হত। আর এ রকম করলে সুনিশ্চিত ভাবেই ঐ দেশগুলি মনে অত্যন্ত তিক্ততা নিয়ে এবং চিরতরে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার সঙ্কল্প সহ স্বাধীন হত। তিক্ততা ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন কমনওয়েলথ গঠন করা যায় না বা বজায় রাখা যায় না। সখ্যতা ও সাধারণ স্বার্থই এর একমাত্র নিরাপদ বনিয়াদ। যে-সব দেশ শত্রু হতে পারত তাদের আমরা বন্ধুতে পরিণত করেছি। এর জন্য ঝুঁকি নেওয়া চলতে পারে।"

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের বনিয়াদ

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উপযুক্ত অহিংসা-ভিত্তিক এক নবীন পদ্ধতির উদ্ভাবনকারীরূপে দেশ-বিদেশের জননায়কেরা গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গান্ধীজীর শিক্ষা একটি "পদ্ধতি"—এই ধারণা বহুবিধ বিকৃতি ভ্রান্তি এবং বলা বাহুল্য আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। অহিংসা একটা সহজ সরল যন্ত্র নয় যার দ্বারা আপনারা এমন কিছু পেতে পারেন গান্ধী-পূর্ব যুগে যা হিংসার সহায়তায় পেতেন। "পদ্ধতি" শব্দটি যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে বলব যে, মহাত্মা গান্ধীর পদ্ধতি ছিল অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে প্রেম ও সত্যকে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা কোন রকম যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল না। এ হল ঈশ্বর এবং তাঁর অন্তিম সার্ব-ভৌমত্বের ভিত্তিতে পাপের প্রতিরোধ করা।

আত্মার শক্তির উৎস হল ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ধর্মে যথার্থ ভক্তি। গান্ধীজী যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার অনুসরণ করছি বলে বহুক্ষেত্রে নৈষ্ঠিক অনুগামীরা যে অহিংসার আচরণ করেন তা হিংসারই রকমফের মাত্র। কেবল লাঠি ছোরা বা পিস্তলের সাহায্য না নেওয়াকে অহিংসা বলে না। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের যথার্থতা সম্বন্ধে যেখানে আস্থার অপ্রতুলতা আছে সেখানে পুরাতন যুগের হিংসার মতই অহিংসাও ব্যর্থ হবে।

সবাই মোটামুটি একথা জানেন যে, গান্ধীজী যে অহিংস পন্থা প্রদর্শন করেন তা হিংসার নিছক রকমফের নয়। তবে যে-কথা সবার ততটা জানা নেই তা হল এই যে : হৃদয়ে বিদ্বেষ ও বিষের জ্বালা নিয়ে স্থূল হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকলেও তাকে অহিংসা বলা যায় না। গান্ধী-পরিকল্পিত সত্যাগ্রহের উদ্‌গম-ভূমি হবে এমন মানুষের হৃদয় যিনি প্রেমের পথে হিংসা ও পাপের উত্তর দিতে চান। অপর পক্ষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে নিজ দেহকে কাজে লাগানোর নাম সত্যাগ্রহ নয়। এ হল প্রতিপক্ষের দৈহিক হিংসার বেদীমূলে নিজের দেহকে উৎসর্গ করে দেওয়া।

এ কথা বলা সহজ যে, প্রেম ও সত্যকে গান্ধীজী বিদ্বেষ মিথ্যাচার ও হিংসার শক্তিশালী উত্তররূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। আরও বলা সহজ যে, প্রেম ও সত্যের এই শক্তি বর্ণবিদ্বেষ, আর্থিক অসাম্য ও রাজনৈতিক কারণ সঞ্জাত

সংঘর্ষের নিরাকরণ করতে পারে এবং তা করার একমের পন্থা। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপার অত সহজ নয়। যিনি আপনার মনে এত বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হয়েছেন তাঁকে ভালবাসবেন কি করে? নিগ্রোরা কি ভাবে শ্বেতাঙ্গদের ভালবাসবেন? কোন স্বদেশপ্রেমী পাকিস্তানী কি ভাবে ভারতবাসীদের ভালবাসবেন অথবা কোন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমীই বা কি করে পাকিস্তানীদের ভালবাসতে পারেন? এ তো অসম্ভব কথা! গান্ধীজীর পন্থা যাতে করে কোন অসার মতবাদ অথবা ব্যর্থ পদ্ধতিতে পর্যবসিত না হয় তার জন্য প্রেম এবং সত্যের শক্তিকে ঈশ্বর ও মানব-হৃদয়ের উপর তাঁর দৃঢ় সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসের উৎসের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। শেক্সপীয়রের বর্ণনায় আমরা পাই যে, এনোবার্বুস তাঁর পক্ষ ছেড়ে দিয়ে শত্রুপক্ষে যোগদান করার পরও মিশরে মার্ক অ্যাণ্টনি তাঁর ধনসম্পত্তি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। ভিক্টর হুগোর উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই যে, জঁ্যা ভালজঁ্যা প্রথম রূপার মোমবাতিদানটি চুরি করার পর বিশপ দ্বিতীয় বাতিদানটিও তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। উভয় ক্ষেত্রেই যে হৃদয়-পরিবর্তন ঘটে তা কোন নূতন "পদ্ধতির" বিজয় নয়, এ হল ঐশী বিধানের প্রতিক্রিয়া।

সংশয়ী অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ও এই জগতে যা কিছু দেখা যায় তার শ্রেণী বিভাজনে তৃপ্ত ব্যক্তির জন্য সত্যাগ্রহ নয়। খুব সুন্দর একটি ফাউণ্টেন পেন আপনার কাছে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে যদি কালি না থাকে অথবা কালির বদলে যদি জল ভরেন তাহলে তা দিয়ে লেখা যাবে না। গান্ধীজীর কর্ম থেকে আমরা যেন সঠিক পাঠ পাই এবং তাঁকে যেন কোন নিছক আবিষ্কারক বলে মনে না করি। তিনি কোন আবিষ্কারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঈশ্বরময়।

ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী

ডঃ জাকির হোসেন

স্বয়ং আমি ভারতবাসী বলেই হয়ত আমার পক্ষে অন্য অনেকের চেয়ে অনেকটা স্বাধীন ভাবে ও আত্মবিশ্বাস সহকারে ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বলা সহজ। এই ভারতভূমিতেই বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ গান্ধীজী ছিলেন, এবং অবিরত ও অবিশ্রান্ত ভাবে কথা বলেছেন, লিখেছেন ও কাজ করেছেন। আবার আততায়ীর গুলি যখন তাঁকে বিদ্ধ করল এবং নিজের স্বদেশবাসীর ভিতর শান্তি ও শুভেচ্ছা সৃষ্টি করার জন্য অতুলনীয় গৌরবে তিনি যখন শহীদ হলেন তখন তাঁর মরদেহ এই ভারতবর্ষেরই ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিল এবং তাঁর রক্তে এই দেশেরই মৃত্তিকা সিঞ্চিত হয়েছিল। তবে বিশ্ব-ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে মানব মন ও তার প্রতিক্রিয়াকে ভারতীয় ও অভারতীয়—দুই দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমার কাছে সমগ্র মানব-পরিবার এক ও অবিভাজ্য। আর গান্ধীজীও কেবল ভারতবাসী ছিলেন না অথবা তিনি শুধু ভারতেরই ছিলেন না। আমাদের জ্ঞাত যাবতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের তিনি আত্তীকরণ করেছিলেন। আজও আমরা দেখতে পাই যে মানবসমাজ মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের কেন্দ্র বিন্দুতে যেসব সমস্যা ছিল তার চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। 'অখণ্ড জগৎ'-এর আদর্শ আজকের মত আর কখনও সম্ভাবনার গণ্ডিতে ধরা দেয় নি। আবার আজকের মত আর কখনও এ আদর্শ মরীচিকার মত মনেও হয় নি। সুতরাং আমার কথা যদি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছায় তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলার দায়িত্ব পালনে আমি যেন কুণ্ঠিত না হই। অবর্ণনীয় আবেগে অভিভূত চিত্তে আমি উপলব্ধি করছি যে আমরা গান্ধী শতবার্ষিকীর সন্নিকটবর্তী হচ্ছি।

জানা মানে যদি বোঝা হয় এবং বোঝার অর্থ যদি হয় গ্রহণের সম্ভাবনার সূত্রপাত তাহলে আমি বলব যে ভারতবর্ষে আমরা যারা গান্ধীজীর বাণীকে মূল্যবান মনে করি তাদের কর্তব্য হল এই বাণীকে আমাদের সাধ্যমত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। তবে আমাদের পক্ষে ততক্ষণ একাজ করা সম্ভবপর হবে না যতক্ষণ না আমাদের নিজের ভিতরই কিছুটা এই বিশ্বাস জাগে যে, গান্ধীজী যে আদর্শের প্রতীক ছিলেন এবং তিনি যা করে গেছেন মানব জাতির

কাছে তা অসীম গুরুত্বপূর্ণ। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, একের পর এক শতাব্দী এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির বিবর্তনে গান্ধীজীর প্রভাব উত্তরোত্তর অধিকতর মহত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হবে।

ইতিহাসের আরও অনেক মহাপুরুষের মত গান্ধীজীও এমন সব ভাবধারা ও কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সমসাময়িক পরিবেশ ও কালের সঙ্গে যার সম্বন্ধ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী এবং সম্ভবতঃ সর্বকাল ও সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তা কার্যকরী নয়। গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও কর্মের এজাতীয় নশ্বর অঙ্গ বর্জন করার দায়িত্ব আমরা অসঙ্কোচে ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তবে গান্ধীজীর কাছ থেকে আমরা যে মৌলিক বিচারধারা এবং সমপরিমাণ মৌলিক কর্মপদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা পেয়েছি তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আজ আমাদের যেন ভুল না হয়। গান্ধীজীকে কেবল একজন সন্তপুরুষ রূপে স্মরণ করা ভুল হবে। কারণ তিনি গভীর ভাবে এই জগতের কার্যকলাপ—আধুনিক ভারত ও বিশ্বের রাজনৈতিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় যুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী যার ভিতর আধ্যাত্মিক নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিপূর্ণ জীবনবোধের সুমহান অভিব্যক্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। আমাদের স্মরণপথে এমন কোন নেতার কথা উদিত হয় না যিনি তাঁর মত নিজের মধ্যে একই সময়ে এমন সুচারু রূপে মানবের অন্তরাত্মার বাণী ও ঐহিক জীবনের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজীর মানসভূমিতেই কেবল আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক প্রগতি অবিচ্ছেদ্য ছিল না, যেসব উন্নয়নমূলক কাজের তিনি ছিলেন প্রতীক সেখানেও ছিল এই অদ্বৈতের প্রভাব। গান্ধীজীকে বোঝার চেষ্টা করার সময় এই সমন্বয়ের কথা মনে রাখতে হবে। আমি অবশ্য এই দাবি করছি না যে, আমার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বা সকলকে এটা মানতে হবে। আমার পাঠকেরা যদি খোলা মন নিয়ে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের প্রতি নূতন করে দৃষ্টিপাত করেন তাহলেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি বোধ করব।

গান্ধীজী মূলতঃ পৃথিবীর নৈতিক বিধানরূপী সেই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যার কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই। ব্যক্তি সমাজ অথবা জাতি কেউই নিজের সর্বনাশ না করে এই নৈতিক বিধানের বাইরে থাকতে পারে না। গান্ধীজী কখনও একথা স্বীকার করেন নি যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা জাতির নৈতিক মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রাখতে হলে ব্যক্তি এবং জাতিকে

রাজনীতি ও অর্থনীতির যন্ত্র নৈতিক বিধানের মধ্যেই চালাতে হবে। নৈতিক বিধানে রাজনৈতিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক—সর্ববিধ শোষণ বর্জনীয়। সমভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক অপরের উপর সর্বপ্রকারের আধিপত্যও নৈতিক বিধানে নিষিদ্ধ। গান্ধীজী বার বার বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সাধারণ্য ও জাতীয় নৈতিকতার মধ্যে কোন রকম পার্থক্য হতে পারে না। নৈতিক মানদণ্ডের বিশ্বজনীন প্রয়োগের এই নীতি স্বীকার করার তাৎপর্য এমনই সুদূরপ্রসারী যে, আমাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই চ্যালেঞ্জ যথাযথ ভাবে গ্রহণে ইচ্ছুক। অথচ আমরা যদি একে স্বীকার না করি তাহলে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিস্পর্ধা ও পারমাণবিক অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে মানব-সমাজের কোন ভবিষ্যৎ আছে?

যতই বৈপ্লবিক, অপরিহার্য অথবা মহান লক্ষ্য হোক না কেন তার সংসাধনের জন্য শুদ্ধ পন্থার উপর গান্ধীজী যেভাবে জোর দিতেন তার কথা সবারই জানা আছে। তাঁর কাছে শুদ্ধ পন্থার অর্থ প্রেম ও অহিংসাভিত্তিক কর্মসূচি ছাড়া অপর কিছু নয়। অহিংসা অর্থাৎ সক্রিয় প্রেম—এই ছিল তাঁর সহজ সরল ব্যাখ্যা। সুতরাং ঘৃণা ও হিংসা অশুদ্ধ পন্থা। নিষ্ঠুরতা সন্ত্রাস ও হিংসাকে তিনি তাই সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলেন। সুতরাং একমাত্র অহিংসা ছাড়া অপর কোন কর্ম-পন্থাই আর আমাদের সামনে থাকে না। 'সত্যাগ্রহ' গান্ধীজীর শব্দভাণ্ডারে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যার মূল অর্থ হল অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আমাদের মনে যেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে যে, গান্ধীজী জোর দিতেন নিছক অহিংসার উপর নয়, অহিংস কার্যক্রমের উপর। গান্ধীজীর অহিংসার তাৎপর্য হল তাবৎ অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা। তাই অহিংসা পর্বতের মত সুপ্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্ভবতঃ গান্ধীজীরই সমসাময়িক। আমাদের একথাও ভুললে চলবে না যে, সত্যাগ্রহ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এটা হল ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সর্বসাধারণকে অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার প্রক্রিয়া। গান্ধীজী কেবল সত্যাগ্রহের আবিষ্কারই করেন নি এমন তিনটি মহান অহিংস আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত করেছিলেন যাতে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারী অংশগ্রহণ করে পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন ভারতের সাধারণতন্ত্রে উত্তরিত করে। ইতিহাসের কোন সত্যনিষ্ঠ ছাত্রই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রবাহ হচ্ছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত

এই অহিংস বিপ্লবতত্ত্ব। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের আবিষ্কার ও অনুশীলন করার পূর্বে মনে হত যে, ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধানই হল এই যে, দুর্বলকে সবলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর এটা আর আমাদের ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধান নয়। দৈহিক দিক থেকে দুর্বল কিন্তু নৈতিক শক্তিতে বলবান মানুষ সত্যাগ্রহে দৈহিক দিক থেকে সবল কিন্তু নৈতিক দিক থেকে দুর্বলের বিরুদ্ধে লড়াই-এর একমেব সাধন খুঁজে পেল। অতএব সত্যাগ্রহপ্রেমীরা যে একে সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এর সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মনে করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবী যতই সত্যাগ্রহের অর্থ ও শক্তি উপলব্ধি করবে, যারা একদা দুর্বল ও অসহায় বিবেচিত হত তাদের কাছ থেকে অত্যাচার ও অবিচার ততই প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এমন কোন অত্যাচার বা প্রভুত্বকাঙ্ক্ষা নেই যা এমন সব লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে যারা আত্মসমর্পণ করার বদলে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মৃত্যু বরণে প্রস্তুত।

এর পর রয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করার গান্ধীজীর শিক্ষা। তিনি তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার তাবৎ প্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখনও কোন না কোন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। এদের আভ্যন্তরীণ শক্তি আবিষ্কারের জন্য তিনি এদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করতেন এবং এর দ্বারা রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপনার চাবিকাঠি রয়েছে যাবতীয় মহান ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ ও সহনশীলতার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুশীলন এবং খোলা মনের চর্চা। রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী ধর্ম ও নীতিমত্তার মনোভাব ব্যতিরেকে যাবতীয় ধর্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে অথবা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কারণে সৃষ্ট জড়বাদের প্রবল প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধর্মের ভিতর নিহিত আবেগরাজিকে মানবের স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচাররূপী মহৎ আদর্শের পরিপূর্তির জন্য কাজে লাগান যায় একথা সংশয়াতীত ভাবে আমাদের এই যুগের যে মহান রাজনৈতিক নেতা প্রমাণ করেন তাঁর নাম হল মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধীজী যে নতুন গণতন্ত্রের ধারণার সৃষ্টি করেন তার প্রভাব আমরা এড়াতে পারি না যদি আমরা যথার্থ গণতন্ত্রবাদী হতে চাই। রবীন্দ্রনাথ যাকে সবার পিছে সবার নীচে বলেছেন গণতান্ত্রিক সমাজে তাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত

ও যোগ্যতমের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরঙ্কুশ শাসনব্যবস্থা অথবা যতই দৃঢ়সংবদ্ধ বা বিপ্লবী হোক না কেন সংখ্যালঘুর একনায়কত্বকে গান্ধীজী গণতন্ত্র বলে স্বীকার করতেন না। তিনি বরাবরই এই ধারণার বিরোধী ছিলেন যে অপেক্ষাকৃত বলবানেরা স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলেরা কোণঠাসা হবে। গণতন্ত্রকে তার নামের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে কেবল সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্ন নিলেই চলবে না, জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও সামগ্রিক কল্যাণবিধান হবে এর লক্ষ্য। অহিংস সংগ্রামের দ্বারা জাতি ও শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠন এবং শান্তিময় উপায়ে তার সংরক্ষণ ছিল তাঁর অভীষ্ট। সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রসারী এই নূতন গণতন্ত্রের ধারণার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'সর্বোদয়' এবং বর্তমান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'সর্বোদয়ের' বিচারধারার ভিতর গণতন্ত্রের সর্বাধুনিক ধ্যান-ধারণার সমাবেশ হয়েছে।

ব্যক্তির পূর্ণতম সংহতি বিকাশ ছিল গান্ধীজীর কাম্য। কিন্তু বার বার তিনি জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, কেবল পূর্ণমাত্রার ন্যায়পরায়ণ ও শোষণরহিত সমাজ-ব্যবস্থাতেই পূর্বোক্ত আদর্শের সিদ্ধি সম্ভবপর। নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সমাজ তাঁর কাছে ছিল অবিচ্ছেদ্য। গান্ধীজীর কাছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড ছিল ন্যায়-বিচার ও বিকাশের সুযোগের ক্ষেত্রে এমন একটা সাম্যমূলক ব্যবস্থা যাতে প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভা অনুযায়ী বিকাশের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে পারে এবং দুর্বলতমও যেন নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি করার পূর্ণতম সুযোগ পায়। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর শরীর মন ও বুদ্ধির প্রতিটি অবদান সম্পূর্ণ-ভাবে এবং অবাধে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরদের সেবার জন্য নিয়োগ করতে হবে। আর এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে শিক্ষা, আইন প্রণয়ন ও যেখানে একান্তভাবে অপরিহার্য—সত্যাগ্রহের দ্বারা। এইখানে গান্ধীজীর সামাজিক ন্যাসবাদের মূল-তত্ত্বের কথা আসে এবং এটা এখনও আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণতঃ অধিগত আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবার অপেক্ষা রাখে।

অতীব নম্রতা ও আন্তরিকতা সহকারে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। আমাদের এই যুগ কি এজাতীয় এক মৌলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নেতার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে যাঁর ভিতর উচ্চতম মনীষার সঙ্গে সঙ্গে বিশালতম হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছিল, যিনি ছিলেন একাধারে অত্যুচ্চ আদর্শবাদ ও মাটির পৃথিবীর বাস্তববাদী যোগ্যতার প্রতীক এবং যাঁর ভিতর অহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে

বিপ্লবী কার্যক্রম মূর্ত হয়েছিল তাঁর গভীরতম সত্য ও করুণানিষ্ঠার মাধ্যমে? আমাদের রাজনীতিকে পরিশুদ্ধকারী ও অর্থব্যবস্থাকে মহীয়ানকারী গান্ধীজীর নীতিশাস্ত্র ব্যতিরেকে, পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিরোধকারী ও বিশ্বকে নিরস্ত্রীকরণের অভিমুখে পরিচালনকারী তাঁর অহিংসার আদর্শ ছাড়া, সমাজের দীনতমের নিরাপত্তা ও বিকাশের নিশ্চয়তাদানকারী তাঁর গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা ছাড়া এবং সর্বোপরি তাঁর বাঞ্ছিত ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভূমিকার সমন্বয়-সাধন ব্যতিরেকে মানব জাতির মুক্তির বিশেষ আশা নেই। হয় এই শতাব্দী গান্ধীজীর বাণীতে কর্ণপাত করে ন্যায়বিচার সাম্য ও শান্তির দ্যোতক নূতন বিশ্ব-বিধান রচনা করার অভিমুখে অগ্রসর হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হবে আর নচেৎ তাঁকে উপেক্ষা করে শনৈঃ শনৈঃ সর্বনাশের সেই কিনারে উপনীত হবার শোকাবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করব যেখানে কেবল পারমাণবিক মারণাস্ত্রের স্তূপ বিরাজিত। গান্ধীজীর কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা হোক একথা আমি বলতে চাই না। তবে আমার সর্বশক্তি দিয়ে অবশ্যই আমি একথা বলব যে আমাদের এই যুগে অত্যন্ত সঙ্গতিসহকারে অসঙ্কোচে ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি যে সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন, তার সম্বন্ধে ব্যাপকতর অধ্যয়ন ও উপলব্ধির গভীরতর প্রয়াস হোক।

সত্যের সন্ধানে

বিনোবা ভাবে

যীশু খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্যে কে প্রবেশ করতে পারবে? ঘটনাস্থলে একটি টেবিল ছিল এবং তার উপর বসেছিল কয়েকটি শিশু। যীশু একটি ছোট্ট শিশুকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে বললেন যে, যারা শিশুর মত হবে তারাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেনতিষ্ঠাসেৎ—ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল জ্ঞান পরিপাক করে বালভাবে থাকা। জ্ঞান পরিপাক করে অজ্ঞানে পরিণত হবে। জ্ঞানের পরিপাক করে বালকের মত হয়ে যাবে। একথা উপনিষদের। এবং ব্রহ্মসূত্রেও এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বালভাবে থাকার অর্থ কি? বালবৎ কামচারবাদভক্ষতা—অর্থাৎ বালকেরা যেমন ধূলা মাটি যত্রতত্র হাত দেয় বা যা পায় মুখে পোরে সেই রকম কি? না, অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ। অর্থাৎ বালকদের মত দম্ভরহিত। যথার্থ স্বরূপে অপরের নিকট নিজেকে উপস্থাপিত করা হল এর লক্ষ্য। শিশু কোন কিছু গোপন করতে জানে না। শৈশবে আমরা পরমাত্মার নিকটে থাকি।

প্রধান কথা হল এই যে, শিশুদের মধ্যে দম্ভ থাকে না। শিশুরা রাগও করে। প্রায়ই শিশুদের রাগতে দেখা যায় এবং যাকে আমরা 'মিসচিফ' বলি তাও শিশুদের স্বভাবে থাকে। কিন্তু এমন শিশু দেখতে পাবেন না যে কিছু গোপন করে অর্থাৎ মিথ্যাচার জানে। এবং যেদিন থেকে দেখা যাবে যে শিশু মিথ্যা কি তা জানে, বুঝে নিতে হবে যে আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া তার শুরু হয়ে গেছে। পিতা মাতা তাকে নিজেদের বুদ্ধির কিছুটা দিয়েছেন।

গান্ধীজীর ভিতর যেমন বহুবিধ গুণ ছিল তেমনি দোষও নিশ্চয় কিছু না কিছু ছিল। প্রতিটি মানুষের ভিতরই দোষ গুণ দুই-ই থাকে। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, তিনি কিছু গোপন করতে জানতেন না। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন যে, এই সত্যের ঢালের জন্যই জীবনে শতবিধ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সত্যকে তিনি ঢালের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গান্ধী-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সমগ্র জীবনে তিনি বহুবিধ প্রয়াস করেন। ক্রমশঃ তাঁর শক্তি বাড়তে থাকে। কপিল মুনি—যিনি শৈশবেই পরম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মত অলৌকিক প্রতিভার অধি-

কারী গান্ধীজী ছিলেন না। অথবা তিনি শঙ্করাচার্যের মতও ছিলেন না যিনি আট বৎসর বয়সে বেদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে গান্ধীজী এজাতীয় মহাপুরুষদের পর্যায়ে পড়েন না। তা যদি হতেন তবে তিনি আমাদের কাজে লাগতেন না। তাহলে আমরা হয়ত তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতাম আর বলতাম যে প্রভু, আপনি আপনার স্থানে থাকুন আমরা থাকব নিজেদের জায়গায়। আমরা আপনার অনুকরণ করতে অক্ষম। আপনি মহান—সূর্যনারায়ণের মত মহান। কিন্তু আমাদের তো এই ধূলার ধরণীতে বিচরণ করতে হবে। আপনি আমাদের প্রণম্য; কিন্তু আমরা আপনার অনুগামী হতে পারব না। আমরা আপনার থেকে ভিন্ন শ্রেণীর। আপনি যক্ষ কিন্নর গন্ধর্বের পর্যায়ে এবং আমরা হলাম সামান্ত মানব।

কিন্তু গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমরা এসব কথা বলতে পারি না। আমাদের প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে, জন্মসূত্রে গান্ধীজী একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁকে পরিশ্রম করে মহাত্মা হতে হয়। তাঁর সমগ্র পরাক্রম এই জন্মের। পূর্ব জন্মের কোন সিদ্ধি নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হলে তিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হতেন বটে, কিন্তু অনুকরণীয় হতেন না। কিন্তু জন্মান্তরের কোন সিদ্ধি নিয়ে তিনি আসেন নি। তাঁর যদি কোন সিদ্ধি থাকে তবে তা হল সত্যনিষ্ঠা।

আজ আমরা যখন তাঁর স্মরণ করছি তখন আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে তাঁর চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। নচেৎ তাঁকে অবতার জাতীয় কোন কিছু করে তুললে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আর এই জন্ম গান্ধীজীর মানব-স্বরূপ আমাদের বজায় রাখতে হবে। তাঁর কোন সম্প্রদায় বা পন্থ বানালে চলবে না। তাঁর মুখ দিয়ে যা কিছু উচ্চারিত হয়েছে সবই স্বতঃপ্রমাণ—এমন যেন আমরা ধরে না নিই। তাঁর উক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। তিনিও সর্বদা চিন্তা করতেন এবং তাঁর বক্তব্যের পরিবর্তনও হত। তিনি একথা বলতেনও যে আমার পুরাতন উক্তির সঙ্গে নূতন উক্তির যদি অসঙ্গতি দেখতে পান তাহলে নূতন উক্তিকেই প্রামাণ্য মনে করে পূর্ববর্তী উক্তিকে ভ্রান্ত মনে করতে পারেন। কারণ নিত্য প্রতিদিন আমার বিকাশ ঘটেছে এবং তাই পুরাতন উক্তি জীর্ণ বুদ্ধির দ্যোতক। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামের যে বালক একদা ব্যারিস্টার হবার জন্ম লণ্ডনে গিয়েছিল সে এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত মানুষটি একই এবং বালক মোহনদাস

যা বলেছিল মহাত্মা গান্ধীকেও তাই বলতে হবে। তিনি বলেছেন যে ধীরে ধীরে তাঁর বিকাশ ঘটেছে এবং ক্রমশঃ সত্যের সন্ধান চলেছে ও ধীরে ধীরে সত্যের অনুভূতিও ঘটেছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে তিনি নিজের ভুল ভ্রান্তিও বুঝতে পেরেছেন। তাঁর এক উক্তি—'মাই হিমালয়ান ব্লান্‌ডার' তো সমগ্র দেশে অত্যন্ত বিখ্যাত। সর্বজনীন কার্যের ক্ষেত্রে কোন ভুল হয়েছে বুঝতে পারা মাত্র তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর হিমালয় প্রমাণ ভ্রম হয়েছে। এর থেকে বেশী কে আর করতে পারেন? হিমালয়ের থেকে উঁচু তো আর কোন পাহাড় নেই!

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য ছিল নিজের দোষ হয়েছে বুঝতে পারলে তাকে গোপন না করে অবিলম্বে সাধারণ্যে প্রকাশ করা। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে এতদসত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এর কারণ হল এই যে, তাঁর সামনে প্রতিপক্ষের যে রাজনীতি ছিল তার ভিত্তি ছিল মিথ্যার উপর। আর গান্ধীজীর রাজনীতি ছিল সত্যনির্ভর—সত্য কথন এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কোন শব্দ উচ্চারণ করা। সুতরাং সত্যের সামনে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে দাঁড়ান যায় না। গান্ধীজীর সমসাময়িক রাজনীতিজ্ঞদের চেয়ে গান্ধীজী যে অধিকতর কুশল ছিলেন এমন কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, গান্ধীজী সত্যের শরণ নিয়েছিলেন এবং সত্য সর্বদাই কুশল হয়। মূল কথা হল এই যে, যিনি সত্যনিষ্ঠ থাকেন তাঁর থেকে বড় মানুষ এ পৃথিবীতে আর হয় না। কুশলতার মোহে যাঁরা অসত্যের শরণ নেন তাঁরা কখনও সফল প্রমাণিত হন না। সত্যের শরণ নিয়ে চললে আমরা সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত এবং মানুষ সর্বপ্রকারের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে—এইটা বোঝার মধ্যেই কুশলতা। সত্যের পরিণাম কি হয় সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

সত্যবাদী মানুষের বাক্যের উপর বিশ্ব এবং এমন কি তাঁর শত্রুরও আস্থা থাকে বলে জনসাধারণের ভিতর চৈতন্যের উদ্রেক হয়। গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষে যেসব নেতা ছিলেন তাঁরাও ছিলেন মহান। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস ছিল না যে, তাঁরা মুখে যা বলছেন তাঁদের মনেও তাই আছে। পক্ষান্তরে লোকে মনে করত যে আইন বাঁচাবার জন্য তাঁরা মুখে যা বলছেন মনের ভাব আসলে তার থেকে ভিন্ন। সরকার যাতে আইনের প্যাঁচে ফেলে বিব্রত করতে না পারে এই জন্য তাঁরা আইন বাঁচিয়ে বলতেন।

এইজন্য সেযুগে লোকে মনে করত যে, দেশনেতা হতে হলে আইনজীবী হতে হবে। গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময়েও দেশের মানসিকতা এই রকমই ছিল। গান্ধীজী এসে কিন্তু তাঁর মনের যা আসল অভিপ্রায় তদনুযায়ীই প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন। তাঁর নাম নিয়ে পাঞ্জাবে অত্যাচার ঘটে গেল এবং ওদিকে আহমেদাবাদের জনসাধারণ মারপিট শুরু করে দিল।

সেই সময়ে আমরা জনকয়েক সহকর্মী আহমেদাবাদের গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলাম। জনসাধারণ সে সময় গান্ধীজীর নাম নিয়ে দাঙ্গা করত এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটত। এদিকে এই সব কুকার্যের সময় মুখে কিন্তু উচ্চারণ করত—গান্ধীজী কী জয়। সম্ভবতঃ ১৯২০-২১ সনের ঘটনা এটা। আমরা গিয়েছিলাম জনসাধারণকে বোঝাতে যে ভাই গান্ধীজীর উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাঁর নাম নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা আগুন লাগান হোক অথবা হিংসার অনুষ্ঠান হোক। তিনি তো কখনও এমন কথা বলেন নি। লোকেরা আমাদের বলত—তোমরা কি বুঝবে গান্ধীজীকে? গান্ধীজী কি বলতে চান তোমরা আমাদের বোঝাবে? আর সত্যি সত্যিই সে সময় আমরা পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের যুবক ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং আমাদের বয়সী তরুণরা কি প্রবীণ জনসাধারণের চেয়ে গান্ধীজী সম্বন্ধে বেশী জানতে পারি? আর সেই সব প্রবীণেরা আগুন লাগাতে বেরিয়েছিলেন! তাঁরা বললেন, আরে ধর্মরাজ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যা বলছেন তার তাৎপর্য বোঝেন ভীম—হ্যাঁ, একমাত্র ভীমই। যুধিষ্ঠির তো রেখে ঢেকে বলবেনই; কিন্তু তাঁর কথার অর্থ কি তা জানেন কেবল ভীম। এই জবাব তাঁরা আমাদের দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, যাঁরা নেতা হন তাঁরা এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন কিন্তু তার অনুগামীরা জানেন যে, নেতার মনে আসলে কি আছে এবং তাঁরা তাই তদনুযায়ী কাজ করেন। তাই আহমেদাবাদের সেই প্রবীণেরা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি।

এর পর গান্ধীজী প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন শুরু করলেন। এবং তখন জনসাধারণের সংবিৎ ফিরে এল এবং তারা বুঝতে পারল যে এ-ব্যক্তি মুখে যা বলেন মনেও তাঁর সেই কথা। তার পূর্বে পর্যন্ত এই চলত যে, নেতা বলতেন এক আর অনুগামী তা থেকে ভিন্ন বুঝে তদনুযায়ী চলত। গান্ধীজী নূতন এক প্রথা শুরু করলেন—মুখে যা উচ্চারিত হবে মনেও তাই থাকবে এবং যা মনে থাকবে তাই মুখে বলতে হবে। এর ফলে জনমানসে গান্ধীজীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাঁর শব্দ শক্তিশালী প্রমাণিত হল। এবং শব্দের পরাক্রম থেকেই তাঁর তাবৎ পরাক্রম।

একথা বলতে দুঃখ হচ্ছে যে, আমরা যারা তাঁর সাথী বা সহকর্মী ছিলাম তাঁদের মধ্যে তাঁর এই সত্যনিষ্ঠা ছিল না। এজন্য তাঁর জীবনের সায়ংকালে গান্ধীজীর মুখে উচ্চারিত শব্দ সম্বন্ধে জনসাধারণ, বিরোধীপক্ষ এবং সরকারের মনে সংশয় দেখা দেয়। তাঁরা এই কথা মনে করা শুরু করেন যে গান্ধীজী মুখে যা বলেছেন তাঁর অন্তরের কথা হয়ত তা নয়। অর্থাৎ শব্দের শক্তি কুণ্ঠিত হওয়া শুরু করল। এর পরিণাম আমরা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। স্বরাজ প্রাপ্তির সময় গান্ধী-জীবনের শেষলগ্নে যে সব ঘটনা ঘটে তার কারণ গান্ধীজীকে অত্যন্ত মনোকষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। তাঁর কথা লোকে তখন শুনত না। শেষ অবধি তাঁর সেই শব্দশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি এই কথা বলতে চেয়েছি যে, তাঁর এই যে সত্যনিষ্ঠার গুণ এ কোন দুরূহ গুণ নয়। সরলতা পূর্বক আচরণ করতে হবে এবং তাহলে কোন ষড়যন্ত্র করতে হবে না। ষড়যন্ত্র করতে হয় তখন যখন অসত্য বলে আমরা ধরা না পড়তে চাই। কিন্তু সত্যকে রক্ষা করার জন্য ষড়যন্ত্রের আদৌ প্রয়োজন ঘটে না। যেমন দেখছি তেমনি বলতে হবে, যেমন আছে তেমনি করতে হবে। বড় বেশী হলে এই পন্থাশ্রয়ী মানুষকে এই পৃথিবীতে মার খেতে হবে। প্রহার যদি পড়েই তবে নিজ শরীরকে কিছুটা মজবুত করতে হবে—আর কি? প্রহার খেলে মনে করতে হবে নিজের ব্যায়াম হচ্ছে।

দেশকে বাঁচাবার জন্য

কাকাসাহেব কালেলকার

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দেশের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে দেশের লোক অদৃষ্টবাদী হবার জন্য সে অবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। আজকের মত এত সমালোচনা বা নিন্দা শোনা যেত না। বিশেষ কেউ অসন্তোষ ব্যক্ত করতেন না।

নিজের রাজনৈতিক গুরু গোখেলের পরামর্শ মেনে নিয়ে গান্ধীজী এক বছরের জন্য এক প্রকার মৌনব্রত ধারণ করলেন এবং দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে ভারতবর্ষকে দেখলেন। তাঁর বুদ্ধিমান চক্ষু ভাল মন্দ সবই দেখলো। তিনি স্থির করলেন যে দোষের কথা আলোচনা করলে দোষ না কমে বরং বেড়ে যায় এবং জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসও ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। সেই জন্য তিনি যেখানে যে গুণ দেখলেন তার স্বীকৃতি দিলেন, তাকে প্রোৎসাহিত করলেন এবং দেশের সামনে নূতন যুগের নূতন আদর্শকে শুদ্ধরূপে উপস্থাপিত করলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই গান্ধীজী নিজের এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে সকল প্রদেশ ও সকল ধর্মের ব্যক্তিদের তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। শর্ত কেবল এইটুকুই ছিল যে, যাঁরা আশ্রমবাসী হবেন তাঁরা নম্রতাপূর্বক জনসেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করবেন। পাণ্ডিত্যের কোন শর্ত রাখা হয় নি। জীবনশুদ্ধি, সংযম, নিষ্কাম সেবা, সর্বধর্ম সমভাব এবং বিশেষ করে উপাসনা-প্রার্থনার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়েছিল।

কেবল উপদেশের দ্বারাই নয়, আশ্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জীবনচর্যা দ্বারা জাতীয় ও সাংস্কৃতিক একতার আদর্শ গান্ধীজী দেশের সমক্ষে তুলে ধরলেন। আশ্রমে সকল প্রদেশের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি সব ধর্মের লোক এসে আত্মীয়ের মত থাকতেন। তাঁদের সেবার সুগন্ধ সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হল। তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে সেবাপরায়ণ ব্যক্তিরা এই জাতীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। আশ্রমের সর্বধর্ম সমভাবের প্রার্থনা এই সব জায়গায় স্বীকৃত হল।

তবে যাঁরা কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন তাঁদের কাছে গান্ধীজীর এই আশ্রম-প্রবৃত্তি আলুনী, মৃদু ও নিস্তেজ বলে মনে হল। তাঁদের কেউ কেউ এইসব

আশ্রমের কাজ-কর্মের বিরূপ সমালোচনাও করলেন। তবে মৃদু কণ্ঠে। সত্যাগ্রহী গান্ধীর নিন্দা উচ্চ কণ্ঠে করা সম্ভব ছিল না।

আশ্রম-জীবন থেকে গান্ধীজী জাতি গঠনের গঠনমূলক কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রের কর্মীরা এই গঠনমূলক কার্যক্রমকে মেনে নিলেও একে স্বরাজের যথার্থ ভিত্তি বলে স্বীকার করেন নি।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ স্বরাজ অর্জন করল। সর্বধর্ম সমভাব সম্পর্কিত গান্ধীজীর বক্তব্য জনসাধারণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন নি। এই জন্য দেশ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং ইংরেজদের নীতি ও মুসলিম লীগের স্বার্থ এই পরিমাণে সফল হল। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রের লোকেরা মহাত্মাজীর জাতিগঠনের গঠনমূলক প্রয়াসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি। আজ তাঁরা হায় হায় করে বলছেন যে, "জাতীয় ঐক্য খণ্ডিত হয়েছে, সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি বাড়ছে। ধর্মভেদ, প্রাদেশিকতা, ভাষাদ্বন্দ্ব ও জাতিগত বৈরীভাব শক্তিশালী হয়ে চলেছে।"

প্রত্যেকের সদ্‌গুণাবলীর সমাদর গান্ধীজী করতেন। মুখে কিছু না বলে তাঁদের দোষ দূর করার চেষ্টা করতেন। আজ সে পালা বদলে গেছে। দেশকে বাঁচাতে চাইলে আজ আমাদের দেশের স্থানে স্থানে আশ্রম খুলতে হবে। তবে কেবল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আশ্রমের অনুকরণ করলে লাভ হবে না। সর্বধর্ম ও সব প্রদেশের লোক একত্র থাকতে পারেন—তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কেবল হিন্দু পরিবেশে কাজ হবে না। যেমন যেমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে তেমনি আশ্রম-প্রবৃত্তির প্রসার ঘটাতে হবে; গান্ধীশতবার্ষিকীতে এইটাই যেন প্রধান কর্মসূচী হয়।

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক

শঙ্কররাও দেও

গান্ধীজীর কাছে সত্যই ছিল সার্বভৌম নীতি বা ঈশ্বর। ঈশ্বরকে তিনি সত্য-রূপে আরাধনা করেন। শিশু যেমন সহজ সাবলীলভাবে মায়ের বক্ষে সংলগ্ন থাকে গান্ধীজীও তেমনি ভাবে সত্যের শরণ নিয়েছিলেন। তবে অহিংসার ক্ষেত্রে এমন ঘটে নি; দুস্তর প্রয়াসে তাঁকে এটা আয়ত্ত করতে হয়েছিল। এ সত্ত্বেও গান্ধীজীর কাছে অহিংসা ছিল একটি সাধ্য বা লক্ষ্য (end) সাধন বা উপায় (means) নয়। তাঁর অন্তিম লক্ষ্য ছিল সত্য।

গান্ধীজী এ জগতে সত্যের পথের প্রথম তীর্থযাত্রী নন; এই "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতো দুরত্যয়া" পথে তাঁর যে-সব পূর্বসূরী চলেছেন তাঁদের সংখ্যা বহু। তবে এই অভিযাত্রীদলে এই সত্যসন্ধানীকে যার জন্য বিশিষ্ট আখ্যা দেওয়া যায় তা হল এই যে তাঁর পূর্বসূরীর দল যেখানে এই মহাযাত্রায় সাফল্য লাভ করার জন্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য স্বয়ং প্রিয় সব কিছু ত্যাগ করেছেন ও অপরকেও সেই পথের পথিক হবার উপদেশ দিয়েছেন গান্ধী সেখানে যা কিছুর সম্পর্কে এসেছেন তাতেই সত্য দর্শন করেছেন ও তার মাধ্যমেই ঈশ্বরোপলব্ধির প্রয়াস করেছেন। আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে সত্য বা ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের এই প্রয়াসে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, যা সব থেকে এর কাছাকাছি যায়, তা হল প্রেমের পন্থা। তিনি তাই বলে গেছেন যে, সত্যের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী রূপের সাক্ষাৎ দর্শন পাবার উপায় হল সৃষ্টির তুচ্ছতম অঙ্গকেও নিজেরই মত ভালবাসা।

তাঁর কাছে বস্তু ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য বা ঈশ্বর হচ্ছে প্রেম এবং এই একই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমই হল ঈশ্বর। গান্ধীজীর মতে অহিংসার আচরণ ব্যতি-রেকে আর কোন প্রকারে মানবীয় পটভূমিকায় সত্যের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং মানবীয় পটভূমিকায় না হলে যদিও তা সম্ভবপর হয় তবু গান্ধী সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি কাম্য মনে করতেন না।

সুতরাং তাঁর কাছে অহিংসা কোন কার্যপদ্ধতি (technique) ছিল না। এ ছিল এক জীবনপদ্ধতি এবং এই জন্যই তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হতে পেরেছিলেন।

গান্ধী—মত ও পথ



১৯৩৮এর হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী

সেবাগ্রামে গান্ধীজীর কুটির

গান্ধীজির ধর্মচিন্তা

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

আধুনিক মনস্বীদের অনেকের ওপর, বিশেষ করে তরুণ বিদ্যার্থীদের ওপর, ধর্মের কোন প্রভাব নেই বলে শুনি।[১] ধর্ম জিনিসটা নাকি নিতান্তই সেকেলে, ওটার আচরণে এগিয়ে-যাওয়া নয়, পেছিয়ে-পড়ার আশঙ্কাই নাকি সমধিক। প্রগতিশীল আধুনিকেরা এবং উচ্চাভিলাষী তরুণ বিদ্যার্থীরা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়েই যেতে চান, পশ্চাৎপদ হয়ে বৃদ্ধবৎ পড়ে থাকতে তাঁদের লজ্জা, আর সেই কারণেই ধর্মচিন্তায় তাঁরা উদাসীন!

ধর্মসমাজে হয়তো ভালো কাজ কিছু কিছু করেছে, কিন্তু মন্দ কাজের তুলনায় তা নাকি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর! ধর্মের জন্যই হয় সাম্প্রদায়িক কলহ, ধর্মের জন্যই সরল বুদ্ধি মানুষেরা হয় প্রতারিত, ধর্মের জন্যই দেশে দেশে যুগে যুগে হয়েছে জিঘাংসু যুদ্ধ, জিগীষু পাপাচার! ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারলে মানুষ তার সংস্কারবিহীন বৈজ্ঞানিক স্বরূপে প্রকাশিত হবে—এই নাকি প্রগতিশীল আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অভিমত!

ধর্ম কী, কী তার স্বরূপ, স্পষ্টতঃ তা না জানার জন্য এই জাতের মত ও মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে—এ কথা বললে আধুনিকেরা হয়তো ক্ষুণ্ণই হবেন। কিন্তু এটা আমরা নিশ্চিত জানি—আধুনিকেরা যদি সত্য সত্যই মানুষ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান এবং তাঁদের চাওয়ার মূলে যদি সততা থাকে, ত্যাগ থাকে, আন্তরিকতা থাকে, থাকে প্রেম—তবে কালে ধর্মবিরোধী কথা বলতে তাঁদের লজ্জাই হবে। যদি প্রমাণিত হয়, ধর্মচিন্তায়, বিশেষ করে গান্ধীপ্রমুখ স্থিতধী মনীষীদের ধর্মচিন্তায়, শিবসুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আনয়নেরই দ্যোতনা আছে, আছে শক্তি, তবে কি তাঁরা ধর্মানুশীলনে যত্নবান হবেন না?

কোনো কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা যেমন বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, কোনো কিছুকে বিনাবিচারে ত্যাগ করা কিংবা বিরুদ্ধ মন্তব্যে উন্নাসিক হওয়াও তেমনি

১. To Students. P. 8

সাবালক বুদ্ধির লক্ষণ নয়। গান্ধীজির ধর্মচিন্তার মূলতত্ত্বগুলি অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে ধর্ম হচ্ছে জীবনের একটি আদর্শ বিজ্ঞান; 'জ্ঞানে' এটিকে ধরতে হয়, 'কর্মে' এটিকে ফোটাতে হয়, 'প্রেমে' এটিকে দেশ-জীবনে তথা বিশ্ব-জীবনে সঞ্চার করতে হয়।

অন্তরে বাহিরে 'সৎ' ও 'সুন্দর' হয়ে ওঠাই ধর্ম। এতেই আবির্ভূত হন মঙ্গলের দেবতা, অর্থাৎ শিব। এটিকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে বিশ্বজগতের ও জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আনা কি সম্ভব? সূর্যকে বাদ দিয়ে যদি জগতকে আলোকিত করা সম্ভব, তবেই ধর্মকে, প্রকৃত ধর্মকে, বাদ দিয়ে জগৎ-জীবনে সত্যকার মঙ্গল আনা সম্ভব।

বলতে পারেন সূর্যকে বাদই দেবেন, দিতেও পারেন সুড়ঙ্গপথে গিয়ে চক্ষু বুজিয়ে। কিন্তু আপনি না মানলেও সূর্য আছেন, সূর্য থাকবেন। আমি যাব, আপনিও থাকবেন না, যাবেন, এ-ও-সে যাবে, সবাই যাবে, সূর্য কিন্তু ঠিক থাকবেন আকাশে,—আলো দিতে, প্রাণ দিতে। নাস্তিকের বুদ্ধি-বিচারে অথবা রাজনীতিকদের সাময়িক সুবিধাবাদী নীতিপ্রভাবে ধর্মকে বাচনিক উগ্রতায় অথবা মানসিক ঔদ্ধত্যে নস্যাৎ করে দিতে পারেন সত্য, কিন্তু যখনি জানবেন আপনি যা বলছেন বা করছেন তা-ও এক প্রকার ধর্ম, যা ভাবছেন তা-ও ধর্মসত্তার সর্বকালগত বিশ্বচৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তখন নিশ্চয়ই আপনাকে ধর্ম সম্পর্কে নবতর বিচারের সম্মুখীন হয়ে গভীরতর কোনো জীবন-সন্ধানে তৎপর হতে হবে।

গান্ধীজির ধর্মচিন্তায় এই নবজীবন সন্ধানের তৎপরতা। অনাগত মঙ্গলোজ্জ্বল মহান ভবিষ্যৎ এর মর্মমন্ত্রে। পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে, দেবত্ব থেকে সর্বব্যাপী এক শিবসত্যে সচেতন অগ্রগতির নাম ধর্ম। এটি সেকেলে নয়, সাম্প্রতিকও নয়, চিরকালের সাধ্যবস্তু। কর্ম যাঁরা করেন, কর্মদ্বারা পরিবার পোষণই শুধু নয়, সমাজমঙ্গল তথা স্বদেশমঙ্গলেও যাঁদের অভিলাষ, স্বদেশসেবার মধ্য দিয়ে বিশ্বসেবার আনন্দে যাঁদের মানস-গতি, ধর্মচেতনায় তাঁদের কর্ম ও কর্মভাবকে শুদ্ধ করে নিতেই হবে। ধর্মবোধবিহীন কর্ম ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির পথে সাময়িকভাবে সহায়তা করতেও পারে, কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল তার দ্বারা সম্ভব না। মহাত্মাজির ধর্মচিন্তানুসরণে কর্মসাধকের অন্তরে এ-বোধ সহজ শ্রদ্ধার আনন্দেই প্রমুদিত হয় বলে জানি।

১

মহাত্মাজির সাধনবাণী তথা জীবনবাণী এই: অন্তরে বাহিরে হও সত্য, তবেই ধর্মের স্বরূপ-দর্শন সম্ভব হবে।

কিন্তু সত্য কী, সত্য কোনখানে? সত্য স্থূল অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, ব্যাপক অর্থেও তো তেমনি। সাময়িক সত্য, চিরন্তন সত্য, অর্থনৈতিক সত্য; বৈজ্ঞানিক সত্য, ধর্মনৈতিক সত্য, সাহিত্যিক সত্য; আবার বাচনিক সত্য, মানবিক সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য—কত প্রকার সত্যের কথাই তো শোনা যায়! ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী সত্যেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে পৃথিবীতে। রামের কাছে যা সত্য, রহিমের কাছে তা সত্য না-ও হতে পারে। আজ যা সত্য বলে আপনি ধারণা করছেন, কাল তা মিথ্যা বলে মৃৎপাত্রের মত ফেলেও দিতে পারেন। সত্য স্পষ্টতঃ তা হলে কী বস্তু? অন্তরে বাহিরে যে সত্য হব, সেই সত্য বস্তুটি কী?

না, যা পেলে সকল 'পাওয়া' সহজ হবে, সকল 'জানা' সম্ভব হবে, সকল 'করা' সার্থক হবে—তাই হচ্ছে সত্য। কিন্তু কথাটা কি সাধারণ মতে খুব স্পষ্ট হল? অবশ্যই হল না। সত্য আসলে ব্যাখ্যা করার বস্তু নয়, হওয়ার বস্তু। হয়ে উঠলে তবে তার স্বরূপতত্ত্ব বোঝা সম্ভব। গান্ধীজি তাই প্রচলিত দার্শনিকদের মত খুব বেশী ব্যাখ্যায় না গিয়ে একেবারে সরাসরি বললেন: সত্যই জীবনের সার বস্তু, সত্যই সারাৎসার।[১] সত্যই ভগবান। অর্থাৎ সত্যই শিব, মঙ্গলের দেবতা এবং সুন্দর, প্রেমের পরমেশ্বর। অন্তরে-বাহিরে সত্য হয়ে উঠলেই শিবমঙ্গলের বরাভয় পাবে, প্রেমসুন্দরের পাবে আশীর্বাদ। সত্য হও অন্তরে বাহিরে।

কিন্তু হব কি করে তাকে না জানলে? হ্যাঁ, শ্রদ্ধাভরে তাকে জানো। ...তা কে জানতে পারেন সেই দুরধিগম্য দুর্জ্ঞেয় সত্যকে? মন আর মুখ যাঁর এক, তিনিই জানেন সেই সত্য। আচ্ছা, মন যার অশুদ্ধ, মুখ অশ্লীলতার অনাচারে উগ্রগন্ধী, সে কি সত্যকে জানতে পারে? হ্যাঁ, সেও পারে। তবে তার মত সত্যটুকুকেই পারে, বিশ্বসত্যকে পারে না। প্রেমে যার মন শুদ্ধ, মুখ নম্রতার মাধুর্যে সুরচ্ছন্দ, আপন অন্তরের গভীরে সেই পায় বিশ্বসত্যের দর্শন।...সত্য সর্বব্যাপী, আমি যেমন, সত্যের প্রকাশ আমার কাছে ঠিক তেমনতর। সূর্যের আলো তো সকলের জন্য। শুধু কি সমুদ্রের জন্য? শুধু কি সমুদ্রগামিনী মহানদীর জন্য? পচা পুকুরটার জন্যে নয়? নালাটার জন্যে নয়?

১. My God, P.23

নয় ডোবাটার জন্য ? নয় কি অতি তুচ্ছ সেই গোষ্পদটার জন্যে ? যার যেমন ধারণশক্তি সূর্যকে সে ধরে তেমন ভাবেই। তর্ক করার কিছু নেই। আপনি যেমন, আপনার কাছে সত্যও ঠিক তেমনতর, একচুল কম নয়, বেশী নয়। যদি প্রেমিক, তবে প্রেমই আপনার কাছে সত্য। যদি লোভী, তবে লোভই। জগতে যত প্রকার মানুষ আছে, তত প্রকার সত্য আছে বলা চলে। তবে কোন সত্যের করব সাধনা ? যে সত্য আমার অহংকে অর্থাৎ 'ছোট আমি'টাকেই আছে ঘিরে, সে-সত্যের আশ্রয়ে আমার অহংটিই প্রবল হবে, উদ্ধতও হতে পারে; তাতে বিশ্বমঙ্গলের সম্ভাবনা কম, নেই বললেই হয়। সুতরাং যে সত্য আমার আত্মার অর্থাৎ 'বড় আমি'টির আনন্দে দিব্য চৈতন্য, সে সত্যের সাধনায় আমি তো প্রকাশ পাবই, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও প্রকাশ পাবে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে। ...জানো সেই সত্যকে।

কিন্তু জানলেই কি হয়ে উঠবো ?' 'জানা' ও 'হওয়া' কি এক কথা ? এক কথা অবশ্যই নয়। তবে সাধনার পথে, পরিণামে, একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব। শ্রদ্ধাভরে জানতে-জানতে হওয়া, হতে-হতে আরো জানা—এইভাবে সর্বজগদ্‌গত ও জীবনগত সত্যস্বরূপকে জন্মে-জন্মে জীবনে-জীবনে আয়ত্তে আনার সাধনা করতে হয়। এই সাধনাই মহাত্মার ধর্ম।

সত্য-সাধনা তাই কথা মাত্র নয়। আবার 'কোনোমতে একবার চাই বললেই এটি পাওয়া যায় না। পেতে গেলে, বলাই বাহুল্য, ধৈর্য ধরে কতকগুলি শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে হয়।[১] সত্যের স্বরূপটি, কই, দেখাও একবার—তর্ক করে জোর গলায় একথা বললেই কি দেখতে পাব ? তুচ্ছ একটা অঙ্ক শিখতে গেলে নিয়ম জানতে হয়, আর সর্বজীবনগত সত্যকে জানতে হলে এমনি সহজে হবে ? জানার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে না ? স্বভাবজীবনে যা আছি তার দ্বারা সাময়িক চলমান সত্যকেই জানতে পারি ; সাধন জীবনে শমদম-ব্রহ্মচর্যাদি মহাব্রতের আনন্দে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে যা হয়ে উঠবো, তার দ্বারা জানতে পারব চিরন্তন সেই শিবসত্যকে। এই বিশ্বচরাচরকে যিনি মঙ্গল বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন, প্রেমের আনন্দে মুক্তি দিচ্ছেন—সময়ে দিচ্ছেন জন্ম, সময়ে করছেন পালন, আবার সময় হলেই টেনে নিচ্ছেন আপন ক্রোড়ে[২], জন্মে জন্মে তিনি সাধককে পরীক্ষার পথে আনছেন, উত্তীর্ণ করছেন পরীক্ষায়, আবার নবতর পরীক্ষার পথে আনছেন বিচিত্র রহস্যে। জন্মে

১. My God, P. 15 ২. My God, P. 52

তিনি, মরণে তিনি, কর্মে তিনি, মর্মে তিনি, রূপে তিনি, অরূপে তিনি—সর্বত্র তিনি বিদ্যমান। এই তিনি কে?

তাঁর নাম নেই। তিনি অ-নামা। অ-নামা বলেই কিন্তু বিশ্বনামা।[১] যার যে নামে রুচি, তার কাছে সেই নামে তিনি কীর্তিত। গান্ধী-সাধনায় 'সত্য' নামে তিনি আরাধিত। বস্তুতঃ 'সত্য' নামটির তাৎপর্য খুব গভীর। 'সৎ' থেকে সত্য শব্দটির উৎপত্তি। 'সৎ' মানে যা চিরকাল আছে, ছিল, থাকবে—তাই। সৎ ছাড়া অর্থাৎ সত্য ছাড়া, ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়, নেই-ও। "তদন্যদখিলমনিত্যম্"।..."That is why sat or truth is perhaps the most important name of God."[২] সত্যই শ্রীভগবানের মহত্তম নাম। 'তিনি সত্য' এ-কথা না বলে 'সত্য-ই তিনি' বলা সঙ্গত। সত্যই ভগবান।

> সত্য যেখানে জ্ঞানও সেখানে। জ্ঞান সত্যস্বরূপ। সত্য যেখানে নেই, যথার্থ জ্ঞান সেখানে থাকতে পারে না। তাই তো ভগবানের নামের সঙ্গে 'চিৎ' বা জ্ঞান জোড়া হয়। আর যেখানে প্রকৃত জ্ঞান সেখানেই চির-আনন্দ। দুঃখের তথায় ঠাঁই নেই। আর সত্য যেমন নিত্য, সত্যসম্ভূত আনন্দও তেমনি নিত্য। তাই ভগবানকে আমরা সচ্চিদানন্দ বলি। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দধাম বলি।[৩]

এই সচ্চিদানন্দ দিব্য ভগবানকে, এক কথায়, সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যই জীবন, জীবনের কর্ম, জীবনের দান-ধ্যান-জ্ঞান সব।

> Devotion to this truth is the sole justification for our existence. All our activities should be centred in Truth. Truth should be the very breath of our life.[৪]

সত্য জ্ঞান, সত্য ধ্যান, সত্য চিন্তামণি—এই হওয়া চাই সাধকের জীবনে। এই ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্য: সাধকের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-নাওয়া—সব বিষয়েই বিচ্ছুরিত হয় ধর্মের জ্যোতিঃসম্পদ।

> You must watch my life, how I live, eat, sit, talk, behave in general. The sum tolal of all these in me is my religion.[৫]

১. My God, P. 11. ২. My God, P. 8. ৩. সত্যই ভগবান, পৃঃ ২০.
৪. My God, P. 8. ৫. Selection from Gandhi P.254.

গান্ধীজির ধর্মচিন্তার খানিকটা আভাস হয়তো পাওয়া গেল। বোঝা গেল: ধর্ম শুধু ঠাকুর ঘরে কি মঠে-মন্দিরে, আশ্রমে কি চার্চে-মসজিদে, তীর্থে কি প্যাগোডা-গুরুদ্বারে নয়, সত্যকে মর্মে ধরে যেখানে যা কিছু করি, তাই ধর্ম। ধর্ম সর্বত্র। তা পারিবারিক খুঁটিনাটি কর্মে, পড়শীদের সঙ্গে দৈনন্দিন সামাজিক ব্যবহারে, রাজনৈতিক ঘোর-জটিল বিচিত্র কর্ম-সংগ্রামে, আধ্যাত্মিক ধ্যানজীবনের নিভৃত চিন্তায়। ধর্ম তো শুধু 'বলা'র নয়, তা 'হওয়া'র, তা 'করা'র, তা 'করানো'র। সত্যচিন্তা থেকে যা সমাগত, সুন্দর আচরণে যা প্রমুদিত, শিব-সাধনে যা বীতনিদ্র—তা ধর্ম। এ-ধর্ম গতানুগতিক কোনো বিশেষ সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়—এ-ধর্ম মন ও মননের, বুদ্ধির ও আত্মার, আচারের ও আচরণের। এ-ধর্ম বলতে পারি 'মহামানবধর্ম', কেননা এ হিন্দুর হয়েও বৌদ্ধের; বৌদ্ধের হয়েও জৈনের; জৈনের হয়েও খৃষ্টানের; খৃষ্টানের হয়েও মুসলমানের; মুসলমানের হয়েও পার্শীর; পার্শীর হয়েও ব্রাহ্ম-সাধকের। এ ধর্মের যিনি সচেতন সাধক মর্মতঃ তিনি অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কর্মতঃ দ্বৈতবাদী[১], কখনো কখনো, অনেকান্তবাদীও। এই ধর্মের আনন্দসাধনায় পারিবারিক হয়েও তিনি সামাজিক; সামাজিক হয়েও জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিক; স্বাদেশিক হয়েও আন্তর্জাতিক সংহতি সাধনে বিশ্বদেশিক। বিশ্বের প্রতিটি জাতির সঙ্গে তাঁর সখ্য-সৌহার্দ্য, প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বতোভদ্র প্রেম।

গান্ধীজির ধর্ম তাই জীবনসাধনার একটি মহান অথচ বাস্তব আদর্শ। এটি বুঝতে পারে না বলেই বুদ্ধিমান মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা তোলে, নাস্তিক হওয়ার ঔদ্ধত্যে পাশবিক হয়; কিংবা পলায়নী মনোবৃত্তির অনুসরণে মানুষের ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে হয় উদাসীন।

ধর্ম বলতে অনেকে অবশ্য বাইরের আচার অনুষ্ঠানগুলিকেই বুঝে থাকে। আর এই আচার অনুষ্ঠানের নিন্দনীয় কিছু যদি থাকে, তবে ধর্ম-ই, সমালোচক-দের বিচারে, নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্মের নামে এ-দেশে ব্যয়বহুল উৎসব সমারোহ ও বাহ্যাড়ম্বর এককালে অনেক হয়েছে, আমোদ প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রমত্ত থেকে এবং খানা-পিনার ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে অধ্যাত্মধর্মকে অনেক নিচেই এককালে নামিয়ে আনা হয়েছে। গান্ধীজি, বলাই বাহুল্য, এর নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায়।[২] গান্ধীজির

১. Hindu Dharma P. 55. ২. Hindu Dharma P. 12

ধর্ম সাধনা হচ্ছে জীবন সাধনা আর সে-সাধনা ভাবভিত্তিক শুধু নয়, কর্মভিত্তিক। সদাচারে ও শিবাচরণে সত্যকে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা চাই। জীবন হচ্ছে নানা উদ্দেশ্যে ভরা; সাধু এবং অসাধু—কত উদ্দেশ্যই না আছে মানুষের জীবনে। গান্ধীজির কথাটি তাই এই, সদুপায়ে সদুদ্দেশ্যসাধন দ্বারা জীবনকে ধর্মদীক্ষিত করা সম্ভব। সোজা কথায় উদ্দেশ্যসাধনে আমরা যে পন্থা বা উপায় অবলম্বন করব—তা যেন সৎ ও সুন্দর হয়।[১] উদ্দেশ্য সাধু অথচ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়গুলি অসাধু, এমন অবস্থায় ধর্ম বিড়ম্বিত হবে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত নিম্নস্তরের, কিন্তু বাহ্যতঃ সাধু পন্থানুসরণে তা সিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে—এটা লোক-দেখানো ধর্ম ব্যবসা, এতে ধর্ম মুহূর্তকাল তিষ্ঠাতে পারে না।… অন্তরে ভোগবাদী অসংযতচিত্ত, বাইরে সন্ন্যাসীর বেশভূষা—এটি ঘোরতর অধর্ম। অন্তরে প্রভুত্বপ্রিয় স্বার্থবাদী কূটনীতিক, আর বাক্যে ব্যবহারে জনকল্যাণ ও জনদরদের অমিতব্যয়িতা—অতি কৌতুককর এই অধর্ম। অন্তরে হয়তো আছে বিশ্বমানবের মুক্তিচিন্তা, কিন্তু ব্যবহারে সমর্থিত হচ্ছে জিঘাংসা বৃত্তির পাশব ষড়যন্ত্র—অতি নিন্দনীয় এই অনাচার, ভয়াবহভাবে এটি অধর্ম। গান্ধীজির এই মতবাদ শ্রদ্ধাসহকারে যদি মনন করি, হৃদয়ঙ্গম করি, তবেই বুঝতে পারব জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন তিনি ধর্মের স্থান দিয়ে থাকেন, এমন কি রাজনীতির মধ্যেও কেন তিনি প্রার্থনা করেন ধর্মাদর্শের সহায়তা।

বর্তমানকালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে হাস্যকর একটা অদ্ভুত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন ধর্মকে অহিফেনসেবীর নেশা মনে করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি রাজনীতিকে দুষ্ট চক্রীদের পাপ-ষড়যন্ত্রও মনে করা হচ্ছে। রাজনীতিকে একটা দুরভিসন্ধিমূলক অসৎ ব্যাপার মনে করে নেওয়ায় সাধারণ ধার্মিকেরা রাজনীতিকে ভয়ই করেন; আবার ধর্মকে কর্মবিহীন একটা আত্মবিলাস বলে ধারণা থাকায় কৌশলী রাজনীতিকেরা ধর্মকে খুব করে নিন্দা করেন। ফলে, রাজনীতির ও ধর্মনীতির মাঝখানে পর্বতপ্রমাণ সুউচ্চ ব্যবধান কল্পনা করা হয়েছে।…গান্ধীজির বিচারে, রাজনীতির মধ্যে যদি সর্বতোভদ্র শ্রেয়োবুদ্ধি কাজ করে, স্বদেশ মঙ্গলের সত্যসাধনায় এবং বিশ্বমঙ্গলের শিবচিন্তায় রাজনীতিকেরা যদি সর্বতোভাবে চালিত হয়, তবে ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো ব্যবধানই থাকতে পারে না।

রাজনীতি যদি ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়,

---

১ সর্বোদয় পৃঃ ১৫

তবে ধর্মবিচারে তা অধর্ম। কিন্তু সত্যের সাধনসূত্রে কেউ যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আন্তরিক সেবা ও কল্যাণ বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে রাজনীতিকে কেউ যদি কর্মজীবনের মাধ্যম করেন, তবে সেই রাজনীতিকে ধর্ম বলাই সঙ্গত। গান্ধীজি তাই-ই বলেন। বলেন তিনি:

> সত্যের সাধনসূত্রেই আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়েছে। আর এ-কথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলব যে, যাঁরা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই, ধর্ম যে কি তা তাঁরা জানেন না।[১]

ধর্ম কী? পাঠক যদি ধৈর্য না হারিয়ে অনুমতি করেন তো পুনরাবৃত্তি করি, সদুদ্দেশ্যে সকল প্রকার সৎকর্মই ধর্ম। মনে রাখতে হবে—কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মযাজকদের অন্তঃসারশূন্য তন্ত্রমন্ত্র ধর্ম নয়, ধর্ম হচ্ছে শ্রেয়োবুদ্ধি, ধর্ম হচ্ছে বিবেক-বৈরাগ্য, ধর্ম হচ্ছে সেবা প্রেম অহিংসা। ব্যক্তিজীবনকে সুস্থ ও পবিত্র রাখার তৎপরতার নাম ধর্ম; সমষ্টি সেবায় অর্থাৎ লোকসেবায় নিত্য আগ্রহের নাম ধর্ম; বিশ্বমঙ্গলে নিত্য ধ্যান, অন্যায় প্রতিরোধে নিঃশঙ্ক প্রচেষ্টা, অহংবোধের ঊর্ধ্বে বিশ্ববোধের উজ্জীবনে নিরলস কর্মতপস্যার নাম ধর্ম। অন্তরে অন্তরে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে বাইরে কর্মযোগী সামাজিক থাকার দিব্য সাধনার নাম ধর্মসাধনা।

এই সাধনার বৈশিষ্ট্য এই: জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ধর্মবোধ প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালাতে হবে। পরিবার চিন্তাই বলুন, সমাজ চিন্তাই বলুন রাজনীতি, অর্থনীতি চিন্তাই বলুন—সর্ববিধ চিন্তাতেই শিবত্বটি প্রয়োগ করা চাই-ই চাই। ছোট্ট একটি 'তকলি' নিয়ে খেলাচ্ছলে সুতা কাটা থেকে শুরু করে উচ্চতম স্বদেশধর্ম কি বিশ্বকর্ম পর্যন্ত সর্বত্রই ধর্ম চৈতন্যের সজ্ঞান আনন্দটি অনির্বাণ দীপশিখার মত জ্বালিয়ে রাখা চাই।

ধর্ম হচ্ছে বিশ্বজগদ্‌গত একটি বিরাট আদর্শ। উচ্চতম অধ্যাত্মচৈতন্যের আনন্দও যেমন, নিম্নতম সংসার দারিদ্র্যের বিজ্ঞানেও তেমনি, প্রযোজ্য। এ-আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সাধনাই জগতে স্থায়ী সুখ ও শান্তি আনয়ন করতে পারে। গান্ধীজির কর্মশক্তির ও ভাবশক্তির প্রাণস্পন্দ এই ধর্মাদর্শ। এটিকে বাদ দিলে গান্ধীজির জীবনে অনেক কিছুই যেন বাদ পড়ে যায়। গান্ধীজি মহান কর্মযোগী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ধর্মটি ঠিকমত ধরতে পারলেই বুঝা যায় তাঁর জীবনে কর্ম ও ধর্ম একার্থবোধক।

১. আত্মকথা ('৪৮), পৃঃ ৬১৫

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—এই হচ্ছে গান্ধীজির কর্মাদর্শ। কর্মই মায়ের পূজা, ব্রহ্মের আরাধনা। ধর্মাশ্রিত কর্মই ধর্ম এবং সতর্ক সাধক একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রতিটি কর্মই গান্ধীজির ধর্মাশ্রিত। গান্ধীজি তা স্বীকারও করেছেন :

> It is true that all my activities whatever their outer form are fundamentally religious.[১]

ধর্মাশ্রিত কর্মের সাফল্য ও আনন্দ-বেদনা থেকেই তিনি বুঝেছেন—ধর্মই জীবনের সার বস্তু। ধর্মোপলব্ধি তথা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যই মানবকুলের নিত্য কর্ম, বিশ্বকর্ম :

> Man's ultimate aim is the realisation of god and all his activities, social, political, religious, have to be guided by the ultimate aim of the vision of god.[২]

"ধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্যই তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।"[৩] ভারতব্যাপী কর্মসংগ্রাম, জীবনব্যাপী অহিংস-সাধনা, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ের আগ্রহ। আসল কথা ধর্মবিকাশের জন্যই তিনি কর্মযোগী। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর সকল উপদেশের সার উপদেশ এই :

> I want that every action of yours should be guided by sense of dharma—devotion to duty and perfect humility.[৪]

'আমি চাই তরুণ সমাজের যাবতীয় কর্ম ধর্মবোধের আনন্দেই হোক নিয়ন্ত্রিত।'...বিনয়দীপ্ত হৃদয়ে জীবনের সর্ববিধ দায় ও দায়িত্ব যদি বহন করতে পারো ধর্ম বিকশিত হবে জীবনে। তখন সকল কিছু কর্মই আনন্দের বিষয় হবে, মুক্তির পাথেয় হবে।

বস্তুতঃ জীবনমুক্তির জন্যই গান্ধীজির কর্মকর্তব্য। কর্ম-সম্পাদনের দ্বারা কর্মক্ষয় করার আনন্দটি তাঁর ধর্মবোধের মূলসূত্র। ওটি বুঝলেই জানা যায়, কেন তিনি গীতার অনাসক্তি-ব্যাখ্যায় এত ব্যগ্র।

গীতা বলেছেন—অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর, যজ্ঞার্থে কর্ম কর। কর্ম তাহলে বন্ধন হবে না, মুক্তিরই পাথেয় হবে।

১. Problem of Education. P 165-66. ২. Selection from Gandhi, P. 25
৩. ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মহাত্মাগান্ধী, পৃঃ ১৭৪ ৪. Problem of Education, P. 19

কর্ম সচরাচর বন্ধনই আনে। কিন্তু ধর্মার্থে, ঈশ্বরার্থে, সহজবোধ্য কথায়, পরোপকারার্থে যে কর্ম, সে কর্ম বন্ধন আনে না, কেননা তা যজ্ঞার্থ। এই কর্ম করো নম্র হৃদয়ে, মুক্তি পাবে :

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকাঽয়ং কর্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

শ্রীগীতা, ৩।৯

—যজ্ঞার্থে যে-কর্ম, সেই কর্ম ছাড়া অন্য সকল প্রকার কর্মই মানুষের বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি মুক্তসঙ্গ হয়ে অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে যজ্ঞার্থে কর্ম করো।

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার অর্থই হল ধর্মাশ্রিত কর্ম করা, যজ্ঞার্থে কর্ম করা। এর মর্মমূল হল, বলাই বাহুল্য, সর্বকর্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। 'কর্মেই আমার অধিকার, ফলে নয়,'—এই ভাবচৈতন্যের রসোল্লাস এর ব্যঞ্জনা। ফল তিনি ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, আমি করব কর্ম, তাঁর উদ্দেশ্যে কর্ম। জন্মেছি কর্ম করতে, কর্মফলের কাঙালপনা করতে নয়। গান্ধীজি তাই অনাসক্ত নিষ্কাম কর্মের ওপর বেশী জোর দেন। নিষ্কাম কর্ম কী? না, সকলের মঙ্গলের জন্য যে কর্ম, ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে কর্ম, সেই কর্ম নিষ্কাম কর্ম। ব্যক্তিগত কামনার বশবর্তী হয়ে যে কর্ম করি, তা সকাম কর্ম; কিন্তু সকলের জন্য, বিশ্বের জন্য যে কর্ম, তা নিষ্কাম কর্ম। অশন বসন শয়ন স্বপন চলন বলন সমস্তই যদি বাসুদেবে সমর্পণ করে করি, তবে তা বন্ধন হবে না, তা নিষ্কাম কর্ম হবে বলে মুক্তির আনন্দই বহন করবে। গান্ধীজি মর্মতঃ মুক্তিই চান, মোক্ষই তাঁর কাম্য, ঈশ্বরকে দেখতে চান একেবারে "face to face"[১] কিন্তু যতদিন দেহ আছে,[২] আছে মন, তিনি কর্ম করবেন, সেবাকর্ম, এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস এই যে, এই সেবা কর্মই একদা মুক্তির দ্বার খুলে দেবে তাঁর সম্মুখে। একলাফে তিনি মুক্তি চান না। কর্ম এড়িয়ে মুক্তি চান না, যেমন ধর্ম এড়িয়ে কর্ম চান না কখনও। জীবজগতকে যথাসাধ্য সেবা করে, প্রেম ও অহিংসার আনন্দে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে ধীরে ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি জীবনের পরম সত্যে মুক্তিলাভ করবেন। তাঁর কর্ম, সহজেই বোঝা যায়, মুক্তি পথেরই পাথেয়।

আর ধর্মও তো ঠিক তাই। ধর্ম কি বিষয়-বৈষয়িকতায়? ব্যবসায়িত্মিকা

১. My God, P. 51 ২. Selction form Gandhi p. 8

বুদ্ধি? লোকমান্য হওয়ার কুটিল কৌশল? গুরু হয়ে ওঠার সজ্ঞান অভিনয়? নিরন্তর আত্মানুসন্ধানই তো ধর্ম। আত্মা কি? গান্ধীজির কাছে সত্যই আত্মা—পরমাত্মা—পরমেশ্বর—পরাতত্ত্ব।

> আমার কাছে সত্য পরাতত্ত্ব। এই পরাতত্ত্বের গুহায় আরো নানা তত্ত্ব নিহিত। এই সত্য মানে কেবল সত্য কথন নয়, সত্য চিন্তনও বটে। আর এটি আমাদের ধারণার আপেক্ষিক সত্যও নয়। এ পরাসত্য, শাশ্বত বিধি, অর্থাৎ ভগবান। ভগবানের নাম অনন্ত, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত। এই অনন্ত নাম ও অনন্তরূপের কথা যখন ভাবি, বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অভিভূত হই, ক্ষণেকের তরে বিহ্বল ও হতবাক্ হয়ে যাই। কিন্তু সত্যরূপেই কেবল আমি ভগবানের উপাসনা করি। তাঁকে আমি পাইনি, পাওয়ার চেষ্টা করছি। এই সাধনার সিদ্ধিকল্পে যে কোনো প্রিয়বস্তু জলাঞ্জলি দিতে আমি প্রস্তুত।[১]

সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার, এমন কি জীবনটুকু ত্যাগ করারও আনন্দ উচ্চ কোটি সন্ন্যাসীর আনন্দ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-আনন্দ আপামর জনসাধারণ কি অনুভব করতে সমর্থ? যদি নয়, তবে সত্য, হোক না তা পরাসত্য, সাধারণ জীবনে কি ব্যর্থ হল না? সাধারণ মানুষ কি বঞ্চিত থাকবে তাঁর করুণা থেকে? দয়া করে আপনি ছোট হয়ে সাধারণের দ্বারে তিনি কি নামবেন না? সত্য যদি সর্বজগদ্গত মহা-মহেশ্বর, তবে সাধারণ মানুষদের জন্য রসরূপে কি নামরূপে আবির্ভূত হওয়া তাঁর পক্ষে কি এতই অযৌক্তিক?

গান্ধীজির এই প্রশ্ন। অতি স্পষ্টভাষায় তাই তিনি লিখছেন:

> মানবগোষ্ঠীর সকলেই আমরা দার্শনিক নই। আমরা পৃথিবীর জীব, একান্তই বস্তুবাদী। নিরাকার অদৃশ্য ভগবানের চিন্তনে আমাদের তৃষ্ণা মেটে না। এভাবে কি ওভাবে এমন কিছু না হলে আমাদের চলে না, যা আমরা চোখে দেখতে পারি, হাতে স্পর্শ করতে পারি, যাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে পারি—তা সে বই-ই হোক বা পাথরে তৈরী গৃহ-ই হোক, শূন্য বা মূর্তি সম্বলিত। কারো তুষ্টি গ্রন্থে, কারো বা শূন্য ভবনে; আবার এই সব শূন্য ভবনে কারো অধিষ্ঠান দেখতে না পেলে অপর অনেকের মন মানে না।[২]

গান্ধীজিরও মন মানে না, বলা চলে। অমূর্তের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও

১. সত্যই ভগবান পৃঃ ৩৪ ২. সত্যই ভগবান পৃঃ ৯৩

মূর্তি পূজার তাই বিরোধী নন। ভগবানের 'মূর্তি' বা রূপ কিংবা 'নাম'কে প্রতীক বলে মেনে নিতে তাঁর বাধে না।

> অতএব যাঁর নাম হৃদয়ে অঙ্কিত হলে মানুষের ত্রিতাপ দূর হয়ে যায়, দশরথের পুত্র সীতাপতিরূপে বর্ণিত রামকে আমি সেই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা থেকে অভিন্নই জ্ঞান করি।[১]

অরূপ পরাতত্ত্বের রূপসুন্দর পরানাম এই রাম।[২] 'সত্য' যদি তত্ত্বের আনন্দে অমূর্ত সুন্দর, 'রাম' তবে রসের আনন্দে মূর্ত মনোহর। দুই-ই এক বস্তু, শুধু প্রকার ভেদ, নামভেদ। ভাবে ইনি সত্য, রূপে ইনি রাম। সত্য-জ্ঞানে যে আনন্দ, রাম ধ্যানে সেই আনন্দ।

গান্ধীজির ইষ্টদেব এই রাম। আত্মার আরাম আনে বলে রাম। সত্য আত্মার আনন্দ জাগায়, সত্য তাই রাম; প্রেম আত্মার হ্লাদিনী জাগায়, প্রেম-তাই রাম; অহিংসা আত্মার শমদমযমনিয়মাদির শক্তি জাগায়, অহিংসা তাই রাম। গান্ধীজির রামকে দাশরথি রাম অবশ্যই বলতে পারেন—কিন্তু মনন সহকারে একটু গভীরে প্রবেশ করলেই দেখবেন ত্রেতাযুগের ঋষিদৃষ্ট রাম হওয়া সত্ত্বেও এ-রাম অন্যবিধ আর এক অভিনব রাম; একেবারে সত্যস্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, কর্তব্যস্বরূপ এ-রাম পরমাশ্চর্য একটি দিব্য মহাভাব, গান্ধীজির ভাষায় 'সর্ব-শক্তিমান পরমাত্মা'।

পরমাত্মার অনেক নাম। He is 'one' and yet 'many'. কারো কাছে ইনি ঈশ্বর, পরমেশ্বর; কারোর কাছে আল্লা, খোদা; কারোর কাছে হরমুজ্‌দা; কারোর কাছে দাদা; কারো কাছে বা জেহোবা। কেউ এঁকে ডাকে শিব বলে, কেউ বিষ্ণু বলে, কেউ কৃষ্ণ বলে, কেউ বা রাম বলে। ইচ্ছা হয় এঁকেই আপনি বলতে পারেন মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী; বলতে পারেন সর্বদেবময়ী দেবী পরমা প্রকৃতি ইনি মহাদুর্গা। অনাম এবং অনির্বচনীয় বলে নানা নামে এঁকে খোঁজা, নানা রূপে এঁকে ধরতে যাওয়া। 'As a matter of fact we are all thinking of the unthinkable, describing the indescribable, seeking to know the unknown'. রসের আনন্দ চাই যে, রূপের আনন্দ চাই যে, নামরূপের সন্ধানে তাই ফিরতেই হবে। গান্ধীজিও ফিরেছেন। 'রাম' নামে পেয়েছেন তৃপ্তি। নিষ্ঠা তাই রাম-নামে। রুচি রাম নামে। ভক্তি রাম নামে। রাম নামই তাঁর কাছে সত্য।

---

১. সত্যই ভগবান, পৃঃ ৯২ ২. Hindu Dharma, p. 119

সত্যই রাম। এপারে যদি দাশরথি রাম, ওপারে তবে পরব্রহ্ম পরাতত্ত্ব রাম।

গান্ধীজির ধ্যানের ভারতবর্ষ এই রামের রাজ্য। ভারতবর্ষ তাই 'ভোগভূমি' নয়, 'কর্মভূমি'।[১] এখানে কর্ম করতে হবে ধর্মের আনন্দে, ধর্ম ধরতে হবে কর্মের আশ্রয়ে। কম্যুনিস্টরা অনাগত যে ভবিষ্যৎ রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন ও দেখান, হিংসা ও ঘৃণার সুযোগে শ্রেণীসংঘর্ষকে কাজে লাগিয়ে যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিতে চান, জিগীষা ও জিঘাংসার প্রশ্রয় দিয়ে, রক্তপাত ঘটিয়ে দিকে দিকে যে-রাজ্য আনতে পারবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন, রাম রাজ্য অবশ্যই সে-রাজ্য নয়, কিন্তু কল্যাণদীপ্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কম্যুনিস্টরা যদি সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে রাম রাজ্যে তাঁদের সে-স্বপ্ন সফল হবে। গান্ধীজি নিজেকে 'এ ফোরমোস্ট্ কম্যুনিস্ট'[২] বলেও প্রচার করেছেন। কম্যুনিস্টদের জিঘাংসাবৃত্তিকে কখনও কোনো কারণেই তিনি বরদাস্ত করবেন না, কিন্তু মানুষে মানুষে সাম্য, দেশে দেশে মৈত্রী, জাতিতে জাতিতে সখ্য আনয়নের সাধনায় থাকবেন বীতনিদ্র। মানুষের হৃদয় জাগিয়ে, মানুষের মধ্যে সেবা ও প্রেমের ভাব জাগিয়ে দেশে ও পৃথিবীতে তিনি সাম্য আনবেন। 'সাম্যবাদ' নিয়ে অর্থহীন বাদানুবাদ নয়, 'সাম্যযোগে'-র আদর্শ নিয়েই তাঁর ধর্মতপস্যা। ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঘৃণা জাগিয়ে নয়, শ্রমিকদের কল্যাণে ধনিকদের হৃদয় পরিবর্তন করে তিনি তাঁদের সেবাকর্মে লাগাবেন, আর অতিরিক্ত যে সম্পদ তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে আছেন, তার 'অছি' রূপে তাঁরা থাকবেন জনসেবার কাজে। শ্রমিকদেরও হৃদয় পরিবর্তন করে অহিংস পথে তাঁদের গঠনমূলক বিচিত্র কর্মে নিয়োজিত করবেন।[৩] এই ভাবে প্রেমের পথে শ্রেণী সংঘর্ষ দেশে দেশে তিরোহিত হবে, অর্থাৎ শ্রেণী থেকেও শ্রেণীবিরোধ হবে না, শ্রেণীবিহীন সমাজের শান্তি ও সৌভ্রাত্র তখন প্রমুদিত হবে দেশে।

এটি হতে সময় লাগবে সন্দেহ নেই—কিন্তু মানব-সভ্যতাকে যদি বাঁচতে হয় তবে এইটাই হবে সহজ পন্থা, শ্রেষ্ঠ পন্থা। বিশেষ একটা জাত বা শ্রেণী অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে রাক্ষসের শক্তিমত্ততায় অন্য সব শ্রেণীকে হনন করবে, হনন করার পর শ্মশানের ওপর স্থাপন করবে স্বপ্নরাজ্য, স্বর্গরাজ্য, এটা উগ্রপন্থী বুদ্ধিবিহীনের বিচার মাত্র। হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে আজ না হয় জয়ী হলাম, কাল আমার চেয়ে শক্তিমান কেউ আমার ওপর অধিকতর

১. India of my Dreams, p. 3 ২. Communism and Communists, p. 21.
৩. Trusteeship, P. 9

হিংসা যে করবে না, তা কে বলতে পারে ? কম্যুনিস্ট রাজ্যগুলির মধ্যে আজই কি ক্ষমতার লড়াইয়ে উগ্রতর হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না ? ধনিক শ্রমিকের সংঘর্ষের কথা যেখানে বলা হয়, সেখানে কম্যুনিস্টে-কম্যুনিস্টে সংঘর্ষ ঘটছে কেন ? মানবজাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনাই কি আদর্শ, না সকল প্রকার বিরুদ্ধ মত ও পথের শিরোদেশে উঠে একচ্ছত্র প্রভুত্ব-লাভেই অভিলাষ ?

অন্তরকে প্রেমে ও অহিংসায় সত্যকার সেবাব্রতী ও সত্যাগ্রহী করার তত্ত্বটি তরুণদের আজ ধীরভাবে বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যদি আনতে চাই, তবে বর্তমানেই তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। আর সাধনা যেমন সিদ্ধি তেমন। যদি প্রেমের তপস্যায় জয় করি মানুষের মন, তবেই মানব-সভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভব। ষড়যন্ত্র করে বা যুদ্ধ করে যদি সাময়িক সৌভাগ্যে জয়ের পথে যাওয়া আমার সম্ভবও হয়, মনে রাখতে হবে—এই জয়ই আমার মৃত্যুবাণ : ওই জয়ই আমার ভবিষ্যৎ পরাজয়ের অব্যর্থ সূচনা।··· কথাগুলি দার্শনিকের মত শোনালেও এর বাস্তব দিকটা আজ ভাবতে হবে। মানুষের সেবা নয়, জাতির কল্যাণ নয়, আমার দলের প্রাধান্যের কথাই আমি ভাবছি, কিংবা ভাবছি নিজের প্রভুত্বলাভের কথা—এই যদি হয়, তবে যাও ষড়যন্ত্রের পথে, বাধাও হত্যাকাণ্ড, বইয়ে দাও রক্তের নদী, কিন্তু মুখে বা লেখায় জনদরদের কথা আর বলো না, মানুষকে আর বঞ্চিত করো না উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মরীচিকা দেখিয়ে।

প্রশ্ন এই : মানব সভ্যতাকে আজ কোন পথে নিতে চাও ? সাম্যবাদে, না সাম্যযোগে ? প্রেমের মীমাংসায়, না ঘৃণার সংঘর্ষে ? মানবিকতার মাহাত্ম্যে, না দানবীয়তার দৌরাত্ম্যে ? দুর্ধর্ষ দানব হওয়ার কৌশলটাই কি অত্যাধুনিক, আর সর্বত্যাগী মানব হওয়ার অভিপ্রায়টা নিতান্তই সেকেলে ?

সত্য সত্যই যদি মানুষের কল্যাণ চাও, তবে কারও প্রতি হিংসা তুমি করতেই পারো না। এমন কি শত্রুর প্রতিও না। শত্রুকে প্রেমের দ্বারা জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব, ভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের বেয়নেটের খোঁচায় নির্জিত করে, ছলে বলে কৌশলে মুখ তাদের একেবারে বন্ধ করে দিয়ে, সাইবেরিয়ায় মুক্তি দিয়ে কিংবা "কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে" পচতে দিয়ে যে-বীরত্ব সে-বীরত্ব আদিমকালের। প্রগতিপন্থীরা কেমন করে তা সমর্থন করে ?

অসৎ থেকে চলো সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে

অমৃতের আনন্দে, চলো ধর্মপথে, রামরাজ্য মিলবে। অসার কল্পনার অলীক স্বপ্ন-রাজ্য নয়, রামরাজ্য, রামরাজ্য হল অসীম ত্যাগের রাজ্য, জীবন-যজ্ঞের মহারাজ্য, বিশ্বপ্রেমের মহাসাম্রাজ্য। আত্মার আরাম সেখানে সম্ভব সেই রামরাজ্য। পরম সত্য প্রেমরূপে রমণ করেন যে-রাজ্যে, সেই রাজ্যই রামরাজ্য। সর্বধর্মের সমন্বয় যে রাজ্যে, মানবাত্মার মুক্তি বিরাজে যে রাজ্যে, শোষণমুক্ত সমাজের হিংসাবিহীন সহযোগিতা যে রাজ্যে, সেই রাজ্যই রামরাজ্য। রামরাজ্যের অর্থ ও তাৎপর্য তরুণেরা, এমন কি তরুণ অধ্যাপকেরাও ঠিক মত বুঝতে পারেন না বলে হাসি ঠাট্টা করেন, উপহাস করেন। বর্তমান ভারতবর্ষের দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্গতি দেখিয়ে রামরাজ্যকে যারা পরিহাস করেন, আমাদের সত্যাগ্রহী সাধকবর্গের মঙ্গলকামনাকেই তাঁরা নস্যাৎ করতে চান। রামরাজ্য একদিনেই আয়ত্ত করার বস্তু নয়, আকাশ থেকে হঠাৎ একদিন মন্ত্র বলে এটি ধরাধামে পড়বে, তা-ও না। আমাদের খুঁটিনাটি ছোটখাটো কাজ থেকে শুরু করে বৃহৎ কর্ম পর্যন্ত রামরাজ্যের অপেক্ষায় যদি থাকে, তবেই, তবেই তা মাটির পৃথিবীতে একদা অবতীর্ণ হবে। কেউ এটি দয়া করে এনে দেবে না। আমাদের কঠিনতম তপস্যাতেই তা আসবে। রামরাজ্যে অবিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে নিজেদের শক্তি ও তপস্যায় আস্থা হারানো।

সত্যাগ্রহী সাধকেরা অবশ্যই বলবেন: মারমুখী বেয়নেটের সম্মুখে দাঁড়িয়েও আত্মশক্তি আমরা হারাবো না। রামরাজ্য হচ্ছে আত্মশক্তির মহারাজ্য, ব্রহ্মরাজ্য, মুক্তিরাজ্য।[১] সোজা কথায় প্রেমরাজ্য, সত্যরাজ্য; আরও সোজা কথায় স্বাধীন রাজ্য, স্বরাজ্য।

> আত্মসংযমই স্বরাজের প্রকৃত অর্থ। যে ব্যক্তি নৈতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলে, কাউকে প্রবঞ্চিত করে না এবং পিতামাতা স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি যে কর্তব্য, তা পালন করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে আত্মসংযমী হতে পারে। এমন মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন, সে প্রকৃত স্বরাজ উপভোগ করে থাকে। যে রাষ্ট্রে এ ধরনের আত্মসংযমী মানুষ যথেষ্ট সংখ্যায় আছে, সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত স্বরাজ উপভোগ করে।[২]

অহং নয় আত্মার প্রকাশকল্পে সেখানে তপস্যা চলে, তপস্যা সমর্থিত হয়, সেখানেই সত্যরাজ্য বা স্বরাজ্য স্বভাবের নিয়মেই হয় আবির্ভূত। 'স্ব' হচ্ছে আত্মা, স্ব ঈশ্বর, স্ব ব্রহ্ম, স্ব সত্য, স্ব প্রেম, স্ব সর্বোচ্চতম শ্রেয়োবুদ্ধি, স্ব

---

১. Selection from Gandhi, P. 35, ২. সর্বোদয়, পৃঃ ৮২,

পরাজ্ঞান, স্ব পরাবিভূতি। এই স্ব-ই আমার স্বরূপ। এ থেকে এসেছি, এতেই যাচ্ছি। মাঝপথে অহং বিকারে এ থেকে সাময়িক ভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ি বলেই পরাধীন হই, স্বাধীন আর থাকি না। আত্মার অধীনতাই স্বাধীনতা, অহংএর অধীনতা পরাধীনতা। পরাধীন মানুষই স্বধর্ম বিচ্যুত হয়, লোভ করে, নিজে মরে, অন্যকে মারে। পৃথিবীতে অশান্তি এইজন্য, যুদ্ধবিগ্রহ এইজন্য, হিংসাকে মৌন সত্য ভাবার অভিরুচি এই জন্য। স্ব-এর অধীনতা নেব তো স্বাধীন হব, স্ব-রাজ্য পাব। যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর, যা ধর্ম তারই আমি অধীন, এই বোধ স্বাধীনবোধ। এই বোধে যে রাজ্য গড়ি বা গড়তে চাই তা-ই ধর্মরাজ্য, স্বরাজ্য। সে রাজ্যে শোষণ শাসন থাকবে না, অন্যায় থাকবে না, অবারিত প্রেম-দাক্ষিণ্যের আনন্দ-বৈরাগ্যে তা সর্বোদয়ের মহিমা আনবে বহন করে। এই রাজ্য, স্বরাজ্য, গান্ধীজির ভাষায় রামরাজ্য।[১] এখানে ধর্মের জন্যই কর্ম, নিষ্কাম কর্ম, রাগরহিত সেবা কর্ম। রামরাজ্য পেতে গেলে, সুদূর অতীতে, সেই ত্রেতাযুগে আমাদের পিছু হাঁটতে হবে—এ চিন্তা অমূলক, এ মন্তব্য অশ্রদ্ধেয়। এগিয়ে চলো, মিলবে সেই রাজ্যের সন্ধান। আজও অনাগত যে সর্বতোভদ্র মহান রাজ্য অন্ধকারের অন্তরালে আছে অপেক্ষমাণ, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মরীচিকা নয়, তা সত্য; আমাদের নিরলস কর্ম ও প্রজ্ঞাধর্ম, সর্বস্বত্যাগ ও নৈতিক শক্তির সাহায্যে অহরহ তাকে আমরা আকর্ষণ করব।

পুনর্বার কি বলতে হবে: ধর্মবোধেই রামরাজ্যের অভ্যুদয়, ধর্মানুসরণেই রাম-রাজ্যের বাস্তব প্রতিষ্ঠা?

২

গান্ধীজির এই যে রামনামে প্রেম, রামধর্মে নিষ্ঠা এবং রামরাজ্যে আস্থা—কোথায় এ সমস্তর উৎসভূমি? পরিণত বয়সে রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়ার পরই কি রাম-নামের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, কিংবা অতি শৈশবকাল থেকেই রামধর্মে তিনি কি অনুগত, রামনামে প্রসন্নচিত্ত?

গান্ধীজির জীবনকাহিনী সম্পর্কে আজও যাঁরা কোন খোঁজ রাখেন না, তাঁদের মহলে এ-প্রশ্ন জাগা হয়তো স্বাভাবিক। গান্ধীজির 'আত্মকথা' যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা অবশ্য জানেন বাল্যকাল থেকেই তিনি রামভক্ত, যেমন সত্যের পূজারী, সেবাধর্মের বিশ্বাসী। জন্মেছেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে—

১. সর্বোদয়, পৃঃ ৯০

তাঁর জীবনে মাতাপিতা ও ধাত্রীমাতার প্রভাব আজ ঐতিহাসিক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে বলা যায়। মা ছিলেন সাধ্বী রমণী, পরমা ধর্মপরায়ণা; হিন্দুধর্মের সর্ববিধ আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠাভাবে পালন করতেন। পিতাও ধর্মবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদী পুরুষ ছিলেন। পারিবারিক জীবনে এঁদের ধর্মসুন্দর নৈষ্ঠিক জীবনচর্যা গান্ধীজিকে গভীরভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল। এই সময় 'শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক' পাঠ করে এবং 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক দেখে সেবা, ভক্তি ও ত্যাগের সৌন্দর্য বাল্যকালেই কতকটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। শৈশবের সেই অধ্যাত্মশিক্ষা উত্তরকালে তাঁকে স্বদেশসেবা তথা বিশ্বসেবায় আকৃষ্ট করেছে বলা যায়। বাল্যকাল থেকেই অন্তরে-বাহিরে 'সত্য' হওয়ার তপস্যা। তরুণ বয়সে তপস্যার বেদনায় গণসেবা। সেবার চেতনায় ক্রমশঃ প্রেমোপলব্ধি। প্রেম থেকে 'অদ্বেষ্টাসর্বভূতানাং' হওয়ার অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা থেকে অহিংসা। অহিংসা থেকে শিবোপলব্ধি অর্থাৎ স্থায়ী মঙ্গলের স্বরূপদর্শন। স্বরূপদর্শনে তত্ত্ব-ব্রহ্ম। ব্রহ্মানুভাবে আনন্দ সুন্দর। আনন্দ সুন্দরে অভিনব সত্য। সত্যই আত্মারাম, নয়নাভিরাম প্রাণারাম রাম। "সত্যকে আমি রাম বলে জানি"[১] বলেছেন তিনি পরিণত বয়সে।

ধাত্রীমাতা শ্রীরম্ভা দেবীর কাছ থেকে অতি শিশুকালেই তিনি 'রাম'-নাম পেয়েছিলেন। বাল্যকালে ভূতের ভয় ছিল তাঁর। ধাত্রীমা বললেন—রাম নাম করো, ভয় থাকবে না। ভয় দূরীকরণে অভয়মন্ত্র রাম। অমোঘ এই মন্ত্র-বীজ। উত্তর জীবনে এই বীজ বিরাট মহীরুহ হয়ে দেখা দিল। গান্ধীজির বিচিত্র কর্মজীবনের অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় অভিনব এই রামপ্রাণতারই রস-সৌন্দর্য।

তাঁর পরিবারের উপাস্যদেব ছিলেন শ্রীনাথজী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু রামজীতেই ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। এর মানে এই নয়, রাম ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীকে তিনি অবিশ্বাস করতেন বা অবজ্ঞা করতেন। বিশ্বরূপই সেই এক অদ্বিতীয়ের রূপ—এ-তত্ত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার বয়স তখন তাঁর হয়নি, কিন্তু সর্বধর্মেই যে কিছু-না-কিছু সত্য আছে, একথা অস্ফুটভাবে সেই অতিবাল্যকালেই তিনি অনুভব করেছিলেন।

শৈশবে রামায়ণ পাঠ, ভাগবত শ্রবণ, বয়োজ্যেষ্ঠদের ধর্মকথালোচনায় মাঝেমধ্যে যোগদান, মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে গতায়াত,

---

১. সত্যই ভগবান, পৃঃ ১১৮

সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশা ও সহযোগিতা—তাঁর উদার ধর্মচিন্তার গভীরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তবু একথা স্বীকার্য যে, তাঁর জীবনে এগুলি যথার্থ ধর্মবোধের সূচনা মাত্র। সর্বকালীন একটি মহাজীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ভূমিকা মাত্র। অবশ্য এই ভূমিকায় আমাদের, অর্থাৎ দেশের অভিভাবক ও অধ্যাপকদের, ধীরভাবে মনন করবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় আছে: শিশু শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, ভারতচিন্তায় তথা বিশ্বচিন্তায় শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে হলে কী কী গ্রন্থ এবং কোন কোন জাতের গ্রন্থ তাদের পড়তে দিতে হবে, সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে তাদের নিজেদেরকে সন্তানদের সম্মুখে কেমন ভাবে পরিচালিত করতে হবে, গান্ধীজির বাল্যজীবনের ধর্ম প্রসঙ্গ অনুধ্যানে তা স্পষ্ট হওয়া সম্ভব।

তরুণ বয়সে গান্ধীজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গিয়ে থিয়োসফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের সন্ধান পেলেন, সখ্যও লাভ করলেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে গীতা পাঠের এবং গীতানুধ্যানের আগ্রহ তাঁর প্রবল হল। এডুইন আরনল্ডের 'দি সঙ্ সিলেস্টিয়াল্' পাঠে ভাবের গভীরে নূতন জগৎ যেন দর্শন করলেন। আরনল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' পড়েও অভিভূত হলেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কীর 'কী টু থিয়োসফি'-ও পড়লেন মনন সহকারে।

গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিকে কেন্দ্র করে অন্তর্জীবনের অতিসূক্ষ্ম চৈতন্যের মুখোমুখী তিনি আসতে লাগলেন। ভারতের ধর্মচিন্তায় তাঁর শ্রদ্ধা বর্ধিত হল। বালকোচিত আবেগের স্তর থেকে তাঁর মন তরুণোচিত যুক্তিবোধের ও বিচারবোধের স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হল।...আফ্রিকার প্রিটোরিয়া থেকে শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রকে (রায়চাঁদ ভাই) লেখা একটি পত্রে যুবক বয়সে গান্ধীজি যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন, সেগুলি তাঁর ধর্মোন্মেষের ও ধর্মসন্ধানের প্রামাণ্য বহন করে। আত্মা কি, মোক্ষ কি, ঈশ্বর কি, রাম বা কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করলে কি মোক্ষ মিলবে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর কে ছিলেন প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম-প্রশ্ন তিনি শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রকে করতেন।[১] ভারতে প্রত্যাগত হয়ে রাজচন্দ্রের সংস্পর্শে গূঢ়ভাবে আসার পর গান্ধীজি কর্মজীবনে ধর্মচেতনা এবং ধর্মজীবনে কর্মনিষ্ঠার সমন্বয় তত্ত্বটি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন বলা যায়।

গান্ধীজির ধর্মজীবনে কবি শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। রাজচন্দ্র সহস্র কর্মের কর্মী ছিলেন। কিন্তু সকল কর্মের মূলে ছিল তাঁর প্রাণগভীর

১. গান্ধীরচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫

ধর্মচেতনা। রাজচন্দ্রের বাণী ও পত্রাবলী গান্ধীজির উত্তরজীবনে বিশেষ সহায়তা দান করেছে। বহুক্ষেত্রে রক্ষাকবচের কার্যও করেছে। আফ্রিকায় থাকাকালে খৃষ্টানবন্ধুদের প্রার্থনাসভায় খৃষ্টধর্মের মহিমা উপলব্ধি করলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। রেভারেণ্ড মুরের অনুরোধ প্রত্যাখান করে তিনি যা জানালেন তার সারমর্ম এই: যার যা ধর্ম তাতেই শ্রদ্ধাবান থেকে ঈশ্বরচিন্তা সঙ্গত। ধর্ম করার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। আবদুল্লাসেটকেও তিনি এই মর্মে জবাব দিয়েছিলেন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন আবদুল্লা। কিন্তু আপন ধর্মভূমির ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বধর্ম প্রচার ও স্বীকার করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। যত্নভরে তিনি কোরাণ পাঠ করলেন, হজরত মোহম্মদ জীবনকথা জানলেন, জরথুস্ত্রের ধর্মবাণীগুলি হৃদয়ঙ্গম করলেন; বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা ও তত্ত্বদর্শন অনুশীলন করলেন; জৈনদের বিচারপদ্ধতিগুলি শিক্ষা করলেন। হিন্দুদের যোগশাস্ত্র (পাতঞ্জল দর্শন) এবং তার ওপরে লেখা শ্রীবিবেকানন্দর 'রাজযোগ' পাঠ করলেন, উপলব্ধি করলেন নিষ্ঠাভরে। পরিশেষে গীতার চিন্তাগভীরে ডুব দিলেন যোগনিষ্ঠ ভক্তের আনন্দে। এই যুবক বয়সে রাস্‌কিন ও টলস্টয়ের বক্তব্যগুলি অনুধ্যান করে ধর্মজীবনে তথা কর্মজীবনে তা রূপান্তরিত করার সংকল্প নিলেন। আফ্রিকায় 'টলস্টয় ফার্মে' সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঐতিহাসিক অনুশীলন শুরু হল। অবশেষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আংশিক ভাবে এবং ১৯০৬ থেকে পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেন কর্ম ও ধর্ম সাধনায় অর্থাৎ সত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য।

> যে সত্যনিষ্ঠ, যে সত্যের উপাসক তার পক্ষে অন্য কোনো দিকে শক্তি বিনিয়োগ করার উপায় নেই, করলে সে সত্যভ্রষ্ট হবে। সত্যের উপাসক কি বিষয়-সেবা করতে পারে? স্বার্থলেশশূন্য না হলে সত্যোপলব্ধি হয় না, তাই সত্যোপলব্ধির জন্য যার সকল কর্ম নিয়োজিত, সন্তানোৎপাদন ও পরিবার প্রতিপালনের মত স্বার্থপর কর্মে তার রুচি থাকতেই পারে না। উপরের মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ভোগপরায়ণতা ও সত্যোপলব্ধি একসঙ্গে চলে না—একে অন্যের বিরোধী।[১]

১. সত্যই ভগবান, পৃঃ ১৩১

কিন্তু যারা বিবাহ করে ফেলেছেন, সন্তানাদি পালন করতে হচ্ছে, তাদের কি তবে সত্যোপলব্ধি সম্ভব নয়? গান্ধীজি অনুভব করলেন, অবশ্যই সম্ভব।

> স্বামিস্ত্রী যদি ভাইবোনের মত আচরণ করে তবে সার্বজনিক সেবার জন্য তারা মুক্ত হবে। নারী মাত্রই ভগ্নী, মাতা বা দুহিতা—এ ভাব জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত হয়, বন্ধনরজ্জু তার ছিন্ন হয়। এতে স্বামিস্ত্রীর বা তাদের পরিবারের কোন ক্ষতি হয় না; হয় সম্পদ বৃদ্ধি। কামগন্ধরহিত হয় বলে তাদের প্রেমবন্ধন দৃঢ় হয়। আবিলতা দূর হওয়ার দরুন পরস্পরের অধিকতর উত্তম সেবার তারা যোগ্য হয় আর কলহ মনোমালিন্যের হেতু অনেক কমে যায়। প্রেম যেখানে স্বার্থে মলিন ও বন্ধনের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেখানে ঝগড়ার প্রসঙ্গ অধিক।[১]

অন্তরকে শুচিশুদ্ধ করে কর্মজগতে সর্বাত্মক সন্ন্যাসানন্দে অবতরণ করার এই যে সংকল্প, এটি শুধু মহাত্মার মত উচ্চ কোটি সাধকেরই সংকল্প, তা মনে করলে ভুল হবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সাধু সত্যাগ্রহীর এটি প্রধান সংকল্প। কর্ম চাই তো ধর্ম চাই; আর ধর্ম চাই তো অন্তর্জীবনটিকে শুচিশুদ্ধ এই সুন্দর সংকল্পে সংযত করা চাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই।

গান্ধীজির ধর্মচিন্তার এই নির্দেশনা।

৩

প্রকৃত ধর্মের মূলকথা তবে স্বার্থচিন্তা নয়, পরার্থচিন্তা, পরমার্থচিন্তা। এ চিন্তার মধ্যে, বলাই বোধ হয় বাহুল্য, কোনোরূপ একদেশদর্শিতা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক মোহ বা প্রাদেশিকতা থাকতেই পারে না। গান্ধীজি ধর্মবোধের বিমল চৈতন্য থেকেই জেনেছেন—সকল ধর্মমত ও ধর্মপথই পূর্ণের অভিমুখে যাত্রা করতে চায়, তবে মানুষ অপূর্ণ, এইজন্য তার ধর্মসাধনে অপূর্ণতা থাকতেই পারে। এটি জানা দরকার, মানা দরকার। আমি যা মানি তাই-ই পূর্ণ, অন্যে যা মানে তা অপূর্ণ—এই ভাব প্রেমের বিরোধী, অহিংসার অন্তরায়, সুতরাং ধর্মভাবই নয়। সত্যোপলব্ধি ও প্রেমচৈতন্যের যিনি সাধক, ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে-ধর্মেরই ধর্মী হন না কেন, সকল ধর্মেই তাঁর শ্রদ্ধা, তাঁর প্রীতি। গান্ধীজির ছিল সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা, সর্ব ধর্মে প্রীতি, সর্ব ধর্মে সমভাব। বলতে কি তাঁর

---

১. সত্যই ভগবান, পৃঃ ১৩২

একাদশ আশ্রম-ব্রতের অন্যতম ব্রতই ছিল এই সমভাবের ঔদার্য। আর এই কারণেই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু হয়েও বিশ্বধর্মের পোষক, ভারত-মানব হয়েও প্রেমের আনন্দে বিশ্বমানব। স্বদেশ সেবার মধ্য দিয়ে বিশ্বদেশের সেবা করায় তিনি বিশ্বাসী। তাঁর জাতীয়তাবোধ এই উদার প্রেম বিশ্বাস থেকে সমায়াত বলেই অন্তরে-বাহিরে তিনি অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক।

রাজনৈতিক কারণে যাঁরা আন্তর্জাতিক হওয়ার কথা প্রচার করেন, তাঁরা গান্ধীজির আন্তর্জাতিকতার মর্মরহস্য বুঝবেন না, আমি জানি। ধর্মের মর্মকথা না বুঝলে গান্ধীজিকে কি আংশিক ভাবেও বুঝা যায়? গান্ধী সম্পর্কে যাঁরা 'থিসিস' লিখছেন, গবেষণা করছেন, ভবিষ্যতে আরও কত করবেন, তাঁদের এ-কথাটি স্মরণে রাখতে বলি। রাজনৈতিক কারণে যাঁরা ধর্মকে তুচ্ছ করতে চান, তুচ্ছ করেন, তাঁরা কি করে কোন গুণে ধর্মসন্ধ একজন বিশ্ব-পুরুষকে বুঝবেন? তাঁরা তো বুঝেই রেখেছেন ধর্ম একটা শোষণবৃত্তি, নেশাখোরদের উগ্র নেশা, আদিমযুগের কুসংস্কার, ধনিকতন্ত্রের রক্ষাকবচ, ভণ্ড ব্যবসাদারদের ছদ্ম সাধুতা। ধর্ম শুধু এই-ই? আর কিছু নয়? "আর যা কিছু তা সমস্তই বুর্জোয়াদের ভেল্কিবাজী।"—এই যাঁরা বলেন, গান্ধীজির ধর্মানুগত্যের ভাবটি ধৈর্য ধরে তাঁরা কেমন করে বুঝবেন!

মহামতি কার্ল মার্ক্‌স্‌ ধর্মের বিরুদ্ধে একদা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই: সে কোন ধর্মের? ঈশ্বরের নাম নিয়ে যথেচ্ছাচার করে যে-ধর্ম, গান্ধীজি তাকে ধর্মই বলেন না, কিন্তু মার্ক্‌স্‌ তাকেই ধর্ম মনে করে ধর্মত্যাগের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন; এটা কি মার্ক্‌স্‌বাদীরা কখনও ভেবে দেখেছেন? অ-ধর্মকে পরিহার করুন, করাই সঙ্গত। অ-ধর্মকে প্রশ্রয় দেবার জন্য যে ঈশ্বরের নাম অ-সাধুরা নিয়ে থাকে, পরিহার করুন সেই ঈশ্বরকেও, গান্ধীজি আপনাকে সমর্থনই করবেন। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশের যা নিত্য সহায়ক, প্রেম ও অহিংসার যা মন্ত্রচৈতন্য, সত্য ও ন্যায়ের যা অনুকূল সেই ধর্মের, বিশ্বমানবধর্মের, বিরোধিতা করার অর্থ কি আত্মহত্যা করা নয়?

কার্ল মার্ক্‌স্‌ বিশ্বমানবের মুক্তি চেয়েছেন, গান্ধীজিও চেয়েছেন অখিল মানবের মুক্তি। দুই-এর সদিচ্ছার মধ্যেই আছে প্রাণোচ্ছলতা, আছে সত্য। তবে মার্কস্‌ সত্যকে চেয়েছেন হিংসার আশ্রয়ে, এইজন্য শ্রেণী-সংঘর্ষে তাঁর আস্থা। গান্ধীজি সত্যকে চেয়েছেন প্রেমের সাধনায়, এই জন্য শ্রেণী-মীমাংসায় তাঁর

অভিপ্রায়। বেয়নেটের মুখেই শান্তি আসবে, না অহিংসার পথে আসবে শান্তি—এ নিয়ে যত ইচ্ছা তর্ক করুন, কিন্তু অসৎ পন্থাবলম্বনে সদুদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না, সাময়িক ভাবে যদি হচ্ছে বলে মনেও হয়, কালে তা নূতনতর ভয়াবহ সংঘর্ষের সৃষ্টি করবে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজির মন্তব্য :

> ভারতীয় মানসের নিকট শ্রেণী-সংঘর্ষ একটি বিদেশী তত্ত্ব। ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়েই ভারতবর্ষে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। আমার কল্পনার 'রামরাজ্যে' ধনী, দরিদ্র সবারই সমান অধিকার আছে।
>
> আপনারা নিশ্চিত জানবেন যে, আমি আমার সকল শক্তি নিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ করার চেষ্টা করে যাব।
>
> পশ্চিমের সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ এমন কতকগুলো চিন্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যা আমাদের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে তারা একটা মূল আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমি এ মতবাদে বিশ্বাসী নই। মানুষ এবং পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এইখানে যে, মানুষ তার বিবেকের অনুশাসন বলে পাশবিক সত্তার বহু ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে ধরতে পারে, সুতরাং মানুষ হিংসা এবং স্বার্থপরতা মুক্ত হতে পারে। হিংসা এবং স্বার্থপরতা পাশববৃত্তি ; আধ্যাত্মিক মানবীয় বৃত্তি নয়। হিন্দুধর্মমতের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস। দীর্ঘদিনের সাধনা ও সংযমের ফলেই হিন্দুধর্ম এই পরমসত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই কারণেই দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশের সাধু সন্তরা কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মাহুতির পথে জীবনের নিগূঢ় সত্যটি জানবার চেষ্টা করে গেছেন। সুতরাং আমাদের সমাজবাদ অথবা সাম্যবাদের উচিত অহিংসনীতির অনুসরণ করে শ্রম ও পুঁজি, কৃষক এবং জমিদারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এগিয়ে চলা।[১]

সমাজ ও রাষ্ট্র-প্রসঙ্গে গান্ধীজি সাধুসন্তদের কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মাহুতির আদর্শ স্মরণ করাতে চাইছেন—এই থেকেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর ধর্মবোধ কত গূঢ়, এবং জীবনবাদ কত গম্ভীর। ধর্মকে যেমন জীবনের কোনো কর্ম থেকে আলাদা করে দেখা সমীচীন নয়, জীবনকে তেমনি কোনো কারণেই খণ্ড খণ্ড করে দেখা সঙ্গত নয়। অথচ বাস্তববাদী চিন্তাশীলদের দোষ এই : জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে

১. সর্বোদয়, পৃঃ ১১৪-১৫.

দেখতেই তাঁরা অভ্যস্ত, 'ভাবে' একরকম, 'কর্মে' অন্য রকম, পরিবার জীবনে একপ্রকার, সমাজ জীবনে অন্যপ্রকার—এমন মানুষ আমরা অনেক দেখেছি, শিক্ষিত মহলেও দেখেছি। কথা ও কাজ, ভাব ও ভাষা সঙ্গতিপূর্ণ হবে, শ্রেয়োবুদ্ধিতে পরিচালিত হবে, নৈতিক একটি উচ্চ মান তাঁর চলনে বলনে, শয়নে স্বপনে, আচারে ব্যবহারে প্রকটিত হবে,—এমন যে ধর্মগুণসম্পন্ন সু-মানুষ, স্বরাজ তাঁরই অধিকারে, সত্য তাঁরই অধিকারে; বিবেকবুদ্ধি উজ্জ্বল সূর্যে উদ্দীপ্ত তাঁর মন, তাঁর হৃদয়, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কর্ম।

কিন্তু বিবেক বুদ্ধি কী বস্তু? না, ব্যক্তিস্বার্থশূন্য বিশুদ্ধ বিশ্ব-বুদ্ধিই বিবেকবুদ্ধি। সত্যসাধনায় এ বুদ্ধির প্রকাশ। এ-স্থলে মনে রাখা ভালো, 'সত্য' সম্বন্ধে ধারণা সকলের সমান নয়। একজন স্বার্থবাদী মানুষের সত্যবোধ এবং একজন বিশ্ববাদী মানুষের সত্যচিন্তা এক জিনিস নয়। বিশ্ববাদী বিশুদ্ধ চিত্তের সত্যবোধই বিবেকবাণী শোনার দাবি করতে পারে। অন্যের অর্থাৎ অসংযত চিত্তের, বিবেকের দোহাই গ্রাহ্য নয়। গ্রাহ্য করা হচ্ছে বলেই—

> অসত্যের বহুল প্রচারে দুনিয়ার লোক বিভ্রান্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সবিনয়ে এই কথাই কেবল বলব যে, অশেষ নম্রতা বিনা সত্যের দর্শন মিলবার নয়। সত্যরূপ অনন্ত আকাশে বিচরণ করতে চান তো আপনাকে 'শূন্য' বনতে হবে।[1]

'আপনাকে শূন্য বনতে হবে'—অদ্ভুত এই মন্তব্যটির তাৎপর্য একবার অনুধাবন করুন। বস্তুবাদীরা এ মন্তব্যে শিহরিত হবেন সন্দেহ নেই; কিন্তু ধর্মসন্ধানীরা এর তাৎপর্য বুঝবেন: নিজেকে শূন্য করার অর্থ হচ্ছে অহং থেকে আত্মায়, ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, ব্যক্তিকামনা থেকে বিশ্বকামনায় তথা ব্রহ্মসাধনায় জেগে ওঠা। বহুতর ত্যাগ ও সেবাধর্মের আশীর্বাদে অহংবোধ থেকে বিশ্ববোধে যদি জাগতে পারি, তবেই অন্তর্জীবনের দেবত্বটির সন্ধান পাব, সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব হবে।...ভারতীয় জীবনধর্মে ও ধর্মবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদীরা এ-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না বলেই অশেষ শক্তি ও ধীসম্পন্ন হয়েও ভারতকে তাঁরা আজও স্পর্শ করতে পারছেন না। স্বদেশকল্যাণ তথা বিশ্বকল্যাণে কর্ম যদি চান, অহংকে তবে শূন্য করুন, উঠে আসুন আত্মার উদয়াচলে, দিব্য জীবনের আলো বিকিরণ করুন জীবন থেকে জীবনে।

নম্র হৃদয়ে সত্যের মহাধর্মে আজ তবে আমরা দীক্ষা নেব, দীক্ষা নেব

১. সত্যই ভগবান, পৃঃ ১৬

প্রেমপ্রত্যয়ের আনন্দে। স্বার্থের দোহাই দিয়ে জীবনের মূল্যবোধগুলিকে ভিন্নভাবে এতকাল দেখেছি, ঘৃণাকে মৌলসত্য মনে করে এতকাল ভ্রান্তপথে করেছি পদচারণা। কালের অনাচারে যতকিছু বিপরীত সংস্কার আমরা অর্জন করেছি, প্রেমজন্মে তা সমস্তই আজ ত্যাগ করব পরমপৌরুষে। প্রার্থনা করবো, আমাদের আত্মশুদ্ধি হোক, চিত্তশুদ্ধি হোক ; কেননা হলেই তখন বুঝব আমরা কারা, কী আমাদের স্বরূপ, কী আমাদের পরিচয়। মা আমাদের মহাজননী পরমাপ্রকৃতি পার্বতী, পিতা দেবাদিদেব মহামহেশ্বর, মঙ্গল সেবকেরা আমাদের বন্ধুবান্ধব, আর স্বদেশ আমাদের স্বর্গমর্ত্যপাতাল, এই ত্রিভুবন।

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

—'স্বদেশোভুবনত্রয়ম্', এর চেয়ে বড় বিশ্বচিন্তা আর কোথাও কখনও কি প্রকাশ পেয়েছে ? গর্ব অনুভব করি, এ-চিন্তা সোনার ভারতের সোনার হৃদয় থেকেই একদা সমুত্থিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ একদা ছিল সোনার স্বর্গভূমি, ভারতীয়েরা যে তখন সোনার হৃদয়ের করত তপস্যা :

> India was once a golden land because Indians then had hearts of gold. The land is still the same but it is a desert because we are corrupt. It can become a land of gold again only if the base metal of our present national character is transmuted into gold.[১]

'Golden land' বলতে বুঝি পুণ্যভূমি, আর 'Hearts of gold' বলতে শুদ্ধান্তঃকরণ।...শুদ্ধান্তঃকরণের নিত্যসাধনায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মর্যাদা আমরা রক্ষা করব, আর এই পুণ্যেই আমাদের সত্যদর্শন হবে সার্থক। চিত্ত যার যত শুদ্ধ, হৃদয় প্রেমভাবে পবিত্র, সত্যভগবান ততই তাঁর নিকটবর্তী। 'The purer I try to become, the nearer I feel to be God.'[২] অন্তরের মন্দিরেই সমাসীন তিনি আনন্দময় সত্যবিগ্রহ, অহংবাসনার অন্ধকারে দৃষ্টিহীন হয়ে আর থাকব না বলেই দেখতে তাঁকে পাব। মনই অন্ধকার, মনই আলো। মনেই মুক্তি, মনেই বন্ধন। শাস্ত্র বলেছেন, মন হচ্ছে দ্বিবিধ শুদ্ধ আর অশুদ্ধ :

১. Unto the Last—a paraphrase. P. 67

২. My God, P. 7.

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং, শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্।[1]

—ব্যক্তিগত কামকামনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন যে মন, সেই মনই হল অশুদ্ধ মন ; আর কাম বিবর্জিত যে মন প্রেমের আলোকে সূর্যোজ্জ্বল, সেই মনই হল শুদ্ধ মন। শুদ্ধ মনেই মুক্তি, অশুদ্ধ মনেই বন্ধন।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥

—ব্যক্তিগত বিষয়ে আসক্ত যে মন, সেই মনই বন্ধনের কারণ ; আর কামনাশূন্য যে মন নিষ্কামকর্মের সত্যে ব্রহ্ম-তৎপর, সেই মনই মুক্তির কারণ। মুক্ত মনের আমরা তপস্যা করব। সত্যব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করব অচিরাৎ—

গান্ধীজির এই ধর্ম-সংকল্প।

১. ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ : স্তবকুসুমাঞ্জলি, পৃঃ ১১৯

অহিংসা ও গান্ধী

জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালনী

প্রচলিত অর্থে গান্ধীজিকে শান্তিবাদী বলা চলে না। হিংসাই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ—একথা তিনি মনে করতেন না। তাঁর মতে বরং ভয়ই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা যার দ্বারা মানবজাতি পীড়িত। এ-ই হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকা বা ভারতবর্ষে তিনি সর্বাগ্রে যে সমস্যার সমাধানে হাত দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই ভীতির নিরাকরণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাবের পূর্বে আমরা কী পরিমাণ ভয়ের আওতায় বাস করতাম একমাত্র আমরা ভারতবাসীরাই তা জানি। সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতবাসীও ভয়ের পরিবেশে বাস করতেন এবং ঘোরাফেরা করতেন।

সুতরাং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে গান্ধীজি যা করেছিলেন তা হল এই ভীষণ ভয়ের অপনোদন। ইংরেজ, পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট, জেল, লাঠি চার্জ এবং এমন কি বন্দুকের গুলির ভয়ও তিনি দূর করেছিলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে অনেককে ধরা হতে লাগল। পূর্বের মত এ অভিযোগে "দোষী নই" বলার পরিবর্তে লোকে দোষ স্বীকার করতে লাগল এবং এই কথা ঘোষণা করতে আরম্ভ করল যে, রাজদ্রোহের প্রচার করা তাদের জাতীয় কর্তব্য। উচ্চকণ্ঠে তারা ঘোষণা করল যে ভারতের ইংরেজ শাসন "শয়তানের রাজত্ব"।

গান্ধীজি চাইতেন যে মানুষ কেবল সাহসী হবে না, নির্ভীকও হবে। দুর্বলতা, ভীরুতা ও ভয়কে তিনি মনুষ্যত্ববিরোধী পাপ বলে মনে করতেন। ভীতিগ্রস্ত মানুষ যে কোন রকমের অপমান সহ্য করবে ও যে কোন অত্যাচার বরদাস্ত করবে। ভয়ের প্রভাবে সে যে-কোন অপরাধ বা মহাপাপ করতে পারে। শেষ অবধি হিংসা তো একটা সদর্থক (positive) ব্যাপার। ভয় হল নেতিবাচক। ভয় অন্যায়কারীর ইচ্ছার কাছে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করে। একমাত্র কোনো অপেক্ষাকৃত নির্ভীক ব্যক্তিই হিংসার শরণ নিতে পারে। ভীতিবিহ্বল মানুষ শক্তি বা

বীর্যবিহীন। অপ্রতুলতার রোগে তিনি ভুগছেন। চাহিদা বা অপ্রতুলতা নৈতিক আচরণের বনিয়াদ নয়। কোনো রকম ফলপ্রসূ কার্যের জন্য এর প্রয়োগ চলতে পারে না। পক্ষান্তরে হিংসা সদর্থক ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। প্রাণোচ্ছল হয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত এ। সঠিক ভাবে প্রযুক্ত হলে হিংসাকে ফলপ্রসূ কাজে লাগান যায়। মহাপাপী পরম সাধু পুরুষে পরিণত হয়েছেন—এর ভূরি ভূরি উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কেন এমন হয়? কারণ তাঁদের এমন একটা ক্ষমতা ছিল সঠিক ভাবে যার প্রয়োগ করা মাত্র হৃদয়-পরিবর্তন ও নূতন জীবনে চরণপাত করার চমৎকার ঘটল।

চম্পারণে গান্ধীজির জীবনের একটি ঘটনার কথা আমার এখানে মনে পড়ছে। সেখানকার ইউরোপীয় নীলকর সাহেবরা স্থানীয় চাষীদের উপর অত্যাচার করতেন। আমরা যখন সেখানে তখন একদিন নীলকরদের লোকেরা একটি গ্রামে গিয়ে লুটপাট করে। ভীতি তাড়িত গ্রামবাসীরা এমন কি গ্রামের মেয়েছেলেদের ফেলে রেখে গ্রাম থেকে পালিয়ে যান। এই খবর পেয়ে গান্ধীজির ক্রোধের আর সীমা ছিল না। তিনি বললেন যে, গ্রামবাসীরা যদি হিংস উপায়েও প্রতিরোধ করতেন তাহলে তা অধিকতর নীতিসম্মত হত। ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ করেছেন।

হিংসায় বিশ্বাসী ভারতের বিপ্লবীদের সাহস দেশপ্রেম ও অত্যাচারের প্রতি ঘৃণার মনোভাবকে গান্ধীজি চিরকাল স্বীকার ও প্রশংসা করেছেন। বাহ্যতঃ অহিংস মনে হলেও যে সব ভারতবাসী বিনা প্রতিবাদে ও শান্তিত অবস্থায় ইংরেজদের দাসত্ব-বন্ধন ও অত্যাচার বরদাস্ত করতেন তাঁদের চেয়ে তিনি এই সব বিপ্লবীদের বেশী পছন্দ করতেন। পূর্বোক্ত নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীদের তিনি কখনও অহিংস বলে মনে করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন অহিংসা এক সদর্থক গুণ। একে অভাব, অপ্রতুলতা, ভীরুতা এবং এমন কি অলীক তৃপ্তিও বলা চলে না। অহিংসা হল একটা উচ্চ কোটির অতৃপ্তি যার লক্ষ্য হচ্ছে অবিচার ও অত্যাচারের নিরাকরণ প্রয়াস। গান্ধীজি প্রায়ই বলতেন, বিদেশী শাসনের অধীনে সন্তুষ্ট থাকার বদলে তিনি বরং চাইবেন যে ভারতবর্ষ যেন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিংসার শরণ নেয়। তবে তিনি এও বলতেন যে, সে স্বাধীনতা সত্যকার স্বাধীনতা হবে না। অন্ততঃ তাঁর ধারণায় স্বাধীনতা তো হবেই না।

সুতরাং গান্ধীজির অহিংসা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল। এর সর্বনিম্ন ধাপে

ছিল সেই ব্যক্তি যে ভয়ের জন্য যাকে অবিচার ও অত্যাচার বলে মনে করছে তার প্রতিরোধ করবে না। এমন ব্যক্তিকে অহিংস বলা চলে না, এ হচ্ছে অপ্রতিরোধকারী ভীরুর নিদর্শন। অবাধ সুযোগ দিয়ে তিনি বরং অত্যাচারকে প্রোৎসাহিত করছেন। এর উপরের ধাপে—তবে অনেকটা উপরে—সৈনিক বা হিংস পন্থায় প্রতিরোধকারীর স্থান। অবিচারে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেন এবং প্রয়োজন হলে এই ভাবে তিনি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। তিনি সাহসী তবে সম্পূর্ণ নির্ভীক নন। নিজের জীবন দেওয়ার চেয়ে তিনি অপরের জীবন নিতে বেশী উৎসুক। তাঁর ভরসা হল অস্ত্রশস্ত্র এবং সেই সব পদ্ধতি, যার দ্বারা তিনি অসত্য ও হিংসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তবে ভীরুতার চেয়ে এ অনেক ভাল। এইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি জাপানের বিরুদ্ধে চীন ও জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের প্রতিরোধকে প্রায় অহিংসার আখ্যা দিয়েছিলেন। স্থূল অহিংস প্রতিরোধকারীর স্থান এর থেকেও উচ্চতর পর্যায়ে। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি অহিংস। কারণ তিনি দেখেছেন যে হিংস প্রতিরোধের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজনের খাতিরে তিনি হিংসা বিসর্জন দিয়েছেন। হিংসা বিসর্জন দিলেও তাঁর মনে বিদ্বেষ ও ভয় ভরা। তবে আজকে যখন উত্তরোত্তর অধিকতর বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে লড়াই করা হচ্ছে এবং যখন কেবল মানব-সভ্যতাই নয়, মানব-জাতির অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন তখন এই জাতীয় অহিংসা খুবই উপকারী। এ অহিংসা অমানুষিক নরহত্যা ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানবসমাজকে বহুলাংশে বাঁচাতে পারে। বর্তমানের সশস্ত্র সংঘর্ষে যে অযৌক্তিক উন্মত্ততা ভয় ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এই প্রক্রিয়ায় তার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। স্থূল অহিংস প্রতিরোধকারী সৈনিকের মতই সাহসী। তবে তাঁর অহিংসার পিছনে প্রচ্ছন্ন ভয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিজেকে দুর্বল মনে করার মধ্যেই এই ভয়ের উৎস। গান্ধীজি বলতেন যে, এটা হল দুর্বলের অহিংসা, ভীরুর অহিংসা নয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাঁর স্থান যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস। তাঁর কাছে অহিংসা কেবল একটা কর্মকৌশল (policy) নয়, এ হল জীবন-নীতি। অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে তিনি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ; কিন্তু কখনও অপরের প্রাণ নেবেন না। তিনি কেবল সাহসী নন, নির্ভীকও বটেন। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উভয় ধরনের মানবীয় মনোবিজ্ঞানের কথাই হল এই যে, অস্ত্রের উপর নির্ভরকারী মানুষ সাহসী হলেও নির্ভীক হতে

পারে না। আজকে সবচেয়ে বেশী ভীতিগ্রস্ত জাতি হল তারাই একটুখানি প্ররোচনাতেই যারা মৃগীরোগীর মত বিহ্বল হয়ে পড়ে। অথচ এরাই হল আবার বৃহৎ রাষ্ট্র যাদের তাঁবে অতীব শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্র প্রস্তুত। ক্ষুদ্রতর জাতিগুলি আত্মরক্ষার জন্ত অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভর করে না (হয়ত বা উপায় নেই বলেই) এবং তারাই বর্তমানের ঘনঘটার মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্ত।

সর্বোচ্চ কোটির অহিংসা অর্থাৎ সবলের অহিংসা নির্ভীকতা-ভিত্তিক। কারণ এই জাতীয় অহিংসা অপরের জীবন নেয় না, কিন্তু নিজ জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত। তাই বিশ্বের যে ব্যাধির অভিপ্রকাশ অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারে তার যথাযথ কারণ নির্ণয় করে এই জাতীয় অহিংসা। অন্যায় প্রথা ও সেই প্রথার পরিচালক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই অহিংসা পার্থক্য করে। কোনো প্রথা অন্যায় ও নিষ্ঠুর হতে পারে; কিন্তু এর কর্ণধার নরনারীরা স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর ও অন্যায়কারী নাও হতে পারে। সুতরাং অন্যায় প্রথার যে পরিচালকবর্গ প্রায়শঃ নিরপরাধ হন হিংস উপায়ে তাঁদের বিলুপ্তিসাধন আমাদের কাম্য নয়— আমাদের লক্ষ্য হবে অন্যায় প্রথার অবসান ঘটান। কোনো কুপ্রথার কর্ণধারদেরও যে সময় সময় বিবেক জাগ্রত হয় ও তাঁরা অন্যায় পথ পরিহার করেন, এর মূলে রয়েছে সত্যাগ্রহীর পূর্বোক্ত মনোভঙ্গী।

গান্ধীজি উচ্চগ্রামের অহিংস ছিলেন বলে তাঁর অপর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং প্রতিটি যথার্থ সত্যাগ্রহীর ভিতরও এই লক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যটি হল: তিনি যে পথের কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে আর সকলকে বোঝাতে সক্ষম না হলে "একলা চলো রে" নীতি গ্রহণ করা। কোন কর্মপন্থা নিজের কাছে যথার্থ ও অভ্রান্ত মনে হলে আর সবাই কি ভাবছে বা করছে তার প্রতি গান্ধীজি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রকট। এর ফলে তিনি প্রচলিত প্রথাবিরোধী (unconventional) বলে পরিগণিত হন। তাঁর পোশাক, খাদ্য, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি—সবই ছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্যাপার। লোকে তাঁর এসব দেখে উপহাসের হাসি হাসতে পারে; কিন্তু গান্ধীজির তার জন্ত কোনই দুশ্চিন্তা ছিল না। এই সব সমালোচকদের উপেক্ষা করে শেষ হাসি গান্ধীজিই হাসতেন। কি দক্ষিণ আফ্রিকায় কি ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু স্থলেই তাঁকে এই ভাবে একলা চলতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারকুশলী। অপরকে স্বমতে

আনার ক্ষমতাও ছিল তাঁর প্রচণ্ড। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর আপস করার শক্তিও ছিল অদ্ভুতপূর্ব। এসব গুণরাজি সত্ত্বেও সময় সময় তিনি তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ সহকর্মী ও অনুগামীদের কোনো কোনো বিষয় বোঝাতে অসমর্থ হতেন। সেই সব মুহূর্তে তিনি সাহসে বুক বেঁধে একলা চলতেন। বিদ্রূপ, বিজ্ঞতার আহ্বান অথবা নিরাপত্তার আকর্ষণ—কোনো কিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। নিজের সামনে স্পষ্ট আলোক-শিখা দেখতে পেলে পরিণাম চিন্তা না করেই একলা চলার সাহস তাঁর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুমোদন করতে বলার মধ্যেও এই "একলা চলো রে" নীতির এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। ইংরেজের হাতে যখন এক অমিতশক্তিশালী ও সুদক্ষ যুদ্ধ-যন্ত্র, তখন এই প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমটির সামনে পেশ হয়। ইংরেজ তখন জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে যুদ্ধায়োজন করছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন তখন তার শক্তিশালী মিত্র। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও সে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইংরেজের কাছে তখন মরণ বাঁচনের প্রশ্ন। এই রকম সময়ই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠী চরমতম নিষ্ঠুরতার আতঙ্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়। গান্ধীজি কিন্তু সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তাঁর ঔদ্ধত্য দেখে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ হতবাক্। আর কিছু না হোক, বিশ্ব-জনমতের ভয় অন্ততঃ তাঁদের ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-দাবির প্রতি আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের সহানুভূতির কথাও ছিল সুবিদিত। অসময়ে এই যুদ্ধঘোষণা দেশকে ঐসব রাষ্ট্রের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করবে। তাই স্বভাবতই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। এই দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করে গান্ধীজী প্রস্তাব করলেন যে, একা তাঁকে এই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হোক। একমাত্র তাঁরাই যেন তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন যাঁরা তাঁর মতো বিশ্বাস করেন যে, জাতি যদি সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধ না করে তাহলে মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অনেক দেশের মতো জাপানী আক্রমণের সম্মুখে তাকে অপমানজনক ভাবে এবং বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। সঙ্কট-লগ্নে এই একলা চলার শক্তি ছিল গান্ধীজির অতীব মূল্যবান সম্পদ। এটা তাঁর ঐকান্তিক নির্ভীকতার লক্ষণও বটে। এই নির্ভীকতা হচ্ছে অহংকে অবনমিতকারী এবং ঈশ্বর বা নৈতিক বিধানের পরম শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী চূড়ান্ত অহিংসার পরিণাম।

সর্বশেষে গান্ধীজির আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা হল তাঁর ত্বরিৎ-মানসিকতা (sense of urgency)। এই ত্বরিৎ-মানসিকতা ব্যতিরেকে মহৎ কোনো কিছু করা সম্ভবপর নয়। তাবৎ মহান নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী ও ধর্মপ্রবর্তকদের ভিতর এই ত্বরিৎ-মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। যীশু স্বয়ং বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও এই বিশ্বাস সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন যে, "স্বর্গরাজ্য হাতের মধ্যে"। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন যে, স্বর্গরাজ্য এই কাছেপিঠে কোথাও। কিন্তু হায়! সুদীর্ঘ বিশ শতাব্দীর পরও আজও তা পূর্বেরই মত সুদূর পরাহত। কিন্তু এই বিশ্বাসের বলেই খ্রীষ্টধর্ম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সংস্কারকের মতো গান্ধীজিও বিশ্বাস করতেন যে, কাল পক্ব ও পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে বিলোপসাধনও করে। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি তাঁর কাছে এত খারাপ মনে হয়েছিল যে, এর সমস্যা নিয়ে কোনো রকম কালহরণ, আপস করা বা দ্বিধা সঙ্কোচের পরিচয় দেওয়ার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার পরিণামে জাতি আরও নির্বীর্য হয়ে পড়বে এবং আগামী বহু যুগ আর তার উদ্ধারের আশা থাকবে না। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই জাতির কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। হয় এই মুহূর্তে, নচেৎ কোনো দিনই নয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি এক বছরের মধ্যে স্বরাজের কথা বলেছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন যে, স্বরাজ অর্জিত না হলে তিনি সবরমতী আশ্রমে ফিরবেন না। ১৯৪২সনে তিনি বললেন, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" যুদ্ধ ও হিংসার যাঁরা বিকল্প খুঁজছেন তাঁদেরও গান্ধীজির মতো এই জাতীয় ত্বরিৎ-মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে যার বহুবিধ নিদর্শন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রেখে গেছেন। ঝটিকা বেগে তিনি স্বরাজের রাজ্য অধিগত করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজির অহিংসা

দাদা ধর্মাধিকারী

গান্ধীজির অহিংসা সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে অহিংসা কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের হতে পারে? অহিংসাতে কি এটা "আমার অহিংসা" এটা "তোমার অহিংসা" ও এটা "তার অহিংসা"—এই রকম কোন ভেদ-প্রভেদ করা সম্ভব? এই রকম পার্থক্য করা যুক্তিসঙ্গত বলে যদি এক মুহূর্তের জন্ম ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে বাস্তবে কি তাকে কখনও সাকার করা যায়? অহিংসা অহিংসাই—তা সে উত্তম পুরুষ (first person) মধ্যম পুরুষ (second person) অথবা প্রথম পুরুষ (third person), যারই হোক না কেন। জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে অহিংস-প্রক্রিয়া প্রয়োগের বেলায় ব্যাকরণের মত পুরুষ-ভেদ চলে না।

তবুও গান্ধীজি মনুষ্য-সমাজের পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অহিংসার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন ইতিহাসে তা অপূর্ব এবং বিস্ময়কর। তাঁর পূর্বে বহু মহাপুরুষ অহিংসার প্রয়োগ করেছিলেন; কিন্তু সেই সব প্রয়োগের মাধ্যমে এক সামাজিক মূল্য রূপে অহিংসা বিকশিত হয় নি। প্রশ্ন হল এই যে, অহিংসা কি কখনও সামাজিক মূল্য হতে পারে? অন্ততঃ অদ্যাবধি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যার বলে বলা চলে যে, সমাজের কোনো এক পর্যায়ে হিংসা সমাজকে বিধৃতকারী আধার স্বরূপ ছিল। হিংসার ভিত্তিতে দুই জন মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে—তাই বা কেন তাদের পক্ষে কাছাকাছিও থাকা অসম্ভব। এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে সামাজিক জীবনে অহিংসার প্রয়োগের প্রতিপাদন করার প্রয়োজনই পড়ে না। জীবন আর অহিংসা তো সম-অর্থবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

কথাটি একান্ত সত্য। জীবন ও অহিংসা সমঅর্থবাচক নয়, একই অর্থের বোধক শব্দ। কিন্তু মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও বিকারের কারণ স্বার্থ ও মতবাদের বিরোধের সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও তো এমন ভ্রমের সৃষ্টি হয় যে, জীবন-সংরক্ষণের জন্যই সীমিত মাত্রায় হিংসা প্রয়োগের আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ সমাজে হিংসার যে মর্যাদা তা হল জীবন-সংরক্ষণের সাধন

রূপে। অর্থাৎ অহিংসার মর্যাদার সংরক্ষণের জন্য সীমিত মাত্রায় হিংসা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কথাটা শুনতে বিরোধাভাসাত্মক। কিন্তু এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাৎপর্য হল এই যে, যে প্রক্রিয়ায় হিংসা সর্বাপেক্ষা কম এবং জীবন-সংরক্ষণের ক্ষমতা বেশী সেই ধরনের হিংসাই আজ অর্থাৎ গান্ধী-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সমাজমান্য ছিল। এই ধরনের হিংসার নাম দেওয়া হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ। শস্ত্র প্রয়োগের অনুজ্ঞা সেই প্রক্রিয়ায় ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও দেওয়া ছিল অপর যাবতীয় উপায় ব্যর্থ হলেই কেবল যেন এই শিষ্ট-সম্মত হিংসার প্রয়োগ করা হয় এবং তাও আপৎধর্মরূপে যথাসম্ভব স্বল্প মাত্রায়। সারাংশ হল এই যে, ধর্মযুদ্ধকে সমাজের একটা অবস্থায় একটা সীমা পর্যন্ত প্রগতির উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছিল; কিন্তু স্বয়ং হিংসাকে কদাচ জীবনের আধার রূপে মেনে নেওয়া হয় নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির অবদান অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক। তিনি এই কথা বললেন ও বুঝলেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যায় ও বিসমতার নিবারণার্থ প্রতিকারাত্মক পদ্ধতির শরণ নেওয়া আবশ্যক হতে পারে; কিন্তু যে হিংসার প্রয়োগ আমরা ন্যূনতম মাত্রায় করতে চাই কেনই বা তাকে শূন্য পর্যন্ত পৌছান হবে না? যুদ্ধে পরাক্রম ও শৌর্যের যে পরিমাণ আবশ্যকতা তার থেকে কম তো নয়ই বরং কিছু অধিক পরিমাণ বীরত্ব ও পরাক্রমের অবকাশ কি শস্ত্র-নিরপেক্ষ প্রতিকার-পদ্ধতিতে হতে পারে না? নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমূহে গান্ধীজি পূর্বোক্ত প্রশ্নের বাস্তব ও আচারাত্মক উত্তর দিতে সমর্থ হলেন। এই শস্ত্র-নিরপেক্ষ-প্রতিকারাত্মক পদ্ধতির আবিষ্কার ও সীমিত প্রয়োগ তো গান্ধীজির পূর্বেও এই পৃথিবীতে হয়েছে। ইউরোপে এই প্রতিকার-পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistence) নাম দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও বালগঙ্গাধর তিলক এর সার্থকতা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু প্রতিকারের পদ্ধতিতে শস্ত্র-প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না। আর একথাও মনে করা হত না যে, এই নিঃশস্ত্র প্রতিকার সশস্ত্র প্রতিকারের বিকল্প হতে পারে। গান্ধীজির সত্যাগ্রহের দাবি এই যে, শস্ত্র-প্রয়োগ অপেক্ষা সত্যাগ্রহের প্রতিকার-পদ্ধতি অধিকতর পরিণামদায়ী। এতে শস্ত্র-প্রয়োগের চেয়ে অধিক পরিমাণ শূরতার অবকাশ বিদ্যমান। কিন্তু ক্রূরতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই হল গান্ধীজির অহিংসার এক বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজির অহিংসার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা প্রতিযোগী বা প্রতিক্রিয়াত্মক নয়। অর্থাৎ সত্যাগ্রহী একথা বিশ্বাস করেন না যে, যতক্ষণ বা যে পরিমাণে বিরুদ্ধপক্ষ অহিংসার আচারবিধি পালন করবেন ততক্ষণ বা তার থেকে কিছু বেশী সময় পর্যন্ত এবং সেই মাত্রায় বা তার কিছু অধিক মাত্রায় তিনি স্বয়ং অহিংস আচরণ করবেন। এই অর্থে সত্যাগ্রহীর অহিংসা নিরপেক্ষ। এই জন্য সর্বদাই অতিক্রম (initiative) থাকে সত্যাগ্রহীর হাতে। সীমাবদ্ধ হিংসার সমাজমান্য যে কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন দাবি করা চলে না। সমাজমান্য হিংসার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই এই দাবি করবেন যে, তাঁরা যথাসম্ভব কম হিংসার প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আদৌ কোনো দাবি করা সম্ভবপর হয় তাহলে সকল পক্ষ এই দাবি করবে যে, আমরা যথাসম্ভব অধিক মাত্রায় অহিংসা পালন করেছি। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ এমন এক প্রতিকার-পদ্ধতি যার মধ্যে এক শাশ্বত জীবন-মূল্য নিহিত। এর ফলে বিরুদ্ধপক্ষেরও জীবন ও আত্মমর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

পারমাণবিক শক্তি অবধি আজ বিজ্ঞানের প্রগতি হয়েছে। এবং এই প্রগতির কোনো সীমা নেই। এমতাবস্থায় মানবীয় সংঘর্ষের পরিহারের জন্য নিত্য নব নব অস্ত্রের অনুসন্ধান করলে জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এ বিষয়ে আজ বোধহয় কারও মতভেদ নেই। বর্তমান পরিস্থিতিই এমন যে, গান্ধীজির অহিংসা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অর্বাচীন পুরাণ-প্রিয় বিপ্লবীদের ভাষায় একে আপনারা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও বলতে পারেন। পরিস্থিতিতে এর আবশ্যকতা রয়েছে; কিন্তু মানবসমুদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা এর থেকে পিছনে পড়ে থাকছে। এর মূলে রয়েছে সমাজবিপ্লবের প্রচলিত মতবাদ-সমূহের প্রভাবজনিত সংস্কার। আধুনিক বিপ্লবীও বিপ্লবের বিজ্ঞান ও প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সনাতন ঐতিহ্যানুগামী। এই অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন বিজ্ঞান-যুগের মানব-ব্যক্তিত্ব দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন থাকবে। এই দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের কারণ অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রত্যাশিত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে যে বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তার কারণ মানুষ ব্যাকুল ও বিমূঢ়। পরিস্থিতির আবশ্যকতা ও মানব-জাতির আকাঙ্ক্ষায় যতটা নৈকট্যের সৃষ্টি হবে এই সব সমস্যার সমাধান ততটা সহজ হয়ে উঠবে।

নোয়াখালী ও বিহারে গান্ধীর অহিংসার প্রয়োগ

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আমি গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। সেই সময় গান্ধীজি দিল্লীতে বাল্মীকি মন্দিরে ভাঙ্গী কলোনীতে বাস করিতেছিলেন। ট্রাঙ্ক টেলিফোন পাই রাত্রি দশটায়। আমাদের সহকর্মী হারাণ ঘোষচৌধুরী ডাকিয়াছেন বিপদ সংবাদ দিতে। তিনি বলিলেন ১০ই অক্টোবর হইতে নোয়াখালীর মুসলমানেরা হিন্দুর গৃহদাহ করিতেছে, লুণ্ঠন করিতেছে, হিন্দু হত্যা করিতেছে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইতেছে এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিয়াছে। গান্ধীজির আসা প্রয়োজন। তিনি এই সংবাদ জওহরলালকে ও সর্দার প্যাটেলকেও টেলিফোনে জানাইয়াছেন বলিলেন।

তখন রাত্রি দশটা, গান্ধীজি নিদ্রামগ্ন। তাঁহাকে তখন জাগাইয়া সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। ভোর ৪টায় প্রার্থনা হয়। তার পূর্বে সময় চাহিয়া রাখিব মনস্থির করিলাম।

পরদিন প্রার্থনার পূর্বে প্রত্যুষে গান্ধীজিকে জানাইলাম যে, রাত্রে ট্রাঙ্ককল পাই। গান্ধীজি বলেন, প্রার্থনা হইয়া গেলেই আমার সহিত বাহির হইও। প্রার্থনার পর চলিতে চলিতে কথা হয়। সব বলি। গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, মুসলমান করিয়াছে? স্ত্রীদের উপর অত্যাচার! ইসলামে এমন কিছু আছে যাহাতে কাহাকেও একবার মুসলমান করিয়া লইলে আর তাহাকে হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না। তাঁহার মুখের চেহারা শঙ্কান্বিত হইল। বলিলেন, তুমি যাও, যা পার কর, আমি দুই এক দিনের মধ্য হাতের কাজ শেষ করিয়া আসিতেছি।

হাওড়ায় পহুঁছিয়া দেখি যে, বিশ্বরঞ্জন ও সাধন তৈরী হইয়া আসিয়াছে। নোয়াখালী যাইবে। তখনই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তার করিলাম, খাদিকর্মী দুইজন অহিংসপন্থী পাঠাইতেছি ইহাদের সেবা করার সুবিধা দিও।

সোদপুরে আসিয়া জানি যে গান্ধীজি আসিতেছেন। হেমপ্রভা দেবীও তার করেন নোয়াখালীর বিষয়। গান্ধীজি উত্তরে জানান, তিনি আসিতেছেন।

দুইদিন বাদেই গান্ধী সোদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার নোয়াখালী রওনা হইতে হয়। গান্ধীজি মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবকে জানাইলেন। সুরাবর্দী সোদপুরে আসিয়া গান্ধীজিকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন, তবে তাঁহার প্রয়োজন নোয়াখালীতে নয় বিহারে। নোখাখালীতে কি আর হইয়াছে? কিছুই এমন হয় নাই। গান্ধীর সেখানে যাওয়া মানে একটা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার সৃষ্টি করা যে, সেখানে ভীষণ কিছু হইয়াছে আর ওদিকে বিহার জ্বলিতেছে।

গান্ধীজি বিহারের মন্ত্রীদের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। রাজেন্দ্রবাবু জওহরলালের সহিত পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ করেন। ২রা নভেম্বর বিহারের মন্ত্রীরা জানান যে, ওখানে হাঙ্গামা হইয়াছে। উহা আয়ত্তের মধ্যে আছে। গান্ধীর এখন আসিবার প্রয়োজন নাই। এই আশ্বাসে গান্ধীজি সুরাবর্দী সাহেবের সমস্ত জেদাজেদি অগ্রাহ্য করেন। অগত্যা ৬ই নভেম্বর সুরাবর্দী গান্ধীজির নোয়াখালী যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। গভর্নমেণ্ট তরফে মন্ত্রী সামসুদ্দীন আমেদ আরও একজন সহযাত্রী হয়েন। স্পেশাল ট্রেন ও স্টীমারের ব্যবস্থা হয়। গান্ধীজি সদলে রওনা হয়েন। গোয়ালন্দ ঘাটে একখানা বড় যাত্রীবাহী স্টীমার কেবল গান্ধী ও তাঁহার সঙ্গীদের লওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পথ ছিল সাধারণ যাত্রী-পথ। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমারে চাঁদপুর, চাঁদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে নোয়াখালী। মাঝে লাকসাম জংশন। ভোরে লাকসাম স্টেশনে অনেক নরনারী গান্ধী-দর্শনে উপস্থিত হয়েন এবং দুর্দশার কথা শুনান। গান্ধীজির মুখ হইতে তখন এই কথা বাহির হইল, তোমরা বলিতেছ আমি আসিতেই তোমরা নির্ভয় হইয়াছ, আমি চলিয়া গেলে আবার তোমরা সেই ভয়েই ভীত হইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরে আমি তোমাদিগকে কথা দিতেছি যে, যতদিন পর্যন্ত এতটুকুও ভয় থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত একজন বালিকা এখানে সেখানে ইচ্ছামত নির্ভয়ে চলাফেরা করিতে না পারিবে, ততদিন আমি নোয়াখালী ছাড়িয়া যাইব না। তোমরা নিশ্চয় বিশ্বাস রাখিও এবং নির্ভয় হইও।

লাকসামের পর অনেকগুলি স্টেশন পার হইয়া আমরা চৌমোহানীতে পৌঁছাই। চৌমোহানীই আমাদের হারাণবাবুর দাঙ্গা রিলিফ কেন্দ্র। গান্ধীজির পূর্বে শ্রীমতী কৃপালনী এবং আরও অনেকে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও চৌমোহানীর বাড়িতে ক্যাম্প করিয়াছিলেন। আবার হারাণবাবুর নিজগ্রাম

দত্ত পাড়ায় এক জমিদার বাড়িতে ক্যাম্প করিয়া কতক কর্মী উদ্‌বাস্তু-ক্যাম্প খুলিয়া সেবাকার্য করিতেছিলেন। বাংলার কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁহার একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া কাজ করিতেছিলেন। কাজ ছিল পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে আটক গ্রাম হইতে হিন্দুনরনারীকে রিলিফ ক্যাম্পে আনান। দাঙ্গা দমনের জন্য সুরাবর্দী সাহেব গান্ধী-আগমনের সূচনায় মিলিটারী সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহারা উত্তম কার্য করিতেছিলেন। ব্যাপক মিলিটারীর উপস্থিতি হেতু গান্ধী কলিকাতায় থাকাতেই দাঙ্গা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গান্ধীর চৌমোহানী ক্যাম্পে পরামর্শ সভা বসে। হেমপ্রভা দেবী ও আমি বলি যে, ত্রাণকার্যে মিলিটারীর সাহায্য লওয়া নয়। জীবন বিপন্ন করিয়াই একাজ করিতে হয়। মধুবাবুর (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) যুক্তি অন্যরূপ। তিনি বলেন, ভলান্টিয়ারদের অভিভাবকেরা তাঁহার দিকে চাহিয়াই উহাদিগকে দিয়াছে। তাহাদের জীবনের শঙ্কা হয় এমন কাজে তিনি তাহাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না। শ্রীমতী কৃপালনী ও শ্রীমতী অশোকা গুপ্তাও নিপীড়িত মেয়েদের সন্ধান লইয়া পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও মিলিটারীর যুগ্ম সহায়তায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্য উত্তমরূপে করিতেছিলেন।

এই অবস্থায় গান্ধী বলেন যে, দুই দল নিজ নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিবেন। ইহাই সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হয়। হারাণ ঘোষের ও খাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যথা প্রয়োজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করার ব্যবস্থা আমি করি। কতক কংগ্রেস সংস্থাভুক্ত হইয়া কিছুকাল কাজ করেন।

রামগঞ্জ থানা-বাড়ির চারিদিকেই অত্যাচারটা বেশী চলিয়াছিল। গৃহদগ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত সকল পরিবারই রামগঞ্জ থানার আশেপাশে ক্যাম্প করিয়া বাস করিতেছিলেন। রামগঞ্জে অনেকগুলি জনহিতকারী সংস্থা অর্থ, খাদ্য ও স্বেচ্ছা-সেবক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সেবায় লোকের মনোবল ফিরিয়া আসিতেছিল। গভর্নমেণ্ট হইতে তখনো রিলিফ আরম্ভই হয় নাই বলা যায়। আমরা পঁহুছিয়াই জানিলাম যে, রামগঞ্জ উদ্‌বাস্তু ক্যাম্পে আমাশার মহামারী সৃষ্টি হইয়াছে।

গান্ধীজি আমাকে বলিলেন, তুমি যাও রিপোর্ট লইয়া আইস, কি করা যায় দেখা যাইবে। সকলে চৌমোহানীতে রহিলেন, আমি চারুকে লইয়া রওনা হইলাম। সঙ্গে আরো দুই এক জন সাথী, মনে হয় সৌরীনও ছিল।

চৌমোহানী হইতে ট্রেনে কতকদূর গিয়া মাইল বিশেক পথ নৌকায় গেলে তবে রামগঞ্জে পঁহুছিব। ভাড়াটে নৌকা মাত্রই মুসলমানের। এবং সত্যই এমন অনেক নৌকাওয়ালা আছে যাহারা যাত্রীকে হত্যা করিয়া জিনিসপত্র লয়। আমাদের সঙ্গে কিছু ছিল না। পরবৎসর পূজার সময় কতকগুলি বাক্স বোঝাই বই লইয়া যাইতে নৌকাওয়ালা আমাকে মারিয়া বাকসগুলি লইবে ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাজেই তখনকার দিনে নৌকার মাঝির উপর যে বিশ্বাস করা যাইত না সে কথা পরে জানিয়াছি। যাঁহারা অভিজ্ঞ মিলিটারী পাহারা না লইয়া দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে রাত্রিকালে নৌকায় চলিবার প্রস্তাবে তাঁহারা নিতান্ত অপ্রসন্ন হন। এক মুসলমান মাঝি পাই। সন্ধ্যায় রওনা হইয়া ভোরে পঁহুছাইয়া দিবে। গান্ধীর আগমন-বার্তা মুখে মুখে একদিনেই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। আমরা গান্ধীর লোক বলাতেই অন্যান্য মাঝিরা একজনকে দেখাইয়া দিল ঐ নৌকায় যান। ঠিক ঠিক গেলাম। সারারাত মুসলমান গ্রামের গা ঘেঁষিয়া চলিয়াছি। সকাল হইতেই নৌকা ছাড়িয়া সড়কে চলিতে থাকি। নৌপথ ছিল সড়কের মাটি তোলার খাল।

সকালে দেখি একজন লোক গরু বাঁধিতে মাঠে আসিয়াছে। নাম কি? মুসলমানী নাম বলে, লুঙ্গী পরা। বুঝি যে প্রচ্ছন্ন হিন্দু। বলি, রাম নাম কর। "মারিয়া ফেলিবে যে।" বলি, গান্ধী আসিয়াছে, আর সকল হিন্দুই এখন হিন্দু জান না? "হাঁ শুনিয়াছি।" তবে ধুন ধর,—'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম।" রাস্তায় ধুন তাল ও নৃত্য চলিল। দুই চার জন মুসলমান বাহির হইল। দুই একটা কথা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল। বুঝিলাম একদিনেই গান্ধীর নামে পট-পরিবর্তিত হইয়াছে।

রামগঞ্জ গেলাম। কোনও মহামারী নাই। আমাশাও নাই। রামগঞ্জের ক্যাম্পে পণ্ডিতবাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় হইল। গান্ধীকে তাহাদের কাজিরখিল বাড়িতে লইয়া আসিতে বলিল। ঐ থানার গায়েই কাজিরখিল। পণ্ডিতবাড়ি ক্যাম্প হিসাবে যোগ্য স্থান। কতক পাকা কতক টিনের ঘর। অনেক শরিকের বিস্তীর্ণ বাড়ি। ঐ বাড়ির কর্তাকে হত্যা করে। লুটপাট করে। কয়েকখানা ঘর পোড়ায়। উহারা স্থানীয় লোকেদের প্রিয় ছিল। তবুও টাকাটা ওরাই লয়।

লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নারীহরণ কার্যে একটা প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। যে গ্রামে ধনী পরিবার আছে সেই ধনী পরিবারই লক্ষ্যস্থল, সংশ্লিষ্ট ছোটবড়

হিন্দুবাড়িও বাদ যায় না। গ্রামের লোক আসিয়া বলে যাহা টাকা পয়সা আছে দিয়া দিন, উহারা (লুণ্ঠনকারীরা) আসিয়া পড়িল। এই দিয়া বিদায় করিয়া দিন। কেন ধনেপ্রাণে মারা যাইবেন, টাকা লইয়া গেল ; ফিরিয়াই বলে আর যাহা আছে দিয়া দিন। সব নগদ টাকা, বাসন-পত্র কৌশলে বাহির করিয়া লইল। তারপর বলিবে কর্তা আর ঠেকান গেল না। তখন গৃহদাহ লুণ্ঠন ও হত্যা চলিল। ইহাতে গ্রামের পরিচিত লোক নাই। এই রীতি সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। বিহারী হিন্দুরাও মুসলমান ধ্বংস করিতে এই রীতিই অবলম্বন করিত। লোকে মৃত্যু নিকট জানিয়া জীবনের আশায় সঞ্চিত সম্পদ ফেলিয়া দেয় এই মনোবিজ্ঞান বা মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সহজে সঞ্চিত ধনসম্পদ বাহির করা যাইত। জানিয়াও লোকে ভুলিত যদিই বা প্রাণে না মারে।

পণ্ডিতবাড়ি গান্ধীর কর্মকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করার জন্য উহা সাফাই করিতে লোক লাগাই। নিহতের রক্ত তখনও আঙ্গিনায় শুখাইয়া ছিল। পণ্ডিতবাড়ি কাজিরখিল হইতে শাপুরের পথে ফিরি। 'শাপুর' গোলাম সরোয়ার-এর স্থান। অতি নির্মম পাশবিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যক্তির নেতৃত্বে। ইনি বিধানসভার একজন সদস্য।

চৌমোহানীতে ফিরিয়া দেখি গান্ধী দত্তপাড়ায় চলিয়া গিয়াছেন। দত্তপাড়া লওয়ার পথে তাঁহাকে কয়েকটি হিন্দু গ্রাম দেখাইয়া লওয়া হয়। সেখানে সর্বপ্রকার পৈশাচিকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই যাত্রাতেই গান্ধীজির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হয় যে কী পরিমাণ-নৃশংশতা অনুষ্ঠিত হয়। দত্তপাড়ায় একদিন থাকার পর স্থির হয় গান্ধীজিকে কাজিরখিল ক্যাম্পে লইয়া যাওয়া হইবে। নৌকা পথ ছিল ঐ রাস্তার গায় গায়। পূর্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল শাপুরে কিছুক্ষণ থাকিয়া সভা করিয়া যাইবেন। সভা হয়—সবই তো মুসলমান। নিকটেই করপাড়ায় রাজেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গোলাম সরোয়ার নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়াছিল। সভায় জনতার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা ও আতঙ্কের ভাব ছিল। তখনও দুই একটা অঘটন ঘটিতেছিল। দত্তপাড়ায় গান্ধীর সভায় বহুলোক আসিয়াছিল, পুলিস ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় একথা প্রচার হয় যে, নিকটবর্তী গ্রাম হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের দুইজনকে পাওয়া যাইতেছে না। পরে একজনের মৃতদেহ একটি খালের কিনারায় পাওয়া যায়।

ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড বা হত্যা অবশ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শাপুরের সভার নৈতিক মূল্য ছিল। গান্ধীজি তাঁহার শান্তির বাণী প্রচার করেন এবং দুষ্কৃতিকারীদিগকে প্রকাশ্যে উপস্থিত হইয়া অনুশোচনার চিহ্ন স্বরূপ ধরা দিতে বলেন। যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব লইয়া ফিরাইয়া আনিতে উপদেশ দেন।

কাজিরখিল ক্যাম্প

কাজিরখিল ক্যাম্প গান্ধীজির প্রবেশে খোলা হইল। উহাই সারা নোয়াখালীতে গান্ধীজির শান্তিবাণী প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। পাছে গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, গান্ধীজি কোনও লড়াইয়া সংস্থা গড়িয়া তুলিতেছেন—এ প্রকার আশঙ্কা নিরসনের জন্য গান্ধী বলেন যে, তিনি অনেক গ্রামে শান্তি স্থাপন কেন্দ্র খুলিতেছেন, কিন্তু কোনও এক গ্রামে একজনের বেশী স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে না। কাজেই সে গ্রামবাসীদের প্রদত্ত নিরাপত্তার উপর নির্ভর করিয়াই সেবাকার্য চালাইবে। তাহাকে যে কেহ নিহত করিলে করিতে পারিবে, কেন না তাহার নিকট এক রামনাম ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্র থাকিতে পারিবে না।

এই ব্যবস্থা বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রহরার কাজ করিত। গ্রাম হইতে যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিত। যাহারা ভয়ে ভয়ে ছিল তাহাদিগকে অভয় দিত। এমনও হয়, যেখানে অত্যাচার হইয়াছে সেখানে বর্তমানে কোনও নারী বড় ভীত হইয়া আছে। তাহাকে গৃহ হইতে তুলিয়া লইয়া পলাইতেছিল। ডাকাত-দেরই অপর দল পথিমধ্যে চ্যালেঞ্জ করাতে যুবতীটিকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। সে অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া যায়। তবে আতঙ্কে কেবলই অজ্ঞান হইত। কেন্দ্রকর্তা সংবাদ দিলে তাহাদের পরিবারের সম্মতি অনুসারে মেয়ের পিতামহীর সহিত তাহাকে কাজিরখিলে আনাই। কাজিরখিলের খোলা হাওয়ায় দুইদিনেই প্রকৃতিস্থ হয়। দিনকতক পরে তাহার পিতামহী তাহাকে নিজেদের কোনও আত্মীয়ের নিকট লইয়া যান।

কাজিরখিল হইতে পঁচিশ ত্রিশটি কেন্দ্রে সাইকেল-সেবক যাইত। একজন চার পাঁচ ছয়টি কেন্দ্র ঘুরিত। সংবাদ দিত। সংবাদ লইয়া ফিরিত। গভর্নমেণ্ট হইতে অনুমতি লইয়া সাইক্লোস্টাইল করিয়া দৈনিক পত্রিকা কেন্দ্রসমূহে প্রেরিত হইত।

আবার কেন্দ্রের সংবাদসহ পত্র আনিত। এই পিয়নদ্বারা দৈনিক সংযোগ হেতু কোনো কেন্দ্রও নিজেকে একাকী অসহায় ও বিচ্ছিন্ন বোধ করিত না। উপদ্রুত অঞ্চলব্যাপী এই ব্যবস্থায় একটা সত্যিকার সংগঠনের ভাব গড়িয়া উঠে। কোথাও দুর্ঘটনা ঘটিলে নামধামসহ প্রকাশ করা হইত যাহাতে গভর্নমেণ্টের গোচরে আসে। কিছুই হয় নাই, সর্বত্র শান্ত আছে—এ প্রকার মিথ্যা রটনার অবকাশ থাকে না।

গভর্নমেণ্ট দৈনিক পত্রিকাকে পছন্দ করিতে পারেন নাই। কিন্তু উহা দ্বারা গান্ধী-মিশনের সংগঠনের কার্য অতি সুন্দর অনুষ্ঠিত হইত। সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলেই এই বিশ্বাস উপস্থিত হয় যে, গোপনে কোনও এক গ্রামে অত্যাচার অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহাতেও দুষ্কৃতিকারীদের মনোভাবের পরিবর্তন হয় যে, পুরানো দিন আর নাই। কাজিরখিল সংস্থার প্রত্যেক কেন্দ্রেই সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা হইত। সান্ধ্য প্রার্থনায় গ্রামের লোকে যোগ দিত। ঈশ্বরের নাম লওয়া, ভজন ও রামধুন, প্রার্থনা পদ্ধতি অবলম্বনে একই ভাবে সর্বত্র আচরিত হইত। স্থানীয় লোকও জানিত তাহারা কাজিরখিলে যেখানে গান্ধী অবস্থান করিতেছেন তাঁহার সহিত তাহারা একসূত্রে যুক্ত। এইভাবে যে সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চল কাজিরখিলের তত্ত্বাবধানে ছিল সে সবটাই সুন্দর সংগঠিত হইতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক স্বাভাবিক হইতে থাকে ও মনোবল বাড়িতে থাকে। এই এক নতুন ধরনের সংগঠন গান্ধীজির প্রেরণায় গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। বাহ্যিক আয়োজন তো নিতান্ত স্বল্প। কেন্দ্রে কেন্দ্রে মাত্র একজন করিয়া সেবক। তাহাদের ব্যয় স্থানীয় সাহায্যে কতকটা উঠিত। কোনও কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ আহার যোগাইত। কেন্দ্রব্যয় গান্ধী বহন করিতেন। তাঁহার নিকট নানাদিক হইতে অর্থ সাহায্য আসিত। সেবকসমূহ বাহির হইতে আসিতে চাহিত। তিনি নিষেধ করিতেন, ঠেকাইয়া রাখিতেন, কেহ আসিয়া পড়িলে ফেরত পাঠাইতেন।

কাজিরখিল হইতে অহিংসার প্রবাহ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হইতেছিল। দুই একস্থানে কংগ্রেসী কেন্দ্র ছিল। হাইমচরে বড় একটা ক্ষেত্র ঠক্করবাপার নেতৃত্বে চলিত। সেখানকার কার্যপদ্ধতি ঠক্করবাপা নিজ বিচার অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তবে এক কেন্দ্রে একটিমাত্র সেবক থাকিবে গান্ধীর এই নির্দেশ সর্বত্রই প্রতিপালিত হইত। অহিংসার প্রবাহ জনমনে সঞ্চারিত করিতে গান্ধীজির এই নির্দেশ একটি বিশেষ ব্যবস্থা। ইহার সুফল

যে-কাহারও চোখে পড়িবার মত। কাজিরখিলের বহিরায়োজন ছিল তো মাত্র খানচারেক সাইকেল, চলাচলের জন্য, খানচারেক ডিঙ্গী হাতে চালান, নৌকা একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, একটি টাইপরাইটার যন্ত্র ও একটি ট্রানসিস্টার রেডিও বাহিরের সহিত সংযোগের জন্য। এই স্বল্প আয়োজনে বিরাট কার্য সম্পন্ন যে হইতেছিল তাহা কেবলমাত্র গান্ধীজির মানসিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। সংস্থাটি গান্ধী-মানসের সহিত ঐকতানে যুক্ত হয় ইহাই ছিল আমাদের সকলকার ধ্যেয়। ব্যক্তিগত রুচি এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজিরখিলের ক্ষেত্র সমূহে সংযত থাকিত।

কয়েকদিন কাজিরখিলে গান্ধীজির বাস করার পরই পার্শ্ববর্তী মুসলমান বাড়িগুলিতে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

নন্দনপুরের অভিজ্ঞতা

কাজিরখিল ক্যাম্প বাড়িটার গায়েই কয়েকঘর মুসলমান পরিবার, তারপর একটা সাঁকো পার হইলেই নন্দনপুর গ্রাম। নন্দনপুর ছিল অর্থশালী বণিকদের গ্রাম। অনেক একতলা ও দ্বিতল বাড়ি ছিল। টিনের ঘর ও খড়ের ঘরতো ছিলই। এই গ্রামে সর্বপ্রকার অত্যাচারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাকা বাড়িগুলিও জখম হইয়াছে, অন্য প্রকার ঘর সবই পুড়িয়া গিয়াছে। বাসিন্দারা রামগঞ্জ ক্যাম্পে আছেন। তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনার আগ্রহ করি। স্থির করি, আমি ও হেমপ্রভা ঐ দগ্ধ গ্রামে এই একজোড়া নারীপুরুষ ফাঁকা মাঠে রাত্রি যাপন করিব। একটি ধ্বংস বাড়ির আওতায় এই প্রাঙ্গণ। পাশ দিয়াই হাটে যাতায়াতের পথ। হাটবারে খুব লোক চলে, অন্যবারেও প্রথম রাত্রিতে লোক চলে। কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিয়া আমরা নিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে ফিরিয়া আসিতাম ক্যাম্পে। যাইবার ও ফিরিবার বেলায় মুসলমান বাড়ির উপর দিয়া পথ। দুইদিন যাইবার বেলায় মেয়েরা আগ্রহভরে তাকাইয়া দেখিত। একরাত্রে যাবার পথে মেয়েরা পথ আগলাইয়া আদর করিয়া বলে আমাদের ঘরে এসো—রাত করে কেন এমন ভাবে যাও? হেমপ্রভাকে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া আমি গন্তব্য স্থানে যাই। হেমপ্রভাকে লইয়া মেয়েদের সে কী আদর। বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া রাখিবে, খাওয়াইবে, আচ্ছা আর কিছু না খাও পান তো খাও। এমনি সম্পর্ক। তারপর প্রতি রাত্রে যাইবার পথে খানিকক্ষণ মেয়েরা গান্ধীর কথা শুনিত। ক্যাম্প কেন বসিয়াছে জানিত। পুরুষেরাও আকৃষ্ট হয়। বলে হিন্দুদের যা গিয়াছে তা গিয়াছে।

আমাদের রোজগার করার পুরুষটা পালাইয়া বেড়াইতেছে। সকলে না খাইয়া মরিতেছি।

আমাদের নন্দনপুরে যুগ্ম রাত্রিবাসের কথা জানাজানি হইলে বন্ধু ভাবাপন্ন একজন মুসলমান আসিয়া বলে—তোমরা এখানে রাত্রে থেকো না। কার মনে কী আছে আর একেবারে পথের ধারে পড়িয়া থাকা। হেমপ্রভা বলেন, মারিলে তোমরাই মারিবে এবং মরিব। বরঞ্চ গ্রামের লোকেরা যাহাতে ফিরিয়া আসে সেই চেষ্টা কর। আমার কথা ভুলিয়া যাও, একদিন তো মরিবই। বুড়াও হইয়াছি, না হয় তোমাদের হাতেই মরিলাম। আমাকে তোমরা মারিবে না নিশ্চয় জানি, তোমরা যে ভালবাসিয়াছ। কিন্তু গ্রামের হিন্দুদিগকে সেই ভালবাসা দাও ডাকিয়া আন, নিরাপত্তার ভার লও। এইভাবে দিন চলিতেছিল। গ্রামবাসী দিনের বেলায় গৃহাদি দেখিয়া যাইত। জনপ্রবেশের চিহ্ন দেখা দিল।

এমনি করিয়া ১৯শে নভেম্বর আসিল। ৭ই গান্ধীজি চৌমোহানী নোয়াখালীতে পঁহুছেন। এগার দিন কাটিয়াছে। রাত্রে কাজিরখিল ক্যাম্পে আসিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সুরাবর্দী সাহেবসহ। গান্ধীকে বলিলেন, নোয়াখালীতে তো মুসলমানেরাই নির্যাতিত। কিনা কি একটু হইয়াছিল, এখন সব লোক গ্রেপ্তারের ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছে। আবার সৈন্যদল আসিয়াছে। তাহারা মুসলমান স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিতেছে, ইজ্জত আর রহিল না। এই তো আজও দুইজন ধর্ষিতা মুসলীম নারী রামগঞ্জে আসিয়াছে থানায় জানাইতে।

বাংলা গভর্নমেণ্টকে নিন্দিত করিতেই তুমি এখানে বসিয়াছ যেখানে তেমন কিছুই হয় নাই। আর ওদিকে বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের যে কী করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে তোমার যাওয়া দরকার। তুমি সেখানে যাইবে না, অকাজে নোয়াখালীতে পড়িয়া থাকিবে। কেন থাকিবে? আমাদিগকে দুনিয়ার নিকট অপরাধী করার জন্য ইত্যাদি। বাক্যস্রোত অনুমান দেড় ঘণ্টা অবাধে চলিল। একই কথা বার বার বলিয়া দোষারোপ করিয়া গান্ধীকে মন্দ বলিয়া থামিলেন সুরাবর্দী সাহেব। আমার পক্ষে, বসিয়া গান্ধীর প্রতি এই অবজ্ঞা বর্ষণ শুনিয়া যাওয়া যেন প্রাণান্তকর হইয়াছিল। সুরাবর্দী থামিলে গান্ধী বলিলেন, তোমার বলা শেষ হইয়াছে, তবে শোন:

বিহারে কি হইতেছে সে খবর আমি রাখিতেছি। বিহারের মন্ত্রীরা আমার কথা শোনে, কাজেই বিহারের জন্য এইস্থান হইতেই নির্দেশ দিয়া আমার কর্তব্য পালন করিতে পারি। কিন্তু সেকথা তো তোমার মন্ত্রী মণ্ডলের সম্পর্কে বলা

যায় না। তাহাদের উপর তো আমার কোনো প্রভাব নাই। বিহারে না যাওয়ার এই হেতু। মন্ত্রীদিগকে আমি বলিয়াছি যে, আমি বিহারের ঘটনা শোনা হইতে অর্ধাহারে আছি। যদি বিহারে তাহারা অবস্থা আয়ত্তে না আনিতে পারে তবে আমি অনশন করিব। তাহারা শঙ্কিত আছে ও সংবাদ পাঠাইতেছে।

সামরিক বাহিনীর লোকের দ্বারা নারী-নির্যাতনের কাহিনী বলিলে, তাহার প্রতিকার তো উহাদের কমাণ্ডারের হাতে। যদি কিছু ঘটিতেছে, তুমি কমাণ্ডারের সহিত কথা বলিয়া তাহা নিশ্চয় বন্ধ করিতে পারিবে।

তুমি বলিলে দুই জন ধর্ষিতা নারী নালিশ করিতে এখানে রামগঞ্জে আসিয়াছে। আমার সঙ্গে সুশীলা আছে সে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করুক, কি হইয়াছে জানুক। তখন এই ব্যাপারে তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে। সুরাবর্দী স্বীকৃত হওয়ায় তখনই সুশীলাকে রামগঞ্জ থানায় পাঠান হইল। ঐ তো ঐখানেই। সুশীলা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সুরাবর্দী স্থান ত্যাগ করিয়া আহার করিতে কাহারও নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। সুশীলা বলিল—গ্রাম্য স্ত্রীলোক দুটি এ-সব কিছুই জানে না। তাহাদিগকে কেহ স্পর্শ করে নাই। মন্ত্রী মহাশয় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন বলিয়া তাহাদিগকে এখানে আনা হইয়াছে।

সুরাবর্দী বিহারের কথা সত্য বলিতেছিলেন আঁর নোয়াখালীর কথা এতই মিথ্যা বলিতেছিলেন যে, তাঁহার বিহারের বর্ণনও ভাসিয়া যায়। ইহা পরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

পরে ডাঃ সৈয়দ মামুদ নোয়াখালীতে আসিলেন, বিহারের কথা জানাইতে। ডাঃ মামুদ গান্ধীজির বন্ধুব্যক্তি এবং বিহার মন্ত্রীসভায় ত্রাণ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনিও আসিয়া গান্ধীজীর অর্ধ উপবাস ভঙ্গ করাইলেন। বিহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে জানাইলেন। কি ঘটনা যে কী হইয়াছে ও হইতেছে তাহা গোপন করিলেন। সত্য ঘটনা জানাইলে সোদপুর হইতেই গান্ধী বিহার চলিয়া যাইতেন। কিন্তু গান্ধী বিহারে গেলে তো মুসলমান নিধন, নির্যাতন ও লুণ্ঠন চলিত না। কাজেই স্তোকবাক্যে গান্ধীকে নিরস্ত করিয়া নোয়াখালীতেই রাখা হইল।

বিহারে কি ঘটিতেছিল নভেম্বর মাসে তাহা ডাঃ মামুদও গান্ধীকে জানিতে দিলেন না। চার মাস পরে মার্চ মাসের প্রথম দিকে যখন গান্ধী হাইমচরে তখন ডাঃ মামুদ গান্ধীর নির্বন্ধাতিশয্যে সংবাদ সহ তাঁহার সেক্রেটারীকে

পাঠান। সেইদিনই গান্ধী বিহার যাত্রা স্থির করেন এবং পরদিন নোয়াখালী ত্যাগ করেন।

২৮শে অক্টোবর হইতে কি ঘটিতেছিল, ২রা নভেম্বর গান্ধীজি যখন সেকথা কেবল বলিতেছিলেন সেই সময় গান্ধীকে স্তোক দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ঘটনা যাহা ঘটিতেছিল তাহার তুলনায় সুরাবর্দীর কথাই সত্য দাঁড়ায় যে, নোয়াখালীতে কিছুই হয় নাই।

প্যারেলালের বই হইতে কি ঘটিতেছিল তাহার বর্ণনা তুলিয়া ধরিতেছি :

২৮শে অক্টোবর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছাপরায় আসেন। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ মামুদ। শতেক বাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছিল। ৬০০০ লোক এক বিদ্যালয়ে আশ্রয় লয়। পরদিবস পয়গম্বর গ্রামে দেখেন যে ৫০টি বাড়ি ভস্মীভূত এবং বাড়ির বাসিন্দা পুরুষ, স্ত্রী, শিশু সকলেই নিহত। তাঁহারা যখন পয়গম্বরে তখন একটি দগ্ধ বাড়ি হইতে তিনজন জীবিত লোককে টানিয়া বাহির করা হয়। দগ্ধ বাড়ির যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদের নিকট হইতে নৃশংসতার বিবরণ প্রাপ্ত হন। পাটনার শহরতলীতেও তখন দাঙ্গা ও গৃহদাহ চলিতেছিল। তাঁহারা রাঁচী যাওয়ার পথে দেখেন যে একটি 'গণ্ডগ্রাম' জ্বলিতেছে। দশহাজার লোকের এক জনতা গ্রামটি ঘিরিয়া আছে। লোকগুলিকে সত্য সত্যই জীবন্ত দগ্ধ করা হইতেছিল। এরোপ্লেন উপরঁ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া পুরুষ স্ত্রী, শিশুরা খড়ের চালের উপর উঠিয়া হাত তুলিয়া সাহায্য চাহিতেছিল। শ্রীবাবু (মুখ্য মন্ত্রী) এই দৃশ্যে কাঁদিতেছিলেন। এ ঘটনা ঘটে ১লা নভেম্বর। ৩রা হইতে ৫ই নভেম্বরের মধ্যে পাটনা মহকুমার কতক স্থানে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

পণ্ডিত নেহেরু ও আব্দুলরব নিস্তার আসেন পাটনায় ৩রা নভেম্বর। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলনা আজাদ এবং কৃপালনী তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। তাঁহারা সভা করেন, কিন্তু কত জায়গায় করিবেন? দূরে দূরে বহুস্থানে কোনও বার্তাও পঁহুছে না। এক জায়গায় গুলি চালাইলে জনতা মিলাইয়া যায় আর এক জায়গায় ধ্বংস কার্য চালায়।

এই যখন স্থিতি তখন সুরাবর্দীর কথায় গান্ধীজি স্থিতি জানার জন্য বিহারে টেলিফোন করেন। প্যারেলাল টেলিফোন করে। ২রা নভেম্বরের কথায় প্যারেলাল প্রশ্ন করে বিহারে গান্ধীজির যাওয়া চাই কী? উত্তর আসে তাঁহার আসার প্রয়োজন নাই। অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে। পরে ৬ই নভেম্বর পণ্ডিতজীও সেই কথা বলেন—গান্ধীজির বিহারে প্রয়োজন নাই।

বিহার-রিপোর্ট

গান্ধীজির জীবিত কালে বিহার সম্পর্কে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা গান্ধীকে ধোঁকা দিলেন। গান্ধীর অভিপ্রায় প্রতিপালিত হইতে দিলেন না। মরুক মুসলমান যাহারা কলিকাতায় "কিলিং" করিয়াছে, যাহারা নোয়াখালীর হিন্দুকে নষ্ট করিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক বিহারে। তখনকার বিবেকের দংশনে পীড়িত হইয়া ডাঃ মামুদ গান্ধীকে চার মাস পরে বিহারে লইয়া যান, তখনও বিহারের চিতা ধূমায়িত। গান্ধী গিয়া রিপোর্ট চাহিলে ডাঃ মামুদ তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহার মর্ম যতদূর বুঝা যায় ৮ই অক্টোবরে ব্যাপক জনসংঘাত স্থগিত হয়। ১৬টির ভিতর ৬টি জিলায় দাঙ্গা হয়। ৭৫০টি গ্রাম ইহাতে সংশ্লিষ্ট। ২১৮৬ বার বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করিতে হয় জনতা সরাইতে। গুলিতে ৩৯৩ জন মরে। গভর্নমেণ্টের মতে নিহতের সংখ্যা ৫৪০০। ফ্রেণ্ডস সার্ভিসের অনুমান যে, মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী হইবে না। সঠিক সংখ্যা মাঝামাঝি কিছু। বা দশহাজারই ধরিয়া লওয়া যায়।

নোয়াখালীতে নিহতের সংখ্যা আড়াইশতের বেশী নহে। তাহা হইলে বিহারের মুসলিম হত্যা নোয়াখালীর হিন্দু নিধনের চল্লিশ গুণ। খুব শিক্ষা মুসলিম-দিগকে দেওয়া হইয়াছে। ভারত বিভাগ ইহার পর অনিবার্য হয় এবং আজও কুড়ি বৎসর পরও ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দ্বারা বিহারের নোয়াখালীর জের টানিতেছি। গান্ধীকে আনার জন্য ডাঃ মামুদকে ক্ষমা করা হয় নাই। তিনি বর্জিত হন।

গান্ধীর জীবিত থাকা কালেই যাহারা গান্ধীর নীতিকে বিসর্জন দিয়া গান্ধীকে ব্যর্থ করিয়াছে সেই আমরা কি গান্ধীর মৃত্যুর পর নূতন মানুষ হইয়া গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গান্ধী-নীতি পালন করিতে প্রস্তুত হইব? অথবা গান্ধীর নামে জলসা করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া, গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া গান্ধীর গৌরবে নিজেদিগকে আরও একবার গৌরবান্বিত করিয়া তুলিব? তাঁহার চরকা কি চালাইব, সংযম দ্বারা কি জন্মনিয়ন্ত্রণ করিব, ডেমোক্রেসিকে সত্য করার জন্য সশস্ত্র প্রতিরক্ষা সৈন্যের স্থানে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা, প্রতিরক্ষী সেবক দ্বারা প্রতিরক্ষা করিব? প্রেমের দ্বারা পাকিস্তানের ক্ষোভ জয় করিব অথবা বলিব আমরা শান্তি চাই, কিন্তু জোর করিলে পিষিয়া মারিব? যদি চীন, রুশ, আমেরিকী শক্তি ও পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে তবুও অস্ত্র-বলের দম্ভ করিব? প্রেমের বল এখন হইতেই

প্রয়োগ করিব না ? প্রশ্ন রহিল। কুটিরশিল্প গ্রহণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দী শিক্ষা কি গ্রহণ করিব ?

কাজিরখিলের সংগঠন

এক্ষণে কাজিরখিল সংগঠনে ফিরিয়া যাইব। সুরাবর্দী চলিয়া যাওয়ার পরদিনই গান্ধীর ইচ্ছা হয় তিনি দলবল ত্যাগ করিয়া একাকী নিজেকে ঈশ্বরের হাতে ফেলিয়া দিবেন। একদিন সময় দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামপুরে তাঁহার একান্ত নিবাস স্থির করিয়া দিই। একমাস শ্রীরামপুরে থাকিয়া তিনি প্রতিদিন নূতন গ্রামে রাত্রি যাপন করিবেন স্থির করেন।

ব্যাবস্থাপনা কঠিন—একটা পথক্রম স্থির করিয়া লই। প্রথমে গিয়া পথ কি ভাবে মাঠের উপর দিয়া হইবে স্থির করি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পথ চাঁছিয়া একজনের চলার মত সাফ করার ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের দ্বারা করাই। যে বাড়িতে উঠিবেন সেখানকার ব্যবস্থা করিয়া আবার পরবর্তী গ্রামের জন্য ঐ পর্যায় কার্য সূচনা করি। গান্ধীর সহিত কদাচিৎ দেখা করিতাম। প্রশ্ন উঠিলে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতাম।

শীতকালে খালি পায়ে শিশির-সিক্ত পথে চলিতে চলিতে পা ফাটিয়া যায়। হেমপ্রভা দেবী স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দেন, যাত্রা পথে মধ্যবর্তী স্থানে একটা টুল, গামছা, ঘষার পাথর ও গরম জল লইয়া গান্ধীর পা ঘষিয়া গরমজলে ধুইয়া দিবে।

একবার জানি, দুষ্ট লোকেরা আমার তৈরী পথ নোংরা করে, কাঁটা পুঁতিয়া রাখে। সেই হইতে ব্যবস্থা করি যে, ঝাড়ু-কোদালসহ একদল স্বেচ্ছাসেবক গান্ধীর যাত্রার পনর মিনিট পূর্বে রাস্তা ঝাঁট দিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া যাইবে যাহাতে পথ চলিতে গান্ধীর বিঘ্ন না হয়। এ সমস্তই গান্ধীর অলক্ষ্যে হইত। যে বাড়িতে গান্ধীর আবাস হইবে তাহার কামরাখানা নিজেই ঠিক করিয়া দিতাম। কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। আমার কাজ আমি বুদ্ধিমত করিয়া যাইতাম। অপ্রয়োজনীয় পত্রগুলি আমার নিকট পাঠাইতেন, সেগুলির উত্তর দিয়া দিতাম।

একবার 'আলুনিয়া' গ্রামে গান্ধী উপস্থিত হইলে তাহাকে বলি যে, গতকাল আমি এখানে আসিয়াছিলাম। গান্ধী বলেন, সে আর আমি জানি না ? ঘরে প্রবেশ করিয়াই তোমার স্পর্শ পাইয়াছি। সেবকের ইহার অধিক আর কী পুরস্কার হইতে পারে ? এইভাবে তাঁহাকে পঞ্চাশটির মত গ্রামে ঘোরাইবার ব্যবস্থা করি।

শেষ হাইমচরে তৃতীয় পর্যায়ের যাত্রার সফর-সূচি করিতে যাই। গিয়াই শুনি ডাঃ মামুদের পত্র আসিয়াছে। গান্ধী বিহার রওনা হইবেন। সাক্ষাৎ করিলে গান্ধী বলেন, কালই সকালে রওনা হইব ব্যবস্থা করিয়া দাও। তখন রাত্রি হইয়াছে। চাঁদপুর চৌদ্দ মাইল দূর, পথে বৃহৎ নদী। রওনা হই। জীপসহ নদী পার হইয়া মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রিভারস্টীম কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন—অতিরিক্ত স্টীমার আছে। তখনই উহা পাকা করা হয়। হরদয়ালবাবুকে জানাইয়া যখন হাইমচরে ফিরিয়া আসি তখন গান্ধী তো ঘুমাইতেছেন। তখন রাত্রি দুইটা হইবে। তবু মাথার নিকট মুখ রাখিয়া বলি, সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে তুমি সকালে রওনা হইও। তোমাকে বিদার দিবার জন্য রাত্রে এখানে না থাকিয়া কাজিরখিল চলিয়া যাইব। গান্ধী বলেন, ঠিক আছে আমি তিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরিব। তোমার নামে অথরিটি দিয়া যাইতেছি। সেই যে গেলেন বিহারে আর ফেরা হইল না। বিহারেও কাজিরখিলের অনুরূপ সংস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন ছিল তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

বিহারে কেন্দ্রীভূত ও ব্যাপক অহিংসার প্রয়োগ করার অবকাশ গান্ধীজি পাইলেন না ইহা দৈবদুর্বিপাক। বিহারে গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী অহিংসাশ্রয়ী কেন্দ্র গঠিত করার মত উপযুক্ত অনেক কর্মী ছিলেন। তাঁহারা অহিংসার দ্বারা মুসলমানদের হৃদয় জয় করার অবকাশ পাইলেন না। মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার বিশ্বাস দিবার মত ব্যবস্থা গঠিত হইল না। রহিল মুসলমানদিগের ক্রোধ, আশঙ্কা ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, লীগ বলিতেছিলেন যে, ভাগলপুরে যেসকল উদ্‌বাস্তু মুসলমান গিয়াছে তাহারা সংখ্যায় তিন লক্ষ। তাহাদিগের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল পাটনার গয়ার উপর দিয়া সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের সহিত এক করিয়া তাহাদিগকে সুবিধাদি দিয়া লীগ-অনুরাগী করিয়া দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত গিয়া হায়দারাবাদের সহিত যোগ করিয়া গোয়ার সমুদ্রে গিয়া পঁহুছিবেন। তাহাতে এক মধ্য পাকিস্তান গড়িয়া উঠিবে। সে সম্ভাবনা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

অথচ গান্ধীর অহিংসা প্রয়োগের ফলে নোয়াখালী মানে পূর্বপাকিস্তান আজ পশ্চিমবঙ্গের মিত্র হইয়া আছে। এই পদার্থপাঠ আজও ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সত্যের ও অহিংসার শক্তি যে অস্ত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ ইহা কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র স্বীকার করেন না। তাই, ভাল কথা, প্রেমের কথা পাকিস্তানকে বলিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত শাসানী দেন যে, যদি আক্রমণ

কর তো দেখাইয়া দিব। বলার কি প্রয়োজন ছিল? তোমার মিত্রতা চাই এইটুকু বলিলেই তো যথেষ্ট ছিল। বরঞ্চ বলিতে পারিতেন যে, তোমরা প্যাটন ট্যাংকের নয়া সংস্করণ ইতালীতে কিনিতে যাইতেছ। আমরা ইতালীকে সমঝাইয়া উহা বন্ধ করিয়াছি। কিন্তু ইতালী নাই বা দিল তুমি তো বেলজিয়ম হইতে কিনিতে পার। ওটা করা আমাদের মূর্খতা হইয়াছে। আমরা এখন বলি তোমরা প্যাটন কেনো, আরও কেনো, যত ইচ্ছা কেনো কিন্তু আমরা উহা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে কিছুতে দিব না - তোমার হৃদয় জয় করিয়া লইব। তুমি যাহা চাও তাহা দিব—আরো বেশী কিছু দিব, সে আমাদের অখণ্ড প্রেম। আমাদের ডঃ জাকীর হোসেন যেমন আমাদের ঘরের, তুমি খাঁসাহেব আয়ুবখানও তেমনি। এসো তুমি এসো। আমাদের ঘরে এসো। তোমার ভৌগোলিক রাজ্য আলাদা থাকুক, তোমার রাজসম্মান আমরা মান্য করিব এবং তোমাকে আমার ঘরের লোক আপনার জন করিব। গান্ধী বলিয়াছিলেন জিন্না সাহেবকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হইতে। তখন ঘটে নাই। আজ আবার বলিব তুমি আমার আপন জন, এসো আমাদের ঘরে। আমরা আর গুপ্তচর রাখিব না, তোমার ঘরে না—কোথাও না। তোমার অ্যামব্যাসেডারের নিকট আমার সব খুলিয়া ধরিব। কিছু গোপন রাখিব না। তুমি যখন বিশ্বাস করিবে যে, তোমার বন্ধুত্ব চাই তখন তুমি ধরা দিবে—তোমাকে প্রেমে জয় করিব।

বলিতে পারিতেন আমাদের ইন্দিরাজী। বড় মধুর শোনাইত ইন্দিরাজীর মুখে মায়ের মত কথা। বলিবেন কী? ইন্দিরাজী তো পদাধিকারবলে ভারতমাতা হইয়াছেন। আমার দৃষ্টিতে সেই কারণে জগন্মাতাও হইয়াছেন। তাঁহার বাক্য ও কৃতি তদনুযায়ী হয় ইহা চাই। ইহা মহাত্মা গান্ধী-সম্মত কার্য হইবে। ইন্দিরাজীর উপর গান্ধীর আশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

প্রথম শান্তি-সৈনিক : গান্ধীজি

নারায়ণ দেশাই

মানবতার ইতিহাসে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয় কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপূর্তির জন্য। নিজের জীবন-কালে তাঁরা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারুন বা না-ই পারুন ইতিহাসের পটে তাঁদের আবির্ভাব স্বয়ং এক সীমাচিহ্ন-স্বরূপ হয়ে থাকে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে ট্রান্সভাল সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় গোপালকৃষ্ণ গোখলে এইরকম সীমাচিহ্নের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন :

"এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা দেখে আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে অথবা অপর যে-কোন জনসমাবেশে কোন দিনই কোন ভারতবাসীর পক্ষে গভীর আবেগ ও গর্বভরে ছাড়া তাঁর নামোচ্চারণ করা সম্ভবপর হবে না। শ্রীযুক্ত গান্ধীকে আমি অন্তরঙ্গ ভাবে জানি—এটা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং আমি আপনাদের বলতে পারি যে, ইতিপূর্বে এই ধরাতলে তাঁর মত পবিত্র মহৎ সাহসী ও মহান ব্যক্তি আর বিচরণ করেন নি। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই সব মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা স্বয়ং অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাপন করে নিজ স্বজাতীয় এবং সত্য ও ন্যায়-বিচারের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। তিনি তাঁর দুর্বল ভাইদের চোখে যেন জাদুমন্ত্রের স্পর্শে নূতন দৃষ্টির সঞ্চার করেন। তিনি একজন মানুষের মত মানুষ, বীরের মধ্যে বীর, সেরা স্বদেশপ্রেমী এবং একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, বর্তমান যুগে তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় মানবতা সর্বোচ্চ সীমাচিহ্নে উপনীত হয়েছে।"[১]

গোখলের ক্রান্তদর্শী প্রতিভা অপরাপর দেশবাসীর তুলনায় পূর্বেই গান্ধীজির মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতীয় জনসাধারণ সম্বন্ধে গোখলে যেকথা বলেছিলেন সেই কথাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন গান্ধীজির পরলোকগমনের পর সমগ্র মানবতার সম্বন্ধেই বলেন :

১. Speeches of Gopal Krishna Gokhale—G. A. Natesan. P. 862—63

"ভবিষ্যৎকাল হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাংসের দেহধারী এমন কেউ কোন দিন এই ধরাতলে বিচরণ করতেন।"[১]

ভারতীয় মানবতা থেকে সমগ্র মানবতা—চল্লিশ বৎসরের ভিতর এই ছিল গান্ধীজির বিভূতির বিকাশের ধারা।

মানবতার সঙ্গে বিকশিত হতে হতে শান্তির বিচারধারা যে সীমা পর্যন্ত উপনীত হয়, নিজ জীবন দ্বারা গান্ধীজি কেবল তাকে প্রকটই করেন নি,—তাকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিতও করেন।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে মানবতার প্রতি ভারতীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল অদ্বৈতবাদ। বেদ উপনিষৎ ও গীতার সময় থেকে শুরু করে সন্ত যুগ পর্যন্ত অদ্বৈতানুভূতি ভারতবর্ষে মহাসাধনার সীমাচিহ্নস্বরূপ। আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্ব সম্প্রদায় ও সর্ব ধর্মের মূল তত্ত্বকে স্বয়ং নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে সে সবেরই একত্বের দর্শন ও প্রতিপাদন করেন। গান্ধী রামকৃষ্ণের কাছ থেকে সর্ব-ধর্ম সমভাবের মন্ত্র গ্রহণ করেন। দরিদ্র-নারায়নের উপাসনার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ সেবাকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং বলেন :

"বহু তপশ্চর্যার পর আমি এই কথা উপলব্ধি করেছি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হল : তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। এসবই তাঁর অসংখ্য রূপ। অপর কোন ঈশ্বরের আরাধনার প্রয়োজন নেই। তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করেন যিনি সর্বজীবের সেবক।"[২]

বিবেকানন্দের কাছ থেকে গান্ধীজি কেবল "দরিদ্রনারায়ণ" শব্দটিই গ্রহণ করেন নি, সেই দরিদ্রনারায়ণদের সেবাতেই তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজী যে সেবাধর্মকে সমাজে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন গান্ধীজি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার অনুপ্রবেশ ঘটালেন এবং এই ভাবে রাজনীতির আধ্যাত্মিকরণের প্রয়াস পান।

গান্ধীজি যখন ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তিনটি বিচার-ধারা প্রচলিত ছিল। এর প্রথমটি ছিল নরমপন্থী যা রাণাডে ও গোখলে ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্ত হত। দ্বিতীয় ছিল চরমপন্থা, যার অভিব্যক্তি একদিকে

১. Quoted in Mahatma Gandhi : Early Phase—Pyarelal

২. Vivekanand quoted by Romain Rolland in 'Prophets of New India'. P. 449.

ক্ষুদিরাম ও তাঁর পন্থানুসারীদের কার্যকলাপে এবং অপরদিকে লাল-বাল-পালের বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে। তৃতীয়টি ছিল আধ্যাত্মিকতার বিচারধারা যার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তির ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বীকরণ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ছিলেন এই পথের পথিক।

গান্ধীজির জীবনে এই ত্রিধারার মুখ্যতত্ত্বের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটে। নরমপন্থীদের নম্রতা, চরমপন্থীদের তীব্রতা ও অধ্যাত্মবাদীদের উচ্চ মানসিকতার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর ভিতর।

গান্ধীজির কর্মসূচীর নম্রতা বহুখ্যাত। ১৯৪২ সনে "ভারত ছাড়" আন্দোলনের পর আগা খাঁ প্রাসাদ থেকে বড়লাটকে তিনি যেসব পত্র লেখেন তাতে তাঁর নম্রতাগুণের অপ্রতুলতা ছিল না। তাঁর কার্যসূচীর এই নম্রতা লক্ষ্য করেই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় তাঁর প্রধান বিরোধী জেনারেল স্মাটসের সচিব একদা বলেছিলেন :

"আপনাদের স্বদেশবাসীদের আমি পছন্দ করি না এবং তাদের সাহায্য করার জন্য আমার আদৌ আগ্রহ নেই। কিন্তু করব কি? আপনারা আমাদের আপৎকালে সাহায্য করেন। তাই কি করে আপনাদের গায়ে হাত তুলি? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, ইংরেজ ধর্মঘটকারীদের মত আপনারা হিংসার শরণ নিলে ভাল হত। তাহলে আপনাদের শায়েস্তা করার পথ আমরা অবিলম্বে পেতাম। কিন্তু আপনারা তো শত্রুকেও আঘাত করবেন না। কেবল আত্মনিগ্রহের দ্বারাই আপনারা জয়ী হতে চান এবং কদাচ আপনাদের ভদ্রতা ও সৌজন্যের স্বতঃআরোপিত সীমা লঙ্ঘন করেন না। আর এর জন্যই তো আমরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ি।"[১]

কিন্তু এই অসীম নম্রতার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির তীব্রতা কোন বিপ্লবীর থেকে কম ছিল না। ১৯৪২-এর আন্দোলনের পূর্বে বাংলা হরিজন পত্রিকায় "আমার ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছে" শীর্ষক তাঁর যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তা হয়ত বহু পাঠকের এখনও স্মরণে আছে। তাঁর অন্তরের তীব্রতার পরাকাষ্ঠা হল "ভারত ছাড়" আন্দোলন।

গান্ধীজির আধ্যাত্মিকতা রাজনীতিরই আধ্যাত্মিকরণ করার প্রচেষ্টা করে। তিনি ঘোষণা করলেন : "সামাজিক বা রাজনৈতিক যে কোন কাজই হোক না

১. Hibbert Journal Vo. 16. সংখ্যা 2. 'The Soul as it is, and How to deal with it.'

কেন, আত্মশক্তিই তার সাধ্য এবং এই আত্মশক্তিই আবার তার সাধন। প্রতিটি কার্যে সাফল্যলাভের চাবিকাঠি এই।" এই সোপানের কারণ রাজনীতির আধ্যাত্মিকরণ সহজসাধ্য হল। গান্ধীজির অধ্যাত্ম তাঁর বিরোধীর হৃদয়েও ভগবৎ-দর্শন করাল এবং এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—পাপের বিরোধিতা কর কিন্তু পাপীর নয়। জীবনের বহু ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছিল। গান্ধীজির বৈশিষ্ট্য হল এই সিদ্ধান্তকে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং এই জন্যই তিনি কম্বুকণ্ঠে বলতে পারলেন, "অত্যাচারের প্রতিকার করো; কিন্তু অত্যাচারীর নয়।" মানবমাত্রের মধ্যে সংগুপ্ত সদ্‌গুণাবলীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত করা অত্যাবশ্যক—এ কথা তাঁর মনে হয়েছিল এবং সেইজন্যই তিনি হৃদয় পরিবর্তনের আদর্শ সপ্রমাণে সক্ষম হয়েছিলেন। গান্ধীজির অধ্যাত্মদর্শনের ভিতর থেকেই তাঁর সত্যাগ্রহের মূল সিদ্ধান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। সত্যাগ্রহী যখন "কষ্ট বরণ" অথবা তপস্যার কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেন তখন তাঁর মনে আত্মার অভিন্নতার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই কথা মেনে নেন যে, আত্মা-আত্মায় অভিন্নতা বিদ্যমান এবং তাই আমার কষ্টের প্রভাব প্রতিপক্ষীয়ের হৃদয়ে অবশ্যই পড়বে।

এইভাবে গান্ধীজি ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে ভারতবর্ষের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজ কার্যসূচীতে সমাবিষ্ট করলেন এবং অন্যদিকে তৎকালীন সমাজের প্রধান তিন বিচারধারার তিন মুখ্য তত্ত্বেরও যথোচিত সমন্বয় সাধন করলেন। এরই ফলস্বরূপ তাঁর বাণীতে ভারতীয় আত্মার সমগ্র মাধুর্য, তার যাবতীয় শিব বা কল্যাণ-তত্ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতিতে যে সত্য অমৃতময় ও জ্যোতির্ময় তত্ত্বস্বরূপ ছিল গান্ধীজির ব্যক্তিত্বে সে সবও আমরা ভাস্বর হতে দেখি। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের পরিসরে সমগ্র মানবতার সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রতি বিহঙ্গম দৃষ্টিতে দেখা না সম্ভবপর, আর না বর্তমান লেখকের সে যোগ্যতাই আছে। এই জন্য এখানে আমরা কেবল শান্তির বিচারধারার বিকাশের এক অপরিহার্য ঐতিহাসিক গ্রন্থিরূপী গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে সন্তুষ্টি মানবো।

"শান্তি, সমৃদ্ধি, অমৃতত্বম্"—এই হল সমগ্র মানবজাতির সনাতন আকাঙ্ক্ষা। একে অর্জনের প্রয়াসে মানবতার যে চেষ্টা তারই ফলস্বরূপ মানুষের ইতিহাসে শান্তির জন্য এমন একটা আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে যাকে "শান্তিবাদী-গোষ্ঠী-চেতনা" (pacifist conscience) বলা যায়। য়ুংগ ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিকের পর

একথা আজ সর্বজনমান্য যে, ব্যক্তিগত চেতনার মত সামাজিক চেতনাও একটা বাস্তব তত্ত্ব। মানব-মনের শান্তিময় আকাঙ্ক্ষাসমূহ ও তার জন্য অনুষ্ঠিত সাধনার ফলে মানব-সমাজে শান্তিময় বিচারধারা ও আচারের প্রতি যে গোষ্ঠী-চেতনা যুগ যুগের পুণ্যের ফলে ও অসংখ্য মহাপুরুষদের তপশ্চর্যার কারণ সৃষ্টি হয়েছে, তাকেই আমরা জগতের শান্তিময় চেতনার সংজ্ঞা দিতে পারি। দেশ ও কালের অনুসারে এই শান্তি-চেতনার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে। কিঞ্চিৎ গভীর ভাবে এই শান্তি-চেতনার অনুশীলন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, গান্ধীজির জীবন ছিল এই সংসারক্ষেত্র-ব্যাপী ও কালপ্রবাহ-সিঞ্চিত শান্তি-চেতনার এক উৎকৃষ্ট ফল।

হিংসা ও যুদ্ধ যদি মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গী হয়ে থাকে তাহলে শান্তির প্রয়াসও মনুষ্য-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বিকশিত হয়ে আসছে। আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাসে যদি যুদ্ধের কথা থেকে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সীমিত রাখার জন্য ধর্মযুদ্ধের নিয়ম ও অনুশাসনও ছিল। উপনিষদের ঋষি দৈনন্দিন জীবনচর্যায় শান্তিমন্ত্র জপ করতে ইতস্তত করতেন না। এবং তাঁদের শান্তির আকাঙ্ক্ষা "দ্যো শান্তিঃ, পৃথিবীঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ" পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

বুদ্ধের "অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ ও সাধুত্বের দ্বারা অসাধুত্বকে জয় করো" এবং "বৈরিতা দ্বারা কদাপি বৈরভাবের নিরসন হয় না, মৈত্রীর দ্বারাই তা মেটে এবং এই হল সনাতন ধর্ম" এবং জৈনদের :

"সবার কাছে মাগি ক্ষমা, ক্ষমা যেন করি সবে।
সবে যেন হয় মিত্র মোর, কেহ নাহি বৈরী ভবে॥"

প্রাচীনকালে ভারতে ব্যাপ্ত শান্তি-চেতনার দ্যোতক।

প্রায় সমসাময়িক চীনের লাওৎসে কনফুশিয়স মেন্সিয়স ও মোৎসের বাণীতেও এই জাতীয় শান্তি-চেতনার আভাস পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ অবশ্য নিজ শান্তিবাদের এই জাতীয় ঘোষণা করেন নি যার বলে শান্তিবাদীরা তাঁদের নিজ বর্ণের বলে দাবী করতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত মহাপুরুষেরা সবাই যুদ্ধ ও হিংসার সার্থকতায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, সেটা "তাও"-এর পথ নয়।

এর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

"সৈন্যদল যেখানে ছাউনি গাড়ে সেখানে কাঁটা ঝোপ গজিয়ে ওঠে। প্রবল

যুদ্ধের পর অবধারিত ভাবে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটে। সৎ ব্যক্তি দৃঢ়চিত্তে কাজ করে থেমে যায়। গায়ের জোরে কোন কিছু দখল করার কথা তিনি চিন্তা করেন না।"

অথবা

"দৃঢ়চিত্ত হও কিন্তু গর্ব কোরো না—দৃঢ়চিত্ত কিন্তু মাথা গরম নয়। দৃঢ়চিত্ত হও কিন্তু আক্রমণাত্মক মনোভাবের হোয়ো না। উপায় নেই বলেই দৃঢ়চিত্ত হবে। দৃঢ়চিত্ত হও কিন্তু হিংসাশ্রয়ী হবে না।"—লাওৎসে।[১]

কিংবা

"রাষ্ট্রদের পরস্পরাক্রমণ, গৃহস্থদের পরস্পরের সম্পত্তি জবরদখল এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে আঘাত করা—এই সব হল পৃথিবীর প্রধান বিপদ।...এসবের উৎস হচ্ছে পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভাবের অভাব।"—মোৎসে।

"কিসে যে তাঁদের লাভ সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নেতৃবর্গের কোন ধারণা নেই। অপরকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা অপরের ভালবাসা পাবেন। অপরের ভাল করুন তাহলে অপরে আপনার ভাল করবেন। অপরকে ঘৃণা করলে তাঁদের ঘৃণা পেতে হবে। তাঁদের আঘাত করলে আঘাত পেতে হবে।"—মোৎসে।[২]

ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস যুদ্ধ এবং শান্তিময় প্রতিরোধ—উভয় ধরনের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে "এসেনাজ" সম্প্রদায়ের লোকেরা শান্তিবাদী আদর্শের ভিত্তিতে সামূহিক জীবন যাপন করতেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম তো নিষ্কাম প্রেম শান্তি অপ্রতিরোধ ও পাপকে পরিহার করার উপদেশে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আবার বাইবেলের "সারমন অন দি মাউণ্ট"-এর উপদেশাবলী এমন যে, তা বহুশতাব্দী ধরে শান্তিবাদীদের স্বমতে অবিচল থাকার প্রেরণা দিয়েছে। প্রাচীন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তের্তুলিয়ন, জাস্টিন, মার্টির, ওরিজেন, সিপ্রিয়ন ও লেক্টেন্টিয়াস প্রভৃতি স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের সঙ্গতি থাকতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

"তলোয়ার যে ব্যবহার করবে তলোয়ারেই সে শেষ হবে—এ কথা প্রভু যখন বলে গেছেন তখন তলোয়ারের মালিক হওয়াকে কি আইনসঙ্গত আখ্যা দেওয়া সম্ভব? আর কাউকে আঘাত করাই যখন তার মর্যাদাবহির্ভূত ব্যাপার তখন

১. Tao Teh ching—from Canons of Reason and Virtue Paul Carus.
২. The Wisdom of China and India—Ed. Liz Yutang.

শান্তির পুত্রের কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত? এবং যিনি নিজের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেন না তিনি কি শৃঙ্খল কারাগার ও অন্যবিধ অত্যাচারের প্রক্রিয়ার শরণ নেবেন?"—তেতুর্লিয়ন।[১]

প্রাচীন খ্রীষ্টানদের এই শান্তিবাদী ঐতিহ্য প্রতিটি যুগে কোন না কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বজায় রেখেছিলেন। এর মধ্যে আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রবর্তিত ফ্রায়ার্স মাইনর সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রেনেসাঁস-এর যুগের ইরাস্‌মাসের ভূমিকা ধার্মিক হলেও তাঁর চিন্তাধারায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার শান্তি-চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়:

"সৃষ্টির অযৌক্তিক অংশে দেখা যায় যে পশুদের মধ্যে যারা বন্য নামে খ্যাত একমাত্র তারাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আর এ যুদ্ধ পরস্পরের সঙ্গে হয় না—ভিন্ন প্রজাতির পশুর সঙ্গে হয়। এবং তারা যুদ্ধ করে কেবল নিজেদের প্রকৃতিদত্ত আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করার অস্ত্রে। সামান্য কারণে বা হঠাৎ দানবীয় প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত ধ্বংসের যন্ত্র নিয়ে তারা আক্রমণ করে না। নিজেদের শাবকদের রক্ষা করার জন্য অথবা খাদ্যের সন্ধানে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধের কারণ হল অপ্রতিহত ক্ষমতা অথবা অপর কোন মানসিক ভারসাম্যের অভাবজনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রোধ অথবা ঈর্ষা। জঙ্গলের পশুরা এমন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয় না যেখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সুশৃঙ্খলভাবে হত্যা করার জন্য একত্র হয়েছে।"[২]

সপ্তদশ শতাব্দীতে মেননাইট ও কোয়েকার—খ্রীষ্টানদের ভিতর এই দুই বিশিষ্ট শান্তিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদেরই নিজ শান্তিবাদী আদর্শের কারণ বহু নিগ্রহ বরণ করতে হয়। কোয়েকারদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন জর্জ ফক্স ও উইলিয়াম পেন। বাইবেলের কোন উক্তির ভিত্তিতে নয়, নিজেদের বিশ্বাসের বশেই তাঁরা মনে করতেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ও যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক বিরোধাভাস বিদ্যমান। পূর্বের শান্তিবাদীদের মত তাঁরা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে উভয় প্রকার যুদ্ধকেই ধর্মবিরোধী বিবেচনা করতেন।

সপ্তদশ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ নিবারণার্থ এক নূতন বিচারধারার উদ্ভব হল। এটা হল আন্তর্জাতিক সংগঠনের কল্পনা। এর সূচনা এইভাবে হয়

১. The soldier's Chaplet—from The Writings of Tertullian
২. Complaint of Peace—Desiderius Erasmus.

যে, একজন সমগ্র বিশ্বের রাজা হবেন এবং সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রস্তাব পেশ করেছেন সেই দেশের কোন ব্যক্তি। তবে সেই প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একাধিক সুপরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিকতার বিচারধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার মত জনসেবার কার্যক্রমও গৃহীত হল। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র রাষ্ট্রেরা পারস্পারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সৌকর্য বিধানের জন্য কিছু কিছু আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস্-এর স্থাপনা হয়। বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লীগ অফ নেশনস্ অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে এবং সেই সব সফলতার ভিত্তিতে পুরাতন ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনের আশায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনাইটেড নেশনস্-এর স্থাপনা হয়। বিশ্বে শান্তি-চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে ইউনাইটেড নেশনস্-এর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

আধুনিক যুগের শান্তিকামী মহাপুরুষদের মধ্যে থোরো, রাস্কিন ও টলস্টয়ের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের চিন্তাধারা থেকে গান্ধীজি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেরণা পেয়েছিলেন। থোরোর 'অন্যায় ব্যবস্থাকে মানতে নম্রভাবে অস্বীকার' বা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের বিচারধারাকে গান্ধীজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন। সামাজিক অন্যায় সম্পর্কে রাস্কিনের বিশ্লেষণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধীজি সর্বোদয়ের অর্থব্যবস্থার আদর্শ উপস্থাপিত করেন। টলস্টয়ের ধর্মনীতি, সরল জীবন ও শান্তির প্রেরণাকে গান্ধীজি আরও স্পষ্ট রূপ দেন।

এইভাবে গান্ধীজি হলেন বিশ্বের শান্তিচেতনার সর্বশেষ ধাপ। ধর্ম-বিশ্বাসের কারণ আজও জগতে শান্তি-চেতনা ব্যাপ্ত এবং এটা গান্ধীজির পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁর প্রকৃতিই ছিল ধার্মিকতাভিত্তিক। কিন্তু এই ধার্মিকতা তাঁর শান্তি-চেতনাকে সীমিত বা সঙ্কুচিত করতে পারে নি। এই অর্থে তিনি কট্টর ধর্মধ্বজী ছিলেন না। ধর্মের কোন অংশ তাঁর শান্তি-চেতনার বাধক হলে তিনি তাকে পরিহার করতে প্রস্তুত ছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাভিত্তিক শান্তি-চেতনা গান্ধী-মানসের প্রতিকূল ছিল না। প্রত্যুত তাঁর ধার্মিকতা ছিল মানবতার ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান।

শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক উপায়ের শরণ নেওয়াও তাঁর কাছে অজ্ঞাত ব্যাপার ছিল না। অবশ্য তাঁর সমগ্র কার্যক্রম সেই ভিত্তি-ভূমির উপরই দাঁড়াত যেখান

পর্যন্ত তিনি স্বয়ং যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশী ব্রত তাঁকে প্রতিবেশীর সেবা করার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সেবায় নিয়োগ করত। আসলে তাঁর মানবতা-চেতনাই ছিল বিশ্বব্যাপী।

আজকের শান্তিবাদীদের একটা বড় অংশই কেবল পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা করে থাকে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইত্যাদি এই জাতীয় শান্তিবাদী। জীবন-সায়াহ্নে গান্ধীজির সামনেও পারমাণবিক অস্ত্রের আতঙ্ক প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা দেখে অহিংসার প্রতি তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন:

"মানবজাতিকে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি যুগ যুগ ধরে বিধৃত করে রেখেছে পারমাণবিক বোমা তা ধ্বংস করেছে। তথাকথিত যুদ্ধের আইন বলে একটা বিধান ছিল যার ফলে যুদ্ধ বরদাস্ত করা যেত। এবার নগ্ন সত্য উপলব্ধি করা যাচ্ছে। শক্তি ছাড়া যুদ্ধ অপর কোন বিধানের কথাই জানে না।…

"এর পরও কি আমি আমার সত্য ও অহিংসার বিশ্বাস আঁকড়ে থাকব? পারমাণবিক বোমা কি সে বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় নি? পারমাণবিক বোমা শুধু যে এ পারে নি তা-ই নয়, আমাকে সুস্পষ্টভাবে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়েছে যে, ঐ দুই নীতিই হল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বলশালী শক্তি। এর সামনে বোমারও কোন মূল্য নেই। নূতন বিরোধী শক্তিরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—এর একটি হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং অপরটি ভৌতিক ও জড়ধর্মী। এর প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ, স্বভাবতঃই দ্বিতীয়টি নশ্বর। চৈতন্য-শক্তি চিরপ্রগতিশীল এবং অনন্ত।"[১]

শান্তি বলতে যুদ্ধবিহীনতা—এই সংকীর্ণ পরিভাষা গান্ধীজি কখনও স্বীকার করেন নি। তাঁর পরিভাষায় শান্তির কার্যে নিম্নোক্ত অংশ থাকবে:

ক. মনুষ্যের মনের শান্তি;

খ. সামাজিক শান্তি।

এবং সামাজিক শান্তিকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. অন্যায়ের জন্য যে অশান্তি হয় তার নিরাকরণ এবং

২. আক্রমণের ফলে সৃষ্ট অশান্তির নিবারণ।

এর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকারে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং দ্বিতীয় প্রকারে

১. Non-Violent way to World Peace—M.K. Gandhi. P. 30—31.

আন্তর্জাতিক শান্তি সমাবিষ্ট। গান্ধীজির ব্যাপক শান্তি-চেতনা এই সমগ্র বিশাল পটকে আবরিত করে। গান্ধীজির কাছে ব্যক্তিগত শান্তি ও সামাজিক শান্তির প্রশ্ন পরস্পর সম্বন্ধিত ও পরিপূরক—তাঁর কাছে যুদ্ধ-নিবারণ ছিল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অন্যায় নিরাকরণের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যুত বিশ্বের শান্তিবাদী আন্দোলনে গান্ধীজির অন্যতম অবদান হল শান্তির ব্যাখ্যাকে ব্যাপক করা। তিনি শান্তির এক গঠনাত্মক পরিভাষা দেন। "যুদ্ধবিহীনতা" রূপ নেতিবাচক ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি "অহিংস সমাজ রচনার" গঠনাত্মক পরিভাষা উপস্থাপিত করেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবদানের মূল সূত্র পাওয়া যাবে তাঁর একাদশ ব্রতে। নিজ সত্যাগ্রহ আশ্রমের আশ্রমবাসীদের জন্য গান্ধীজি এই একাদশ ব্রতের সঙ্কলন করেন। এই ব্রতগুলির দ্বারা গান্ধীজি ব্যক্তিগত গুণাবলীকে সমষ্টিগত মূল্যবোধে রূপান্তরিত করেন এবং ব্যক্তি ও সমাজের ভিতর এক বিচিত্র সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেন। এ-যাবৎ কাল পর্যন্ত মানবতা নিজ বিকাশের জন্য দুই ধরনের প্রযত্ন করেছিল। এর প্রথমটি হল ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ জাতীয় প্রয়াসের নিদর্শন বার বার দেখা গেছে। মানবতা-বিকাশের দ্বিতীয় পন্থা হল সামাজিক বিপ্লবের পথ। পশ্চিমের ইতিহাসে এ জাতীয় প্রয়াসের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় প্রয়াসই যতক্ষণ পর্যন্ত ঐকান্তিক ততক্ষণ পর্যন্ত একাঙ্গীও বটে। কেবল চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস মানুষকে করল সমাজবিমুখ আর কেবল সামাজিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া ব্যক্তি-মানবকেই বিস্মৃত হল। সত্যাগ্রহের সঙ্গে একাদশ ব্রতকে যুক্ত করে গান্ধীজি উপরোক্ত দুই পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধিকেই তিনি সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে পরিণত করলেন। বিশ্বের সামাজিক শান্তি-চেতনার অভিমুখে গান্ধীজির এ এক অনবদ্য অবদান। এই ভাবে তিনি ব্যক্তিগত শান্তি ও সামাজিক শান্তির পন্থাকে এক এবং অভিন্ন করে তুললেন।

আজকে শান্তিসেনার যে কল্পনা তা গান্ধীজির তিরোধানের পর আচার্য বিনোবা ভাবে কর্তৃক প্রদত্ত। এই জন্য গান্ধীকে প্রথম শান্তিসৈনিক আখ্যা দেওয়াটা হয়ত বিচিত্র শোনাবে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের এই শীর্ষক বিনোবাজীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে গৃহীত :

"গান্ধীজি শান্তিসেনার প্রথম সেনাপতি ও সৈনিকও ছিলেন। সেনাপতি

হিসাবে তিনি 'কর অথবা মর"—এই হুকুম দিয়েছিলেন এবং সৈনিক হিসাবে তিনি সে হুকুম পালন করেন। অর্থাৎ 'নিজ কৃতি—নিজ জীবনের মাধ্যমে' এর এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে তিনি পেশ করে গেছেন।

নোয়াখালি-যাত্রার সময় জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তাঁর কাছে একটি বাণী চান। ৭৯ বৎসর বয়সেও গান্ধীজি তখন ছাত্রের মত বাঙলা ভাষা প্রথম শিখছিলেন। বাঙলাতেই তিনি লিখে দিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।" বিনোবাজী যথার্থই বলেছেন যে, গান্ধীজি নিজ জীবনের দ্বারা শান্তি-সৈনিকের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে পেশ করে গেছেন। গান্ধীজির জীবন-চরিত বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। চরিতের পরিবর্তে চারিত্র সম্বন্ধেই আমাদের আগ্রহ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিধির মধ্যে সেই চরিত্রেরও সব দিকের উপর আলোকসম্পাত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনীয়তাও নেই। শান্তির বিচারধারার বিকাশক্রমে গান্ধীজির আবির্ভাব কি ভাবে এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার রূপ নিয়েছিল—এটা দেখার পর এবার আমরা শান্তিসেনার আভ্যন্তরীণ রূপ-রঙের দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজির চরিত্রের প্রতি কথঞ্চিৎ অবলোকন করব। শান্তি-সৈনিক হবার জন্য তিনটি গুণ অপরিহার্য বলে মনে করা হয়: নিরপেক্ষতা, নির্বৈরতা, নির্ভীকতা। গান্ধীজির জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই ত্রিবিধ গুণের প্রভূত পরিমাণ সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। গান্ধীজি নিজ রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ ভাগ কংগ্রেসের সঙ্গে কাটালেও স্মরণ রাখতে হবে যে, সেকালে কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না—ছিল এক রাজনৈতিক মঞ্চ। এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন আদর্শযুক্ত ব্যক্তিদের লোক-সংগ্রহ গান্ধীজি কম করেন নি। এমন কি অহিংসার পূজারী হওয়া সত্ত্বেও হিংসায় বিশ্বাসীদের নিজ আত্মীয়-স্বজন করতে তাঁর বাধে নি। ১৯২২ সনে তিনি যারবেদা জেলে থাকাকালীন একটি ঘটনা ঘটে। তাঁর অ্যাপেনডিক্সে অস্ত্রোপচার হবার কথা। সেকালে এ অস্ত্রোপচারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। কারাকর্তৃপক্ষ বললেন যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন সে সময় তাঁর কোন নিকট আত্মীয়কে কাছে ডাকতে পারেন। গান্ধীজি উত্তর দিলেন, "তার জন্য দূরে যেতে হবে না।" জেলকর্তৃপক্ষ তাঁদের নাম জানতে চাইলে তিনি শ্রীযুক্ত ন্. চি, কেলকার ও বাপুজী আণের নাম দিলেন। উভয় ব্যক্তিই রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির ভিন্নপক্ষীয়—এক দিক থেকে বিরুদ্ধপক্ষীয় ছিলেন বলা যায়। গান্ধীজি কিন্তু তাঁদেরই আপনজন

বলে মনে করলেন এবং অস্ত্রোপচারের ঐ সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতিই যথেষ্ট বিবেচনা করলেন। এই ঘটনায় অত্যন্ত অভিভূত হয়ে শ্রীযুক্ত কেলকার পরে এক প্রবন্ধ রচনা করেন।

"যুদ্ধস্ব বিগত জ্বরঃ" বলে অবশ্য গীতা নির্বৈরতার প্রতিপাদন করেছে। এর উপর গান্ধীজি ছিলেন অহিংস-যোদ্ধা। তাই তাঁর নির্বৈর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গান্ধীজির বিপুল-বিস্তার সামাজিক জীবনে তাঁর নির্বৈরতার বহুবিধ উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতির নির্বৈরতাই দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের সব চেয়ে বড় প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে অনুপ্রেরিত করে। তাঁর নির্বৈর বৃত্তির কারণ মহম্মদ আলী জিন্নার একান্ত অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে নির্মল হাস্যোদ্ভাসিত মুখের তাঁর সেই বিখ্যাত চিত্র দেখা যায়। তবে বোধ হয় তাঁর নির্বৈরতার অপ্রতিম উদাহরণ হল দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের সময় জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে জেনারেল স্মাটস লিখছেন:

"কপালক্রমে আমি এমন একজন ব্যক্তির বিরোধী হয়েছিলাম যাঁর সম্বন্ধে আমার তখনও অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব ছিল।...যে আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম করছিলেন তার জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকলেও তিনি পরিস্থিতির মানবীয় দিকটি কদাচ বিস্মৃত হন নি। কখনও তিনি ধৈর্যচ্যুত বা ঘৃণার বশীভূত হন নি। এবং অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের স্বভাবের সৌম্য সরসতা হারান নি।......গান্ধীজির পদ্ধতিতে সব কিছুর সঙ্গেই একটা বিচিত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকত। কারারুদ্ধ থাকাকালীন আমার জন্য চমৎকার কাজের একজোড়া চপ্পল তৈরী করেন এবং কারামুক্ত হবার পর আমাকে তা উপহার দেন। তারপর থেকে বহু বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি সেই চপ্পল জোড়া পরেছি, যদিও আমার বরাবরই মনে হয়েছে এই রকম একজন মহাপুরুষের হাতের তৈরী চপ্পল পরার উপযুক্ত আমি নই।...বরাবরই তাঁর ক্রিয়াকলাপ মহানুভবের মত। সব শ্রেণী ও জাতি এবং বিশেষ করে নিপীড়িতবর্গের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গী আত্মার যথার্থ মহানতার প্রতীক সেই বিশ্বজনীন ও শাশ্বত মানবীয় মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।"[১]

১. Mahatma Gandhi—Ed. S. Radhakrishna. P. 276—281

গান্ধীজির নির্ভয়তার জন্ম তাঁর ঈশ্বর-শরণ-বৃত্তি থেকে। তাই ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে তিনি ভয় করতেন না। বাল্যকালে ধাইমা রম্ভাবাঈ-এর কাছ থেকে তিনি ভীতি-নিবারণের জন্ম রামনাম-রূপী মন্ত্র পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মীর আলমের লাঠি খেয়ে পড়ে যাবার সময় তাঁর মুখ থেকে "হে রাম!" শব্দই নির্গত হয়েছিল। এবং জীবন-সায়াহ্নে যখন হত্যাকারীর গুলি তাঁকে আঘাত করল তখনও সেই "হে রাম!" শব্দই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল। বস্তুতঃ গান্ধীজির অন্তর্জীবন যেন ছিল "হে রাম!"—মন্ত্রেরই অখণ্ড জপমালা। তাই ভয় কি বস্তু তা তিনি জানতেনই না। তাঁর নোয়াখালির "একলা চলো রে" যাত্রা এই সত্যেরই সাক্ষী।

আজকে শান্তিসেনার যে স্বরূপ প্রকট হচ্ছে তার মূলেও রয়েছে শান্তিসেনা সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বোম্বাই-এ ইতস্ততঃ কয়েকটি দাঙ্গা ঘটে। সে-সময় গান্ধীজি একদিকে স্বয়ং অনশন শুরু করলেন এবং অন্যদিকে সকল ধর্মের স্বেচ্ছাসেবকদের একত্র করে তাঁদের মিলিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দাঙ্গার স্থলে পাঠালেন। স্বেচ্ছাসেবকদের এই দলগুলির জন্ম যে নিয়মাবলী তৈরি করা হয় তার মধ্যে বর্তমান শান্তিসেনার যাবতীয় মহত্বপূর্ণ নিয়মাবলীর বীজ ছিল। "শান্তিসেনার বিকাশ" পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত প্যারেলাল সেই সব নিয়ম এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "একটি নিয়ম ছিল এই যে, এর সদস্যরা কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন না, লাঠি চালাবেন না। দ্বিতীয় নিয়ম ছিল এই যে, তাঁরা কোন বেতনের প্রত্যাশা করবেন না। তৃতীয় নিয়ম অনুসারে তাঁদের খদ্দরের বিশেষ এক ধরনের উর্দি পরতে হবে যাতে বিনা বিলম্বে তাঁদের চেনা যায়। চতুর্থ নিয়ম ছিল—দলের নেতার নির্দেশ পুরোপুরি মানতে হবে। পঞ্চম নিয়ম ছিল এই যে, তাঁদের মন বচন ও কর্মে পূর্ণমাত্রায় অহিংসা পালন করতে হবে। ষষ্ঠ নিয়ম এই যে, এর সদস্যরা সকল ধর্মমতকে সমান মনে করবেন।" উপরোক্ত ষড়বিধ নিয়ম শান্তিসেনাদের বর্তমান নিষ্ঠাপত্রে প্রতিবিম্বিত।

"শান্তিসেনা" শব্দও গান্ধীজির অবদান। দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম তিনি যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন তখন সত্যাগ্রহীদের দলকে "অহিংসক সেনা" বলতেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদাবাদের দাঙ্গার সময় গান্ধীজি নিজ ব্যক্তিগত সচিব স্বর্গীয় মহাদেব দেশাইকে সেখানে পাঠান। দাঙ্গার সময় শান্তি স্থাপনার জন্ম তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের যে দল সংগঠন করেন তার নাম

দিয়েছিলেন "শান্তিসেনা।"

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, মৃত্যুর পূর্বে গান্ধীজি তাঁর অনুগামীদের সেবাগ্রামে এক সম্মেলনে আমন্ত্রিত করেছিলেন। এই আমন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমগ্র দেশে যে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অখিল ভারতীয় পর্যায়ে শান্তিসেনা সংগঠন-ব্যবস্থা। দেশের দুর্ভাগ্য যে, গান্ধীজির নিজের হাতে সৃষ্ট শান্তিসেনা দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, শান্তিসেনার বিচারধারা ছিল তাঁর অন্তিম অভিলাষ। সর্বশেষ বলিদানের দ্বারা শান্তিসৈনিক হিসাবে গান্ধীজি নিজ জীবনকে চরিতার্থ করেন। তাঁর ঐ বলিদানের কারণ পরস্পরকে আঘাত করতে উদ্যত হস্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

শান্তিসেনা সম্বন্ধে গান্ধীজির বিচারধারা ছিল তাঁর নিজ জীবনের পূর্ণ সাধনার কষ্টিপাথরে যাচাই করা। শ্রীযুক্ত প্যারেলাল কর্তৃক তাঁর "মহাত্মা গান্ধী—লাস্ট ফেজ" গ্রন্থে সেই সব বিচারধারার যে সঙ্কলন করা হয়েছে তার কয়েকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। গান্ধীজি বলতেন যে, অহিংসা-শক্তির সংগঠনের জন্য সর্বাগ্রে তার সম্ভাব্যতা ও মানব-স্বভাবের উপর আস্থার প্রয়োজনীয়তা নিজের সম্বন্ধে মানুষ যেমন চিন্তা করে তেমনিই হয়ে থাকে। তিনি একথাও বলতেন যে, হিংসাশ্রিত সেনার সংগঠনের জন্য যেসব গুণের আবশ্যক হয় তার মধ্যে কিছু কিছু তো অহিংস সৈনিকদেরও চাই—কিন্তু কয়েকটির আবার আদৌ প্রয়োজনীয়তা নেই। হিংসাশ্রিত সৈনিকদের কাছে প্রদর্শন ও হত্যার জন্য অস্ত্র থাকবে; অহিংস সৈন্যের কাছে কিন্তু আদৌ অস্ত্র থাকবে না। অহিংস সৈনিকের চেষ্টা হবে তলোয়ার ও বন্দুককে লাঙ্গলে কোদালে পরিণত করা। শারীরিক শক্তি দেখে হিংসাশ্রিত সৈনিক ভর্তি করা হবে কিন্তু শান্তিসেনার সিপাহী ভর্তি করা হবে বৌদ্ধিক ও আত্মিক শক্তি দেখে। শান্তি সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, আজও তাঁদের প্রশিক্ষণ-কার্যে মোটামুটি তা কার্যকরী।

আজকের শান্তিসেনাদের প্রধান কাজ দুটি : অশান্তির সময় অশান্তি নিবারণ ও সাধারণ সময়ে সেবা। নিজ ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজি তো অশান্তি নিরাকরণের নৈমিত্তিক এবং সেবার নিত্যগুণের নিদর্শন পেশ করেন। কিন্তু তাঁর আন্দোলন-সমূহেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাতে অশান্তি নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেগঠনকর্ম-রূপী সেবাও যুক্ত থাকত।

আজকের শান্তিসেনার নিজ অনুশাসনের তিনটি মুখ্য অঙ্গ : শ্রম, স্বাধ্যায় ও সেবা। এই ত্রিবিধ গুণ গান্ধীজির জীবনে টানা-পোড়েনের মত ওতপ্রোত ছিল। রাস্কিনের "আন টু দিস লাস্ট" গ্রন্থ পাঠ করে তিনি নিজ জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধন করে তাকে উৎপাদক শরীর-শ্রম-ময় করে তুললেন। ফিনিক্স আশ্রমে তিনি নিজের হাতে পায়খানা পরিষ্কার করতেন, সেখানকার ছাপাখানা চালাতেন নিজের হাতে এবং সেখানের বৃক্ষলতায় নিজহস্তে জলসিঞ্চন করতেন। তাঁর এই শ্রমোপাসনা আজীবন বজায় ছিল। গান্ধীজির খুব বেশী পড়ার অভ্যাস না থাকলেও বহুল অধ্যয়নকেই স্বাধ্যায় বলা চলে না। গান্ধীজি যেটুকু পড়তেন সে সম্বন্ধে মনন করতেন এবং তার থেকে যা গ্রহণ করতেন তদনুযায়ী আচরণ করতেন। স্বাধ্যায়ের যথার্থ অর্থ এই। স্বাধ্যায়ের এই প্রক্রিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি জারি রাখেন। আর সেবার কথা তো বলারই দরকার করে না। তার ফলে ভারতের সামাজিক জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তাঁর সেবার পরশ পৌছায় নি। হরিজনদের সেবা, আদি-বাসীদের সেবা, কৃষকদের সেবা, রোগীর (এমন কি কুষ্ঠ রোগীও) সেবা, নারী-জাতির সেবা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা—তাঁর সেবার ক্ষেত্র গুনে শেষ করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আক্রমণের সময় অহিংস প্রতিরক্ষার কার্যক্রম সম্বন্ধে গান্ধীজি যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন ভারতবর্ষের উপর বোমা বর্ষণ করে তখন তিনি এই প্রশ্নেরও উত্তর দেন যে অহিংস রাষ্ট্র কিভাবে হিংস আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে। গান্ধীজি কল্পনা করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করতেন যে, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এমন হবে যে কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেন তার উপর আক্রমণ করতে ইচ্ছুক না হয়। তবুও যদি বহিরাক্রমণের ঘটনা ঘটে তো গান্ধীজি মনে করতেন যে, শান্তি সৈনিকদের দল দেশের সীমান্তে গিয়ে আক্রমণকারী সৈন্যদের সামনে দাঁড়াবে এবং তাদের গুলি গোলায় প্রাণোৎসর্গ করবে। এবং আক্রমণকারীরা এর পরও যদি শান্তি সৈনিকদের শবরাশি পদদলিত করে অগ্রসর হয় তাহলে জনসাধারণের জন্য অহিংস অসহযোগের অমোঘ অস্ত্র গান্ধীজি পেশ করেছিলেন। একথা সত্য যে, তাঁর এ কল্পনা সাকার হয় নি। আর একথা কল্পনা করাও নিরর্থক যে, আজ গান্ধীজি বেঁচে থাকলে কি করতেন। যদি চিন্তা করতেই হয় তাহলে কেবল এই কথাই এখন ভাবা উচিত যে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির

সত্য অহিংসার আদর্শকে কিভাবে কার্যকরী করা যায়।

গান্ধীজির সমগ্র জীবনই ছিল শান্তি-সৈনিকের জীবন। তাঁর মৃত্যু তো শান্তি-সৈনিকের জীবনের পরাকাষ্ঠা। হয়ত বলা যেতে পারে যে গান্ধীজির জীবন এক বিয়োগান্তক মহাকাব্য। কিন্তু মানবতার ইতিহাসে মহাকাব্য কি কেবল বিয়োগান্তকই হয় না? যীশু সক্রেটিস লিঙ্কন কেনেডি মার্টিন লুথার কিং ইত্যাদির অমর কাহিনী বিয়োগান্তক কিনা? এই বিয়োগান্তক কাব্য এক দিকে যেমন উক্ত মহাপুরুষদের মহত্ত্ব ও মানবতার অপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে অন্য দিকে আবার এই সত্যের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, মানবতাকে আরও কত দূরে যেতে হবে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে :

> "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
> ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
> প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করবো—
> কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
> সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।"[১]

১ শিশুতীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃষ্ঠা ১৫

গান্ধীজির গঠনকর্ম

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গান্ধী শতবার্ষিকী আগতপ্রায়। সারা ভারতে এই শতবার্ষিকী নানাভাবে পালিত হবে—তার কথাবার্তা উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। এই সূত্রে গান্ধী প্রবর্তিত গঠনকর্মের মূল সূত্রগুলির একটু আলোচনা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তথাপি আলোচনায় পদে পদে কুণ্ঠা অনুভূত হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর গত বিশ বৎসরে দেশ গঠনকর্ম ব্যাপারে গান্ধী-পন্থা হতে অনেক দূরে সরে এসেছে। থাক্ সে কথা। গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসবকে সামনে রেখে আজ এই প্রার্থনাই করি যে দেশবাসীর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও সহযোগিতায় শক্তিশালী সমষ্টি-মন যেন দেশের বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশে নতুন করে গঠনকর্মের পথ পায় এবং সেই পথে অগ্রসর হবার শক্তি লাভ করে।

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় গান্ধীজি দেশব্যাপী গঠনকর্মের কথা বলেন। বহুমুখী গঠনকর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি যে বিপুল আয়োজন ও ভারতব্যাপী সংগঠন করেন আজ তা ইতিহাসের গৌরবময় কথা। স্বাধীনতা লাভের পর আজ স্বরাজগঠনেও সেই গঠনকর্মের প্রয়োজনীয়তা তুল্যরূপে বর্তমান।

দেশবাসীর প্রতি তাঁর সেই চিরস্মরণীয় শেষ নির্দেশপত্রে গান্ধীজি তাঁর সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর বিস্ময়কর মহাভারতীয় জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার অমূল্য কথা বলে গেছেন—

> "গঠনকর্মী পল্লীগুলিকে এইভাবে সংগঠিত করবেন যাতে কৃষি ও পল্লীশিল্পের মধ্য দিয়ে ঐগুলি স্বয়ংপূর্ণ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।"

শেষ নির্দেশপত্রে গঠনকর্মীর প্রতি তাঁর অন্যান্য প্রধান কথাগুলি এই—

> "ভারতের শহর ও নগরগুলি থেকে স্বতন্ত্র যে সাত লক্ষ গ্রাম রয়েছে তাদেরও কল্যাণার্থে সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক মুক্তি ভারতকে এইবার অর্জন করতে হবে।"
>
> "স্বীয় পল্লীঅঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থের সহিত কর্মীর ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগস্থাপন করা চাই।"
>
> "তিনি পল্লীবাসীদের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ ক'রে তাদের শিক্ষা

দেবার ব্যবস্থা করবেন।"

(গান্ধীজির শেষ নির্দেশপত্র, হরিজন পত্রিকা ২৯-২-৪৮)

আজ আসন্ন গান্ধী শতাব্দী উৎসবের প্রস্তুতির জন্য মহাত্মা গান্ধীর সেই মূল কথা, সেই ষোল আনা স্বদেশীর কথা, ভারতের স্বকীয় প্রতিভা অনুযায়ী ভারত সংগঠনের সেই অপূর্ব নব কর্মযোগের কথা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও মনন করতে হবে এবং তারই জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তপশ্চরণের সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। ভারতের নিজস্ব ধারায় আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এই পথেই অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে।

ভারতের যে বিশাল প্রাণ পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে নানা শিল্পকার্যে আশ্রয় পেয়েছে, তার কৃষির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রাণরস আহরণ করেছে এবং পল্লীর নানা উৎসব ও আনন্দে সঞ্জীবিত হয়েছে, ইংরেজ শাসনে সেই পল্লীময় ভারত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। সারা ভারতে কৃষি ও পল্লীশিল্পকে সঞ্জীবিত করে পল্লীর উদ্ধার ও পুনর্গঠনই গান্ধী গঠনকর্মের প্রধান লক্ষ্য।

গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা-কর্মের দুই দিক ছিল। একদিকে গঠনকর্ম ও অপরদিকে উপযুক্ত কালে সত্যাগ্রহ। গঠনকর্মের সূত্রে আদর্শনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী কর্মিগণ সারা দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন, গ্রাম ও শহরের দুস্তর ব্যবধানের উপর সেবা ও প্রেম ও রাজনৈতিক ঐক্যচেতনার সুবর্ণ-সেতু নির্মিত হয়, গ্রামে নূতন আশার উদয় ও নবশক্তির উদ্ভব হয় এবং এ-সকলই সত্যাগ্রহের পুষ্টি ও প্রসারসাধন করে। গান্ধীজির কথায়—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য যেমন অস্ত্র পরিচালন শিক্ষা আবশ্যক, নিরস্ত্র আইন অমান্যের শিক্ষার জন্য সেইরূপ চাই দেশব্যাপী গঠনকর্ম।

গঠনকর্মের লক্ষ্য পল্লীময় ভারতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা—দেশের একেবারে সর্বনিম্ন স্তর থেকে আত্মশক্তিসহায়ে সমগ্র জাতিকে মজবুত করে গেঁথে গড়ে তোলা। এই সংগঠনে পরানুবাদ পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষার দুঃস্বপ্ন কোথাও ছিল না এবং মূঢ় আন্তর্জাতিকতার বাতিকও ছিল না। এ একেবারে গান্ধীজির ষোল আনা স্বদেশী। প্রধানতঃ গ্রামের হ'লেও এই কর্ম স্বাধীন দেশে গ্রাম, শহর সর্বত্র সকলের এবং সর্বব্যাপী।

খাদি, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যরক্ষা, মাদকবর্জন, গ্রামশিল্প, গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান, নারী-উন্নয়ন, বনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা, রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা, ধনসাম্যবিধান,

ছাত্র, কৃষক, মজুর, আদিবাসী ও কুষ্ঠরোগীর মধ্যে সেবা ও শিক্ষাদানকার্য—এই সকল গঠনকর্ম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু রচনাত্মক বা গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা থাকা উচিত নয় যে এটা চরকা-খাদি, অস্পৃশ্যতা পরিহার প্রভৃতি উল্লিখিত কয়েকটি ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গান্ধীজি উদাহরণস্বরূপ এই অষ্টাদশ গঠনমূলক কাজের কথা বলেছিলেন। গঠনকর্মের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলেছিলেন যে, এই অষ্টাদশ দফা ছাড়া স্থলবিশেষে তৎস্থান উপযোগী আরও বহু রকমের গঠনকর্ম আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—১৯৪৪-৪৫ সনে হুগলী জেলার কর্মিগণ শীতকালে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে কতকগুলি বাঁধ বেঁধে বোরো ধানের চাষ জন্য সেচের সুব্যবস্থা ও উৎপাদনকার্য সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করতে পেরেছেন,—এর বিস্তৃত বিবরণ লেখকের মুখে শুনে তিনি তৎকাল ও তৎস্থানোপযোগী সেই কার্যকে "রচনাত্মক কার্যকা হিস্‌সা" অর্থাৎ তাঁর গঠনকর্মেরই অঙ্গ বলেছিলেন এবং সেই কার্যকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

এই আশীর্বাদ লাভ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। গান্ধীজি ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সোদপুর আশ্রমে আসেন। তারপর প্রধানতঃ ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৬, সোদপুর ছেড়ে যান। এই দেড় মাসেরও অধিককাল সারা ভারতের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে নিবদ্ধ ছিল সোদপুর আশ্রমের উপর।

আশ্রমের পশ্চিম দিকের মনোরম উদ্যানকে বেষ্টন করে একটি পথ ছিল। এই পথে গান্ধীজি সকাল বিকাল ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণকালে নানালোক নানা কথা নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। গান্ধীজি রহস্য করে একে বলতেন, Walking interview—চলন্ত সাক্ষাৎকার। এই চলন্ত সাক্ষাৎকারে একদিন সকালবেলা—সেদিন ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৫—আমি গান্ধীজিকে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে প্রায় ২০টি ছোটবড় বাঁধ বেঁধে আমাদের বোরো চাষের সেচের জলের সুব্যবস্থা করার কথা বলেছিলাম। হিন্দী না জানায় তাঁরই নির্দেশে আমি তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে বাংলায় প্রায় আধঘণ্টা কাল কথা বলি। তিনি হেসে বলেন—"আমি বাংলা বুঝি—বাংলা তোমার কাছে শিখবো।" তিনি আমার সব কথাই বুঝলেন। কথাপ্রসঙ্গে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাদের বাঁধ বাঁধার কৌশল কোথায় পেলে—Engineering skill?"

আমি উত্তরে বললাম—"একদম দেশী।"

গান্ধীজি বললেন—"হাঁ, এই ত ঠিক হ্যায়।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"এর জ্ঞান কোথা থেকে এল ?"

আমি—বললাম "পরম্পরাগতভাবে—গ্রামের লোকের কাছ থেকে।"

তাঁর সঙ্গে বাংলা কথাবার্তায় আমি সাধু ভাষার দিকে ঝোঁক রেখেছিলাম। আমার উত্তর শুনে পরম পরিতুষ্ট হয়ে হাস্যোজ্জ্বলমুখে বাপুজী একটু জোর দিয়ে বললেন "ও তো দেহাতী হ্যায়।"

তখন গঠনকর্ম সম্বন্ধে গান্ধীজির নিম্নলিখিত কথাটি মনে পড়ে গেল—

> "It means a wholesale Swadeshi mentality, a determination to find all the necessaries of life in India and that too through the labour and intellect of villagers"—Constructive Programme
>
> অর্থাৎ এ তো ষোল আনা একটা স্বদেশী মনোভাব, দেশের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু দেশের মধ্যে পাবার সংকল্প আর—সে পাওয়া গ্রামের লোকের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে।—গঠনকর্ম পন্থা

১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে সেবাশ্রম থেকে গান্ধীজি গঠনকর্ম-সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন—

> "It should be remembered that constructive programme is *illustrative not exhaustive.* Local circumstances may suggest many more items not found in the printed programme. *They are necessarily for local workers to find out and do the needful.*"
>
> অর্থাৎ মনে রাখা দরকার যে 'গঠনকর্ম-পন্থা' পুস্তিকায় দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, সকল রকম কাজের কথা বলা হয় নি। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এই সব কাজ খুঁজে বার করে স্থানীয় কর্মিগণকে তার সম্পাদনের জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করতে হবে।

বোরো বাঁধ সম্বন্ধে সবিস্তার কথা বলার স্থান এই প্রবন্ধে নেই—বলা সম্ভবতঃ উচিত নয়। শুধু এইমাত্র বলে প্রসঙ্গের শেষ করি যে বাপুজী তাঁর হাস্যসমুজ্জ্বল সস্নেহ দৃষ্টি নিয়ে হুগলীতে বোরো বাঁধ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সকল কথা শুনে পরিতুষ্ট হয়ে সানন্দে সমর্থন করলেন। বিদায়ের দিন ১৯শে জানুয়ারি

১৯৪৬ সকালবেলায় তাঁর সন্নিকটে যখন যাই তখন সেখানে কেউ ছিল না। আমার প্রার্থনায় বোরো বাঁধ সম্বন্ধে তখন তিনি তাঁর বিচিত্র হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী লিখে দিলেন—

"হুগলীমেঁ যো বাঁধকাম হুয়া, জিস্‌কে লোগোঁকো বড়া ফায়দা পঁহুচা উসে মৈঁ রচনাত্মক কার্যকা হিস্সাহী সমঝ্‌তা হুঁ। ঔর ঐসী শোধকশক্তি সব সেবকমে হোনী চাহিয়ে।"

হুগলীতে যে বাঁধকার্য হয়েছে, যাতে লোকের বড় উপকার হয়েছে, সেই কাজকে রচনাত্মক (গঠনমূলক) কাজের অংশ বলেই আমি বুঝি। আর এইরূপ শোষকশক্তি সব সেবকের মধ্যেই হওয়া চাই।

হুগলীতে বোরো বাঁধ প্রসঙ্গে এই কয়টা কথা জানাবার উদ্দেশ্য এই যে, এই কাজটি স্থানীয় অবস্থা অনুসারে স্থানীয় কর্মিগণ কর্তৃক অনুসন্ধানের পর গৃহীত ও সুসম্পন্ন হয়—"গঠনকর্মপন্থা" 'Constructive Programme' পুস্তিকায় এই ধরনের কার্যের উল্লেখ নেই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কথাগুলি নিয়ত স্মরণ ও প্রণিধানযোগ্য।

"......এই দুর্ভাগ্যদেশের বিনাপুরস্কারের কার্য্যে দুর্গম পথে যাত্রা করিতে কে কে প্রস্তুত আছ আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়—পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়াছি তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে।...চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব। কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব। আমরা আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা সেই একই—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিও।
আজি ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।"

প্রকৃতপক্ষে গঠনকর্ম দেশের সব নীচের স্তর থেকে গ্রামে গ্রামে আত্মশক্তি-সহায়ে স্বরাজ গড়ে তোলার উপায়—এইটেই হ'ল মূল কথা। এই কাজ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। এই কাজে নিত্য বিদেশের মুখ-চাওয়া ও বিদেশের কাছে হাত-পাতার অপরিসীম গ্লানি ও লজ্জা নেই, জীবনের সব ক্ষেত্রে পরের অন্ধ অনুকরণের লজ্জাকর লম্বা ফর্দ নেই। আজ স্বাধীন দেশে কর্মীর দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়

ও বলিষ্ঠ চিন্তা গঠনকর্মের নতুন নতুন দিক খুলে দিক। গঠনকর্ম স্বাধীন দেশে আদর্শবাদ ও স্বাদেশিকতার পুষ্টিসাধন করে তাকে নতুন রূপ দিক—ভারতের গণমনকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার শক্তিশালী ধারক ও বাহক করে তুলুক, গঠনকর্মের মূল সূত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিধিতে, বিবিধ বিচিত্র নতুন রূপে তার প্রসার ও বিকাশ হোক্। গান্ধীজি বলেছেন, "কঠোর শ্রম, অবিরাম চেষ্টা, ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক সামর্থ্যের প্রয়োগ বিনা এই কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।" কর্মীকে এই কর্মযোগে একবারে ভাবৈকরসঃ হ'তে হবে।

> স্বাধীনতা লাভের পর প্রদেশে প্রদেশে লেখাপড়া-জানা লোকদের প্রাদেশিকতার খণ্ডদৃষ্টি নিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে মগ্ন দেখে বাপুজী বড় দুঃখেই বলেছিলেন, "আজ সকলেই যে-যার নিজের ও পরিবারের চিন্তায় মগ্ন—সমগ্র ভারতের কথা কেউ ভাবে না। স্বাধীনতা পেয়ে মনে হচ্ছে স্বাধীনতা নিয়ে কি করব তা আমরা জানি না। স্বাধীনতাকে প্রায় আত্মঘাতী অরাজকতা বলে ভুল করা হচ্ছে।" (হরিজন ৩০-১১-৪৭) গভীর খেদে তিনি আরও বলেছিলেন, "আজ পরম আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, দেশ যখন আমাদের নিজের হয়েছে তখন খাদির কথা কেউ ভাবে না।" (প্রার্থনা ভাষণ ৬-১১-৪৭)

দেশের এই দুরবস্থা ও অবসাদজনক মনোভাব যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পায় এবং সদ্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা-পরিচালনের মত্ততা দেশকে বিপথগামী না করে, সেইজন্য গান্ধীজিকে কঠোর চিন্তা করতে হয়। ভবিষ্যৎ ভারতের সুসংগঠন ও দীনতমের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন এবং ভারতীয় লোকজীবনে ও কর্মক্ষেত্রে সত্য ও নীতির সুরক্ষণ ও সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি "লোকসেবক সংঘ"-এর পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনাই জাতির প্রতি তাঁর শেষ নির্দেশ। পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

গান্ধীজি বলেছিলেন—

> "আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কাপড়ের কল একে একে বন্ধ করে দিতুম—দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র গ্রামে গ্রামে চরকা ও তাঁতের দ্বারা উৎপন্ন করতুম।"

চরকা গান্ধীজির কাছে বিভিন্ন গ্রামশিল্পের প্রতীক—তার মধ্যমণি স্বরূপ। বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পব্যবস্থায় গ্রামশিল্পের পুনরুজ্জীবন ছাড়া মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে গ্রামময় ভারত বাঁচবে না—তাই বার বার খুব জোর দিয়েই তিনি বলতেন,

মৃতকল্প গ্রামশিল্পগুলিকে সর্বপ্রচেষ্টায় এখনই পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। এই কার্য সম্পাদনের জন্য ভারতব্যাপী আয়োজন তিনি করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস! স্বাধীন দেশে রাজ-ক্ষমতা হাতে আসার পর আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরে গান্ধীজির সেই মৃতকল্প গ্রামশিল্পগুলিকে উদ্ধার করা দূরে থাক, একে একে তাদের বধ করে কবর দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে পরম উৎসাহে ও চরম পাণ্ডিত্যের আশ্রয়ে।

গান্ধীজি বলেছেন—

"যন্ত্রশিল্পের প্রসার মনুষ্যজাতির পক্ষে অভিশাপ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একজাতির দ্বারা অন্য জাতির শোষণ চিরকাল চলবে না। বৃহৎযন্ত্রে মানুষের শ্রম-লাঘবের প্রেরণা নেই—আছে লোভের প্রজ্বলন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে বলেছেন—"ওরা যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে—মানুষ বলি চায়। দেবতাকে ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে।"

গান্ধীজি যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলেছেন ভারি বা বৃহৎ শিল্প ও যন্ত্র—আপন প্রয়োজনে যা থাকবে তা জাতীয় সম্পত্তি হয়ে রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে। তিনি বলেছেন, "যন্ত্র এসেছে ও থাকবে—কিন্তু মানব-কল্যাণের জন্যই তাকে থাকতে হবে। সব সময়েই মনে রাখতে হবে—যন্ত্র মানুষের দাস, মানুষ যন্ত্রের দাস নয়। ব্যক্তিই সবার উপর—তার বিকাশই সকল ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য—যন্ত্রের জয়গান কদাপি নয়।" আজ পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রমোহের যুগে কল-পাগল মানুষের রক্ষার পথ নির্দেশ করেছে এই গান্ধী-গঠন-কর্মব্যবস্থা—শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উপর সহযোগিতা ও সমবায়মূলক সমাজ গঠন। গঠনকর্মীরা সকলেই এ কথা জানেন—আরও জানতে, বুঝতে হবে এবং করতে হবে। গ্রাম ও শহরে দেশব্যাপী বেকার সমস্যা, গ্রামের সাধারণ জনগণের ঘোর দারিদ্র্য, দেশের নিম্নস্তরের অবজ্ঞাত লোকসাধারণের অশেষ অজ্ঞতা ও দুর্দশা—এই সমস্ত সংকট মোচনের উপায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ নির্দেশ-পত্রের মধ্যে পরিষ্কার ভাবেই দৃষ্ট হয়। বহু সহস্র কোটি টাকার জলজ্বলে মুকুট-পরা অতিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গান্ধীর সেই শেষ নির্দেশপত্রের কোন মূল্য দেয় নি। মহাসমারোহের শোরগোল তুলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশকে অসহ্য মুদ্রাস্ফীতি, দুর্মূল্যতা, কালোবাজারীর টাকা এবং ঘোর বেকার সমস্যার মহাপঙ্কে ডুবিয়েছে।

গান্ধীজির পরিকল্পিত 'লোকসেবকসংঘ' তাঁর মহাপ্রয়াণের পর পরিবর্তিত পরিবেশে 'সর্বসেবাসংঘ'এর রূপ নিয়েছে। গান্ধীজির ষোল আনা স্বদেশীই সর্বোদয়ের আশ্রয়। সর্বোদয় দূরের স্বপ্ন, নিকটের সাধন। এই সর্বোদয়-প্রচেষ্টা সন্ত বিনোবাজীর পরিচালনায় আজ ভূদান ও গ্রামদানরূপে পরিণত। ভূদান ও গ্রামদানের মহাবাণী নিয়ে আমাদের 'অনিকেতঃ' স্থিরমতি 'ভক্তিমান্' নেতা সন্ত বিনোবা দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল বিশাল ভারতের পথে পথে পরিক্রমা করেছেন—আর অপূর্ব হরিকথা ছড়িয়েছেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে। গ্রামদানী গ্রামের পরিণত রূপ এখনও কোথাও দৃষ্ট হয় নি। কিন্তু গ্রামদানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে লোকের বোধ ক্রমশঃ জাগছে। গ্রামদান হতে জেগে উঠবে সমগ্র গ্রামবোধ—এই আমাদের আশা। সমগ্র গ্রামবোধ—গ্রামে এই সমষ্টিচেতনা বা নব শক্তির উদ্ভব হবে গান্ধীজির ষোল আনা স্বদেশীর আশ্রয়ে। এই সত্যাশ্রিত মানবধর্মোপেত নীতির আশ্রয়ে জাগ্রত গ্রামগুলি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে ক্রমে ক্রমে স্বয়ংপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে। গান্ধীজির গঠনকর্ম বা ষোল আনা স্বদেশীর এই কাজ—তাঁরই ভাষায়—"সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও বিঘ্নকণ্টকিত"—কর্মিগণ তা নিশ্চয়ই জানেন।

এইবার রবীন্দ্রনাথের কথায় শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন—

> "কেবল ভোটের সংখ্যা ও পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব বর্ণনা করে কোন জাতি দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে আমরা তাঁকে দেখবো না—যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করবো। তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে।"

গান্ধীজীর শিক্ষাব্যবস্থা

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনকর্মের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। যদিও শিক্ষার কথা তিনি সকলের শেষে বলেন, তাহলেও শিক্ষা তাঁর সমস্ত গঠনকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে ছিল। এই শিক্ষাকে তিনি একটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা মানুষের কোন বিশেষ বয়সের বিশেষ প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষা একটা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা চলবে, কোন দিন এর শেষ হবে না। এবং শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নয়।

আমরা মনে করি, শিক্ষা মানুষের প্রথম বয়সের ব্যাপার। প্রথম জীবনে কিছুদিন পর্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন, তার পর আর এর প্রয়োজন নাই। শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন। জীবনে মানুষকে কাজ করতে হবে। সেই কাজের জন্য জ্ঞানের দরকার। কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে সে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করবে। সেই হল শিক্ষা। গান্ধীজী শিক্ষাকে এই দৃষ্টিতে দেখতেন না।

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্ম আলাদা ছিল না। জ্ঞান এবং কর্ম একই বস্তুর দুটো দিক। জ্ঞান না হলে কর্ম হয় না, এবং কর্ম না হলে জ্ঞান হয় না। মানুষ কাজ করবে এবং কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করবে। কাজ এবং শিক্ষা একসঙ্গেই চলবে। আগে শিক্ষা পরে কাজ, এ নয়। এ কথা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে যেমন সত্য ছোট ছেলেদের পক্ষেও তেমনই।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন, এই শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। কি ছোট কি বড়, কারও ক্ষেত্রেই শিক্ষার জন্য বিশেষ করে কোন খরচ করতে হবে না। শিক্ষা হবে কাজের মধ্য দিয়ে। যে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা হবে তা থেকে একটা আয় হবে। সেই আয় থেকে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। গান্ধীজীর মতে স্বাবলম্বনই শিক্ষার মূল্যবিচারের মাপকাঠি। যে শিক্ষা স্বাবলম্বী নয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

গান্ধীজীর প্রথম শিক্ষা-পরিকল্পনা ছেলেদের জন্য। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের পর কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশ

শাসনের ভার কংগ্রেসের হাতে আসে। দেশের অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের প্রশ্ন কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ছেলেমেয়েদের কি রকমের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কিভাবে এই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে? গান্ধীজী বললেন, ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কল্যাণকর কোন একটা উৎপাদনাত্মক কাজ করবে। তাদের শিক্ষা হবে এই কাজের ভিতর দিয়ে। এই কাজের ফলে যে সব জিনিস উৎপন্ন হবে গভর্নমেণ্ট তা কিনে নেবেন। সেই আয় থেকেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে।

তখনকার দিনে গান্ধীজীর এই পরিকল্পনার একটা সাময়িক উপযোগিতা ছিল। দেশের অগণিত অশিক্ষিত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেবার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন আমাদের দরিদ্র দেশে তার একান্ত অভাব। অর্থাভাবের জন্য যদি ছেলেদের শিক্ষা দিতে না পারা যায় তাহলে কোনদিনই তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এমনভাবেই শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে যেন অর্থাভাব শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু এই সাময়িক উপযোগিতাই এর বড় কথা নয়।

এ ছাড়াও এর একটা বৃহত্তর উপযোগিতা আছে। সে উপযোগিতা কোন একটা বিশেষ দেশের বিশেষ কালের নয়। সে উপযোগিতা সর্বদেশের সর্ব কালের। সে উপযোগিতা বিশ্বমানবসমাজের। তা যদি না হত তাহলে এর সাময়িক মূল্য যতই হোক না কেন, গান্ধীজী কখনও একে স্বীকার করতেন না।

এই উপযোগিতার বিষয় বুঝতে হলে যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত সেইটা বোঝা আবশ্যক। সব শিক্ষার মূলেই একটা দার্শনিক তত্ত্ব থাকে। তারই উপরে ভিত্তি করে সেই শিক্ষা রচিত হয়। এই দার্শনিক তত্ত্বটি না বুঝলে সেই শিক্ষাকে সম্যকরূপে বোঝা যায় না।

গান্ধীজীর জীবনাদর্শের মূলে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে, গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষার মূলেও তাই আছে। গান্ধীজী অধ্যাত্মবাদী লোক। তাঁর কাছে মানুষের আত্মার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এই আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই তার জীবনের লক্ষ্য। মানুষকে তার এই লক্ষ্য সিদ্ধ করতে হলে সে যে সমাজে বাস করবে সেই সমাজকেও এর অনুকূল করে গড়ে তুলতে হবে। সেই সমাজের গোড়ার কথা হবে প্রত্যেকটি মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। যে সমাজে মানুষের চিন্তার বাক্যের এবং চেষ্টার স্বাধীনতা নাই সে সমাজে সে কেমন করে তার আত্মার বিকাশ সাধন করবে?

স্বাবলম্বন না হলে স্বাধীনতা হতে পারে না। যে মানুষ স্বাবলম্বী নয়, জীবনের প্রয়োজনের জন্য যাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় সে কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। মানুষকে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দিতে হয় তাহলে সে যাতে নিজের চেষ্টায় সহজে তার জীবনের প্রধান প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যে সমাজে ধন উৎপাদনের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আয়ত্তে নাই সেই সমাজে মানুষের স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

যে সমাজে মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সে সমাজের রূপ বর্তমান সমাজের মত হবে না। এই সমাজে দেশের রাষ্ট্রশক্তি বা অর্থশক্তি কোন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না, থাকবে সমস্ত সমাজের সর্ব স্তরে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে। কৃষি এবং পল্লীশিল্পই হবে এই সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। এই কৃষি এবং পল্লীশিল্পকে অবলম্বন করে এক একটি গ্রামসমাজ গড়ে উঠবে। এই সমাজে রাষ্ট্রশক্তিও কোন একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের হাতে থাকবে না। বিভিন্ন গ্রামসমাজই পরস্পরের সহযোগে এই শক্তি পরিচালনা করবে। গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা সবই এই গ্রামসমাজের হাতে থাকবে।

এই স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী গ্রামসমাজের একটি সুন্দর চিত্র গান্ধীজী তাঁর এক লেখায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এই গ্রামসমাজ হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণতন্ত্র। এই সমাজ তার প্রধান প্রয়োজনগুলি স্বাধীনভাবে নিজেই নির্বাহ করবে, তার জন্য প্রতিবেশী গ্রামসমাজের উপর নির্ভর করবে না। তাহলেও যেখানে আবশ্যক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামেরই প্রথম কাজ হবে নিজেদের খাদ্যশস্য এবং কাপড়ের জন্য তুলা উৎপাদন করা। গ্রামে পৃথক গোচর জমি এবং ছোট বড় সকলের খেলাধূলা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের জন্য খেলার মাঠ থাকবে। যেখানে এ ছাড়াও জমি পাওয়া যাবে সেখানে প্রয়োজনীয় পণ্য শস্য চাষ করা হবে। তবে, গাঁজা তামাক আফিম প্রভৃতি চাষ করা হবে না। গ্রামে স্কুল থাকবে, থিয়েটার থাকবে এবং সাধারণের সভার জন্য হল থাকবে। নিজেদের জলের ব্যবস্থা থাকবে, সেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে। সংরক্ষিত কুয়া এবং পুকুরের সাহায্যে এই ব্যবস্থা হতে পারবে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক হবে। যথাসম্ভব সমস্ত কাজই সমবায় পদ্ধতিতে করা হবে। আজকার মত জাতিভেদ থাকবে না, বিভিন্ন স্তরের

অস্পৃশ্যতাও থাকবে না। অহিংস অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহই হবে এই গ্রাম-সমাজের শাসনশক্তি। গ্রামে গ্রামরক্ষীদল থাকবে, তারাই পালা করে গ্রাম রক্ষার কাজ করবে। গ্রাম পঞ্চায়ত গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। পাঁচজন লোক নিয়ে এই পঞ্চায়ত গঠিত হবে এবং পঞ্চায়তের কার্যকাল হবে এক বৎসর। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়ে এই পঞ্চায়তের সভ্য নির্বাচন করবে। এই গ্রাম-পঞ্চায়তের হাতে আইন-প্রণয়ন, বিচার এবং প্রশাসন সব কিছুর ভার থাকবে। প্রচলিত অর্থে শাস্তির ব্যবস্থা এই সমাজে থাকবে না।"

আজকার সমাজে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একটা গভীর বৈষম্য রয়েছে। একদল লোক অপরকে শোষণ করে বড় হচ্ছে এবং আর একদল শোষিত হয়ে দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। একদল পরিশ্রম না করে বসে বসে খাচ্ছে এবং আর একদল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজে মানুষ এবং মানুষের এই বৈষম্য দূর হয়ে যাবে, এই তিনি আশা করেছিলেন। এই সমাজে সকলেই পরিশ্রম করবে, কেউ বসে খাবে না। শুধু তাই নয়, আজকে মানসিক শ্রম এবং শারীরিক শ্রমের মধ্যে যে মর্যাদার পার্থক্য আছে এই সমাজে তাও থাকবে না। এখানে সকল শ্রমই সমান বলে গণ্য হবে। সুতরাং, ছোটবড় এবং উচ্চনীচের ভেদ এখানে থাকবে না। সকলেই হবে সকলের সঙ্গে সমান। এই সমাজ হবে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য ছেলেকে এই রকম সমাজের উপযুক্ত করে তৈয়ারী করা। জীবনের ভিতর দিয়েই মানুষ জীবনের জন্য তৈয়ারি হতে পারে। একটা বিশেষ সমাজের জন্য ছেলেকে তৈয়ারী করতে হলে সেইরকম সমাজের ভিতর দিয়েই করতে হবে। সেইজন্য শিক্ষালয়েও এই সমাজের অনুরূপ একটা সমাজ গঠন করা হয়। তার উদ্দেশ্য, সেই শিক্ষালয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে সেই সমাজ-জীবন যাপন করতে করতে ছেলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে।

গান্ধীজীর শিক্ষার একটা গোড়ার কথা হল উৎপাদনাত্মক কাজ। এই কাজের ভিতর দিয়ে মানুষ হতে হতে ছেলে ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক হবার মত গুণ অর্জন করতে থাকবে। আজ সমাজে সর্বত্রই শারীরিক শ্রমের উপর একটা ঘৃণা আছে, শারীরিক শ্রমকে আমরা অপমানজনক বলে

মনে করি। এই শিক্ষার ফলে সেই ঘৃণা দূর হবে, শারীরিক শ্রমের কাজকে কেউ ছোট কাজ বলে মনে করবে না। তা ছাড়া, আজ সমস্ত সমাজই হয়েছে লাভের ভাবে অনুপ্রাণিত এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্রই কেবল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। কে কত অর্থ উপার্জন করবে, কে কত ধন সঞ্চয় করবে, এই নিয়ে মানুষে মানুষে কেবলই প্রতিযোগিতা চলেছে। তার ফলে সর্বত্রই মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধ এবং অশান্তি। এ শিক্ষার ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। যে-মানুষ সৃষ্টি করে না তারই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বড় হয়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষালয়ে সৃষ্টির কোন অবকাশ নাই। এখানে তা নয়। এখানে সৃষ্টিই হবে ছেলের বড় কাজ। তার ফলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তার কমে যাবে। পড়াশোনা একলা একলা করা যায়, কিন্তু কাজ করা একলা হয় না। তার জন্য অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই কাজ করতে গিয়ে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার প্রবৃত্তি বাড়বে। তার মনে সেবার ভাব জেগে উঠবে। লাভটাই জীবনের বড় কথা হয়ে থাকবে না।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এই শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা আছে। সাধারণ শিক্ষালয়ে ছেলেকে শুধু বসে বসে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু এ তার স্বভাবের প্রতিকূল। ছেলে চায় কাজ। সে লাফাবে ঝাঁপাবে, ছুটোছুটি হুটোপাটি করবে, ভাঙবে গড়বে, এই তার স্বভাব। এর ভিতরে সে যে আনন্দ পায়, বসে বসে লেখাপড়ায় সে আনন্দ পায় না। আর আনন্দের ভিতর দিয়েই ছেলের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। প্রত্যেক ছেলের মনেই একটা ধ্বংসের এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা সৃজনেরও আকাঙ্ক্ষা আছে। সৃষ্টির কাজ তার সেই ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষার সংশোধক হিসাবে কাজ করে এবং তার সৃজনের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে। তা ছাড়া, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষাও ভাল হয়। বিনা প্রয়োজনে মানুষ কিছু শিখতে চায় না। প্রয়োজনের তাগিদেই শেখে। শুধু শিখতে চায় তাই নয়, তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং যা শেখে তা মনেও থাকে ভাল। ছেলে যখন কাজ করতে করতে কাজের প্রয়োজনে শিখতে থাকে, তখন এই দিক থেকে তার সুবিধা হয়।

শিক্ষার দিক থেকেও এই শিক্ষা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী। শিক্ষা তো কেবল লিখতে পড়তে শেখা নয়, শিক্ষা মানে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কাজের ভিতর দিয়ে এ যেমন হয়, পড়ার ভিতর দিয়ে তেমন হয় না। পড়ার ক্ষেত্রে ছেলেকে নিক্রিয়ভাবে অপরের অভিজ্ঞতার

কথা গলাধঃকরণ করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে সে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। সেখানে সে মোটেই নিষ্ক্রিয় নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়। আর এই ক্রিয়াশীলতাই তো জীবন। এই শিক্ষার আর একটা গুণ, এতে ছেলের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে যায়। কাজ করতে করতে এবং কাজের ভিতর দিয়ে রোজগার করতে করতে ছেলের মনে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে যে, সেও আর পাঁচজনের মত নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন নাই। সে যে শিক্ষাকে অপরের দান হিসাবে গ্রহণ করছে না, নিজের শ্রমের মূল্যে সে যে শিক্ষাকে অর্জন করে নিচ্ছে, এই জ্ঞান থেকে তার আত্মমর্যাদাবোধও বেড়ে যায়। সে যে কাজ করে তার ফল সে একা ভোগ করে না, তার ফল ভোগ করে সমগ্র শিক্ষালয়সমাজ। এর ফলে ত্যাগ এবং সেবার পথে তার মনটা তৈয়ারী হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষার জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সেইজন্য শিক্ষার দ্বারা জীবন যেভাবে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত তা হয় না। জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। জীবনের কাজে লাগে না। শিক্ষাকে যদি প্রকৃতই জীবনের কাজে লাগাতে হয়, তা হলে জীবনের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষায় জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন পূর্ণতর এবং সমৃদ্ধতর হতে থাকে। তার ফলে শিক্ষালয় এবং সমাজ উভয়েই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

গান্ধীজীর শিক্ষার আর একটা গোড়ার কথা হল স্বাবলম্বন। কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার কথা আধুনিক যুগে অনেক শিক্ষাবিদই বলেছেন। কিন্তু সে কাজ উৎপাদনাত্মক কাজ হবে, যে কোন রকমের কাজ নয়, একথা গান্ধীজীই প্রথম বললেন। গান্ধীজীর এই কথার অনেক সমালোচনা হয়েছে। তার চেয়েও বেশি সমালোচনা হয়েছে তাঁর স্বাবলম্বনের কথার সম্বন্ধে। কিন্তু গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজের শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, এটা একেবারে অপরিহার্য। গ্রামসমাজকে যদি স্বাবলম্বী হতে হয় তাহলে তার ছেলেদের শিক্ষার খরচও গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমি গ্রাম থেকে দেওয়া শক্ত নয়। ঘরবাড়িও গ্রাম থেকেই করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষালয় পরিচালনার সমস্ত খরচ গ্রাম থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। তা

ছাড়া, সে খরচ দেওয়া যদি সম্ভব হয় তাহলেও শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হবে না। শিক্ষালয়সমাজের ভিতর দিয়েই ছেলে গ্রামসমাজের জন্ম তৈয়ারী হবে। সেই শিক্ষালয়সমাজ যদি নিজে স্বাবলম্বী না হয় তাহলে সেই সমাজ-জীবনের ভিতর দিয়ে স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ গঠনের শিক্ষা কেমন করে হবে? সেইজন্মই গান্ধীজী স্বাবলম্বনের উপরে এত বেশি জোর দিয়েছিলেন, সেইজন্যই তিনি বলেছিলেন, "Whatever the criticisms may be, I know that the only education is that which is self-supporting," লোকে যে যাই বলুক, আমি মনে করি স্বাবলম্বী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শনের গোড়ার কথা

শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গান্ধীজীর কাছে একদা একটি অদ্ভুত প্রচারপত্রে এই প্রশ্নোত্তরটি ছিল :

"যখন গান্ধীরাজ আসবে, তখন ভারতের অবস্থা কেমন হবে ?

"কোন রেলপথ থাকবে না, হাসপাতাল থাকবে না, যন্ত্রপাতিও থাকবে না।...কোন আইন আদালতেরও প্রয়োজন হবে না ; কেন না প্রত্যেকে তখন নিজেরা আইন রচনা করবে...। তখন জীবন হবে খুব সুখের ; কারণ প্রত্যেকে খদ্দরের এক টুকরো লেংটি পরে চলাফেরা করবে ও উন্মুক্ত প্রান্তরে শয্যা গ্রহণ করবে।"[১]

গান্ধীজীর আদর্শ বা তাঁর স্বরাজের রূপরেখা সম্বন্ধে এরূপ বিকৃত ব্যঙ্গোক্তি ১৯২০-২২ সালের ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যেত। গান্ধীজীর অহিংস সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে তৎকালীন চিন্তাশীল মহলে যদিও নতুন চিন্তার উদয় হয়েছিল, তথাপি তাঁকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করতে অপর পক্ষ কসুর করেন নি। এর উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে তাঁর সেই অমর পুস্তিকা 'হিন্দ্-স্বরাজ' যাতে তিনি উপস্থাপিত করলেন আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মহত্তম প্রতিবাদ। বর্তমান সভ্যতার কুফলগুলির প্রবল বিরোধিতা করলেও গান্ধীজী উক্ত প্রচারপত্রের উত্তরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন, "কিন্তু স্বরাজ এলে কোন প্রকার রেলওয়ে, হাসপাতাল, যন্ত্র, সৈন্য, নৌবহর বা আইন আদালত থাকবে না এমন স্বপ্ন কেউই দেখে না ; অন্ততঃ-পক্ষে আমি তো তেমন কল্পনা করি না।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ৯. ৩. ২২)

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, আজও গান্ধীজীর অহিংস সমাজ ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা দেখা যায়, তাতে শিক্ষিত জনমানসে গান্ধী-ভাবাদর্শের তথ্যনিষ্ঠ অধ্যয়ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। গান্ধীজী চরকা, খাদি ও কুটিরশিল্পের কথা বলেছিলেন বলেই কি এই যুগে অচল ? কিন্তু একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সভ্য সমাজ প্রগতির উন্মত্ত অভিযানে ছুটে এক সীমাহীন গহ্বর মুখে এসে থমকে

১. Towards Non-Violent Socialism.

দাঁড়িয়েছে। সমাজশাস্ত্রীরা বর্তমানের এই অবস্থাকে বলেছেন, 'রুগ্ন মানুষ ও রুগ্ন সমাজ (Sick man and Sick society)।' বর্তমান যুগের এই সংকটের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ তথা শান্তিবাদী লেখক উইলফ্রেড্ ওয়েলক তাঁর যুগোপযোগী পুস্তিকা, 'New Horizons'-এ বেদনার সুরে বলেছেন—

"সভ্যতা আজ এমনই এক অবস্থায় এসেছে যেখানে হয় সভ্যতার নয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে।...কারণ, শিল্প-বিপ্লব এমন অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে, যা সমাধানে তা অক্ষম। ফলে, আমরা এক যুদ্ধ হতে অন্য যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে চলেছি এবং এক জীর্ণ, ঘুণধরা আর্থিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি যা মারাত্মক প্লেগ রোগের ন্যায় জড়বাদী মূল্যমানের বিষ ছড়াচ্ছে।"

এ সভ্যতাকে 'সংখ্যাবাচক সভ্যতা'[১]-রূপে অভিহিত করে এক পূর্ণ মানুষ সৃষ্টিকামী 'গুণবাচক সভ্যতা'র[২] প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন যা এক নূতন শিল্প-বিপ্লব ও সমাজ-কাঠামো রচনা করবে। যুগপুরুষ গান্ধীও এই নূতন যুগের আহ্বান জানিয়েছেন।

যন্ত্রাসুরের এই দাপটে আধুনিক সমাজে মানুষের অসহায় অবস্থাকে সুন্দর রূপে প্রকাশ করেছেন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক শ্রীবিনয় ঘোষ :

"বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যত উন্নতি হল, মানুষের তত উন্নতি হল না। সমস্যাটা বিজ্ঞান বা যন্ত্র নিয়ে নয়। যন্ত্রের ক্রীতদাস মানুষকে নিয়ে। যন্ত্রের মত মানুষও হয়ে উঠছে যান্ত্রিক। যে যন্ত্র মানুষ চালাত, সেই যন্ত্র কেবল সুইচ টিপলে যখন নিজেই চলতে থাকবে, তখন মানুষ অচল হয়ে যাবে।"[৩]

অতি-যান্ত্রিকতা-পুষ্ট শিল্পবাদের ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে আজ বিদগ্ধ সমাজে গবেষণা চলেছে। মানবপ্রেমিক গান্ধীজীর দৃষ্টিতে শিল্পবাদের[৪] এই নগ্নরূপ বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। সেজন্য ইউরোপের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "আমার ভয় হয়, আধুনিক শিল্পবাদ মানব-সমাজের কাছে অভিশাপস্বরূপ হতে চলেছে। শিল্পবাদ সম্পূর্ণরূপে অপরকে শোষণ করার ক্ষমতার উপরে বেঁচে থাকে। আর অপরকে শোষণ করার জন্য ভারতকে শিল্পায়িত করার কথা কেনই বা আমি চিন্তা করব ?"[৫] শোষণ আর অসাম্যের জন্মদাতা যে শিল্পবাদ, তার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এই উক্তির সর্বকালীন মূল্য রয়েছে।

---

১. Quantitative Civilisation ২. Qualitative Civilisation

৩. শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৬৫ ৪. Industrialism ৫. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২. ১১. ৩১

ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের কুফল দূর করার উদ্দেশ্যে নানা মুনির নানা মত। জাতীয়করণ, রাষ্ট্রীয়করণ, সমাজীকরণ প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রচলিত। বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মুনাফা ব্যক্তির বদলে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে তা জাতীয় কল্যাণে ব্যয়িত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ব্যক্তিগত পুঁজি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হলে রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা গ্রাস করতে উদ্যত হয়। রাষ্ট্র-প্রধান এই সমাজ গান্ধী-ভাবনার পরিপন্থী কেননা রাষ্ট্রীয়বাদ অধিকতর ভয়াবহ। গান্ধীজী সেজন্য একদা একটি মূল্যবান উক্তি করেছিলেন: "পণ্ডিত নেহরু শিল্পায়ন চান; কারণ, তাঁর ধারণা যে, শিল্পের জাতীয়করণ হলে তা পুঁজিবাদের দোষ হতে মুক্ত হবে। আমার নিজস্ব অভিমত এই যে, এই সকল দোষ শিল্পবাদের মজ্জাগত রোগ। আর যতই তার সমাজীকরণ করা হোক, তা দূর হবে না।"[১]

আজ একথা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয়করণ হলেই প্রকৃত সমাজবাদ আসে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করে যা অধিকতর মারাত্মক। এজন্য অর্থনীতিবিদ দাঁতওয়ালা এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন, "সমাজীকরণ টেকনলজির আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট দাওয়াই নয়।···বিংশ শতাব্দীর প্রধান সংঘর্ষের কারণ মানুষ ও যন্ত্র—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পন্থা মানুষকে আজ বার করতে হবে।"[২]

প্রশ্ন উঠবে, গান্ধীজী কেন এত প্রবলভাবে কেন্দ্রিত শিল্পোদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন? তবে কি তিনি সকল উন্নত শিল্প ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন? শিল্পবিপ্লবোত্তর দুনিয়ায় যন্ত্র ও যান্ত্রিকতাকে নির্বিচারে স্বাগত জানাতে সক্ষম হন নি বলেই বোধহয় গান্ধী-আদর্শের প্রতি এই প্রতিবাদ! গান্ধীজী চাইতেন জাতীয় জীবন সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হোক। সমাজজীবনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে আমি অতিশয় ভয়ের চোখে দেখি। কারণ আপাতদৃষ্টিতে যদিও শোষণ কমিয়ে রাষ্ট্র ভালই করে, কিন্তু সকল প্রগতির মূলে আছে যে ব্যক্তিত্ব তা বিনাশ করে রাষ্ট্র মানবজাতির সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।"[৩] অনুরূপভাবে আর্থিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের বিরোধী ছিলেন তিনি। সেজন্য অহিংস অর্থনীতির অর্থ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত আর্থিক

---

১. হরিজন, ২৯. ৯. ৪০ ২. Gandhism Reconsidered.

৩. মডার্ণ রিভিউ, ১৯৩৫

ব্যবস্থা। কারণ, তাঁর কথায়, "পদ্ধতি হিসাবে কেন্দ্রীকরণ অহিংস সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিহীন।"[১] গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, যে অর্থনীতি ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে আঘাত করে, তা নীতিবিগর্হিত এবং সেজন্য তা বর্জনীয়।

অহিংস অর্থনীতির স্বরূপ কি? অহিংস স্বরাজের মূল চাবিকাঠি হল আর্থিক সাম্য। আর্থিক সমতা সাম্যবাদী আদর্শেরও মূল তত্ত্ব। কিন্তু গান্ধীজীর পন্থা পুরোপুরি অহিংস; অর্থাৎ, বিচার পরিবর্তনের পথ। জোর জবরদস্তির স্থান এতে নেই বললেই চলে। প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অংশ দরিদ্রতর অংশের জন্য স্বেচ্ছায় অর্পণ করবে—এই হবে সমবণ্টনের আদর্শ। যেমন, কারুর দুর্বল পাকস্থলীর জন্য ১০০ গ্রাম চালের প্রয়োজন; আর এক-জনের ৪০০ গ্রামের প্রয়োজন হয়, তবে উভয়েই আপন প্রয়োজন মত চাল পাবে। ধনী ও ক্ষুধার্তের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যতদিন থাকবে, ততদিন অহিংস স্বরাজের কল্পনা অসম্ভব। এবং স্বেচ্ছায় সম্পদের সহভোগ না হলে সহিংস রক্ত-বিপ্লব যে অনিবার্য, একথা গান্ধীজী স্বীকার করতেন। একথা ঠিক যে, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত এই সমবণ্টনের পথ কষ্টসাধ্য লক্ষ্য। অহিংসাও তাই। সমবণ্টনের অর্থ সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন। গাণিতিক অর্থে সমপরিমাণ বণ্টন নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সঞ্চয় বৃত্তি প্রভৃতি গুণগুলি সকলের মধ্যে এক নয়। সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নায্য বণ্টন ব্যবস্থাই সমবণ্টনের বাস্তব রূপ। হিংসার পথে ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে সমবণ্টনের যে পথ, তাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না। কেননা, তাতে অর্থ বা সম্পদ সৃষ্টির সামর্থ্য যাদের আছে তাদের অবদান আমরা হারাব। এজন্য গান্ধীজী অহিংস উপায়ে ধনবানকে তার ধনের অছি রূপে আচরণ করতে বলেছেন। অতএব, বিচার পরিবর্তন, হৃদয় পরিবর্তন, সবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন—এই ত্রিমুখী পরিবর্তন বা ত্রিধারা বিপ্লব সাধনই হচ্ছে গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের কর্ম-কৌশল। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা যদি তাদের ধনের প্রকৃত অছি না হন, তবে কি করা হবে? সেক্ষেত্রে শেষ অস্ত্র হিসাবে গান্ধীজী বলেছেন, দরিদ্ররা সংগঠিতভাবে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্যরূপ সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেবে। কেননা, কোন অবস্থাতেই গরীবের সহযোগিতা ছাড়া ধনীর ধন উপার্জন সম্ভব নয়।

গান্ধী-উত্তরসাধক আচার্য বিনোবা ভাবের মতে সমগ্র গান্ধীদর্শনের ভিত্তি চারটি মৌলিক নীতির উপর দণ্ডায়মান: সত্যাগ্রহ (সত্য ও অহিংসার শক্তি),

১. হরিজন, ১৮.১.৪২

সর্বোদয় (সকলের কল্যাণ নীতি), সাম্যযোগ (জীবনের সর্বাবস্থায় সমতার প্রয়োগ), এবং সমন্বয় (বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান)।[১] গান্ধীজীর বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, তা জানতে হলে তাঁর সর্বোদয় দর্শনের সম্যক পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। বিখ্যাত মনীষী রাস্‌কিনের লেখা, 'আনটু দিস্‌ লাস্ট' পুস্তকটি গান্ধীজীর সমগ্র জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, পরবর্তীকালে তা 'সর্বোদয়' দর্শনরূপে খ্যাত হল। মানব সমাজের বিকাশের প্রথম বিধান ছিল, 'আপনি বাঁচ'; অর্থাৎ নিজের কল্যাণ ভাবনা। পরের যুগে তা হল, নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচার সুযোগ দাও (live and let live); অর্থাৎ অধিকতমের কল্যাণ সাধন; এর থেকেই এসেছে বর্তমানে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব। আর সর্বোদয়-দর্শনে বলা হয়েছে সকলের কল্যাণ, সকলের উদয়ের কথা। কেবলমাত্র নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচাও এ নীতি নয়। সর্বোদয় সমাজের প্রাথমিক বিধান হচ্ছে—সমষ্টির কল্যাণ ভাবনা। সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। অন্য কথায় বলা যায়, আপনার কল্যাণ যেন অপরের হিতের পথে বাধক না হয়। সর্বোদয় সমাজে পৌঁছবার পথ কি হবে? গান্ধীজী বলেন, তা হবে অন্ত্যোদয়। অর্থাৎ সমাজের সব শেষের লোকটির উদয়; বা সর্বহারার উত্থানের মধ্য দিয়েই আসবে সর্বোদয়ের অভিষেক। এই শেষের লোকটির কল্যাণ-ভাবনা হতেই গান্ধীজীর চরকা, গ্রাম-শিল্পের কল্পনা। বৃহৎ পুঁজি বা বৃহৎ যন্ত্রশক্তি গ্রামের নিঃস্ব শিল্পীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় বলেই তাঁর আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা। গ্রামীণ কিষাণ ও শিল্পীকে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার এক বাস্তব কার্যসূচী দিলেন গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কার্যক্রমে। সেই কার্যসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠা।

বলতে পারেন, গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতের স্বপ্ন কি কেবল গ্রাম-স্বরাজের দ্বারা সম্ভব? আধুনিক বৈজ্ঞানিক নগর পরিকল্পনার স্থান কি এতে থাকবে না? কিন্তু তাঁর কল্পিত অহিংস সমাজ যে গ্রামস্বরাজের মধ্যেই সম্ভব একথার ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "আপনারা কারখানা-সভ্যতার উপর অহিংসার সৌধ নির্মাণ করতে পারেন না। তা কেবল স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের দ্বারাই সম্ভব।...আমার ধারণা অনুযায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে শোষণ বর্জন করে; আর শোষণই হচ্ছে হিংসার গোড়ার কথা। অতএব, অহিংস হওয়ার আগে আপনাকে

১. Towards New Horizons—Pyarelal

গ্রামমুখী হতে হবে; এবং গ্রামমুখী হতে হলে চরকায় বিশ্বাসী হতে হবে।"[১] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই চরকা যে মান্ধাতা আমলের হবে এমন কথা গান্ধীজী বলতেন না। যুগোপযোগী প্রগতির সঙ্গে চরকাকে উন্নত ও অধিকতর উৎপাদিকাশক্তি সম্পন্ন করার জন্য গান্ধীজী সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চরকার যে প্রভূত যান্ত্রিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তার প্রমাণ যে কেউ আজকের রাজকোট বা টেক্‌স্‌টুল মডেলের ধাতুনির্মিত চরকার মধ্যেই পাবেন। চরকা হবে বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ শিল্পায়নের প্রতীক। প্রাচীন ভারতের স্বয়ংনির্ভর পল্লীজীবনের সহজ সরল রূপটি গান্ধীমানসকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া অহিংসার বিকাশের সম্ভাবনা তিনি এই গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যেই দেখেছিলেন: "অহিংসার উপরে গড়ে ওঠা সভ্যতার নিকটতম পন্থা হচ্ছে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-গণতন্ত্র।"[২] এই গ্রামসভ্যতার স্বরূপ আমাদের ভালভাবে বিচার করে দেখা দরকার। নচেৎ, শিক্ষিত সমাজে গ্রামীণ সভ্যতা গ্রামীণ অর্থনীতি প্রভৃতি শব্দগুলির উপরে যেন একটা নাকসিটকানি মনোভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্যের শিল্প-সভ্যতার জঠর হতে যে বিশ্বব্যাপী শোষণ, হিংসা ও আর্থিক অসাম্যের প্রবাহ এল, তার পৃষ্ঠভূমিতেই গান্ধীজীর শোষণমুক্ত উন্নত গ্রামীণ গণতন্ত্রের পরিকল্পনা। তিনি যে উচ্চমানের গুণগত সভ্যতার কল্পনা করেছিলেন, সেখানে সমাজের মিলিত জীবনচর্যায় থাকবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস—বুদ্ধি ও শ্রম, ধনী-নির্ধন, ভূমিবান-ভূমিহীন এদের সকলের সহযোগী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে এক সহযোগী সমাজের বনিয়াদ। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষী ও সমাজশাস্ত্রী যেমন, আলডুস্ হাক্‌সলে, আর্থার মরগ্যান, উইলফ্রেড ওয়েলক এবং এমন কি শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড তাঁর "My life and Work" গ্রন্থে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। সেজন্য গান্ধীজী কোন অবৈজ্ঞানিক কথা বলেন নি।

ভারতীয় সভ্যতায় পরিপুষ্ট গান্ধীমানস। স্বভাবতঃ তাই গ্রামস্বরাজের আদর্শে তাঁর আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিস্বরূপ আধুনিক নগর-সভ্যতার বিরোধী হলেও মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের শুভ অবদানকে গান্ধীজী স্বাগত জানিয়েছেন। গান্ধীনীতি বিজ্ঞানবিরোধী নয়। কোন দেশের স্থান, কাল, ভূমি, লোকসংখ্যা প্রভৃতি বাস্তব অবস্থার বিচারে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের দুই দৃষ্টি: সেবামূলক ও

১. হরিজন, ৪.১১.৩৯ ২. হরিজন, ১৩.১.৪০

ধ্বংসাত্মক। ক্লোরোফরমের ন্যায় অশেষ উপকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে কার বিরোধ থাকতে পারে? পারমাণবিকশক্তিকে কল্যাণ ও ধ্বংস এই উভয়বিধ কাজেই নিয়োগ করা যায়। সেজন্য বিজ্ঞানের শুভশক্তিকে মানবকল্যাণে আনাই ছিল গান্ধীজীর যন্ত্রনীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রগতি যখন মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে তা আপামর জনতাকে নির্বিচারে শোষণ করে, গান্ধীজীর আপত্তি সেখানেই। মানুষের স্বাতন্ত্র্য চির-অক্ষুণ্ণ রাখা গ্রামস্বরাজ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থায় গ্রাম হতে কাঁচামাল শহরের কারখানায় গিয়ে তা আবার পুনরায় পাকামালের আকারে ফিরে আসছে গ্রামে। এভাবে এক-মুখী প্রবাহের (One way traffic) ফলে গ্রাম হতে ক্রমে শিল্পব্যবস্থা বিদায় নেওয়ায় শহরগুলি স্ফীতকায় হচ্ছে দিনে দিনে। পরিণামে দেখা দিচ্ছে—গ্রামজীবন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে; আর জনসংখ্যার বিস্ফোরণে শহরজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। অদ্যাবধি যেখানে শতকরা আশীভাগ জনসমষ্টি গ্রামের বাসিন্দা, সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অবহেলা করার অর্থ সমগ্র দেশের অর্থ-নৈতিক বিনাশ। আজ গ্রামের অস্তিত্ব থাকলেও গ্রামসমাজ নেই; গ্রাম-ভাবনা নেই, সেজন্য আজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সুরক্ষিত করার জন্যই গ্রামীণ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের সুসমন্বিত এরূপ সমাজের (Agro-industrial community) একক হবে গ্রাম গণতন্ত্র। এ হবে এক নতুন সমাজ কাঠামোর পিলসুজ যার ওপর গড়ে উঠবে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের সৌধ। বিশ্বের সমাজশাস্ত্রীরাও বর্তমানে এরূপ ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের (face-to-face community) কল্পনা করেন যেখানে সকলের জীবনচর্যায় পারস্পরিক আদানপ্রদান থাকবে। শিক্ষিত সমাজের কাছে গান্ধীজী তাই 'গ্রামে ফিরে যাও' আহ্বান বহুকাল আগেই দিয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই উদ্দেশ্যেই 'অন্নশ্রমের'[১] আবেদনও জানালেন। এই 'অন্নশ্রমের' অর্থ উৎপাদনমূলক শরীরশ্রম। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ বৃহৎ শিল্পকে ছোট ছোট আকারে বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপন করা নয়। এ এক নূতন ধাঁচের শিল্পায়ন। গ্রামীণ গণতন্ত্রের আর্থিক কাঠামো হবে প্রধানতঃ পল্লীশিল্পকেন্দ্রিক। এই পল্লীশিল্পায়নের[২] লক্ষ্য হবে, বর্তমানের কৃষি-নির্ভর পল্লীসমাজকে কৃষি-শিল্প-মূলক সমাজে রূপান্তরিত করা যেখানে কৃষিজ কাঁচামাল সমূহ প্রয়োজন মত

---

১. Bread Labour ২. Rural Industrialisation

উন্নত ধরনের 'মধ্যবর্তীকালীন টেকনলজির' (Intermediate Technology) সাহায্যে গ্রামীণক্ষেত্রেই ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা সম্ভব হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা যে পরিমাণে বিকেন্দ্রিত ও স্বয়ংশাসিত হবে সেই পরিমাণে উৎপাদনজাত সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ না হয়ে সমাজের অধিকাংশের আয়ত্তে এসে পড়বে। ফলে, সংঘর্ষের বদলে সামাজিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। এভাবে গ্রামের উপর শহরের শোষণের আক্রমণ রুদ্ধ হয়ে উভয়ে পরস্পরের সহযোগী হবে। গান্ধীজীর গ্রাম-উদ্যোগ আন্দোলনের এই হচ্ছে মর্মকথা। এই প্রসঙ্গে এক পোলিশ বন্ধু গান্ধীজী সম্বন্ধে একদা বলেছিলেন, "সমাজবাদীদের অপেক্ষা তিনি অধিকতর প্রগতিশীল। কারণ, তাঁরা শ্রমিকদের উপর শোষণের বিরোধী। কিন্তু গান্ধীজী কেবলমাত্র এরই বিরোধী নন, পরন্তু কোন শ্রমিক অপর কাউকে শোষণ করুক, তিনি এরও বিরোধী।"[১]

এখন দেখা যাক, শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ কতদূর সম্ভব ? আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছু পল্লীপ্রান্তে উৎপন্ন করা সম্ভব নয় একথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য সমূহের অনেক কিছু গ্রামীণ কাঁচামাল হতে উৎপাদন সম্ভব। অর্থাৎ, সাধারণ সূত্র স্বরূপ বলা যায় যে, যে দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা জীবনে যত অধিক তার উৎপাদন পদ্ধতিও ততই বিকেন্দ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির রাজ্যেও এই নিয়ম। যেমন, জল, হাওয়া, আলোর ন্যায় জিনিসগুলি সর্বত্র সুলভ। সেরূপ খাদ্যবস্ত্রের ন্যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনও প্রতি পল্লী অঞ্চলে হওয়া বিধেয়। গ্রামস্বরাজের আদর্শে পৌঁছাতে হলে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপাদান জনসাধারণের আয়ত্তে থাকার জন্যই যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত শিল্পব্যবস্থার পরিকল্পনা।

গান্ধীজীর আর্থিক চিন্তাধারায় যন্ত্রের স্থান নিয়ে প্রভূত সমালোচনা হয়েছে। কর্মক্ষম মানুষকে বেকার করে রাখার বিরোধী ছিলেন তিনি। দৈহিক শ্রমে সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত মনে করলেও বৃহত্তম মানব-সমাজকে উন্নত যন্ত্রের দোহাই দিয়ে কর্মহীন করে রাখা চরম অপরাধ। সেজন্য গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল, "আমি যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। শ্রমলাঘবকারী যন্ত্ররূপে যা পরিচিত সেই উন্মত্ততার বিরোধী।...আমি অল্প কিছুর জন্য নয়, বরং সকলের জন্যই সময় ও শ্রম কমাবার পক্ষপাতী।...আজকাল যন্ত্র অল্প

১. হরিজন, ২৯.৮.৩৬

কয়েকজনকে বহুলোকের কাঁধে চড়ে বসার সুযোগ করে দেয়। শ্রম কমাবার কোন সদিচ্ছাবশতঃ নয়, কিন্তু লোভই এর প্রকৃত কারণ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করছি।"[১] যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধী-চিন্তার এ হচ্ছে মৌলিক প্রতিফলন। তিনি প্রধানতঃ কুটিরশিল্পের সমর্থক হলেও সিঙ্গার সেলাই কলের ন্যায় যন্ত্র, যার পিছনে লোভের বদলে প্রেমভাব বিদ্যমান, তাঁর গ্রাম-উদ্যোগ আন্দোলনে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, জনকল্যাণমূলক আধুনিক কালের রেলগাড়ী, জাহাজ, টেলিগ্রাফ, ছাপাখানা প্রভৃতি বৃহৎ যন্ত্রও সর্বোদয় সমাজে অক্ষুন্ন থাকবে। সেজন্য গান্ধীজীর কাছে উন্নত যন্ত্রের স্থানও যেমন আছে, তেমনই ক্ষুদ্র যন্ত্রও অবহেলিত নয়। মানুষের শোষণরূপী যন্ত্র তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, "সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত এমন সকল যান্ত্রিক উন্নতিরই আমি প্রশংসা করি।"[২]

যন্ত্রের ব্যবহার তিনি সীমায়িত করতে চেয়েছেন বলেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় বর্তমানের বহুল উৎপাদনের[৩] স্থলে বহুর দ্বারা উৎপাদন-পদ্ধতির[৪] উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর চরকা ও পল্লীশিল্প এই নূতন শিল্পায়নের প্রতীক। বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টন মূলতঃ স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়ায় সম্পদের সমবণ্টন সম্ভব হয়। আর এর ফলে ক্রমেই সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা শোষণমুক্ত হবার পথে অগ্রসর হতে থাকে। ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগে উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু বণ্টন সুষম না হওয়ায় তাতে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রভূতভাবে যার নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টে। সেজন্য গান্ধীজী এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন, তা অদ্যাবধি প্রণিধানযোগ্য : "উৎপাদন ও বণ্টন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলেই কি আপনি যন্ত্রের বিরোধী ?"

গান্ধীজী—"হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক, আমি বিশেষ সুবিধা এবং কোন প্রকার একচেটিয়া ব্যবস্থাকে ঘৃণা করি। জনতার সঙ্গে যা উপভোগ করা যায় না তা আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। ব্যস, এই যথেষ্ট।"[৫]

স্বাবলম্বন এবং স্বদেশী এই দুই মৌল নীতির উপর নির্ভরশীল অহিংস অর্থনীতি। পরাধীন দেশে স্বদেশী দ্রব্যের আবেদন জনমানসে থাকলেও

১. ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩.১১.২৪
২. হরিজন, ২২.৬.৩৫
৩. Mass Production
৪. Production by the masses.
৫. হরিজন, ২. ১১. ৩৪

স্বাধীন ভারতে আজ তা প্রায় অন্তর্হিত। স্বদেশী-ধর্ম হচ্ছে 'প্রতিবেশীকে ভালবাস' (Love thy neighbour) এই নীতির প্রতিপালন। স্বদেশী ব্রতের লক্ষ্য নয় বিদেশী সব কিছু বর্জন করা। আবার স্বদেশে উৎপন্ন অনেক দ্রব্যের বর্জনও বুঝায়। যেমন, কোনও প্রতিবেশী কলু বা মুচির তৈরি দ্রব্য ব্যবহার না করে শহরের কলে উৎপন্ন তেল বা জুতা ব্যবহার করা স্বদেশী নীতির বিরুদ্ধ। পল্লী শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন করে সমাজে স্বাভাবিক অর্থনীতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা ছিল গান্ধীজীর স্বদেশী ধর্মের উদ্দেশ্য। সস্তার মোহ যেমন স্বদেশী নীতি বিরুদ্ধ, তেমনই অন্ধ জাতীয়তার চীনের প্রাচীর সুলভ মনোভাবও স্বদেশী ব্রতের অর্থ নয়। দেশী পুঁজিপতিদের শোষণও গান্ধীজী সমান অন্যায় মনে করতেন বলেই তাঁর স্বদেশী নীতির আওতায় এরূপ শহরের কলে-তৈরি বহু জিনিসের বর্জন করার কথা বলেছেন অবশ্য যদি তা নিশ্চিতরূপে পল্লীশিল্পীর স্বার্থ বিরোধী হয়। একে তিনি 'ষোল আনা স্বদেশী'[১] বলেছেন। নিকটতম প্রতিবেশীর সেবার দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া স্বদেশীধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

অল্প পরিসর এই নিবন্ধে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শনের সবিস্তার আলোচনা সম্ভব নয়। যান্ত্রিক সভ্যতার এই যুগে এক নূতন ধাঁচের শিল্পায়ন তথা সমাজ-কাঠামোর যে সন্ধান গান্ধীজী দিলেন, তার বিচার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। প্রাচুর্যের মাঝে দৈন্য—এই যুগের এক নিষ্ঠুর সত্য। লক্ষ্মীর বরপুত্র বলে কথিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে এই সেদিনও (২০শে জুন, ১৯৬৮) ৭৫০০০ মানুষের (সাদা ও কালো) যে অভিযান বেরিয়েছিল খাদ্য ও কাজের দাবিতে, তা কিসের ইঙ্গিত দেয়? বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ কানাডার জনসংখ্যা যেখানে মাত্র দুই কোটি সেখানেও ২৫% অধিবাসী সেখানকার জীবনযাত্রার মানদণ্ডে দরিদ্র বলে স্বীকৃত।[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত টেকনলজির দৌলতে সম্পদ বৃদ্ধি পেল ঠিকই। অপরদিকে, সমতার বদলে অসমতাও বৃদ্ধি পেল। এ-যুগের এ হচ্ছে এক মৌলিক সংকট। এই অসঙ্গতি আজ ভারতের শিল্পায়ন অধ্যায়েও প্রকট হয়ে উঠেছে। পরিকল্পনা কমিশনের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, মোট জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশের অধিক অর্থ জনসংখ্যার উপরের দিকের ১০% জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

১. Cent Percent Swadeshi

২. Ref: Khadi Gramodyog, June '68.

ভারতের দরিদ্রতম ১০% অধিবাসী জাতীয় আয়ের ২½% এর কম পরিমাণ অর্থ উপায় করেছে। এদের মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ছিল সাত টাকার কম।[১] গান্ধীজীর কল্পিত অহিংস বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা এই সংকট হতে উদ্ধারের একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পরীক্ষা সাপেক্ষ। তিনি ভারতের মাটিতেই তাঁর এই প্রয়োগ সফল করতে চেয়েছিলেন বলেই গ্রাম-স্বরাজের পরিকল্পনা। এরূপ উন্নত গ্রাম-সমাজকে গ্রাম-গণতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী বলেছেন:

"গ্রাম স্বরাজ সম্বন্ধে আমার কল্পনা হচ্ছে এই যে, ইহা একটি পরিপূর্ণ সাধারণতন্ত্র। মৌলিক প্রয়োজনের জন্য তা প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল নয়। তথাপি অপর অনেক কিছুর জন্য তা পরস্পরাবলম্বী; বিশেষ করে এরূপ নির্ভরশীলতা যখন প্রয়োজন।" গ্রামে বিদ্যালয়, নাট্যশালা, পরিষদগৃহ, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে "সকল কাজই যতখানি সম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।...সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের পদ্ধতি সহ অহিংসাই হবে গ্রাম সমাজের হাতে প্রধান শক্তি।...পঞ্চায়েৎ গ্রামীণ শাসন নিয়ন্ত্রিত করবে যা হবে একাধারে আইন সভা, বিচার ও শাসন পরিষদ।...ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ-গণতন্ত্র এখানে বিরাজ করবে। ব্যক্তিই হবে তার সরকারের স্থপতি। অহিংসা ব্যক্তি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করবে। সে নিজে ও তার গ্রাম বিশ্বের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।" (হরিজন, ২৬. ৭. ৪২)

গ্রামস্বরাজ পরিকল্পনায় বিভিন্ন গ্রামগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন, "অসংখ্য গ্রাম-সমবায়ে গঠিত এই কাঠামোয় ক্রম বিস্তারমান বৃত্ত থাকবে। এখানে জীবনযাপন প্রণালী নীচের তলায় উপরে নির্ভরশীল পিরামিডের শীর্ষবিন্দুর ন্যায় হবে না। সামুদ্রিক বৃত্তের মত তা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হবে যার কেন্দ্রবিন্দু হবে ব্যক্তি; ব্যক্তি সর্বদাই গ্রামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে। আর প্রতিটি গ্রাম অন্যান্য গ্রাম সমবায়ের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত হবে। এইভাবে সমগ্র সমাজ এক অখণ্ড মানব-পরিবারের প্রাণসত্ত্বায় পরিণত হবে। তা পরস্পরের প্রতি আক্রমণমুখী না হয়ে সদা বিনয়ী হবে। অতএব বাইরের পরিধি ভিতরের বৃত্তাংশকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। কিন্তু তা ভিতরের সকলকে শক্তিশালী করে স্বয়ং শক্তিশালী হবে।...কেউ...এই ব্যবস্থার প্রথম বা শেষ থাকবে না।"[২]

১. Jagriti—১৪.২.৬৩

২. হরিজন, ২৮. ৭. ৪৬

অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রাম সুরক্ষিত হবে—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও সুষম বণ্টনের দ্বারা। আর এইভাবে প্রতিটি গ্রাম অপর গ্রাম সমষ্টির সুরক্ষার সহায়ক হবে। এরূপ পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত গ্রামীণ গণতন্ত্রের রূপরেখা গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতের দ্যোতক হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার-গ্রাম সমাজকে 'স্বদেশী সমাজ' বলেছেন। এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত সমাজ সংগঠন বর্তমানে বিশ্বের বৃহদাকার নগর জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। গান্ধীজীর উত্তর সাধকরূপে তাঁর মন্ত্রশিষ্য আচার্য বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলন ভারতের মাটিতে এই নূতন গণতান্ত্রিক কাঠামোর বীজ বপনের কাজে রত। গ্রামদান আন্দোলনের উদ্দেশ্য আত্ম-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম স্বরাজ গঠন করা যেখানে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ সহযোগী জীবনচর্যায় অগ্রণী হয়ে এক নূতন যুগের উদ্‌বোধন করবে।

শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে গান্ধীজির প্রক্রিয়া

ধীরেন্দ্র মজুমদার

আজকের দিনে একটি কথা সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় যে, সমাজ থেকে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হবে। কথাটি সকলে এই জন্যই বলেন যে, এইটিই হল যুগের দাবি। কোন শহরের লোকেদের যদি হঠাৎ দইবড়া খাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তবে দেখা যাবে যে গহনার দোকানেও দইবড়া বিক্রি হচ্ছে। এও হল তেমনি। শোষণের অবসান হল আজকের দিনের আকাঙ্ক্ষা। তাই যাঁরা শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও শোষণহীনতার কথা বলে থাকেন। কিন্তু শোষণ যে কোন্ পথে হয় এবং তার নিদানই বা কী সে সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট নয়। যুগগুরু গান্ধীজি সেটি বুঝতে পেরেছিলেন আর তার প্রতিকারের সঠিক বিধানও তিনি জানিয়েছিলেন।

গান্ধীজি যখন যেখানেই থাকতেন সেখানে সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনা হত। প্রার্থনা শেষে সকলে একাদশ ব্রতের অঙ্গীকার করতেন। এই একাদশ ব্রতের অন্যতম ছিল শরীরশ্রম। অহিংসা, সত্যের মত শরীরশ্রমের প্রতিও গান্ধীজি সমধিক জোর দিতেন। আর সেজন্য তিনি একথাও বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং রমণের মত বৈজ্ঞানিকেরও প্রতিদিন কিছু না কিছু শরীরশ্রম করা উচিত। সুতাকাটার পিছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ থাকলেও গান্ধীজি এটিকে শরীরশ্রমের প্রতীক বলে মনে করতেন। সেজন্য এক সময় খদ্দরের জিনিস কিনতে গেলে অন্তত কিছুটা নিজের কাটা সুতা দিতে হবে, এই নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। দেশে যখন খাদ্যের অভাব তখন তিনি শহরবাসীদের ফুলগাছের টবে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে বলেছিলেন। খাদ্যাভাবের সমস্যা এতে কতটা দূর হবে তা বড় কথা না হলেও গান্ধীজি এর দ্বারা চেয়েছিলেন যে, শহরবাসীরা, যারা কায়িকশ্রমকে হেয় মনে করে তাদের অন্তত কিছুটা পরিমাণেও গায়ে গতরে কাজ করবার অভ্যাস হোক। শুধু তাই নয়, গান্ধীজি মনে করতেন যে, নাগরিকত্ব অর্জনের অন্যতম শর্ত হল শরীর-শ্রম। গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন যে, কায়িকশ্রম না করে যে অন্ন গ্রহণ করে সে অপহরণ করার দোষে অপরাধী। আর এইজন্যই গান্ধীজি

গায়ে গতরে কাজ করে যে কৃষক এবং শ্রমজীবী তাকে তিনি বৌদ্ধিক কর্মরত অন্যান্য তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষের সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে মনে করতেন। গান্ধীজি শরীরশ্রমকে এত যে মূল্য দিতেন তার কারণ হল এই যে, সমাজে মানুষের শোষণ এই শ্রমবিভেদের ফলেই ঘটে থাকে।

একথা প্রায়শই মনে করা হয় যে, ধনী ও দরিদ্র এই দুই নামে তথা পুঁজিপতি ও শ্রমিকরূপে পৃথিবীতে দুটি শ্রেণী বিদ্যমান। উপর উপর দেখলে এই রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শোষণই যদি শ্রেণীবিভেদের কারণ হয় তবে শোষণের সাধনটা কী তা দেখা দরকার। কারো কাছে যদি পুঁজি থাকে কিন্তু বুদ্ধি না থাকে, তবে কি সে শোষণ করতে পারবে? পক্ষান্তরে, কারো কাছে যদি পুঁজি না থেকেও বুদ্ধি থাকে তবে সে সহজেই অপরকে শোষণ করতে পারে। সেজন্য পুঁজিকেই শোষণের একমাত্র মাধ্যম মনে করা ভুল। শোষণের প্রকৃত মাধ্যম হল বুদ্ধি। পুঁজি বুদ্ধিকে কিনে নেয়, কিন্তু শোষণের মূলে থাকে বুদ্ধি। সেজন্য সমাজে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী রূপে যে দুটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তাকেই শ্রেণীবৈষম্যের প্রকৃত রূপ বলে মনে করা উচিত। শ্রেণীবৈষম্যের যে শাস্ত্র অধুনা প্রচলিত তাতে বুদ্ধিজীবীদের শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলে গণনা করা হয়। কিন্তু তা ভুল। কোন শ্রমজীবীকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সে বুদ্ধি চালনা করে উপার্জন করা বেশি পছন্দ করে, না গতর খাটিয়ে, তবে সে অবশ্যই উত্তর দেবে যে, বুদ্ধি চালনাকেই সে পছন্দ করে বেশি। সুতরাং এ দুটিকে একই শ্রেণীভুক্ত করা ঠিক নয়।

কথাটিকে পরিষ্কার করা যাক। মানুষের লোভ কেন্দ্রীভূত যন্ত্রবাদ এবং উন্মত্ত শিল্পবাদের বিস্তার করেছে। কেবল ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যের তৃষ্ণাই নয়, উপরন্তু মানুষের অন্য একটি প্রবৃত্তি যন্ত্রের প্রচার বৃদ্ধি কল্পে সহায়তা করেছে। এর নাম হল শ্রম থেকে বাঁচার প্রবৃত্তি। যন্ত্রের প্রয়োগ করে মানুষ দেখল যে অল্প পরিশ্রমেই অধিক উৎপাদন হয়ে যায়। ফলে এই প্রবৃত্তি মানুষের ভিতর এমন প্রবল তৃষ্ণার সৃষ্টি করেছে যে তারা তাদের সমস্ত বুদ্ধি এরই পিছনে নিয়োগ করা আরম্ভ করেছে।

বস্তুত শ্রম না করার প্রবৃত্তি অতি পুরাতন। ইতিহাসের উষাকালে পারস্পরিক হিংসায় বিব্রত হয়ে মানুষ যখন কেন্দ্রীভূত শাসনের সূত্রপাত করে তখন থেকেই সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের বীজ ব্যপ্ত হয়। শাসক, ব্যবস্থাপক ও

ব্যবসায়ী শ্রেণীর জীবিকা স্বয়ং শ্রম না করে উৎপাদক শ্রেণীর শ্রমের উপর নির্ভর করে চলতে শুরু করে। আপনারা বেড়াল ও বাঁদরের গল্প শুনেছেন। দুটি বেড়াল এক টুকরা রুটি জোগাড় করেছিল। কাছেই ছিল একটি বাঁদর। সে বেড়ালদের রুটি ভাগ করার ব্যবস্থায় লেগে গেল। তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে দেখা গেল যে, বেড়ালদের জন্য আর কিছু নেই। ঠিক এইভাবেই সমাজের বিলিব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ রাজ্য ও রাজার সৃষ্টি করল। অর্থাৎ সমাজে এক বানর জাতির জন্ম হল। রাজ্যের তরফ থেকে সমগ্র দেশের বিলিব্যবস্থা করার অছিলায় এই জাতির সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে মানুষ কলকারখানার আবিষ্কার করে কেন্দ্রীভূত শিল্প গড়ে তুলল। তার ব্যবস্থার জন্যও দরকার হল মানুষের। এই প্রথা প্রবর্তিত হবার আগে সমাজে উৎপাদক ও উপভোক্তা নামে দুটি মাত্র শ্রেণী ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বিতরণের জন্য তৃতীয় একটি শ্রেণীর উদ্ভব হল। অর্থাৎ বিতরক নামে সমাজে এক নবীন বানর শ্রেণীর সৃষ্টি হল। আবার বিতরণের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দেখা দিলে তার যাতে সংশোধন হয় সেজন্য বিতরকদের উপর দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ব্যবস্থাপক শ্রেণীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে পণ্যের যথাযথ বণ্টনের নামেও ব্যবস্থার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবস্থাপক ও বিতরকরূপী বানর জাতি উৎপাদকরূপী বেড়াল জাতির কাঁধে চড়ে বসে আছে। এরা সবাই বুদ্ধিজীবী। এই কারণে মানবজাতি আজ হুজুর ও মজুর নামক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি শোষক অপরটি শোষিত। সুতরাং শোষণের অবসান ঘটাতে হলে এই হুজুর বংশকেই নির্বংশ করতে হবে। তবেই শ্রেণী বৈষম্য দূর হতে পারে।

শ্রেণীহীন সমাজের অর্থ সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এই একটি মাত্র শ্রেণী কোন্‌টি। দেখা গিয়েছে যে, সমাজে মূলত তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান, ধনী, বাবু এবং শ্রমিক। সমাজকে শ্রেণীহীন করতে হলে এই তিনের ভিতর দুটিকে বিলুপ্ত করে একটিকে রাখতে হবে। আবার প্রশ্ন উঠবে, এদের ভিতর কাকে রেখে কাদের শেষ করতে হবে? এর উত্তর স্পষ্ট, যদি একটি মাত্র শ্রেণীকেই রাখতে হয়, তবে সেই শ্রেণী এরূপ হওয়া দরকার যে নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে পারবে। কোন শ্রেণীর নিজের ভরসায় টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই শ্রেণী আপন প্রচেষ্টায় নিজের আবশ্যকতার পূর্তি যেন করতে পারে; অর্থাৎ জীবনযাত্রার

পক্ষে আবশ্যকীয় সামগ্রী তাদের স্বয়ং উৎপাদন করে নিতে হবে। এ ক্ষমতা কেবল শ্রমিক শ্রেণীরই আছে। ধনী এবং বাবু শ্রেণীর অস্তিত্ব তো শ্রমিক-শ্রেণীর শোষণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজের অর্থ হচ্ছে সমাজে কেবল তারাই থাকবে যারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করতে পারবে। এর সরল অর্থ হল এই যে, যারা শোষণের উপর বেঁচে আছে তাদের বিলুপ্ত করে দেওয়া দরকার।

পাশ্চাত্য দেশেও এই রকম শ্রমিকদের শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হতে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টাও করেছেন। শ্রমিকদের দ্বারা হিংসাত্মক উপায়ে ধনী ও বাবুদের নিঃশেষ করার পথে এই চেষ্টা চালিত হয়েছিল। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই দুটি শ্রেণীকে ধ্বংস করে দিলে সমাজে কেবল তৃতীয় শ্রেণীটি অবশিষ্ট থেকে যাবে। কিন্তু এই জাতীয় হিংসাশ্রিত শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণাম কী হতে পারে? এ তো সর্বজনবিদিত যে, হিংসা থেকে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। হিংসা এবং প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাতে মানব সমাজ সদাই ছিন্নভিন্ন হয় এবং সমাজ তার অভীষ্ট সুখ-শান্তির লক্ষ্যে কখনও উপনীত হতে পারে না। সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিলেও এপথে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? হিংসাত্মক উপায়ে কি শোষক শ্রেণীর বিনাশ সম্ভব?

যাঁরা হিংসার পথে শোষক শ্রেণীর বিনাশের পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাঁরা নিজেদের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আকর বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, বিজ্ঞানের প্রথম নিয়মই হল এই যে, 'পৃথিবীতে কোন পদার্থের অবলুপ্তি অসম্ভব।' বস্তুর কেবল রূপপরিবর্তনই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক ইউরোপ উপরোক্ত শ্রেণী দুটিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করার সময় বিজ্ঞানের এই মৌল নিয়মের উপেক্ষা করায় তার পরিণামে এই দুটি শ্রেণীর বিনাশ না হয়ে রূপান্তর হয়েছে। তারা পুঁজিপতির পরিবর্তে ব্যবস্থাপক শ্রেণীর নামে নিজেদের স্থানে আগের মতই সুরক্ষিত রয়েছে এবং এই পরিবর্তন হিংসাত্মক উপায়ে হয়েছে বলে স্বভাবতই তা থেকে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়েছে আর হিংসা প্রতিহিংসার ঘাত প্রতিঘাতে মূল যে উদ্দেশ্য শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা তা স্বপ্ন থেকে গিয়েছে।

একথা তো সত্য যে, আজ শোষক শ্রেণীর কাছেই পুঁজি এবং সুখসুবিধার যাবতীয় উপকরণ রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তা একেবারেই নেই। এ রকম হবার কারণ হল এই যে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাতে সমাজ ব্যবস্থার লাগাম

রয়েছে এবং তারা ব্যবস্থাপনার এমন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে যে, তাতে এই দুটি জিনিস তাদের কাছেই থেকে যায়। সুতরাং শ্রেণীভেদ মেটাবার যে পদ্ধতি তা হিংসাত্মক উপায়ে পুঁজিপতিদের ধ্বংস করার প্রক্রিয়া নয়, তা হল বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের বিচ্ছেদের মূলকে অপসারণ করার প্রক্রিয়া। আর এইটিই হবে শোষণ মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ।

কেবল পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত হবার পথ সমাজবাদীরা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে শোষণের মূল দূর হয়নি। তাতে এই বিপরীত ফল হয়েছে যে, সমাজের সম্পদ সরকার এবং অন্যান্য কেন্দ্রীভূত সংস্থার হাতে চলে যাওয়ায় বুদ্ধিজীবীদের এই সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শ্রমিকদের নাম করে তারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং অধিক পরিমাণে তাদের শোষণ করবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই পথে শোষণের অবসান অথবা শ্রেণীহীন সমাজ গঠন কোনটিই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা পুঁজিপতিরূপী বড় হুজুরের প্রতাপ শেষ করতে পারলেও ব্যবস্থাপক ও বিতরকরূপী ছোট হুজুরদের প্রকোপ তাতে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। দু চারটে বড় হুজুরকে শেষ করে অসংখ্য ছোট হুজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে কী আর এমন লাভ হবে? সুতরাং তার জন্য অন্য পদ্ধতির প্রয়োজন। গান্ধীজি তাই শ্রেণী সংঘর্ষের বদলে শ্রেণী পরিবর্তনের অহিংস পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। শোষকদের তিনি ধ্বংস না করে তাদের উৎপাদক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উৎপাদকদের দ্বারা হিংসাত্মক উপায়ে ধনী ও বাবু সম্প্রদায়ের বিনাশ তাঁর কাম্য ছিল না। বরং তাদের উৎপাদক শ্রেণীতে বিলীন করে দেবার অহিংস প্রক্রিয়াই ছিল তাঁর পন্থা। বস্তুত এই দ্বিমুখী কর্মসূচীর কথা তিনি বলেছিলেন। আজকের যাঁরা ধনী ও বাবু তাঁরা নিজেদের উৎপাদক শ্রেণীতে বিলীন করে দেবেন আর আজকের যাঁরা সমাজ ব্যবস্থাপনায় অনভিজ্ঞ শ্রমিক তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থাপকের যোগ্যতায় উন্নীত করে নেবেন। ফলে সমাজে বুদ্ধিমান শ্রমিকদের একটি মাত্র শ্রেণীই বিরাজ করবে। তাহলে শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে।

ক্ষুরধার পন্থা

অন্নদাশঙ্কর রায়

মা ছেলেকে ভালোবাসেন বলে তার মন্দ কাজকেও ভালোবাসেন না। মন্দ কাজকে ঘৃণা করেন। ছেলেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ তুমি যদি না ছাড়ো তবে আমিই তোমাকে ছাড়ব। তোমার মন্দ কাজের জন্যে তোমাকে সাজা পেতে হবে। তা যদি তুমি না পাও তবে আমিই আমার আপনার গায়ে পেতে নেব সবরকম দুঃখ আর দুর্ভোগ। তা দেখে যদি তোমার শুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায়।

বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে মা তাঁর ছেলের অন্যায়ের প্রতিকার করেন ছেলেকে দণ্ড দিয়ে। যেখানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেখানে আপনাকে অভুক্ত রেখে। যেখানে আরো কঠিন হওয়া দরকার সেখানে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে। কিন্তু ভালোবাসার তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না।

বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই প্রথমত সন্তানের উপর মাতৃহৃদয়ের অহেতুক ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। বিনা শর্তে ভালোবাসা।

দ্বিতীয়ত মন্দের প্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধতা, সংশোধনকামী প্রতিবাদ বা প্রতিকার বা প্রতিরোধ প্রয়াস।

তৃতীয়ত সন্তানকে আঘাত করতে অনিচ্ছা বোধ করলে আত্মনিগ্রহ বা অসহযোগ। ছেলের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনো পদার্থ থাকে তবে মনে লাগবে। ছেলে বুঝবে যে তারই জন্যে তার মা এত কষ্ট পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের জন্যেই। দু'দশ ঘা বেত খেলে সে যা ছাড়ত না মাকে সুখী করার জন্যে তা ছাড়বে।

দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর স্বেচ্ছাদুর্ভোগ।

জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সন্তানের অনিষ্ট কামনা করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামনা করেই।

মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসা যদি অসত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ। সেইজন্যে অহিংসার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তার প্রয়োগকারীর

হৃদয়ে আছে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা সত্যিকার। প্রাথমিক সত্য হচ্ছে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা। তার পরের কথা হচ্ছে অন্যায়কার্যের প্রতি বিরাগ বা বিরুদ্ধতা। শেষ কথা হচ্ছে হিংস্রামিশ্রিত দণ্ডদানে অনিচ্ছা ও অহিংসাত্মক স্বেচ্ছাদুর্ভোগে আগ্রহ।

গান্ধীজীর পূর্বেও নানা দেশে ও নানা যুগে অহিংসার সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে। গান্ধীজীর চেয়ে তাঁরা কেউ কম মানবপ্রেমিক নন। অন্যায়কে তাঁরা অন্যায়ই বলেছেন। কিন্তু তাঁদের অহিংসা অন্যায়কারীকে নিরস্ত করার জন্যে দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ ধারণ করেনি। যদি করে থাকে তো জীবনের ব্রত করেনি।

গান্ধীজীই সেই সাধক যিনি মানবপ্রেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রত্যাঘাতের পথ দিয়ে যাননি, স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বহন করেছেন। তাঁর একমাত্র পূর্বসাধক যীশু। কিন্তু যীশুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ। অহিংস প্রতিরোধ নয়। তা ছাড়াও দু'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। গান্ধীর চেতনায় অন্যায়বোধ একান্ত তীব্র। অন্যায় দেখলেই তাঁর মনে বিরোধিতার ভাব জাগে। সংগ্রাম না করে তিনি শান্তি পান না। অন্তরে আগুন জ্বলতে থাকে। যীশু অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির ও শান্ত।

খ্রীস্টীয় সন্তদের মধ্যেও কেউ কেউ আর সহ্য করতে না পেরে তরবারি হাতে নিয়েছেন। তাঁরা কেবল সন্ত নন, তাঁরা যোদ্ধা। সেই যে যোদ্ধা-সন্তদের ঐতিহ্য সেটাই গান্ধীজীর আসল ঐতিহ্য। শুধু সন্তানকে সাজা দেবার বদলে আপনাকে দুঃখ দেওয়াটুকুই যা তফাৎ।

একদা এটা হয়তো একটা সামান্য তফাৎ ছিল। কিন্তু তরবারি কালক্রমে বন্দুকের রূপ নেয় ও বন্দুক আমাদের কালে পরমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। বিষবাষ্প, ব্যাধিবীজ ইত্যাদি মারণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। যোদ্ধা-সন্তরা কি তা হলে তরবারি ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজাণু বাণ ছুঁড়বেন?

মানবজাতি বেঁচে থাকলে তো মানুষের অন্তঃপরিবর্তন হবে? তা ছাড়া বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা-সন্তদের তরবারির লক্ষ্য হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খ্রীস্টীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হিংসার ব্যবহার নীতিবিগর্হিত না হলেও অহিংসাই উন্নততর নীতি। ভালোবেসে নিজের ছেলেকে সাজা দেওয়া বলতে যখন তাকে মিসিল বা রকেট দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা

বোঝায় তখন সেটা না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্ধীপ্রদর্শিত মার্গই অবলম্বনীয়। খ্রীস্টই যার আদিপ্রবর্তক।

মূল সত্যটা হচ্ছে মানবজাতির প্রতি প্রেম। সে প্রেম যদি সত্য না হয়ে অসত্য হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মানুষকে হত্যা করা আর মন্দ মানুষকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস করা কোনোটাই নীতিবিগর্হিত মনে হয় না। তবে খ্রীস্টীয় সন্তের আদর্শ যে পরমাণু যুদ্ধের দিন ম্লান দেখায় এটাও স্বতঃসিদ্ধ। কোনো প্রকার কূটতর্ক দিয়েই পরকে বা আপনাকে বোঝানো যায় না যে মন্দের উপর ভালোকে জয়ী করাতে হলে মানবজাতিকে সাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য। বলা বাহুল্য ভালো মন্দ উভয়েই জয়ের আগে লয় পাবে।

অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্যায়কারীকে ঘৃণা না করে ভালোবেসে সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্ধীপ্রদর্শিত অহিংস পন্থা। ক্ষুরধার পন্থা। এ পন্থা যারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না। মানুষ যত মন্দই হোক, যত মন্দ কাজই করুক তাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে যদি না পারে তবে গান্ধীজীর অনুসরণ করা নিষ্ফল। অহিংসার বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম।

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরা ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন না। ইংরেজ জাতিকে তাঁরা কমবেশী ভালোবাসতেন। তাঁদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা নামক অভিশাপের বিরুদ্ধে। দীনদরিদ্রের শোষণ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করা নীতিবিগর্হিত নয়। বরঞ্চ সেইটেই হচ্ছে নীতি। কিন্তু মন্দের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে মন্দকে ঘৃণা করতে গিয়ে মানুষকে ঘৃণা করা ও তার অনিষ্ট করা গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগর্হিত। তা যদি তুমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম করলে। তুমিও ভালো থাকলে না।

মন্দের সঙ্গে যারা লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক না কেন মন্দেরই জয় হলো। গান্ধীশিষ্যরা সেরূপ জয় চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইংরেজের চিত্তপরিবর্তন। বহুবার দুঃখবরণের ফলে তাঁরা সেই চিত্তপরিবর্তন ঘটালেন। ইংরেজরা শত্রু না হয়ে বন্ধু হলো। কিন্তু গোড়ায় ভালোবাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রাম-পদ্ধতি হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা হয়তো আসত, কিন্তু বন্ধুতা আসত না। মুখে একটা তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত দুই পক্ষেরই। এক শতাব্দী লেগে যেত তিক্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে।

অহিংসা মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অহিংসার পরীক্ষা। অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার দশ প্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার একমাত্র প্রহরণ ধারণ করা।

গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর হাতে অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি। একই কালে জীবন-দর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি। আমরা তাঁর সমসাময়িকরা ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের অংশভাগী অথবা সাক্ষী।

একথা বলা শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের সকলের অন্তরে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাসা ছিল বা সকলের চেতনায় অন্যায়বোধের তীব্রতা ছিল বা সকলেই তারা মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অপর পক্ষকে সাজা না দিয়ে স্বেচ্ছাদুর্ভোগ বরণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে তারা গান্ধীজীর আদেশে যথাসম্ভব সংযত থেকেছে। অপর পক্ষও মোটের উপর দমননীতির সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। রাশ টেনে ধরেছে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বুদ্ধির ঐতিহ্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস স্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রে ও মর্জিমাফিক বিচারের থেকে আইনসম্মত বিচারে উত্তরণের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। গণতন্ত্র তথা আইনসম্মত বিচার যদি কাম্য হয় তবে ভারতের ইতিহাসে তার বিবর্তন অথবা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নেতারা। শাসকশক্তির দিক থেকেও আনুকূল্য ছিল। কিন্তু আরো জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলণ্ডের জনমত মনঃস্থির করতে গড়িমসি করত। বীরত্বের পরীক্ষা না নিয়ে তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতছাড়া করত না। তা বলে ভারতীয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেও তাদের রুচি ছিল না। গান্ধীজী এটা জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রয় দেননি। দিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো।

সহিংস যুদ্ধের মতো অহিংস যুদ্ধও দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করবে অপর পক্ষও তেমনিটি করবে। কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সময় অহিংস সেনাপতির হাতে। সেইজন্যে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর পক্ষের সেনাপতিও তেমনিটি করবেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে পরিমাণ

সংযত অথচ সংগ্রামরত হয়েছে দেশের শাসকশক্তিও সেই পরিমাণে সাড়া দিয়েছে। সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতো অপরপক্ষের আচরণও ভদ্রতর হতো।

তবে গান্ধীজী তো দুর্ভোগের কমতি চাননি। বরঞ্চ আরো বেশী দুর্ভোগের জন্যে প্রস্তুত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল শুধু এই যে দমননীতির পেষণে অহিংসা যেন হিংসায় রূপান্তরিত না হয়ে যায়। অহিংস সৈনিকরা যেন হিংসায় উন্মত্ত না হয়। তা হলে মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে উভয়পক্ষই মন্দ। উভয়পক্ষই অন্যায়কারী। অবশ্য যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা সমরে তার নজির মেলে। স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে ঐতিহাসিকরা কড়া নজরে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রেও তেমন হিংসা নিন্দিত হয়। গান্ধীজী কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেয়ে উপায়শুদ্ধিকেই মূল্য দিতেন বেশী। ইতিহাসে তিনি একটা নতুন নজির রেখে যেতে চেয়েছিলেন। নীতিশাস্ত্রেও একটি নতুন ধারা যোগ করতে যত্নবান হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যেন তেন প্রকারেণ নয়। শুদ্ধতমপ্রকারেণ। এই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট।

সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবে সেই রামরাজত্ব আসবে এবং আদৌ আসবে কি না যখন মানুষ এতটা আদর্শনিষ্ঠ হবে যে, আর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবকাশ থাকবে না—একথা বলা সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টি বর্তমানে যতদূর যায় তাতে মনে হয় যে, এখনও বহু দিন আজকেরই মত ব্যক্তি-ব্যক্তি, ব্যক্তি-গোষ্ঠী ও এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের কারণ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এবং যতদিন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এই গোষ্ঠীরই সম্প্রসারিত রূপ এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থ-সংঘাতের আশঙ্কাও থাকবে। সুতরাং প্রশ্ন হল এই যে, মানব-সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এই যে স্বার্থ-সংঘাত জনিত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি, কোন্ পদ্ধতিতে এর নিরাকরণ সম্ভবপর ?

স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে আদিম পদ্ধতির কথাই সর্বাগ্রে মনে আসবে। আদিম পদ্ধতি হল হিংসা বা যুদ্ধের। পরিবারের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত বা অপর কারণে মতবৈষম্য হলে দুর্বল পক্ষকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে এবং অল্প বয়স্ক হলে চড় চাপড় মেরে নিরস্ত করা হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মতভেদ ঘটলে লাঠি সোঁটা এবং ঐ জাতীয় অস্ত্রের দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হয় আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হলে হয় যুদ্ধ যাতে সর্ববিধ মারণাস্ত্রের অবাধ ব্যবহার চলে। দ্বন্দ্ব বিবাদের নিরসনের জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পন্থা হল আইন কানুনের। সভ্যতার প্রগতির ফলে মানুষ আর নিজের হাতে আইন তুলে নেয় না, আদালত নামে আখ্যাত এক নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে মানুষ যেখানে উভয় পক্ষের কথা শুনে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি দেখে ন্যায়বিচার করার চেষ্টা করা হয়। নিঃসন্দেহে দ্বন্দ্ব নিরসনের আদিম পদ্ধতির থেকে এ পন্থা শ্রেয়। কিন্তু এরও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমতঃ এই পদ্ধতির কার্যকরিতার গণ্ডি প্রধানতঃ জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ আদালতে সর্বদাই যে "পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়" হবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আদালতকে সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে রায় দিতে হয় এবং এ ব্যাপারে সত্যের চেয়ে তদ্‌বির তদারকের স্থান যে কোন অংশে কম নয় একথা সর্বজনবিদিত। আরও একটি মৌলিক

প্রশ্ন আছে এই পদ্ধতি সম্পর্কে। আদালতের রায় হলেই যে পরাজিত পক্ষ ভাল মনে তা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অবিচারের পথ গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত থাকবে—এর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। ফলে নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট এবং সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা চলবে (এর মধ্যে কত আপিল ও পুনরায় আপিলের ধারা আছে তা বোধহয় শ্রেষ্ঠতম আইনজীবীও জানেন না) এবং পীড়িত পক্ষের ন্যায়বিচার পাবার আশা সুদূর পরাহত হবে। বলাবাহুল্য আদিম পদ্ধতিরও একই পরিণাম—এক যুদ্ধের অবসান অপর যুদ্ধের বীজ বপন করে, ভার্সাই চুক্তি হিটলারের জন্মের কারণ হয়। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সরকারী ভাবে শেষ হলেও বিশ্বের কোণে কোণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে স্বার্থ-সংঘাত জনিত স্থানীয় যুদ্ধ চলেছে তা প্রকৃত্যত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই অবিচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি।

এই কারণেই বহু দিন যাবৎ মানুষ যুদ্ধের একটা নৈতিক বিকল্প খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং সত্যাগ্রহই হল সেই বিকল্প। সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এ নয় যে, এর দ্বারা মানব-সমাজ থেকে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বা সংঘাতের চির অবসান ঘটবে। এসব হয়ত থাকবে। কিন্তু ভালবাসা বা প্রেমবৃত্তির সহায়তায় এইসব দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সংঘর্ষকে সত্যাগ্রহ মহীয়ান করে তুলবে। সত্যাগ্রহ এই অর্থে যুদ্ধের বিকল্প নয়। সত্যাগ্রহ স্বয়ং যুদ্ধ—তবে যুদ্ধের বহুবিধ কুৎসিত ও বীভৎস দিক বিবর্জিত এক মহৎ বা মানবীয় সংগ্রাম-পদ্ধতি।

সকলেই ঈশ্বরের সন্তান বিধায়ে সত্যাগ্রহী বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র মানব-সমাজই এক পরিবার এবং তাই কোথাও কোন মানুষ অন্যায় বা অবিচার করলে তার দায়ভাগী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সবাই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদেরই মত সত্যাগ্রহী মনে করেন যে "অপরাধ" একটা মানসিক অথবা সামাজিক ব্যাধি এবং এই ব্যাধির নিরসনের পথ "অপরাধীকে" দৈহিক শাস্তি দেওয়া নয়, তার মানসিক বা সামাজিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আর এই চিকিৎসার পদ্ধতি হল প্রেম বা ভালবাসা দ্বারা "অপরাধী" বা অন্যায়কারীর হৃদয়-পরিবর্তন করে তার ভিতর এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি করা যার ফলে সে আর অন্যায়ের পথে চলবে না। এইখানে সত্যাগ্রহীর অপর একটি মৌলিক বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহী মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষ মূলতঃ সৎ—অমৃতস্য পুত্রাঃ। স্বার্থ অজ্ঞান ইত্যাদির কারণ তার মনে যে কালিমা পড়ে তার প্রভাবে সে অন্যায় করলেও এই কালিমা বিদূরিত করা মাত্র

সে তার নিত্য স্বভাব—শুদ্ধ বিবেকী রূপে ভাস্বর হবে। এই জন্য আত্মনিগ্রহ বরণ করে সত্যাগ্রহী সাময়িক ভাবে পথভ্রান্ত মনুষ্যের ভিতর প্রেমশক্তির উদ্‌বোধন করেন যাতে তার প্রবাহে সে অসৎ পন্থা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

প্রথমাবস্থায় সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) নামে চললেও এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বহুদিন পূর্বেই সত্যাগ্রহ, অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন, "…নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে দুর্বলের অস্ত্র বলে মনে করা হয়। দুর্বল হিংসার শরণ নিতে অক্ষম বলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় হিংসাকে বর্জন করা হলেও প্রয়োজন পড়লে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী যে এর শরণ নেবেন না তা নয়।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৩-১৯২১) অপর এক প্রসঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবক্তা ইংলণ্ডের শান্তিবাদীদের সম্বন্ধে গান্ধীজী মন্তব্য করেন, "…আমি জানি যে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মহৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আছেন। তবে তাঁরা নির্ভেজাল অহিংসা থেকে পৃথক শান্তিবাদ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। আমি মূলতঃ অহিংস এবং আমি হিংসার যাবতীয় সম্পর্ক বিযুক্ত যুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী। যে ব্যক্তি মূলতঃ অহিংস তিনি এই প্রক্রিয়ার পরিণামের কথা চিন্তা করেন না। আপনারা যেসব ইংরেজ শান্তিবাদীদের কথা বলছেন তাঁরা হিসাব করেন। এবং তাঁরা শান্তিবাদের কথা বলার সময় মনে মনে এই কথা ধরে নেন যে শান্তিবাদ ব্যর্থ হলে সশস্ত্র শক্তির শরণ নেওয়া হবে। তাঁদের কাছে অহিংসা নয়, অস্ত্রই শেষ ভরসা…।" * (হরিজন, ১৪-৫-১৯৩৮)

সুতরাং "সত্যাগ্রহের সঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পার্থক্য উত্তর মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর ব্যবধানের মত। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে দুর্বলের অস্ত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং এতে লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য দৈহিক শক্তি বা হিংসার শরণ নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহ হল সর্বাপেক্ষা বলশালী ব্যক্তির অস্ত্র এবং এখানে যে কোন রূপ বা আকারেই হক না কেন হিংসার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।" (হাণ্টার কমিটির কাছে গান্ধীজীর বিবৃতি থেকে ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৪-১-১৯২০)

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কিন্তু ইংলণ্ড সহ পৃথিবীর আরও বহু দেশে শান্তিবাদীরা অহিংসার আরও অনেক কাছে এসেছেন।

॥ ২ ॥

"সত্যাগ্রহ" শব্দটির আবিষ্কারের পূর্বেই এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার ভারতীয়দের উপর বর্ণবৈষম্যের কারণ যে অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হত তার প্রতিরোধের জন্য এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তত্রস্থ ভারতীয়দের সংগঠিত করে যে অহিংস আন্দোলন গান্ধীজী শুরু করেন প্রথম দিকে তা "প্যাসিভ রেজিস্টান্স" বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এই শব্দটির দ্বারা সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যথাযথ ভাবে অভিব্যক্ত হত না বলে ভারতীয়দের ঐ লড়াই-এর সত্য-স্বরূপ ব্যক্ত করার জন্য একটি নূতন শব্দ সৃষ্টির আবশ্যকতা গান্ধীজী অনুভব করেন।

এসম্বন্ধে তাঁর "আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ" গ্রন্থে গান্ধীজী লিখেছেন, "তেমন নতুন শব্দ কি হইবে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তাই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' পাঠকদের কাছে একটা নাম বাছিয়া দিবার জন্য নামমাত্র পুরস্কার ঘোষণা করিলাম। এই প্রতিযোগিতার ফলে সৎ+আগ্রহ মিলাইয়া 'সদাগ্রহ' শব্দ সৃষ্টি করিয়া মগনলাল গান্ধী পাঠাইয়া দিলেন। তিনিই পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু 'সদাগ্রহ' শব্দকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করার জন্য আমি একটি 'য'-ফলা মধ্যে দিয়া 'সত্যাগ্রহ' এই গুজরাটী শব্দ বানাইলাম ও এই নামেই এই লড়াই পরিচিত হইতে লাগিল।" *(সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ, পৃঃ ৩৩৯, ১৯৪৬ খ্রীঃ সংস্করণ।)

সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করার ব্যাপারে গান্ধীজীর মনোভূমির বনিয়াদ তৈরী করে শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে পঠিত একটি কবিতা যার বক্তব্য ছিল অন্যায়ের বিনিময়ে সদাচার করা বা পুণ্য কর্মের দ্বারা পাপের প্রতিরোধ করা। যৌবনে প্রেম দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধের শিক্ষা তিনি পান বাইবেলের "সারমন অন দি মাউন্টে।" এ ছাড়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা থেকে তিনি আত্মার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অপ্রতিরোধ নীতির প্রবক্তা টলস্টয়, (বিশেষতঃ তাঁর সেই অমর গ্রন্থ "দি কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ") ইংরেজ মনীষী রাস্কিন ও "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স" বা অহিংস আইন অমান্য কর্মসূচির রূপকার আমেরিকার মনীষী হেনরি ডেভিড থোরোর প্রভাব। (অনুমিত হয় স্বয়ং থোরোই আবার উপনিষৎ দ্বারা প্রভাবিত।) যদিও থোরোর রচনা পাঠ করার পূর্বেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই সব বিশ্ব-প্রতিভার সঙ্গমের পরিণাম গান্ধীমনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল—সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধের কর্মসূচি আদৌ গান্ধীজীর মৌলিক আবিষ্কার নয়। মানব-সভ্যতার সমসাময়িক এই কর্মসূচি। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই প্রেমশক্তির প্রয়োগ চিরকালই চলে আসছে। এমন কি পরিবারের বাইরে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগের নিদর্শন ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাল থেকেই পাওয়া যায়। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, মানব-সমাজে প্রচলিত এই শক্তিশালী আয়ুধটির ক্ষমতা উপলব্ধি করে তিনি একে এক বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানের রূপ দেন এবং পজিটিভ বা বিধায়ক প্রেমশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাপক ভাবে এর প্রয়োগের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সত্যের জন্য স্বয়ং নিগ্রহ বরণ করে প্রতিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করার প্রয়াসের আদর্শ নিদর্শন প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস এবং প্যালেস্টাইনের যীশুখ্রীষ্ট। পয়গম্বর মহম্মদের জীবনও বহুলাংশে সত্যাগ্রহ-নিষ্ঠার দ্যোতক। আমাদের ভারতবর্ষেও চৈতন্য মহাপ্রভু এবং মীরাবাঈ এর আদর্শ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহী যিনি সীমিত মাত্রায় ব্যাপক গণ সত্যাগ্রহের প্রবর্তক। নগর সংকীর্তন করার অধিকার রক্ষা করার জন্য চাঁদ কাজীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাঁর নগর সংকীর্তন সংগঠিত করার ঘটনাটি স্মরণযোগ্য। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে অতীতের বিভিন্ন যুগে, বিশেষ করে ধর্ম-প্রবর্তকদের ভিতর এই জাতীয় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নিদর্শন বিদ্যমান।

পুরাতন ধর্মশাস্ত্রেও এজাতীয় বহু উক্তি পাওয়া যায়। উপনিষৎ ও গীতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এর অনুকূল উক্তি আছে। লাওৎসের তাও দর্শনে এবং যীশুপূর্ব ইহুদী ধর্মগ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এবং বিশেষ করে নিউ টেস্টামেন্টে তো নিরস্ত্র প্রতিরোধের এজাতীয় অজস্র উক্তি আছে এবং আমরা পূর্বেই দেখেছি যে স্বয়ং গান্ধীজী কি ভাবে নিউ টেস্টামেন্টের "সারমন অন দি মাউন্ট" দ্বারা প্রভাবিত হন।

পরবর্তীকালে আরও তিনজন মনীষীর রচনায় নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা আত্ম-শক্তির গুণগান পাওয়া যায়। এর প্রথম জন হলেন Etienne de La Boetic মাত্র আঠার বছর বয়সে প্রকাশিত যাঁর "স্বেচ্ছাকৃত দাসত্ব" সম্পর্কিত রচনা (১৫৪৮ খ্রীঃ) এ সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপে স্বীকৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাজনৈতিক-দর্শনের পণ্ডিত উইলিয়াম গডউইনের রচনাতেও (An Enquiry Concerning Political Justice, ১৭৯৩ খ্রীঃ) হিংসার বিরোধীতা

ও সত্যনিষ্ঠার তীব্র আকুতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তৃতীয় জন হলেন গডউইনের আদর্শে প্রভাবিত উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী। ১৮১৯ খ্রীঃ তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের সৈন্যরা আর্থিক অবস্থায় পীড়িত একদল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীর উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করেন। এই ঘটনা অমর কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই কাব্যময় রূপ হল The Masque of Anarchy—সত্যাগ্রহ-মানসিকতার প্রতিফলনের জন্য যা চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। একটু দীর্ঘ হলেও এর কতকাংশের সজনীকান্ত দাস কৃত অনুবাদ (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫১) উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

“তোমরা দাঁড়াও শান্ত ও দৃঢ় মনে
অরণ্যসম নিবিড়, বাক্যহীন,
বুকে বাঁধি বাহু, স্থির দিঠি আঁখিকোণে—
অজেয় মনের অস্ত্র যা চিরদিন।

অত্যাচারীরা পারে যদি, তারো পরে
তোমাদের মাঝে ছুটাইয়া দেয় ঘোড়া,
আসি-কষাঘাতে হত বা পঙ্গু করে—
যা খুশি ওদের, যা পারে করুক ওরা।

বদ্ধ বাহুতে, অপলক দুটি চোখে
থাকিবে না ভয়, জাগিবে না বিস্ময়,
দেখ—যারা রয় নরহত্যার ঝোঁকে,
যাবৎ তাদের ক্রোধ না শান্ত হয়।

লজ্জা মানিয়া সেথা ওরা ফিরে যাবে
যেথা হতে হেথা এসেছিল এককালে,
আজিকার এই নিঠুর রক্তস্রাবে
লজ্জার আভা ফুটিবে ওদের গালে।

জেনো নিশ্চয় এই হত্যার ফলে
এ মহাজাতির হবে নবজাগরণ,

মুখর হইবে মূকেরাই দলে দলে
অগ্নিগিরির শোনা যাবে গরজন।

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ সিংহের মত
কাতারে কাতারে জেগে ওঠ শত শত—
ঘুমের মাঝারে শিকলের ঝন্‌ঝনা
বেড়িয়াছে দেহ, যেন শিশিরের কণা
ঝেড়ে ফেলে দাও, ধর মুক্তির ব্রত ;
তোমরা যে বহু—ওরা শুধু কয়জনা।"

এ তো গেল বিচারধারা অর্থাৎ আদর্শবাদের দিক থেকে সত্যাগ্রহের মূল তত্ত্ব অহিংস প্রতিরোধের নীতির সমর্থনের কথা। বাস্তব কার্যক্রমের দিক থেকেও গান্ধীজীর পূর্বে বহু মনীষী ও জনসেবক যুগে যুগে এর শরণ নিয়েছেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত অহিংস প্রতিরোধের নিদর্শনের সংখ্যা এত অধিক যে, পৃথক ভাবে তার কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনা তাই সংগঠিত অহিংস প্রতিরোধের কয়েকটি কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

এজাতীয় ঘটনার সর্বপুরাতন নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। রোমক সাম্রাজ্যের প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষেরা বহুদিন যাবৎ আর্থিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের শিকার ছিলেন। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২৬০ থেকে ২৪৪ অব্দের মধ্যে প্লেবিয়ানরা এর বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করেন তার ফলে অভিজাত সম্প্রদায়-নিয়ন্ত্রিত সাধারণতন্ত্রকে বহুল পরিমাণ আর্থিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করতে হয়। জেরুজেলামের ইহুদী সম্প্রদায়ও অনুরূপ ভাবে শতবিধ নিগ্রহ বরদাস্ত করেও জেরুজেলামে রোমক সম্রাট ক্যালিগুলার (৩৭-৪১ খ্রীঃ) মূর্তি প্রতিষ্ঠার আদেশের প্রতিরোধ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যের তদানীন্তন রাজার অত্যাচারে পীড়িত হয়ে সমগ্র জনসাধারণ কৃষি করতে বা কর দিতে অস্বীকার করে এবং এই ভাবে রাজাজ্ঞার বিরোধী হবার ফলে তারা জনপদ ছেড়ে দলে দলে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় ; কিন্তু অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করে নি। তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে সাধারণ মানুষের এই অপূর্ব অহিংস সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। অনুরূপ ভাবে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের কৃষকরাও মাইকেল ডেভিটের নেতৃত্বে ইংরেজ জমির মালিকদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বিদ্রোহ

করে ও কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করে। ১৫,০০০ মিলিটারী পুলিস ও ৪০,০০০ সৈন্য নিয়োগ করেও প্রতিরোধের উপশম ঘটান যায় নি। ফ্রান্সিস ডিকের নেতৃত্বে পরিচালিত দীর্ঘ পনের বৎসরেরও অধিক কালের অহিংস আন্দোলনের ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান ফেডারেশানের পত্তন হয় তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস নীতির সার্থক প্রয়োগের এক অন্যতম নিদর্শন। চার্টিস্ট আন্দোলনের সময় থেকে বহু সংখ্যক অহিংস সফল সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে যার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রাশিয়ার ধর্মঘট। আমাদের এই বাঙলা দেশেই বঙ্গভঙ্গের আদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ বিদেশী বয়কট, স্বদেশী ব্রত গ্রহণ, রাখীবন্ধন ও অরন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে তা মূলতঃ অহিংস অসহযোগই ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে বরিশাল কনফারেন্সের সময় বীর কিশোর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের কথাও স্মরণীয়।

এ তো গেল আকস্মিক অহিংস প্রতিরোধের কিছু নিদর্শন যেখানে আদর্শ নেতৃত্ব বা কর্মসূচি—কোন দিক থেকেই অহিংসার পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। অহিংস আদর্শবাদের দৃঢ় বনিয়াদের উপরও সুপরিকল্পিত ভাবে বহু অহিংস প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেছে। এবার তার কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হবে।

ষোড়শ শতাব্দীর দক্ষিণ আমেরিকা। ইউরোপ থেকে অভিযাত্রীরা সঙ্ঘ দলে দলে সেই দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করছেন। স্বভাবতই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের প্রায়ই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে এবং অস্ত্র বলে দুর্বল হবার জন্য আদিম অধিবাসীদের পিছু হটতে হচ্ছে। তবু কোথাও কোথাও তাঁদের প্রতিরোধ হচ্ছে দুর্ধর্ষ। এমনি সময় জনৈক ডোমিনিকান পাদ্রী লাস কাসাস একটি বই লিখলেন। তার নীট বক্তব্য ছিল এই যে লড়াই বা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়, ভালবাসার দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের খ্রীষ্টের পথে আনতে হবে। বলাই বাহুল্য তখনকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ যাঁরা প্রায়ই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে রত থাকতেন, তাঁরা এই পুস্তক রচনার জন্য পাদ্রী লাস কাসাসকে বিদ্রূপ করা শুরু করলেন। অনেকে বললেন যে, গুয়াতেমালার উত্তরের যে অঞ্চলকে শ্বেতাঙ্গরা "যুদ্ধের দেশ" বলতেন সেখানকার শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের যেন-কাসাস তাঁর প্রেমের পন্থায় খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। আদর্শবাদী পাদ্রী অবিশ্বাসীদের এই চ্যালেঞ্জকে সত্য বলেই গ্রহণ করলেন

এবং ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা যে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ শাসকের তরফ থেকে হস্তক্ষেপ হবে না এই প্রতিশ্রুতি পাবার পর উপবাস ও প্রার্থনা করে কাজে নেমে পড়লেন। সহজ সরল ভাষায় খ্রীষ্টের প্রেমের বাণীর ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়ে সুর সহযোগে তা গাওয়া অভ্যাস করলেন এবং বহু প্রয়াসে ঐ "যুদ্ধের দেশের" কয়েকজন বণিকের সঙ্গে পরিচয় করে তাঁদের প্রভাবিত করে তাঁদের সেই খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত শেখালেন। ঐ বণিকেরা দেশে ফিরে যাবার সময় পাদ্রী কাসাসের কাছ থেকে সেখানকার সর্দারদের জন্য কিছু উপহারও নিয়ে গেলেন। বণিকেরা তাঁদের খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতের দ্বারা স্বদেশের সর্দারদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন এবং খ্রীষ্টের প্রেমধর্মের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁদের মাধ্যমে একজন সঙ্গী সহ পাদ্রী কাসাস "যুদ্ধের দেশে" গেলেন এবং ক্রমশঃ নিজ প্রভাবে সেই দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের যুদ্ধদেবতার প্রভাবমুক্ত হয়ে এমন কি নরমাংস ভোজন ছেড়ে দিয়ে আদর্শ খ্রীষ্টান হলেন। এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গেও তাঁদের হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। এইভাবে এক বিন্দু শোণিত পাত ব্যতিরেকেই "যুদ্ধের দেশ" বিজিত হল।

অপর উদাহরণটিও নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানদের কৃতি এবং এর ঘটনাস্থল হল উত্তর আমেরিকার পেন্‌সিলভানিয়া রাজ্য। এখানকার প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক যাঁরা নরহত্যা বা যুদ্ধ করাকে ধর্ম বিগর্হিত ব্যপার মনে করেন। অথচ তদানীন্তন উত্তর আমেরিকাতে এক দিকে স্থানীয় অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধ বিগ্রহ চলত এবং অপরদিকে রাজ্যে রাজ্যে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হত। কিন্তু পেন্‌সিলভানিয়ার উপনিবেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কোয়েকার সম্প্রদায়ের উইলিয়াম পেন্ ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এলম্ গাছের তলে স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার পর থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোয়েকাররা সেখানকার বিধান সভার কর্তৃত্ব ছাড়া পর্যন্ত এই সত্তর বছরেরও অধিক কাল পেন্‌সিল-ভানিয়ার তরফ থেকে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নি। ঐ রাজ্যের কোয়েকার কর্তৃপক্ষ কেবল যে আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যদলের সাহায্যই নেন নি তাই নয়—তাঁরা নিজ রাজ্যে কোন গণ সৈন্যবাহিনী তৈরী করতে অথবা সৈন্য বাহিনীর জন্য কর দিতেও বার বার অস্বীকার করেছেন। অথচ এই সত্তর বৎসরের মধ্যে উত্তর আমেরিকার অন্যান্য রাজ্য ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও অথবা প্রতি-বেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও পেন্‌সিলভানিয়া এর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

কোয়েকারদের এই অহিংস রাষ্ট্র অবশ্য চিরস্থায়ী হয় নি। তবু যে দীর্ঘকাল দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে পেন্‌সিলভানিয়ার কোয়েকার কর্তৃপক্ষ লোক-কল্যাণের কাজ করেছিলেন তার থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে অহিংস সরকার ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আদৌ কবিকল্পনা নয়।

॥ ৩ ॥

বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজী কেবল এযুগের নয়, এযাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী —একথা বলা কোন অযুক্তি নয়। তিনি কেবল সত্যাগ্রহ শব্দটির আবিষ্কার করেন নি, সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞান অর্থাৎ সত্যাগ্রহের উপায়, পদ্ধতি ও কলাকৌশলেরও আবিষ্কার করে তিনি একে এক পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করেন। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহ সংগঠন ও পরিচালনা করে এর সর্ব-শ্রেষ্ঠ প্রায়োগিক রূপকারের গৌরবভাগী হন। এই সব সত্যাগ্রহও আবার বিভিন্ন ধরনের। কস্তুরবার জন্য লবণ ও ডাল খাওয়া ত্যাগ করা বা তাঁকে দামী উপহার নেওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা ইত্যাদি পারিবারিক সত্যাগ্রহের অজস্র নিদর্শনের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায় সার্বজনীক ক্ষেত্রে তিনি বিবিধ প্রকারের সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ (বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে), চম্পারণ, খেড়া বারদোলীর কৃষক সত্যাগ্রহ এবং আহমেদাবাদের শ্রমিক-ধর্মঘটের নেতৃত্ব (আর্থিক অসাম্য নিরাকরণে), অসহযোগ লবণ সত্যাগ্রহ, অহিংস আইন অমান্য, রাজকোট সত্যাগ্রহ ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ (রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য) ভাইকম ও অন্যত্র হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেবার জন্য সত্যাগ্রহ (ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য) কলিকাতা নোয়াখালি বিহার ও দিল্লীর প্রয়াস (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য) ইত্যাদি তাঁর বহুমুখী সত্যাগ্রহ-সাধনার নিদর্শন। গান্ধী-নেতৃত্বে ও আদর্শে পরিচালিত এই সব সাম্প্রতিক সত্যাগ্রহের বিবরণ সর্বজনবিদিত বলে এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তার সবিস্তার বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। তাই কেবল এখানে ঐসব সত্যাগ্রহ-আন্দোলন থেকে সত্যাগ্রহের যে সর্বসামান্য সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তারই উল্লেখ করা হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সত্যাগ্রহী সমগ্র মানব-সমাজের মৌলিক একত্বে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাসী বলে তাঁর কাছে এমন কেউ নেই যাঁর তথাকথিত দুষ্কৃতির জন্য তিনিও সমভাবে দায়ী নন এবং তাই তাঁর প্রক্রিয়া হল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার

নয়, স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণের দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষীয়ের হৃদয় পরিবর্তন করে তাঁকে অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তথাকথিত অন্যায়কারী বিরুদ্ধপক্ষীয়ের প্রতি আন্তরিক প্রেমভাব না থাকলে সত্যাগ্রহ করার কোন অবকাশ নেই। এবং এর থেকে আর একটি কথা স্পষ্ট হয় ও তা হল এই যে, সত্যাগ্রহীর দাবি হবে সুনির্দিষ্ট, একান্ত ন্যায়সঙ্গত ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—আত্মসম্মান বজায় রেখে যাকে আর কমান যায় না। এছাড়া যুক্তি তর্ক আবেদন নিবেদন ইত্যাদি যাবতীয় প্রচলিত বৈধানিক পন্থার শরণ নেবার পরও অভীষ্ট সিদ্ধ না হলে তবেই শেষ কারণ স্বরূপ এই অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

সত্যাগ্রহে কোন গোপনতা বা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের স্থান নেই। এ হল অহিংস পন্থায় পরিচালিত প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সত্যাগ্রহীর ব্যক্তিগত জীবন শুদ্ধ ও নীতিনিষ্ঠ হবে এবং সত্যাগ্রহের অঙ্গ স্বরূপ আইন অমান্য করতে পারেন তিনিই যিনি স্বভাবতঃ আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত। সত্যাগ্রহে ধর্মঘট, হরতাল, পিকেটিং ইত্যাদির স্থান থাকলেও বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখান বা দৈহিক বল প্রয়োগ করে তাঁদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী চলা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার নেই। "সত্যাগ্রহ কদাচ ব্যক্তিগত লাভের জন্য করা চলে না।…শত্রু ভাবাপন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ হিসাবে অনশন করা চলবে না। একমাত্র নিজের আপন জনের বিরুদ্ধে এবং তাও একমাত্র তার মঙ্গলের জন্য অনশন সত্যাগ্রহ করা চলতে পারে" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৬)। "লাঠির দ্বারা আঘাত করতে প্ররোচিত করা বা বাহবা পাবার জন্য দেহে লাঠির আঘাত বরণ করাকে সত্যাগ্রহ বলে না। নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে আঘাত খাবার প্রয়োজন পড়লে তার জন্য প্রস্তুত থাকাকে খাঁটি সত্যাগ্রহ বলে" (হরিজন ৩-৬-১৯৩৯)। "সত্যাগ্রহ হবে সৌম্য, কাউকে এ আঘাত দেবে না। সত্যাগ্রহ ক্রোধ বা বিদ্বেষের পরিণাম হবে না। সত্যাগ্রহ কদাচ বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত, অধৈর্যের দ্যোতক অথবা সোরগোলের ব্যাপার হবে না। কাউকে বাধ্য করার বিপরীত ব্যাপার এ। হিংসার পূর্ণ বিকল্প স্বরূপ এর কল্পনা করা হয়েছে" (হরিজন ১৫-৪-১৯৩৩)।

সত্যাগ্রহের সাফল্য নির্ভর করে নিম্নোদ্ধৃত শর্তগুলির উপর :

"১) সত্যাগ্রহীরা পরস্পরকে বিশ্বাস করবেন।

২) নেতার উপর পূর্ণ আনুগত্য থাকা চাই ; এ বিষয়ে কোন রকম সংশয় থাকা উচিত নয়।

৩) সত্যাগ্রহী সর্বদা সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত থাকবেন। কেবল নিজের ধনসম্পত্তি ও স্বাধীনতা চলে যেতে পারে এমন নয়, তাঁর পরিবারের সবার ধনসম্পত্তিও নষ্ট হতে পারে। সত্যাগ্রহী সানন্দে বন্দুক ও বেয়নেটের সম্মুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকবেন, এমন কি দীর্ঘকাল কঠোর যন্ত্রণা পেয়ে মরতেও তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না।

৪) কি বিরুদ্ধপক্ষ কি সহকর্মী, কারও প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করা সত্যাগ্রহীর পক্ষে অধর্ম।" ('হরিজন ২২-১০-১৯৩৮)

সত্যাগ্রহীর ভূমিকা হল, "বিরুদ্ধ পক্ষ যে ভুল করছেন তা উপলব্ধি করে তাঁকে সেই ভুল বুঝিয়ে দেওয়াই হবে সত্যাগ্রহীর কাজ—সে কাজ কেবল দুঃখ বরণ করেই করা যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে যেখানে বহুদিন থেকে অনাচার চলে আসছে এবং কল্পিত ধর্ম-বিশ্বাস আবার তার সমর্থন যেখানে করে, সেখানে কেবল যুক্তি-প্রয়োগে কাজ হয় না। সে ক্ষেত্রে একমাত্র দুঃখবরণের দ্বারাই কার্য-সিদ্ধি হতে পারে। যুক্তিকে দুঃখবরণের সহায়তা গ্রহণ করতে হয় এবং দুঃখের শক্তিতে যুক্তির পথ সহজ হয়ে যায়। আমাদের চেষ্টায় অপরকে বাধ্য করার মনোভাব থাকলে চলবে না, সত্যাগ্রহীর অধীর হওয়া উচিত নয়—নিজের পদ্ধতির উপর অখণ্ড বিশ্বাস ও ধৈর্য নিয়ে সত্যাগ্রহীকে অগ্রসর হতে হবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৩-১৯২৫)

এছাড়া, "সত্যাগ্রহী সব ভয় পরিহার করেন। তাই বিরুদ্ধ পক্ষকে বিশ্বাস করতেও তিনি ভয় পান না। বিরুদ্ধ পক্ষ যদি বিশ বার তাঁকে বঞ্চনা করেন তবুও সত্যাগ্রহী একুশ বারের বার আবার তাঁকে বিশ্বাস করবেন। সত্যাগ্রহ-ধর্মের মূলে আছে মানবচরিত্রে বিশ্বাস।" (Selection from Gandhi ৫৬৬)

এইজন্য সত্যাগ্রহে কারও পরাজয় নেই। সত্যাগ্রহের পরিসমাপ্তি হয় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা রফা বা আপোস মীমাংসার দ্বারা। কোন এক পক্ষকে শেষ করে দেওয়া বা শেষ হবার কথা এখানে ওঠে না—যদিচ প্রয়োজনে আমৃত্যু সত্যাগ্রহ করার কল্পনাও সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের বহির্ভূত নয় এবং জয়-পরাজয়ের কথা চিন্তা না করে সত্যাগ্রহী শেষ অবধি যা করতে পারেন তাহল আদর্শের জন্ম নিজের প্রাণোৎসর্গ। গান্ধীজী মনে করতেন যে, সত্যাগ্রহে সংখ্যাবল আদৌ বিবেচ্য নয়। একজন মাত্র আদর্শ সত্যাগ্রহী থাকলেও সত্যাগ্রহের জয় অপরিহার্য।

সত্যাগ্রহকে গান্ধীজী সর্বশক্তির সার মনে করতেন। তাঁর কথায় বলতে গেলে, "...নির্ভয়ে এবং দৃঢ় ভাবে আমি এই কথা বলব যে সত্যাগ্রহ প্রয়োগের দ্বারা যেকোন বাঞ্ছনীয় আদর্শ লাভ করা যায়। এ হল উচ্চতম এবং অব্যর্থ মাধ্যম—সর্বাপেক্ষা বলশালী শক্তি।...সত্যাগ্রহ সমাজকে রাজনৈতিক আর্থিক ও নৈতিক—সর্ববিধ পাপমুক্ত করতে পারে" (হরিজন, ২০-৭-১৯৪৭)।

একালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী হলেও সত্যাগ্রহের মত অসীম-বিস্তার বিজ্ঞান সম্বন্ধে শেষ কথা যে গান্ধীজী বলেন নি (এবং কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধেই শেষ কথা বলা চলে না) এই বিনম্র উপলব্ধি গান্ধীজীর ছিল। তিনি তাই স্পষ্টই বলেছিলেন, "সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞান সমগ্র ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ করতে পারি নি। আজও আমি অজানার অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলেছি। যদি এই সত্যের আহ্বান আপনাদের অন্তর স্পর্শ করে তাহলে আসুন, আমার সঙ্গে এই গবেষণায় যোগ দিয়ে সত্যকে প্রকট করুন" (হরিজন, ২৭-৫-১৯৩৯)।

॥ ৪ ॥

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহী জ্ঞানবিশিষ্ট সমালোচক গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহের কার্যকরিতার কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন তোলেন যে, এ পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে কেবল তাঁর মত মহামানবের নেতৃত্বাধীনে। কিন্তু গান্ধী তো কোটিকে গুটিক। তাই সত্যাগ্রহের সর্ব সামান্য প্রক্রিয়া হবার সম্ভাবনা কোথায়? এ সংশয়ের জবাব হল গান্ধী পরবর্তী যুগের গান্ধীজীর নেতৃত্বস্পর্শ-বিরহিত সত্যাগ্রহ সমূহের বিবরণ।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের সমানাধিকার লাভের আন্দোলন। সদ্য পরলোকগত রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর নেতৃত্বে ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টগোমারীতে বিভেদমূলক আচরণের প্রতিবাদে তত্রস্থ নিগ্রোরা যে বাস বয়কটের আন্দোলন শুরু করেন তরুণ ধর্মযাজক মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর নেতৃত্বে তা পূর্ণ মাত্রায় অহিংস সত্যাগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করে। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের সক্রিয় প্রতিবাদ বলশালী হতে হতে অবশেষে বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে দোসরা জুলাই ১৯৬৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক "বিল অফ সিভিল রাইটস" গৃহীত হবার পর তার প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। বলা বাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা এখনও সর্ববিষয়ে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার লাভ করেন

নি এবং মাত্র দশ বৎসরে বহু দিনের এক কুসংস্কারের নিরাকরণ হবে—একথা চিন্তা করাও সমীচীন নয়। অনুরূপ ভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষে আইনতঃ কোন বৈষম্য না থাকলেও হরিজন-সমাজ এখনও সমানাধিকার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক সংবিধানের মূল্য কমে যায় না। সুতরাং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের অহিংস সত্যাগ্রহের মূল্যায়নেও ভুল হওয়া উচিত নয়।

অপর এক দেশের নিগ্রো-সমাজও সম্প্রতি অনুরূপ ভাবে অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সহ তাবৎ অশ্বেতাঙ্গরাই বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কি স্বয়ং গান্ধীজীর সময় এবং কি তারপরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দাদু নাইকার প্রভৃতি ভারতীয়দের নেতৃত্বে তত্রস্থ ভারতবাসীরা অহিংস পন্থায় যে আন্দোলন করেন, স্থানীয় নিগ্রোরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী নূতন মোড় নিল—জুলু উপজাতীয়দের নেতা আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক আলবার্ট লুথুলির নেতৃত্বে তত্রস্থ নিগ্রোরা সরকারের বৈষম্যমূলক আইনকানুনের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গ্রেপ্তার পদচ্যুতি ইত্যাদি চিরাচরিত দমননীতি দ্বারা এই সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের মোকাবিলা করলেও লুথুলি তাতে বিচলিত হলেন না এবং তাঁর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের সমর্থনও বাড়ল ছাড়া কমল না। এর ফলে তাঁরা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সাফল্যজনক বাস বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করলেন যার পরিণামে নিগ্রোদের অহিংস আন্দোলনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে ‘পাশ আইনের’ বিরুদ্ধে নিগ্রো মহিলাদের বিক্ষোভ, পরবর্তী বৎসরে "আলু বয়কট" ও ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে পাশ পোড়ান—এই ভাবে ধাপে ধাপে আন্দোলন এগোতে এগোতে অবশেষে ১৯৬০ খ্রীঃ মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হল শার্পেভেলির সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যা ভারতবর্ষের জালিয়ানওয়ালা-বাগের লজ্জাজনক ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। সরকারের তরফ থেকে এ জাতীয় নিষ্ঠুর আচরণ সত্ত্বেও লুথুলি বা তাঁর সহকর্মীরা অহিংসার কথাই বললেন এবং সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করে লুথুলির নাম শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হল। লুথুলি আজ নেই এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো-সমাজ এখনও পূর্ণ মাত্রায় স্বাধিকার অর্জন করেন নি। কিন্তু যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছেই আজ একথা স্পষ্ট যে আত্মমর্যাদা ও আদর্শের জন্য স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণ

করার ইচ্ছা—স্বাধীনতার এই দ্বিবিধ পূর্বশর্ত আজ ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় সেখানকার নিগ্রো-সমাজের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে।

অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে, হিন্দু ধর্মের শান্তিবাদী পটভূমিকার জন্ম গান্ধীজীর পক্ষে সত্যাগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করা বা ভারতে তাকে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয়েছিল—ভিন্ন ধর্মের পরিবেশে এর সাফল্য সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি যে ইহুদীও খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরা কি ভাবে অতীতে ও বর্তমানে সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও যে সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করেছেন এর বহু নিদর্শন আছে। হজরৎ মহম্মদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে প্যালেস্টাইনের আরবদের মধ্যেও নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় একাধিক নিরস্ত্র প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে। স্বয়ং গান্ধীজী (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১-১৯২২) এ জাতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করেন: "যেসব আরবদের জরিমানা করা হয় সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে থাকে। তাঁদের মাথার উপর বিমান বাহিনী ঘর্ঘর শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এবং সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের গৃহপালিত পশুও তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। পশুগুলিকে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে খাদ্য—এমন কি জল পর্যন্ত বন্ধ করা হয়। বিভ্রান্ত ও অসহায় আরবেরা জরিমানা ও খেসারত নিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের বিদ্রূপ করার জন্মই যেন মৃত ও মরণাপন্ন পশুগুলি তাঁদের ফেরত দেওয়া হল।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান এবং সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খুদা-ই-খিদমতগারের অবদান অতুলনীয়। সীমান্তের পাঠানদের মধ্যে সীমান্ত গান্ধীর প্রভাবে অহিংসার আদর্শ এত প্রবল প্রভাব বিস্তার করে যে, অহিংস আইন অমান্ত আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালাতে ইংরেজ সরকারের চিরকালের অনুগত পাঠান সৈন্যদল অস্বীকার করে যথারীতি শাস্তি গ্রহণ করে। এমন কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খুদা-ই-খিদমত-গারেরা আত্মমর্যাদা ও গণতন্ত্রের জন্ম চরম নিপীড়নের মধ্যেও অপূর্ব অহিংস প্রতিরোধের নিদর্শন পেশ করেছেন। আফ্রিকার সেনেগলে শেখ আমাদো বাম্বা (Amadou Bamba) নামে যে সন্ত পুরুষ অহিংস পন্থায় ফরাসী সামরিক আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিলেন তিনি ও তাঁর প্রায় দশ লক্ষ অনুগামী সকলেই মুসলমান (Pierre Martin-Dumeste, Violence in Africa, Peace News, ২২ সংখ্যা ১৯৬৮)। শিখরা ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত সৈনিক-সম্প্রদায়।

যুদ্ধের মধ্যেই শিখ ধর্মের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি—একথা বলা অত্যুক্তি নয়। কিন্তু সেই শিখ সম্প্রদায়ই ১৯২২-২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের ধর্মস্থানের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্ত তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে যে সাফল্যজনক আন্দোলন করেন তা ছিল সম্পূর্ণভাবে অহিংস।

বলা যেতে পারে যে, সত্যাগ্রহ সফল হতে পারে সেইখানে যেখানে যে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে এ আন্দোলন করা হচ্ছে তারা মোটামুটি গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজের বিধি-বিধান মেনে চলেন। ভারতের ইংরেজ সরকার ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মোটামুটি উদারনীতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানতেন বলেই গান্ধীজী অথবা মার্টিন লুথার কিং-এর পক্ষে অহিংস আন্দোলন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট কমিউনিস্ট অথবা ঐ জাতীয় স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার আওতায় সত্যাগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এজাতীয় সমালোচকেরা ভুলে যান যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী ও তাঁর পরে ভারতীয়দের এবং লুথুলির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ চলে মোটামুটি এক স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষেও গান্ধীজী তাঁর অহিংসা-পদ্ধতিতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার পূর্বে স্বাধীনতাকামীদের দাবির প্রতি ইংরেজ সরকারের যে প্রতিক্রিয়া হত তাও আধা ফ্যাসিস্ট ধরনের। সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি তদানীন্তন সরকারের আচরণ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা এর জলন্ত নিদর্শন। একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াতেই ভারতের ইংরেজ শাসকেরা অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও সংস্কৃতিসম্পন্ন আচরণে অভ্যস্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত ডেনমার্ক ও নরওয়ের শিক্ষক ধর্মযাজক এবং সাধারণ মানুষেরা নাৎসী সরকারের বিরুদ্ধে গৌরবজনক অহিংস প্রতিরোধ করেন। পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে ঘটনার চাপে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্ত অনুষ্ঠিত ঐ উভয় দেশের সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সীমিত গণ্ডির মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে নরওয়ের শিক্ষক-সমাজ ও ধর্মযাজকদের অহিংস প্রতিরোধের কথা উল্লেখযোগ্য—যাঁরা প্রাণ দিয়েও স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস করেন। অমিত শক্তির দম্ভ নিয়েও এবং রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ জয় করা সত্ত্বেও নাৎসী জার্মান বাহিনী ডেনমার্ক ও নরওয়ের স্বাধীনতাকামীদের মনোবল ভাঙতে পারে নি। এমন কি কমিউনিস্ট শাসনের আওতায়ও সত্যাগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার নয়। কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী ইত্যাদিতে গত পনের বছরে যেসব বিদ্রোহ ঘটেছে তার সঙ্গে বহুলাংশে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুক্ত থাকলেও ঐসব দেশের বিদ্রোহে

নিরস্ত্র প্রতিরোধের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী কয়েক দিন দখলকারী চীনা সৈন্যদের প্রকাশ্য চাপ ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে হাজার হাজার নিরস্ত্র তিব্বতী জনতা লাসার নরবুলিংকার প্রাসাদ অবরোধ করে সেখান থেকে দালাই লামার চীনা সৈন্য শিবিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে তাঁর সম্ভাব্য গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এ ঘটনাও কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগের নিদর্শন। কমিউনিস্ট শাসনাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ করার জন্য গত আগস্ট মাসে রাশিয়া ও তার মিত্র রাষ্ট্রবর্গ অতর্কিতে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে তার বিরুদ্ধে চেক্ জনগণ যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ করে প্রথমাবস্থায় তাও ছিল প্রায় সত্যাগ্রহের পর্যায় ভুক্ত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ঘটনা হল ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব জার্মানীর বিদ্রোহের সময় রুশ সরকারের হুকুম অগ্রাহ্য করে সতের জন রুশ সৈনিক ও পদস্থ সামরিক কর্মচারীর আত্মদানের প্রসঙ্গ। পূর্ব জার্মানীতে অবস্থিত রুশ সৈন্যদলকে চরম নিষ্ঠুরতা সহকারে সেই সময়কার জনসাধারণের প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়। এবং দীর্ঘকালের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোঁড়া কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং আদেশ অমান্য করার ফল অবধারিত মৃত্যু জানা সত্ত্বেও চৈতন্যশক্তির প্রতীক ঐ সতের জন কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করেন। অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল রাশিয়ার এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনফের বিজ্ঞানী পৌত্র ও একজন মহিলা সহ অপর চার জন বুদ্ধিজীবী কর্তৃক মস্কোর রেড স্কোয়ারে রাশিয়ার নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং এই "অপরাধে" স্বেচ্ছায় নির্বাসন থেকে শুরু করে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড পর্যন্ত বরণ। কমিউনিস্ট রাশিয়ার ইতিহাসে সম্ভবতঃ শাস্তি পেতে হবে জেনেও বিবেকের নির্দেশে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদের এই ঘটনা অভিনব। এ সব ঘটনা এই সত্যেরই দ্যোতক যে গণতান্ত্রিক অথবা স্বৈরতন্ত্রী—যে শাসনব্যবস্থার আওতাতেই মানুষ থাকুক না কেন, তার সনাতন আত্মা ও বিবেকের আহ্বান অপ্রতিরোধ্য।

গণতন্ত্রপ্রেমীরা বলেন যে ভারতবর্ষের মত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে যখন শাসননীতিকে প্রভাবিত করা ও এমন কি প্রয়োজনে শাসক পরিবর্তন করার অধিকার জনসাধারণের রয়েছে সেখানে সত্যাগ্রহের মত সংসদ-বহির্ভূত পদ্ধতির শরণ নেওয়া কি উচিত? এতে তো গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। সংসদীয় পদ্ধতির

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা যে গৌণতঃ জনপ্রতিনিধি ও মুখ্যতঃ আমলা ও বিশেষজ্ঞদের শাসন-ব্যবস্থা একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের পাঁচ বৎসর অন্তর ভোট দেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ বা তার রূপায়ণে কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারেরও জনস্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে এবং এ যে বাস্তব সম্ভাবনা তা স্বাধীন ভারতবর্ষের বিগত বিশ একুশ বৎসরের ইতিহাসে বার বার চোখে পড়েছে। এই অবস্থায় সংসদে শাসক-দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য সাধারণ মানুষের হাতে প্রতিকার লাভের মাত্র দুটি পথই খোলা থাকে। এক হিংসাত্মক পথে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানান ও এই ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যার বহু দুঃখজনক উদাহরণ আমরা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দেখেছি। এই পদ্ধতিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করলে অপর যে পদ্ধতিটি থাকে তা হল সত্যাগ্রহের পথ। তবে স্বাধীনতার পর স্থানে স্থানে প্রায়ই সত্যাগ্রহের নামে যে দুরাগ্রহের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে এখানে তার সমর্থন করা হচ্ছে না। সত্যাগ্রহের আদর্শ ও বিধি-বিধান মেনে যে অহিংস আন্দোলন করা হয় তার প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এবং এই জাতীয় সত্যাগ্রহ গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে। কারণ অহিংস পন্থায় জনসাধারণের কোন প্রমুখ সমস্যার সমাধান-প্রয়াস করে সত্যাগ্রহ সমাজ থেকে হিংসা ও বিক্ষোভের কারণ দূর করে এবং এই কাজটি সাধিত না হলে পুঞ্জিভূত হিংসা ও বিক্ষোভের বিস্ফোরণে আজ হক অথবা আগামী কাল, যে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অসন্তোষের কারণ বিদূরীত করা অথবা সমস্যার ত্বরিত সমাধান জনগণের স্তরে করার শক্তি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার নেই। তাই সত্যাগ্রহ গণতন্ত্রের পরিপূরক—বিরোধী নয়। এই জন্য আলডুস হাক্সলে তাঁর "বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি" পুস্তকে ঠিকই বলেছেন যে, "…অসহ্য অত্যাচারের কাছে নিষ্ক্রিয় ভাবে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বা বৃথা এর সশস্ত্র প্রতিরোধ করার চেয়ে বস্তুতঃ এর (সত্যাগ্রহ-পদ্ধতির) ফল কিছু খারাপ হবে না। বরং মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে সব দিক থেকে এর ফল অনেক ভাল হবে। যাঁরা সত্যাগ্রহে যোগদান করবেন, যাঁরা দেখবেন এবং অপরের কাছ থেকে যাঁরা এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুনবেন, এঁদের সকলের পক্ষেই এ পদ্ধতি হবে অধিকতর মঙ্গলজনক।"

গ্রন্থপঞ্জী

মো. ক. গান্ধী আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ অনু: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ „ দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ „ „ „
„ „ সত্যাগ্রহ অনু: শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত চম্পারণ সত্যাগ্রহ
আলডুস হাক্সলে Ends and Means
„ „ বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি অনু: শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
আর আর দিবাকর Satyagraha: The Power of Truth
মালফোর্ড সিবলে The Quiet Battle
পিটারিম সোরাকিন The way and Power of love
মার্টিন লুথার কিং Stride towards Freedom
কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী War without Violence
জোয়ান বন্‌ডুরাণ্ট Conquest of Violence
জেনে শার্প Gandhi Weilds the Weapon of Moral Power
নির্মলকুমার বসু Studies in Gandhism
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যাগ্রহের কথা

দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযুদ্ধ

অলকা সেনগুপ্তা

১৮৯৩ সালের মে মাস। বিলেতফেরত এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্যান্বেষণে আমন্ত্রিত হয়ে পৌঁছুলেন নাতালের ডারবান বন্দরে। অজানার আকর্ষণ তাঁর চিরকালের—বিচিত্রে তাঁর অন্তহীন কৌতূহল, চোখে স্বপ্ন। ডারবানে জাহাজেই তিনি একজন ভারতীয়ের প্রতি শ্বেতাঙ্গের বৈষম্য-মূলক আচরণের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এর দিন কয়েক বাদে তরুণ ব্যারিস্টার—যাঁর পরনে বিলাতী পোশাক মাথায় ভারতীয় পাগড়ি—তাঁকে দেখতে পেলাম সেখানকার এক আদালতে যেখানে ইংরেজদের টুপির কায়দায় ভারতীয় পাগড়ি খুলে ফেলতে বলা হয়। অথচ ভারতীয় শিষ্টাচারে উষ্ণীষ যথাস্থানে শোভা পাওয়াই বিধেয়। ভারতের জাতীয় প্রথার বিরোধী কাজ করতে নারাজ তরুণ ব্যারিস্টারের কাছে এখন থেকে তাঁর উষ্ণীষ আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হল। ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া যাবার পথে আবার দেখা হল এই তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে নাতালের রাজধানী মরিৎসবার্গ শহরের একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায়। একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী পুলিসের সহায়তায় তাকে সেই শীতের রাত্রিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিলেন—কারণ একজন ভারতীয়ের প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকলেও শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর সঙ্গে চলার অধিকার তার থাকতে পারে না এই এখানকার প্রথা। তরুণ ব্যারিস্টারকে অবশ্য পেছনের ভ্যান গাড়ী, যাতে করে সচরাচর ভারতীয়েরা যাতায়াত করে থাকে তাতে বসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতিবান্ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত তরুণ মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল—জাতির অপমান, অপমানে লাঞ্ছিত মানবাত্মার ক্রন্দন হৃদয়তন্ত্রীতে সাড়া জাগাল। অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করলেন তিনি, ভাবলেন এর প্রতিকারের উপায় কি!

চলমান ছায়াছবি দেখলাম আবার নিত্য নূতন ঘটনাবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আবার জোহেনস্‌বার্গ যাবার পথে চার্লসটাউনে দেখা গেল একটি যাত্রীবাহ। জুড়িগাড়ীর এজেন্ট একটি যাত্রীকে কিছুতেই গাড়ীর মধ্যে অন্যান্য আরোহীদের সঙ্গে স্থান দিতে নারাজ। অগত্যা যাত্রীটির পীড়া পীড়িতে তাঁকে

গাড়ীর চালকের আসনের পাশের স্থান দেওয়া হল। কিছুক্ষণ বাদে আবার পটপরিবর্তন। এজেন্টটির প্রয়োজন হল ধূমপান করার। এবারে তিনি চালকের আসনের পাশে বসবেন। অতএব যাত্রীটিকে বলা হল পাদানীর ওপর আসন নিতে। আগেকার অপমান যদিও যাত্রীটি হজম করেছিলেন এবারে তিনি আসন ছাড়তে নারাজ হলেন। ফলে এজেন্টের হাতে সর্বজনসমক্ষে তিনি হলেন প্রহৃত। জোহেন্‌সবার্গে যে কোনো হোটেলে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নাতালের চেয়েও ডাচ অধিকৃত ট্রান্সভাল যেন আরও ভয়ঙ্কর। প্রিটোরিয়াতে একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীতেই ভারতীয়দের চলার অধিকার রয়েছে। শান্ত অথচ দৃঢ় এই মানুষটি নীতিগত প্রশ্নে কখনই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। জোহেনস্‌বার্গের স্টেশন মাস্টারকে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিটও কিনলেন। এ যাত্রায় গার্ড প্রথমশ্রেণী থেকে তাঁকে নামিয়ে দিতে চাইলে একমাত্র ইংরেজ সহযাত্রী আপত্তি জানালেন। গার্ড মন্তব্য করলেন কুলীর সঙ্গে চল্‌তে আপত্তি না থাকলে তাঁর আর কি বলার আছে।

প্রিটোরিয়ায় রাত্রি যাপন করবেন কোথায়? তরুণ ব্যারিস্টার যখন নিরুপায় হয়ে ঘোরাফেরা করছেন তখন এক নিগ্রো ভদ্রলোক একটিমাত্র ছোট হোটেলের সন্ধান দিলেন যেখানে ভারতীয় স্থান পেতে পারে। সেখানেও ভোজনাগারে একত্রে বসে খাবার অধিকার ভারতীয়ের ছিল না। তবে শ্বেতাঙ্গদের অনুমোদন থাকায় সাধারণের খাবার ঘরে বসে খাবার মর্যাদা পেলেন আমাদের বর্তমান ছায়াছবির নায়ক।

এই যে প্রতিমুহূর্তের অপমান লাঞ্ছনার চিত্র এটিই সেই সময়ে ভারতীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছিলেন—কারণ দরিদ্র, নিরক্ষর, ভারতবাসী যাঁরা ভাগ্যান্বেষণে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দুটি অন্নের আশায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে মানবিক অধিকারের স্বপ্ন দেখা দুরাশা মাত্র। কাজেই এ ধরনের অত্যাচার সহ্য করা তাঁদের মজ্জাগত ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। তরুণ ব্যারিস্টার তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অনুভূতি-প্রবণতা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিলেন। এখানে আবদুল্লা শেঠের মোকদ্দমা তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর পরবর্তী মিশনের কাজ শুরু করে দিলেন।

তিনি ট্রান্সভালে একটা সমিতি গঠন করলেন। তিনি নিজে ভারতীয়দের

কাজের সহায়ক হবেন একথা বললেন। কিন্তু ভারতীয়দেরও নিজেদের যে তৈরী হতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি ব্যবসায় সততা রক্ষার ওপর জোর দিলেন, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, ভারত থেকে আমদানী করা জাতিভেদ ও ধর্মবিরোধ দূর করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

ভারতীয়রা যেখানে 'কুলী' নামেই পরিচিত সেখানে এক 'কুলী-ব্যারিস্টার' লোকচক্ষুর অন্তরালে শুরু করলেন পরবর্তী সংগ্রামের প্রাথমিক কাজ।

১৮৯৩ সালে ভারতীয় ইতিহাসের এক শুভলগ্নের সূচনাকাল। আকাশে কোনো নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল কিনা জানি না। তবে একথা জানি যে ভারতের দিগন্ত অরুণাভায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন হল সে সময়টার বৈশিষ্ট্য। যে আধ্যাত্মিক ভাব-বন্যায় পূর্বদিগন্ত উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল তার আবেগোচ্ছ্বাস শিকাগোর ধর্মমহাসভায় উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হল এক তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে। অপর দিকে এক তরুণ ব্যারিস্টার উপস্থিত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সমরাঙ্গণে—যেখানে আধ্যাত্মিক অন্বেষার রূপায়ণের পটভূমি প্রস্তুত, যেখানে ধর্মযুদ্ধের প্রথম প্রয়োগ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করল সমষ্টিগত মানুষের ক্ষেত্রে।

'করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে' মন্ত্র 'do or die' ১৯৪২-এর আন্দোলনের নতুন আবিষ্কার নয়। অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি জীবনের প্রথম সংগ্রামের সূচনাতেই। তাই আমরা দেখতে পাই ট্রান্সভালে ভারতীয়দের উন্মূলিত করার উদ্দেশ্যে যে 'ঘাতকী' আইনের প্রবর্তন করা হয় তার প্রতিবাদে ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যে দিনটিকে সত্যাগ্রহের জন্মলগ্ন বলে অভিহিত করা যায় সেদিনকার সভায় গান্ধীজী সুকঠিন এক ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্পই গ্রহণ করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সম্প্রদায়ের সকলকে নিজ ক্ষমতা বিচার বিবেচনা করে এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি বললেন এমন হতে পারে, "কেবল সামান্য সংখ্যক লোক শেষ পর্যন্ত দুঃখতাপ সহ্য করার জন্য রহিয়া গেলেন। তাহা হইলেও আমার চোখের সামনে একটা মাত্র রাস্তা আছে—'আমি মরিব তবু ঐ আইন মানিব না।··· ধরিয়া লউন যে সকলেই ছাড়িয়া গেল, আমি একাই রহিলাম, তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।··· অপরে যাহা কিছু করুক, তবুও নিজে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিব—একথা বুঝিয়া লওয়া চাই।" 'একলা চলোরে' তাঁর জীবন-উষার প্রেরণা—প্রথম দিনেও

যা সত্য ছিল, জীবনের শেষ দিনে তা অগ্নিদহনে আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এ প্রতিজ্ঞার যে এত শক্তি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্তেও গান্ধীজী তা জানতেন না। আর এই যে এক নতুন সত্য জন্ম নিল তার অর্থও তাঁর কাছে সেদিন পরিস্ফুট ছিল না। এ যেন মহর্ষি বাল্মীকির প্রথম কাব্যসৃষ্টি—তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগ-ব্যথার উৎস হতে উৎসারিত। বিরহের করুণ সুর সমগ্র রামায়ণ কাব্যে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত। আর সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের গূঢ়, মৌল যোগসূত্র। গান্ধীজীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলো সত্যাগ্রহের তারে বাঁধা একখানি সুরের ব্যঞ্জনা—নানা অভিধানের একখানি মাল্যসূত্র। অহিংসা যখন সক্রিয় রূপ নেয়, তখন মনের কুঠুরীতে যা সততই আগ্রহ হয়ে বর্তমান তা-ই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সত্যের সঙ্গে আগ্রহ কথাটি জুড়ে দিয়ে সত্যনিষ্ঠ অহিংস প্রক্রিয়া যা আত্মত্যাগ আর প্রেমের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারই সূচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনটিকে গান্ধীজী প্রথমে Passive Resistance—এই নামে অভিহিত করেন। কারণ প্যাসিভ রেজিস্টেন্স-এর সম্পূর্ণ মর্ম তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই নবজাতকের নাম করণ একটা ভাবনার বস্তু হল। অবশেষে ভারতীয় একটি নাম আবিষ্কার করার জন্যে পারিতোষিক দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল। মগনলাল গান্ধীর দেওয়া 'সদাগ্রহ' নামটি বেছে নেওয়া হল। কিন্তু যথার্থ ভাব ব্যক্ত করার শক্তি এ শব্দটির ছিল না। 'সত্যাগ্রহ' কথাটি গান্ধীজী আবিষ্কার করলেন। শান্তি থেকে উৎপন্ন বলের নামে এটি লোকপরিচিতি লাভ করল। সত্যের মধ্যে শান্তিরও সমাবেশ রয়েছে আর কোনও বস্তুর আগ্রহ করলে তাতে বলও উৎপন্ন হয়। সেই হেতু আগ্রহ শব্দের ভিতর বলের সমাবেশ রয়েছে। এখানে বলা বাহুল্য যে সত্যাগ্রহ আর প্যাসিভ রেজিস্টেন্স এক নয়। আন্দোলনের সমর্থক একজন শ্বেতাঙ্গ বলেন "...ভারতীয়দের মতাধিকার নাই, ইঁহারা সংখ্যায় কম, ইঁহারা দুর্বল, ইঁহাদের নিকট অস্ত্র নাই, সেই জন্যেই দুর্বলের অস্ত্রস্বরূপ তাঁরা 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স' অবলম্বন করিয়াছেন।" গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনের এরকম অর্থ শুনে চমকে গেলেন। তিনি বক্তার উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, 'এটি আত্মিক বল। ইংরাজদের মধ্যে দুর্বল পক্ষ প্যাসিভ রেজিস্টেন্স অবলম্বন করেন। এখানে আন্দোলনকারীরা অস্ত্র ব্যবহার করায় অনিচ্ছুক একথা বলা চলে না—পশুবলের প্রয়োগেও বাধা নেই। কিন্তু ভারতীয় আন্দোলনের

কোথাও কোনো অবস্থাতেই পশুবল প্রয়োগের স্থান নাই। সত্যাগ্রহ আত্মিক বল। যেখানে যে পরিমাণে অস্ত্রবল বা শারীরিক বল অর্থাৎ পশুবলের প্রয়োগ হয়, সেখানে সেই পরিমাণে আত্মিকবলের কম প্রয়োগ হয়। এ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি।...প্যাসিভ রেজিস্টেন্সে যেমন প্রেমভাবের স্থান নাই, তেমনি সত্যাগ্রহে বৈরভাবেরও স্থান নাই; বরঞ্চ বৈরভাব পোষণ করাই সত্যাগ্রহের অধর্ম। প্যাসিভ রেজিস্টেন্সে যদি সুবিধা হয় অস্ত্রবল প্রয়োগ করা চলে। সত্যাগ্রহে যদি অস্ত্রপ্রয়োগের খুব উত্তম অবকাশও উপস্থিত হয়, তবু তাহা সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য। প্যাসিভ রেজিস্টেন্স পশুবলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সত্যাগ্রহ অথবা আত্মিকবল এবং অস্ত্রবল একে অন্যের বিরোধী বলিয়া এই বল একসঙ্গে প্রয়োগ করা যায় না। সত্যাগ্রহ প্রীতি-ভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু প্যাসিভ রেজিস্টেন্সের ব্যবহার প্রীতিভাজনদিগের প্রতি করা যায় না। বরঞ্চ যখন প্রীতিভাজনকে বৈরী বলিয়া গণ্য করা হয় তখনই প্যাসিভ রেজিস্টেন্স প্রয়োগ করা চলে। প্যাসিভ রেজিস্টেন্সে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার, যাতনা দেওয়ার কল্পনা রহিয়াছে এবং সেই দুঃখ দিতে গিয়া যদি নিজের দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নাই। সত্যাগ্রহে নিজে দুঃখ সহ্য করিয়া, দুঃখ বহন করিয়াই বিরোধীকে বশীভূত করার ভাব থাকা চাই।"

তবে যীশুখ্রীষ্টকে অনেকে প্যাসিভ রেজিস্টেন্স-এর আদি নেতা বলে গণ্য করেন—এক্ষেত্রে একে সত্যাগ্রহই বলা চলে। ইংরাজী ভাষায় সাধারণ অর্থে কথাটির যে ব্যবহার তার সঙ্গে সত্যাগ্রহ এক নয়।

ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়েরা যে শক্তির প্রয়োগ করেছিল তা ছিল আত্মিক শক্তি—এই সত্যাগ্রহের প্রয়োগ।

এবারে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় কী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করি।

নাতালের কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের প্রয়োজন ছিল ক্রীতদাসের। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ মজুরদের (গিরমিটিয়া) চুক্তির কাল শেষ হওয়ার পর তারা কোনও না কোন একটা কাজ নিয়ে বসে যেতে লাগল যা নাকি নাতালের ঔপনিবেশিকদের পছন্দ হল না। পাছে তারা প্রতিযোগী হয়ে ওঠে সেজন্যে আন্দোলন চলল। ঠিক হল চুক্তিমুক্ত ভারতীয় মজুরদের বছরে মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর দিতে

হবে। স্ত্রী, ষোল বছরের পুত্র আর তের বছরের কন্যা এ থেকে বাদ গেল না। কর দিতে যে এসব দরিদ্র মজুরদের কী কষ্টই না হত তা কল্পনা কর যায় না।

স্বাধীন ভারতীয়দের অবস্থাও প্রায় এক। ভারতীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা ও তার ফলে বিদ্বেষভাব প্রকট হয়ে উঠল। ১৮৯৪ সালে যাতে নাতালের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্ব না করতে পারে তার জন্যে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করে এক বিল পাশ হয়ে যায়। পরে অবশ্য নাতালের প্রায় প্রত্যেকের স্বাক্ষর—১০ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন পত্র-উপনিবেশ মন্ত্রী লর্ড রিপণের কাছে প্রেরিত হয়। তিনি এই বিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এ ধরনের বর্ণভেদ সূচক আইন করায় সম্মতি দিতে পারেন না। এর ফলে নাতাল সরকার আরও দুটি আইন করে অন্যায়ভাবে ভারতীয়দের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ভারতীয়দের প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়।

এ দুটি আইনের একটি দ্বারা ভারতীয়দের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম আইনের ফলে নির্দিষ্ট কর্মচারীর কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে নাতালে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। কার্যতঃ ইউরো পীয়েরা লাইসেন্স পেত, ভারতীয়দের অসুবিধার অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় আইনের ফলে ইউরোপীয় ভাষায় পাশ করা না থাকলে নাতালে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। এ আইনে একটা শর্ত এই ছিল যে, আইন পাশের তিন বৎসর পূর্ব থেকে যারা নাতালে আছে তারা নাতালবাসী বলে গণ্য হবে ও সপরিবারে ভারতে যাতায়াত করতে পারবে।

ট্রান্সভালেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের কোণঠাসা করার জন্যে 'তিন' আইন পাশ করা হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই আইন অনুসারে শেষটায় ধার্য হল যে, প্রত্যেক ভারতীয়কে ব্যবসা করতে হলে তিন পাউণ্ড ফি দিয়ে ব্যবসার অনুমতি নিতে হবে। তারা ইচ্ছামত স্থানে জমি কিনতে পারবেন না। সরকারের ইচ্ছানুসারে কতগুলো গলি বা পাড়ায় ভারতবাসীরা স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। জায়গাগুলো নির্দিষ্ট হত শহর থেকে অনেক দূরে, নোংরা পল্লীতে যেখানে জল, আলো বা পায়খানার ব্যবস্থা থাকত না। আইনের এমনও অর্থ করা হল যে, ভারতীয়রা কেবলমাত্র 'লোকেশনে'ই ব্যবসারও করতে পারবেন। এর ফলে তাঁরা বড় বিশ্রী অবস্থায় পড়েন। বুয়র যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের এমনি অনিশ্চিত ও দীন অবস্থা চলছিল।

ফ্রীস্টেটে দশ বারজন ভারতীয় দোকান খোলা মাত্র সোরগোল পড়ে গেল।

পার্লামেণ্ট কড়া আইন করে ভারতীয়দের বহিষ্কার করল। কোন ভারতীয়ই সম্পত্তি কিনতে পারতেন না বা ব্যবসা করতে পারতেন না। বিশেষ অনুমতি পেলে কোন ভারতীয় হোটেলের পরিচারকের কাজ করতে পারত। বুয়র যুদ্ধের সময় হোটেলের দু'একজন পরিচারক ছাড়া আর কোন ভারতীয় সেখানে ছিল না।

কেপকলোনীতেও ভারতীয় বিরোধী আন্দোলন চলছিল। সেখানে ছেলেরা সাধারণ স্কুলে ভর্তি হতে পারত না, ভারতীয়রা হোটেলে স্থান পেত না। ব্যবসা বা জমি সম্বন্ধে বাধা অবশ্য বহুদিন সেখানে ছিল না।

বুয়র যুদ্ধের আগে যে কোন ভারতীয় যে কোন সময়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে পারত কিন্তু যুদ্ধের পর অনুমতি-পত্র ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সহজেই অনুমতি মিলত। কিন্তু এশিয়াটিক বিভাগের অত্যাচারের ফলে ভারতীয়দের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। এ দিকে ঠিক হল ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয়ের আসা বন্ধ করতে হলে পুরাতনদের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে একের বদলে অপর কেউ প্রবেশ করতে গেলে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। আগে অনুমতি-পত্রে স্বাক্ষর বা টিপসহি নেওয়া হত। এখন নিয়ম হল ফটোগ্রাফ, স্বাক্ষর ও টিপসহি তিনই লাগবে।

এরই মধ্যে নাতালে জুলু বিদ্রোহের সময় গান্ধীজী নাতালবাসীর হয়ে সেবাকার্য চালিয়ে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কাজ শেষ হলে ট্রান্সভালে ফিরে গিয়ে দেখলেন একটি বিল—ঘাতকী আইন—পাশ হয়েছে, যার ফলে ট্রান্সভালবাসী সকল ভারতীয় স্ত্রী, পুরুষ ও আট বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালক বালিকাকে এশিয়াটিক বিভাগে গিয়ে রেজিস্ট্রী করে অনুমতি-পত্র নিয়ে আসতে হবে। পুরোন অনুমতি-পত্র ফেরত দিয়ে নতুন অনুমতি-পত্র নিতে হবে তাতে সব আঙুলেরই ছাপ থাকবে ও দরখাস্তে নাম ধাম জাতি, পরিচয়-চিহ্নের বিবরণ উল্লিখিত থাকবে।

উপরে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে যে সব বিষয় আলোচনা করা হল তা সত্যাগ্রহের সূচনার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পুঞ্জীভূত বেদনা ও দুঃখের বোঝায় ভারাক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাত্মা ভারতীয়দের মধ্য দিয়ে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু মূক মানুষ কীভাবে যে ভাষা পেল এক ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শে, আধমরা দুর্বল মানুষ ক্লৈব্য ত্যাগ করে বীর্যবান হয়ে উঠল এক মহানায়কের সাধনাবলে, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

সংগ্রামের কর্ণধার মহাত্মাকে দেখেছি সত্যাগ্রহের নীতি অনুযায়ী শত্রুকে বারবার বিশ্বাস করে গেছেন যার ফলে সম্প্রদায়ের পাঠান ভাই মীর আলমের লাঠির ঘায়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি। গুরুতর আহত গান্ধীজীর সেবা করে ধন্য হলেন ডোক পরিবার। মীর আলমদের ধারণা হল, যে দৃঢ়তা নিয়ে অনুমতি-পত্র গ্রহণের বিরোধিতার শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা ভুলে গিয়ে এখন জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টার অর্থ গান্ধীজীর দুর্বলতা। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের নায়ক তাঁর বীর সৈনিকদের সামনে এগিয়ে দিলেন না। গুরুতর আহত অবস্থাতেই চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও বললেন, "আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, যদি জীবিত থাকি আর ঈশ্বর করেন, তবে আমিই সর্বপ্রথমে সার্টিফিকেট লইব। সেই জন্যই আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি কাগজপত্র লইয়া আসুন।"

এরই সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উকীলকে টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, তিনি মীর আলমকে অপরাধী মনে করেন না।

অবশ্য এর পরের ঘটনা আমাদের অজানা নয়। জেনারেল স্মাটস তাঁর কথা রাখেন নি। সুতরাং আবার সভা ডেকে ভারতীয়েরা ঘটা করে সার্টিফিকেট-গুলোর বহ্ন্যুৎসব করলেন।

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল।

ধীরে ধীরে আমরা দেখেছি সত্যাগ্রহের পরিধি বেড়ে গেছে। অনিবার্য কারণে নেহাৎ যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে গান্ধীজী বিরোধী পক্ষকে বিপর্যস্ত করতে চান নি।

সত্যাগ্রহের দাবি গিয়ে দাঁড়াল শেষটায় এ-রকম :

১। তিন পাউণ্ড কর রদ করা ;

২। হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মানুমোদিত বিবাহ আইন সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা ;

৩। শিক্ষিত ভারতবাসীর এদেশে প্রবেশাধিকার ,

৪। অবেক্সিয়ার সম্বন্ধে যে শর্ত আছে তা পরিবর্তন করা এবং

৫। বর্তমান আইনগুলির ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ হওয়া চাই, যাতে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের ক্ষতি না হয়।

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের প্রতিপদক্ষেপে নীতির বিশুদ্ধতা, উদ্দেশ্য আর উপায়ের শুদ্ধতায় যাঁরা আন্দোলন-বিরোধী তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছেন। দলে দলে ইউরোপীয়রা পর্যন্ত গান্ধীজীর আন্দোলনকে করেছেন সমর্থন। কত বিদেশিনী

বালিকা, শ্বেতাঙ্গ পরিবার গান্ধীজীকে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। কলেনবেক তো ছিলেন গান্ধীজীর টলস্টয় ফার্মের স্তম্ভ বিশেষ। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' সত্যাগ্রহীদের ভাবধারাকে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত করে জনমত তৈরি করেছে। এসব আত্মত্যাগী বিদেশী যাঁরা ভারতীয়দের সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন তাঁদের স্থান নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাসে বোধহয় এর নজীর মেলে না যে, সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে লক্ষ্য শুধুমাত্র দাবিপূরণ নয়—যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আত্মিক বলে তাকেও টেনে তোলা।

সচরাচর আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিপক্ষ যখন দুর্বল—সেই মুহূর্তে বলপ্রয়োগে তাকে নত পরাস্ত করা। কিন্তু গান্ধী-নীতি সম্পূর্ণ পৃথক। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী প্রতিপক্ষের দুর্বল মুহূর্ত আঘাতের উপযুক্ত ক্ষণ বলে গ্রহণ করেন নি। হয়তো আপাতঃদৃষ্টিতে কোথাও পরাজয় মনে হয়েছে কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেছে তাঁর নীতিরই জয়। এখানেই গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য। এমনকি যে জেনারেল স্মাট্‌স এক সময় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার শিষ্টাচার পর্যন্ত রক্ষা করেন নি, পত্রোত্তরের ধার ধারেন নি এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাঁকে যখন ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম শেষে গান্ধীজী সে দেশ ত্যাগ করেন, তখন বন্দী অবস্থায় তাঁর হাতে তৈরি এক জোড়া চটি উপহার দেবার জন্যে হেন্‌রী পোলক আর শ্লেজিনকে বলে যান। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর সপ্ততিম জন্ম-বার্ষিকীতে তাঁর বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে জেনারেল স্মাট্‌স ভারতে তা পাঠিয়ে দেন এই কথা বলে :

"I have worn these sandals for many a summer since then, even though I may feel that I am not worthy to stand in the shoes of so great a man."

এখানেই সত্যাগ্রহের জয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ যুদ্ধ আট বৎসর ধরে চলেছিল। পরবর্তীকালে ভারতে বিরামগ্রাম, ভারতীয় ইমিগ্রেসান বা বিদেশ বসতির আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ, তারপর চম্পারণের যুদ্ধ, খেড়ার যুদ্ধ, রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পাঞ্জাব ও খিলাফৎ অবিচারের প্রতিবাদ, অসহযোগ আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব—সবই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের এক একটি ধাপ। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এইখানে যে, গান্ধীজীর জীবনব্যাপী সংগ্রামের প্রথম প্রেরণা ও প্রয়োগক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

গান্ধীজী তাঁর গীতাভাষ্যে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে মানবের হৃদয়ক্ষেত্রের সঙ্গে

তুলনা করেছেন। মানুষের সুরাসুর বৃত্তির মধ্যে যে, প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলছে হৃদয়ক্ষেত্রে আত্মিকবলের সাহায্যেই সেখানে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় প্রতি মুহূর্তে। সত্যসন্ধীর একমুহূর্তও অসতর্ক হলে চলবে না। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব পুস্তক পাঠ করেন তার মধ্যে গীতা, বাইবেলের সারমন অন দি মাউণ্ট, টলস্টয়ের কিংডম্ অব্ গড্ ইজ্ উইদিন ইউ, থোরোর সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটা বিজ্ঞানী-মন প্রতিনিয়ত তাঁর প্রিয় নীতিগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত সত্যগুলো তিনি যাচাই করে নিয়েছেন। তাই দেখি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সাথে সাথে তাঁর ফিনিক্স আশ্রম আর টলস্টয় ফার্মে চলেছে প্রস্তুতিপর্ব জীবন যাপনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, শরীরশ্রম, স্বদেশী, সর্বভূতে সমদৃষ্টি—সবই তাঁর জীবনধারণের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত। টলস্টয় ফার্মের জীবনযাত্রা, শরীরশ্রমের মধ্য দিয়ে উৎপাদন, গৃহ-নির্মাণ, রন্ধন, সকলে সমান ভাবে ভাগ করে সুখদুঃখের অংশভোগ—সবকিছু আত্মবলে বলীয়ান্ সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক করে তৈরি করেছিল সেখানকার বাসিন্দাদের।

গান্ধীজী বলেন, "সত্যাগ্রহ স্বচ্ছন্দলব্ধ, উহা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। সত্যাগ্রহ নীতির ভিতরেই এই গুণটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যে ধর্মযুদ্ধের মধ্যে গুপ্ত কিছুই নাই, যেখানে চালাকী খাটাইবার কোনও অবকাশ নাই, অসত্যের স্থান নাই, এমন যুদ্ধ অযাচিতভাবেই আসিয়া পড়ে এবং ধর্মাচরণকারী সর্বদাই এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে যুদ্ধের জন্য পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়, তাহা ন্যায়ানুমোদিত যুদ্ধ নহে। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের পরিকল্পনা ভগবান স্বয়ং করেন এবং তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের নাম লইয়া কেবল ধর্মযুদ্ধই করা যাইতে পারে এবং যখন দেখা যায় যে, সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বনও শেষ হইয়াছে, সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল নিরুপায় হইয়াছে, যখন সে চারিদিক অন্ধকার দেখে, তখনই ঈশ্বরের কৃপা উদ্ধারার্থে আবির্ভূত হয়। যখন কেহ নিজেকে পথের ধূলির অপেক্ষাও অসহায় ও ক্ষুদ্র মনে করে, তখনই ঈশ্বর সাহায্য করেন।"

তাই দেখতে পাই 'ঘাতকী' আইন রদের আগে মিটমাটের যে আশ্বাস পেয়েছিলেন জেনারেল স্মাট্সের দিক থেকে সেখানে সম্প্রদায়কে প্রতিকূলাচরণ করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন তিনি এই বলে যে, "একটা যুক্তি আছে যে, যতক্ষণ না ঐ

আইন রদ হইতেছে, ততক্ষণ আমরা অস্ত্রত্যাগ করিব না। ইহার উত্তর সহজ। সত্যাগ্রহী তো ভয়কে দূর করিয়া দিয়াছে। সেইজন্ত সে বিশ্বাস করিতে কখনো ডরায় না। সে বিশবার বিশ্বাস করিলেও যদি শত্রু বিশবারই তাহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া থাকে, তবুও একুশ বারের বারও সে তাহাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সত্যাগ্রহী বিশ্বাসের দ্বারাই নিজের পথে থাকিতে পারে।"

গান্ধীজী তাঁর সংগ্রামের চরম অবস্থায়ও কখনও বিরোধীপক্ষকে অসুবিধায় ফেলতে চান নি। সবসময়ই মিটমাটের পথ খোলা রেখেছেন। আজকাল যে সব ধর্মঘট করা হয় সেখানে বহু অনিচ্ছুক মানুষকে ভয় দেখিয়ে আন্দোলনে নামান হয়। তাদের পরিবার বা ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন তো করানোই হয় না বরং মিথ্যা আশার জাল বুনে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়। আর কার্য-কালে দেখা যায় নেতা আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না, সাধারণ দরিদ্র মানুষের মাথার উপর দণ্ড উদ্যত।

কিন্তু সত্যাগ্রহে আমরা দেখেছি যখন ভগ্নীদের ডাকে হাজারে হাজারে মজুর কয়লাখনির কাজ ছেড়ে নিউক্যাস্‌লে আন্দোলনে যোগ দিল তখন গান্ধীজী মজুরদের বলে দিলেন যে, এ হরতাল বহুদিন স্থায়ী হবে কাজেই মালিকদের বাড়ীঘর ছেড়ে, বেচার মত জিনিসপত্র বেচে ফেলে আন্দোলনে যোগ দিব। আসার সময় পরবার কাপড় আর কম্বল ছাড়া কিছু আনবে না। আর যতদিন জেলের বাইরে তারা থাকবে ততদিন তিনি সঙ্গে থাকবেন ও তাদের খাওয়াবেন। এ শর্তে যে আসতে পারবে না সে যেন কাজে ফিরে যায়। তাকে সেজন্ত কেউ তিরস্কার করতে পারবে না, বিরক্তও করতে পারবে না। ধর্মযুদ্ধের এই হল বৈশিষ্ট্য।

নিউক্যাস্‌ল থেকে ট্রান্সভালের সীমানা ৩৬ মাইল। পাঁচ হাজার লোক নিয়ে অধিনায়ক গান্ধীজী মহা-অভিযান শুরু করলেন। তাঁরা পায়ে হেঁটেই চললেন। এখানেও মজুরদের বলে দিলেন—যাদের স্ত্রীপুত্র রয়েছে হৃদয় কঠিন করা ছাড়া উপায় নেই। এখনও যারা ফিরে যেতে চায় যেতে পারে। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চাইল না।

আন্দোলনের ফলে খনির মালিকদের ওপর কিছু প্রভাব পড়ল। সত্যাগ্রহীর নম্রতার সীমা নেই। তাই গান্ধীজী মালিকদের কথামত মিটমাটের ব্যাপারে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধীজী বললেন যে, খনির মালিকদের হাতেই হরতাল বন্ধ করার উপায় রয়েছে। তাঁরাই সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব ঠিক করতে পারেন।

নিউক্যাস্‌ল-এ ফিরে গান্ধীজী লোকদের জেলের দুঃখের কথা বললেন তারা কিন্তু অটল, অবিচল—"আপনি যতদিন লড়াই করিবেন আমরা হটিব না।"

পথে হয়তো কখনও ডাল ভাত, বা রুটি জুটতো। কখনও খাদ্যবস্তু কম পড়ে যেত। ভাল মন্দর সব ভার গান্ধীজী নিজে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী পরিবেশন করছেন—শেষটায় ভগ্নীদের বেলায় হয়তো কম পড়ে গেল। ক্ষুধার্ত মানুষ তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। গান্ধীজী বলতেন, "আমি নিরুপায়। রান্না কম আছে, লোক হইয়াছে। যাহা আছে তাহাই ভাগ করিয়া দিতেছি।" তারা এতে গান্ধীজীর অবস্থা বুঝে সন্তোষের সঙ্গে আহার করত।

এমনি কতশত ঘটনা। হাজার হাজার লোকের অভিযানেও গান্ধীজী নৈতিকতার এবং পরিচ্ছন্নতা-বোধের শিক্ষা দিয়ে গেছেন প্রতিনিয়ত এবং ভারতীয়েরা কোনো অঞ্চল মলমূত্রের দ্বারা অপরিচ্ছন্ন করে তোলে নি এ যাত্রার সময়।

যাত্রার সব প্রস্তুত। তবু গান্ধীজী আবার প্রিটোরিয়ায় টেলিফোন করে জানালেন যে, জেনারেল স্মাট্‌স যদি তিন পাউণ্ড কর রদ করার কথা দেন, তবে যাত্রা আরম্ভ করা হবে না। জবাব এল, "জেলারেল স্মাট্‌স আপনার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না, আপনার যাহা খুশি করিতে পারেন।"

ট্রান্সভাল প্রবেশের পূর্বেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল—আবার তাঁর জামিনে মুক্তিও হল। সংগ্রাম তো চলতেই থাকল—দলে দলে সব জেলে গেল। কিন্তু আকাশ যেখানে ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে কর্তৃপক্ষ আর কত অন্যায় করতে পারেন?

এর পরের ঘটনাবলী সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয়ের কাহিনী। ভারতের নেতা গোখলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা-প্রবাহের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। গান্ধীজী ১৮৯৪ সালেই নাতালের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে এবং ভারতে ও বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুস্তিকার মাধ্যমে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। যার ফলে আমরা দেখেছি নাতালের গোরাদের হাতে দ্বিতীয় বার ডারবানে ফিরে এলে গান্ধীজীকে কীভাবে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। সত্যাগ্রহের প্রভাব তো সরকারের উপর পড়েই ছিল, দেশ-বিদেশের জনমত ও সত্যাগ্রহীদের অনুকূল হওয়ায় অবশেষে সরকার তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা বিচারের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করল। শেষ অবধি সেই কমিশন সত্যাগ্রহীদের সব দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করল। এখন সত্যাগ্রহীদের দাবিও সরকারের দিক থেকে মেনে নেওয়া হল।

গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পরিণতির বিষয়ে বলেছেন, "এই যুদ্ধের যেরূপ সুন্দরভাবে অবসান হইয়াছিল আজ তাহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার এখনকার ভারতীয়দের অবস্থা তুলনা করিলে একটা কথা মুহূর্তের জন্য মনে হইতে পারে যে, সত্যাগ্রহের জন্য এত দুঃখ ত সহ্য করা গেল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল। সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এখানে ইহার উত্তর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। সৃষ্টির একটি নিয়ম এই যে, যে জিনিস যে উপায়ে পাওয়া যায় সে জিনিস সেই উপায়েই রাখা যায়। সেইজন্য দণ্ড দ্বারা লব্ধ বস্তু দণ্ড দ্বারাই রাখা যায়, সত্য দ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য দ্বারাই রাখা যায়। সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা আজ যদি সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের ব্যবহার করে, তবে নিজেকে সুরক্ষিত করিতে পারে। সত্যাগ্রহের এ প্রকার বিশেষত্ব নাই যে, সত্য দ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য ত্যাগ করিলেও রক্ষা করা যায়।

"অবশেষে পাঠকগণ একথা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, যদি এই মহাযুদ্ধ না হইত এবং বহু সংখ্যক ভারতবাসী যে দুঃখ সহ্য করিয়াছেন তাহা যদি না করিতেন, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা থাকিতেই পারিতেন না।"

এই যুদ্ধের ফলে অন্যান্য স্থানের প্রবাসী ভারতবাসীরাও অল্পবিস্তর বেঁচে গেছেন। "সত্যাগ্রহ অমূল্য অস্ত্র, ইহাতে নিরাশার অথবা পরাজয়ের স্থান নাই।"

সত্যাগ্রহের আলো

জ্যোতিষচন্দ্র রায়

গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ভারতে স্বাধীনতালাভের জন্য ১৯১৯ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত যে সংগ্রাম চলিয়াছিল জগতের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব। মানবসমাজের ইতিহাসে এই ধরনের সংগ্রাম আগে কখনও দেখা যায় নাই। এই রক্তপাত-বিহীন বিপ্লবপ্রচেষ্টা যে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এই সংগ্রাম মূলত এক অভিনব পদ্ধতিতে চলে ও তাহাতেই সাফল্য-মণ্ডিত হয়। গান্ধীজী এই পদ্ধতির নাম দেন সত্যাগ্রহ। মুখ্যত সত্য ও অহিংসার উপর ইহার নির্ভর। সকল রকম ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াও সর্বশক্তি দিয়া অন্যায়কে অস্বীকার করা এই সংগ্রামের প্রাণ, এবং মনে বা হৃদয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব না রাখিয়া সদিচ্ছার ভাব পোষণ করা এই সংগ্রামের কৌশল। এই পদ্ধতির কথা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম গান্ধীজীর মনে উদয় হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া সেখানে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়া গান্ধীজী এই পদ্ধতিতে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

দেশে থাকিতে ব্যারিস্টার গান্ধীকে রাজকোটে ইংরেজ পলিটিকাল এজেন্টের অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। গান্ধীজীর হিতৈষী দেশের বড় বড় লোকেরা সে অপমান হজম করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। সেদিন প্রতিকারের কোন উপায় তাঁহারা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। গান্ধীজীও কিছুই ভাবিয়া পান নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দিতে না দিতেই মর্মান্তিক ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া গান্ধীজী উপলব্ধি করিলেন, সেখানে ভারতীয়দের মনুষ্যত্বের কোন সম্মানই দেওয়া হয় না। রাজকোটে পলিটিকাল এজেন্টের নিকট যাহা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এখানে তাহা জাতিগত অপমানের ব্যাপার হইয়া দেখা দিল। মক্কেলের কাজে গান্ধীজী রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। শীতের রাত্রি। মাঝপথে এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর জায়গা করিয়া দিবার জন্য এক রেলকর্ম-চারী পুলিস ডাকিয়া জিনিসপত্রসমেত গান্ধীজীকে টানিয়া নামাইয়া দিল। গান্ধীজীর আপত্তিতে দৃকপাতমাত্র করিল না। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গান্ধীজী সারারাত অন্ধকার ওয়েটিংরুমে কাটাইলেন। কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। গান্ধীজী

লিখিয়াছেন, "ঘরে আর একজন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। আমার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। কি করি, ভাবিতে লাগিলাম। আমি কি দেশে ফিরিয়া যাইব, না, কপালে যাহাই ঘটুক, ভগবানের নাম লইয়া আগাইয়া চলিব? আমি নিগ্রহ সহ্য করিয়াও সেখানে থাকিব, ইহাই ঠিক করিলাম। সেইদিন হইতে আমার জীবনে ব্যবহারিক ভাবে অহিংসার প্রয়োগ শুরু হইয়া গেল।"

গান্ধীজী নিরীহ শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব পরিবেশে জন্মিয়াছিলেন ও মানুষ হইয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া কখনও অন্যায়কে সহ্য করিয়া লইতে বা অন্যায়ের সঙ্গে কোন রকম রফানিষ্পত্তি করিয়া চলিতে শেখেন নাই। তাঁর শান্তিপ্রিয়তা বা অহিংসপ্রীতি নির্বীর্যতার বিকল্প বা নামান্তর ছিল না। অসহায় উপদ্রুত মানবের অক্ষমতা জনিত ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাবকে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিবার মতলবও তাহাতে কিছু ছিল না। তিনি নিজে তো কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ব্যক্তিগত ভাবে অন্যায়-প্রতিরোধের সংগ্রাম শুরু করিয়াই দিলেন। কিন্তু ওখানকার অন্যায়ের ক্ষেত্র ছিল আরও ব্যাপক, তাহা ছিল জাতিগত। কাজেই তাঁহার নিজেকে দিয়া যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বাড়িয়া বড় হইতে লাগিল। প্রতিরোধের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত হইয়া দাঁড়াইল নিরস্ত্র, নিরুপায়, বলহীনদের সংগ্রাম। যাহারা এতদিন মুখ বুজিয়া অন্যায় সহ্য করিয়া আসিয়াছে, অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করিয়াই পথ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রতিকারের পথ দেখাইয়া দিবার, ভরসা দিয়া সেই পথে চালনা করিবার, ভার লইতে হইল গান্ধীজীকে।

সশস্ত্র প্রবলের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন দুর্বলের প্রতিরোধ, অস্ত্রশস্ত্র না থাকার দরুনেই হউক, কিংবা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াও পারিয়া উঠিবার সম্ভাবনা না থাকার জন্যই হউক, নিরস্ত্র প্রতিরোধ হইতে বাধ্য, কিন্তু তাহা সর্বরকমে অহিংস হইতে হইবে এমন কথা উঠাতে নাই। অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া আর যতরকম সম্ভাব্য উপায়ে অন্যায় হইতে বিরত হইতে প্রতিপক্ষকে বাধ্য করা যায় তাহা অবলম্বন করিতে নিরস্ত্র প্রতিরোধে কোন বাধা হওয়ার কথা নয়। এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে, কিংবা যাহা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহার দ্বারা মোটের উপরে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এইরূপ 'নিরস্ত্র প্রতিরোধে' বাধা হওয়ারও কিছু নাই। বস্তুত, এই অর্থে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' বুঝিয়া থাকে। কোন রকমে প্রতিপক্ষের ক্ষতি না করা বা তাহার মনোভাবকে খাতির করিয়া চলার কোন কথা ইহার মধ্যে নাই।

গান্ধীজীর প্রতিরোধ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাহার ভিত্তি ছিল সত্য ও অহিংসার। প্রতিপক্ষকে দুঃখকষ্ট দেওয়া নয়, নিজে ত্যাগস্বীকার করা ও আবশ্যক হইলে নিজে দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া নিয়া প্রতিপক্ষের ন্যায়বোধ জাগাইয়া তোলা ও হৃদয় জয় করিয়া লওয়াই ছিল তাহার পদ্ধতি। এই কারণে পশ্চিমের দেওয়া passive resistance বা নিরস্ত্র প্রতিরোধ নামটি গান্ধীজীর পছন্দ হয় নাই। তিনি তাঁর আন্দোলনের নাম দেন সত্যাগ্রহ অর্থাৎ একমাত্র সত্য ও অহিংসার উপর যার নির্ভর ও সত্য অহিংসাতেই যার একান্ত আশ্রয়।

এই সত্যাগ্রহকে আমরা সাধারণত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলিয়াই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে উহা ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। স্বাভাবিক সত্যপ্রীতি লইয়া তিনি জীবন আরম্ভ করেন। হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের কাহিনী শুনিয়া বাল্যকালে সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ পরিপুষ্ট হয়। সত্যের বিষয়ে তাঁর ধ্যান ও বিচার যতই বাড়িতে থাকে ততই সত্য তাঁহার জীবনে এক বিশাল, বিপুল, শাশ্বত বোধ বা উপলব্ধির ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তবে, গান্ধীজী ছিলেন একান্তই কর্মযোগী, তাই সত্য তাঁহার কাছে কেবল বোধের বিষয়ই হইয়া রহিল না, উহা তাঁহার জীবনব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও প্রয়োগের ব্যাপার হইয়া দেখা দিল। কিন্তু সত্য এক সমগ্র জিনিস ও চিরন্তন সাধনার বিষয়। উহাকে অনবরত পাইতে হয়, পাওয়াও যায়, কিন্তু সে পাওয়ার কখনও শেষ হয় না। উহা চিরকালের সাধ্য। পদে পদে সিদ্ধি আসিলেও কখনই উহা পরিপূর্ণভাবে অধিগত হয় না। তাহা ছাড়া, সত্যবোধ কিছু আর গান্ধীজীর একার নিজস্ব নয়। অপর সকলের অন্তরেও সত্যবোধ আছে এবং তাহাদেরও নিজের নিজের পথে সত্যের অনুসরণ করার অধিকার আছে। এক সমগ্র অখণ্ড সত্য সকলেরই অন্তরে, কেবল ব্যক্তির বোধের তারতম্য অনুসারে সত্য নানা রূপে ও নানা স্তরের হইয়া দেখা দেয়। কাহারও বোধই সম্পূর্ণ নয়, আংশিক মাত্র এবং তাই বলিয়াই কিছু-না-কিছু দোষযুক্ত। তাই সব সময়ই নিজের সত্যবোধকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় ও অপরের সত্যের আলোকে যাচাই করিয়া লইতে হয়। ক্রমবিকশমান সত্যের সাধনা এই রূপে চলিতে থাকে। সত্যবোধেরও বিকাশ ও সমৃদ্ধি হয়। উহা পরিপূর্ণতার দিকে আগাইয়া চলে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হয়, কখনও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে না। এই জন্য অপরের প্রতি প্রীতিযুক্ত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হয়। অন্যের বোধের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে যাচাই করার কোন মূল্যও থাকে না, উহার দরকারও হয় না। তাই সত্যই যেখানে মুখ্যত

সাধনার বিষয় সেখানেও পারিপার্শ্বিক জীবন বা মানবের প্রতি প্রেম বা অন্তত অহিংসার ভাব লইয়া অগ্রসর না হইলে চলে না। অহিংসা তাই সত্যোপলব্ধির সাধন হইয়া দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনন্ত রূপে প্রকাশ পাইলেও সত্য এক ও অখণ্ড। মানুষের অন্তরচারী পুরুষ বিভক্তের মত দেখা গেলেও মূলত এক। তাই সত্যের উপলব্ধি হইয়া দাঁড়ায় জীবনের ঐক্যবোধ বা ভগবানেরই উপলব্ধি। অহিংসারও মূল এই ঐক্যবোধে। কাজেই এখানে সত্য আর অহিংসার কোন পার্থক্য থাকে না। যাহা থাকে সাধন তাহা সাধ্যের সহিত এক হইয়া যায়।

সত্যের মত অহিংসার প্রতিও স্বাভাবিক ঝোঁক লইয়া গান্ধীজী জীবন আরম্ভ করেন কিন্তু সত্যোপলব্ধির পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই বুঝিতে পারেন মনেপ্রাণে অহিংস না হইলে যথার্থ সত্যের উপলব্ধি হয় না। তাই সত্য আর অহিংসা তাঁহার জীবনে অঙ্গাঙ্গি হইয়া দেখা দেয়। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, বৃহত্তর জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আন্দোলনেও তেমনই মূল সূত্র হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত, তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার এই বিশিষ্ট রূপই তাঁহার সমষ্টিগত সাধনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। স্বভাবত তিনি ছিলেন কর্মযোগী। নিজের উপলব্ধির আলোকে জীবনের সংস্কার ও সর্ব-ক্ষেত্রে নূতন করিয়া সংগঠন করাই ছিল তাঁহার প্রকৃতিগত কাজ। কাজেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ন্যায়প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইত, কিন্তু অত্যাচারিতের উৎপীড়ন দূর করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, অন্যায়কারীর মনে ন্যায়বোধ বা শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তোলাও তাঁহার আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করিতেন জোর-জবরদস্তি করিয়া অন্যায়কারীকে সাময়িক ভাবে যদি অন্যায় কাজ হইতে বিরতও করা যায়, তবুও তাহাতে সকল পক্ষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় না এবং অন্যায়েরও তাহাতে স্থায়ী নিরাকরণ হয় না; বরং তাঁর মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস ছিল যে নিজের উপর দুঃখকষ্ট টানিয়া লইয়া সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, তাহার মনে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, ও তাহাতেই অবিলম্বে স্থায়ী ফল লাভ করা যায়। অন্য কোন পথে আশু ফললাভ হইতেছে মনে হইলে দেখা যাইবে হয় তাহা সুফল হইবে না অথবা তাহা স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ হইবে না।

ইহাই গান্ধীজীর সাধনার মূলসূত্র। ইহাই তাঁহার নিষ্কাম কর্মযোগ। বৃহত্তর ও ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাঁহার কর্মের একমাত্র কৌশল। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও সমষ্টিগত ভাবে ইহার

প্রয়োগ করিয়া তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান এবং জয়যুক্ত হন। নানা রকম বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল সমালোচনার ভিতর দিয়া বহুজনকে সাফল্যের সহিত এই পথে পরিচালনা করিয়া তিনি যে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহাতে এই কর্মপন্থায় তাঁহার আস্থা আরও দৃঢ় হয় এবং তিনি বুঝিতে পারেন যে, শুধু বিদেশে নয়, তাঁহার স্বদেশেও নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যারও এই পথে সমাধান হইতে পারে।

ইংরেজী ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের ও দশের সেবা গান্ধীজীর জীবনের ব্রত। সেই কাজ যথাযথভাবে চালাইতে হইলে সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশেষ এক ধরনে শিক্ষিত, ত্যাগী ও নিপুণ কর্মীর দরকার। সত্যাগ্রহের রীতিনীতিতেও তাহাদের অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। এই সকল কর্মী তৈরি করিবার জন্য আমেদাবাদে সবরমতির তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি মূল মহাব্রত অবলম্বন করিয়া আশ্রম জীবন আরম্ভ করা হইল। স্বদেশী, অভয়, স্বাদসংযম, অস্পৃশ্যতা-পরিহার প্রভৃতি তো আনুষঙ্গিক হিসাবেই আসিয়া পড়িল। শারীরিক শ্রমের ভিত্তিতে সরলভাবে জীবন যাপন করার জন্যই কর্মীদের বিশেষ ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার নিজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই অহিংস কর্মীর দল গান্ধীজীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

কংগ্রেসে যাতায়াত থাকিলেও সেখানে তখনও তাঁর স্থান হয় নাই। নানারকম সভাসমিতিতে তিনি নিজের ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিলেন। বেশি দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। ভারতে সমস্যার অন্ত ছিল না। একটার পর একটা সমস্যা হাজির হইতে লাগিল। এদেশে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হইল।

চম্পারনে নীলচাষীদের হইয়া নীলকরদের শোষণের ব্যাপারে তদন্ত করিতে গিয়া গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে সরকারী হুকুম অমান্য করিয়া সত্যাগ্রহ শুরু করিতে হইল। সেখানে তাহাতেই কাজ হইল, সরকারের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি হইয়া গেল। আমেদাবাদের মিলমালিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে ও খেড়ায় কৃষকদের খাজনাবন্ধ আন্দোলনে সত্যাগ্রহের ভিত্তি ব্যাপক হইল। অনেক লোকের মধ্যে ইহা ছড়াইয়া পড়িল ও গান্ধীজীকে তাহাদের নেতৃত্ব করিতে হইল। গান্ধীজী দেশের লোককে চিনিলেন। তাহাদেরও

গান্ধীজী ও তাঁহার কর্মনীতির সঙ্গে পরিচয় হইল। কংগ্রেসের মারফত এদেশের আবেদন-নিবেদনের আন্দোলনের সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তার পরে কি, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। গান্ধীজীর কার্যধারায় তাহার পরের অধ্যায়ের বলিষ্ঠ কর্মনীতির পরিচয় পাইয়া তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহার সমস্ত কথা যে তাহারা পুরোপুরি মানিয়া লইল এমন নয়। তাঁহার আন্দোলনে সরল ও সবল মেরুদণ্ডের আভাস পাওয়ায় তাঁহার নেতৃত্বের খ্যাতি ও নূতন ধরনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যগ্রহ-সংগ্রাম চলিয়াছিল অর্থনৈতিক, নাগরিক ও একই সাম্রাজ্যের প্রজাহিসাবে সমব্যবহার পাইবার অধিকারের প্রশ্ন লইয়া। এদেশে আসিয়া চম্পারন, আমেদাবাদ ও খেড়ায় যে সত্যাগ্রহ চলে তাহাও স্থানীয় ও সাময়িক অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য। সেগুলি ভারতব্যাপী আন্দোলন ছিল না, সর্বসাধারণ তাহাতে জড়িত হইয়া পড়ে নাই এবং স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যেও সেগুলি আরম্ভ করা হয় নাই।

কিন্তু ১৯১৯ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত এখানে যে আন্দোলন চলে তাহা বিভিন্ন পর্যায়ের একই স্বাধীনতা-সংগ্রাম ; ঢেউয়ের গতিতে, উত্থান পতনের ভিতর দিয়া পঁচিশ বৎসর ধরিয়া উহা চলিয়াছিল। ছয়টি পর্যায়ে এই আন্দোলন চলে। এক একটি পর্যায়ের পরে সাময়িক সংগ্রাম-বিরতির সময়টি সর্বরকমের সংগঠন কাজে, অর্থাৎ পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য নিয়োগ করা হইত। সকলগুলিই ভারতব্যাপী আন্দোলন। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে আরম্ভ হইলেও সকলগুলির উদ্দেশ্য ছিল এক। প্রথম দুইটি পর্যায়ে উদ্দেশ্য ছিল কতকটা পরোক্ষ কিন্তু শেষের চারটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম চলিয়াছিল।

দীর্ঘকালব্যাপী এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম গান্ধীজীর অভিনব সত্যাগ্রহ-পদ্ধতিতে চলে। সেইজন্য প্রত্যেকটি পর্যায়ে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার উপরেই সংগ্রাম পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তাঁহার অহিংসানীতি কংগ্রেস ও দেশবাসী পুরোপুরি মানিয়া লয় নাই, মোটামুটি কর্মনীতি হিসাবে, অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের লড়াইয়ের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাকে ছাড়া উপায় ছিল না। তাই তাঁহার নির্দেশ ও বিধিনিষেধ যথাযথই পালন করা হইত। সেই জন্য এত বড় দেশের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে হিংসার ব্যাপার ঘটিয়া থাকিলেও আন্দোলনগুলি শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলিয়াছিল বলিতে

হইবে। সেই কারণেই এই সংগ্রাম বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

১৯১৯ সালে রাওলট আইন উপলক্ষ করিয়া প্রথম পর্যায়ের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দেশের লোক আশা করিয়াছিল যুদ্ধের শেষে ইংরেজ হয়তো দেশ শাসনের সত্যকার অধিকার কিছু কিছু দেশবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিবে। তাহার তো কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অধিকন্তু রাওলট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারালয়ের সাধারণ বিচার পদ্ধতির সঙ্কোচ সাধন ও বিনা-বিচারে আটক রাখার জন্য নূতন আইন পাস করিয়া দেশবাসীর বর্তমান অধিকারও হরণ করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই বেআইনি আইনের প্রতিবাদ করা হইল। গান্ধীজী বড়লাটকে চিঠি দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। আইন পাস হইয়া গেল। ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করা হইল। ঠিক হইল যাহারা সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করিবে তাহারা বেআইনি প্রেস-আইন অমান্য করিয়া বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ বই বিক্রি করিবে এবং তাহার জন্য সকল রকম নিপীড়ন সহ্য করিবে। অন্যান্য জনসাধারণ নির্দিষ্ট দিনে উপবাস ও হরতাল করিবে, কাজকর্ম বন্ধ রাখিবে ও জনসভায় রাওলট আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাইবে। হরতালের দিন প্রথমে ৩০শে মার্চ ঠিক করা হয়। পরে তাহা বদলাইয়া ৬ই এপ্রিল ধার্য করা হয়। দিল্লি, অমৃতসর প্রভৃতি কোন কোন জায়গায় ভুল করিয়া দুই দিন ও সমগ্র ভারতে ৬ই এপ্রিল হরতাল করা হয়। দেশে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা গেল। কোন কোন জায়গায় কর্তৃপক্ষ লাঠি ও গুলি চালায়। দেশব্যাপী আন্দোলন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলে কিন্তু কোন কোন জায়গায় পুলিসের দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া জনতা হিংসামূলক কাজ করে। সকল জায়গার লোকে পুরোপুরি অহিংস থাকিতে পারে নাই দেখিয়া ও জনতার হিংসা ছড়াইয়া পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়া ১৮ই এপ্রিল গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত করিয়া দেন এবং ২১শে জুলাই ঘোষণা করেন তখনকার মত আইন অমান্য আবার আরম্ভ করা হইবে না এবং এই বিরতির সময় সকলে সংগঠনের কাজে ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মন দিবেন।

বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। রাওলাট আইন সত্যাগ্রহের ৬ই এপ্রিলের দেশব্যাপী হরতাল খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়। সেই উপলক্ষে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ১০ই এপ্রিল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইলে জনতা শোভাযাত্রা করিয়া নেতাদের মুক্তি দাবি করে ও

পুলিস তাহাদের উপর গুলি চালায়। কিছু লোক হতাহত হয়। জনতা ক্ষেপিয়া গিয়া ইংরেজদের অফিস আক্রমণ করে। কয়েকজনকে মারিয়া ফেলে ও বাড়ি-ঘর পোড়াইয়া দেয়। ইহার প্রতিশোধে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালা বাগে জেনারল ডায়ারের হুকুমে সৈন্যদল সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর বিনা-নোটিশে গুলি চালাইয়া নির্বিচারে বহু নরনারী ও শিশুকে হত্যা করে। গুলিগোলা না ফুরাইয়া যাওয়া পর্যন্ত উহা চালানো হয় ও হতাহতদের কি হইল সেদিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া সৈন্যদল স্থান ত্যাগ করে। ইহার পরই সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিয়া পাঞ্জাবিদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন করা হয় এবং বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী যাহাতে বাহিরে ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য সর্ব-রকম কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতীয়দের মনুষ্যত্বের এই অপমানের কথা অবশ্য বেশিদিন গোপন করিয়া রাখা যায় না। সামরিক আইনের লৌহবেষ্টনী ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া যে সকল খবর বাহির হইয়া আসিল তাহাতে সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেশব্যাপী বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠিল। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদে বাধ্য হইয়া ব্যাপারটি তদন্ত করিবার আশ্বাস দিয়া ভারত গভর্মেণ্ট হাণ্টার কমিটি নামে একটি সরকারী কমিটির নিয়োগ করেন। ১৯২০ সালের মে মাসে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে দেখা গেল রাজকর্মচারীদের সমস্ত অপকর্মের গুরুত্ব কমাইয়া দিয়া তাহার কলঙ্ক-লাঘবের চেষ্টা করা হইয়াছে। রিপোর্ট বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় কাজের জন্য সাধারণ বিচারালয়ের দণ্ডব্যবস্থা হইতে অপরাধী রাজকর্মচারীদের অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ বিচারালয়ের এখতিয়ার হইতে তাহাদের মুক্তি দিয়া সরকার দণ্ডমুক্তি আইন (Indemnity Act) পাস করাইয়া লইলেন। পাঞ্জাব-অনাচার সম্বন্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ ইহাতে কিছুমাত্র না কমিয়া শত-গুণ বাড়িয়া গেল।

আর একটা অসন্তোষের ব্যাপার ঘটিল খিলাফতের মর্যাদা রক্ষা লইয়া। যুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেয়। যুদ্ধের অবসানে, ১৯২০ সালের মে মাসে যখন সন্ধিশর্ত বাহির হইল তখন দেখা গেল খিলাফতের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকালের অনাচার ও খিলাফতের মর্যাদারক্ষার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, এই দুইয়ের প্রতিকারের জন্য দেশবাসী হিন্দুমুসলমান এক ও বদ্ধপরিকর হইল। বড়লাট ও ইংরেজ গভর্মেণ্টের নিকট

বহু নির্বন্ধ ও অনুরোধ উপরোধ করা হইল কিন্তু কোন ফল হইল না দেখিয়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি সকলে মিলিয়া সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করাই ঠিক করা হইল। গান্ধীজীর উপর ইহার ভার দেওয়া হইল। তিনি এই আন্দোলনের নাম দিলেন অহিংস অসহযোগ। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট উপবাস হরতাল ও জনসভা করিয়া এই সংগ্রাম শুরু করা হইল। ইহার কার্য-ক্রমে ছিল পঞ্চবর্জন—খেতাব ও সর্বপ্রকার সম্মানের নিদর্শন, নির্বাচন ও আইন-সভা, স্কুল-কলেজ, আদালত ও মামলামোকর্দমা এবং বিদেশী বস্ত্র। সংগঠনের দিকে ছিল জাতীয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, সালিসি আদালত ও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা, সুতো কাটিয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা, অস্পৃশ্যতা ও মাদক দ্রব্য বর্জন এবং ক্রমে ক্রমে সরকারের সঙ্গে সকল রকমের সহযোগিতা বর্জন করিয়া এক রকমের সমান্তরাল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া গেল। নানারকমে উপদ্রুত, বিপর্যস্ত, অপমানিত জনচিত্তকে গান্ধীজী যেন একটা পথ করিয়া দিলেন। লোকে এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সরকারও বসিয়া রহিল না। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলি সবই চলিল। কর্মীপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনি করা হইল। জেলগুলি ভর্তি হইয়া গেল। গান্ধীজী ১৯২২ সালের প্রথম হইতেই বারদোলিতে খাজনাবন্ধ আন্দোলন শুরু করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ৫ই ফেব্রুয়ারি গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় জনতার উপর পুলিস গুলি চালায়। জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিসকে আক্রমণ করে। গুলিগোলা ফুরাইয়া গেলে পুলিস পলাইয়া থানায় আশ্রয় লয়। উত্তেজিত জনতা তখন থানা ঘিরিয়া আটক করিয়া থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। জন কুড়ি কনস্টেবল ও একজন সাব-ইন্‌স্‌পেকটর আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। গান্ধীজী বুঝিলেন আন্দোলন তাঁহার নির্দিষ্ট পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির মত করাইয়া আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত করিয়া দিলেন ও কর্মীবৃন্দকে সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করিবার নির্দেশ দিলেন।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়া গান্ধীজীর পক্ষেও সহজ কাজ ছিল না। এই আন্দোলনে সমস্ত ভারত উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বনিয়াদ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। দেশে-বিদেশে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। এমন সময়ে অন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অনেকেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

সভায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে তিরস্কার-প্রস্তাব আনা হইল। গান্ধীজী নিজের পক্ষে একটি কথাও বলিলেন না, অনুগামীদের নিজের পক্ষে একটি কথাও বলিতে দিলেন না। ঝড় বহিয়া গেল, তিনি অবিচলিত রহিলেন।

সংগঠনের কাজে কয়েক বছর কাটাইয়া দিয়া ১৯৩০-৩১ সালে তৃতীয় পর্যায়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই কয়েক বছরে স্বাধীনতার দাবি আরও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। দেশে ক্রমেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে লাগিল। এই সময়ে শাসন-সংস্কারের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সরকার সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। তাহা বর্জন করিয়া এই কাজের জন্য কংগ্রেস নিজেই এক কমিটির নিয়োগ করে। সেই কমিটির নির্ধারণ মানিয়া লইয়া ১৯২৮ সালে সর্বদল সম্মেলনে ডোমিনিয়নের সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধিকার-লাভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে এক বৎসর সময় দিয়া ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে সংকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয়—তাহা না হইলে কংগ্রেস হইতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হইবে। ইংরেজ গভর্মেণ্ট ইহাতে কোন সাড়া না দিলে বৎসরান্তে ১৯২৯ সালে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি তারিখটিকে দেশে স্বাধীনতা-দিবস হিসাবে পালন করিবার নির্দেশ দেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস সত্যাগ্রহ চালাইবার ভার গান্ধীজীর উপরে দেন।

স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হইল। লবণ আইন অমান্য করিয়া এই আন্দোলনের আরম্ভ। ঐতিহাসিক দাণ্ডি অভিযানে সবরমতী হইতে পদযাত্রা করিয়া দুই শ' মাইল পাদপরিক্রমার পর ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী দাণ্ডি পেঁাছেন এবং ৬ই তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটুখানি বেআইনী লবণ তুলিয়া লইয়া সংগ্রামের উদ্‌বোধন করেন। বেআইনী ভাবে লবণ তৈরি করা, বহুলোকে মিলিয়া সরকারী লবণের গুদামে হানা দেওয়া, অন্যান্য অন্যায় আইন অমান্য করা ও কোথাও কোথাও কর বন্ধ করা এবং সাধারণভাবে সরকারের কাজে অসহযোগ চালানো, এই আন্দোলনের কার্যক্রম ছিল। ৪ঠা মে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন কিন্তু কাজ বন্ধ হয় না। নেতার পর নেতা গ্রেপ্তার হইতে থাকেন। প্রত্যেকেই যাইবার সময় নূতন নেতা নির্বাচন করিয়া যান। সরকারী দমননীতিও কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে থাকে। অর্ডিনান্‌সের পর অর্ডিনান্‌স্ জারি হয়। নূতন নূতন জেলের

ব্যবস্থা করা হয়। লাঠি, গুলি, শারীরিক অত্যাচার-উৎপীড়ন কোন কিছুই বাদ থাকে না। এক বছর আন্দোলন চলার পর দেশী-বিদেশী বহু লোকের চেষ্টায় বিলাতে একটা রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্‌সে আলোচনার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ও সহ-কর্মীদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গান্ধীজী ও বড়লাট আরউইনের সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে সাময়িকভাবে সমর-বিরতির একটা চুক্তি হয়। ইহাতে ক্ষমতার কোন হস্তান্তর ছিল না, অহিংসার একটা নৈতিক স্বীকৃতি ছিল এবং সেইজন্য ইহার দ্বারা কংগ্রেস ও অহিংসানীতির মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায়।

রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্‌স্ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২-৩৪ সালে চতুর্থ পর্যায়ে যে সত্যাগ্রহ চলে তাহা কোন নূতন সংগ্রাম নয়, উহা ১৯৩০-এর সংগ্রামেরই শেষ পরিণতি বা দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র। উহাতে বস্তুত ১৯৩০-৩১ এর স্থগিত আইন অমান্য আন্দোলনই আবার নূতন করিয়া শুরু হইল মাত্র। গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দ বিনা-বিচারে আটক হইলেন। কংগ্রেস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হইল। কংগ্রেসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। আবার জেল ভর্তি হইল। লক্ষাধিক লোক জেলে বন্দী হইল। ১৯৩৩ সালের ১২ই জুলাই ব্যাপক আইন অমান্য বন্ধ করিয়া কেবল ব্যক্তিগত আইন অমান্য চলিতে থাকিল। ১৯৩৪ সালের ৭ই এপ্রিল আইন অমান্য তখনকার মত স্থগিত রাখা হইল।

১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দুই ধারায় কংগ্রেসের কাজ চলিতে লাগিল। আবার আইনসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হইল। আইনসভার কাজ ও সংগঠনের কাজ পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ভারতের কোন মতামত না লইয়া ব্রিটেন ভারতের হইয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। কাজেই কংগ্রেসী সদস্যরা আইনসভার সদস্যপদ ছাড়িয়া দিলেন। এই যুদ্ধ ইংলণ্ডের পক্ষে জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপার। কংগ্রেসেরও উভয় সঙ্কট। প্রতিপক্ষের দারুণ বিপদের দিনে তাহাকে বিব্রত করা কংগ্রেসের সাধারণ অহিংস নীতির বিরোধী। অথচ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে অনির্দিষ্টকাল কেবলই অপেক্ষা করিয়া থাকাও নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে কম বিপজ্জনক নয়। তাহা হইলে করা যায় কি? একটা কিছু তো করিতেই হইবে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে তো চলিবে না! এই দোটানার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উদ্ভব। কংগ্রেস দাবি করিল, ভারত স্বাধীনভাবে "অহিংস উপায়ে প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরোধী প্রচার

কাজ" ও "সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ করার বিষয়ে প্রচার" করিতে পারিবে। বড়লাট ইহাতে রাজী হইলেন না। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পঞ্চম পর্যায়ের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল।

১৯৪০ সালের ১৭ই অক্টোবর পাওনারে বিনোবা ভাবে প্রথম এই সংগ্রামের উদ্‌বোধন করিলেন। সকল যুদ্ধই খারাপ ও অবাঞ্ছিত এবং এই যুদ্ধও ভারতের নয়, অতএব এই যুদ্ধে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করা অন্যায়—ইহাই ছিল প্রচারের বিষয়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যখন বাড়িয়া চলিল তখন বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়া শুধু ঐ মর্মে ধ্বনি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ঐরূপ প্রচার করিতে করিতে দিল্লিযাত্রাই ছিল কার্যক্রম।

ইহা একটা নৈতিক ঘোষণা মাত্র, ঠিক সংগ্রামের পর্যায়ে ইহা তখনও আসে নাই। এই অবস্থায় এই আন্দোলন ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত চলিল। সেই সময়ে জাপানী আক্রমণ আসন্ন হইয়া পড়ায় যুদ্ধের ব্যাপারে আর একবার ভারতের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য সরকার সত্যাগ্রহীদের ছাড়িয়া দিলেন।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপানীরা পার্ল-বন্দর দখল করিয়া দ্রুতগতিতে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া ভারতের প্রান্তে আসিয়া পড়িল। ইংরেজেদের উপর কাহারও আর কোন ভরসা রহিল না। এই সময়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ইংলণ্ড হইতে নূতন প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। তাহাতে আড়ম্বর ছিল, কিন্তু বস্তু কিছুই ছিল না। ক্রিপ্‌স্‌কে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের ষষ্ঠ বা শেষ পর্যায় আরম্ভ করার আগে ব্রিটেনকে ভারত ছাড়িবার দাবি করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব পাস করিলেন। প্রস্তাবে বলা হইল, এই দাবি অনুযায়ী ইংরেজ যদি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তবে কংগ্রেস, গান্ধীজীর নেতৃত্বে, তাহার সর্বপ্রকার অহিংস শক্তির প্রয়োগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালাইবে। ১৯৪২-এর ৭ ও ৮ই আগস্ট তারিখে বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় এই দাবির সমর্থন করা হইল এবং এই সংকল্প করা হইল যে বাইশ বছরের শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশে যে অহিংস শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহার প্রয়োগে ভারত গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে সুবিস্তৃতভাবে তাহার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাইবে। রাত পোহাইতে না পোহাইতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হইল। সংগ্রাম-

কারীদের নির্দেশ দিয়া ঠিক পথে চালাইয়া লইবার জন্ম নেতৃস্থানীয় কেহ আর বাহিরে রহিল না। কিন্তু জনতা নিজেরাই সংগ্রামের ভার লইল। তাহারা ভুল করিল। গান্ধীজীর নির্দিষ্ট নীতি সকল সময় রক্ষা করিতে পারিল না, কিন্তু তাহারা পিছু হটিল না। সরকারও যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইলেন। ১৯৪৪-এর মে মাস পর্যন্ত এই ভাবে সংগ্রাম চলিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতেও বর্বরোচিত অত্যাচার সরকারপক্ষ হইতে যাহা হইয়াছিল সে তুলনায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তেমন কিছুই হয় নাই। বলিতে গেলে, অহিংস নীতিরই প্রাধান্য বজায় ছিল।

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গের জয় হয়। কাজেই ইংরেজের শাসন এদেশে আরও কিছুদিন চলিয়াছিল। কিন্তু দেশে জনগণের যে জাগরণ ও রাজনৈতিক অধিকারবোধের যে বিকাশ হয় ও ইংরেজের মানসম্মান যে পরিমাণে নামিয়া যায় তাহাতে কংগ্রেসের ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' দাবির মর্যাদা রক্ষা করিয়া ১৯৪৭ সালে ইংরেজকে যথার্থই ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। গান্ধীজীর পরিচালনায় ভারতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। ভারত স্বাধীন হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের সংগ্রাম নূতন। ইহার আগে এখানে সেখানে স্বল্পপরিসর সীমার মধ্যে ইহার মত যাহা কিছু হইয়াছে তাহাকে নিরস্ত্র, বা চলিত কথায় যাহাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয়, প্রতিরোধ বলা যাইতে পারে।

ভারতেও সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে বিশেষ ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ একেবারে নূতন। নূতন বলিয়াই ইহার গতি-প্রকৃতি বা প্রয়োগসূত্র সম্বন্ধে এখানেও কাহারও কোন পরিচয় ছিল না। সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে না দেখিলে, ইহার নিছক ভাবধারার, ইহার অন্তর্নিহিত দর্শনের সহিত ভারতের ধাতুগত একটা মিল ছিল এবং ইহা গ্রহণ বা স্বীকার করিয়া লওয়া সম্পর্কে ভারতের প্রকৃতিতে মূলগত কোন আপত্তি তো ছিলই না, বরং, বলিতে গেলে, ভারতের আলো আর বাতাস, ভারতের আকাশ আর মাটি, ভারতের ধ্যান ও ধারণা, সবই ইহার অনুকূল ছিল। অথচ বহুকালের পরাধীনতাজর্জর, ঐক্যহীন, আত্মসংবিৎহীন, বলিতে গেলে একরকম দেশাত্মবোধ হীন ও একান্ত নিরুপায় ভারতীয়দের পক্ষে অন্য কোন রকমে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো তখন সম্ভবও ছিল না। তাই সংগ্রামের সময়ে বারংবার গান্ধীজীকে ডাকিতে হইয়াছে। তাঁহার নীতির বন্ধন পুরোপুরি পছন্দ হয় নাই, পুরোপুরি মানিয়া লইতে ইচ্ছা হয় নাই। তবুও সামরিকভাবে মানিতে হইয়াছে, তাঁহারই হাতে বারংবার সংগ্রামের নেতৃত্ব ও

পরিচালনাভার তুলিয়া দিতে হইয়াছে। তাঁহার নির্দেশ পুরোপুরি মানা হয় নাই। তাঁহাকে পুরোপুরি গ্রহণও করা হয় নাই। তবুও মোটামুটি তাঁহার নির্দেশমতই সংগ্রাম চালাইতে বা স্থগিত করিতে হইয়াছে। সকল দিক রক্ষা হয় নাই। গান্ধীজী যে-মূল্য ধার্য করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। গান্ধীজী যাহা চাহিয়াছেন তাহা পান নাই, কিন্তু যতটুকু পাইয়াছেন তাহাতেই শেষ রক্ষা হইয়াছে।

কিন্তু এই শেষ গান্ধীজী চান নাই। চান নাই সে কথা ঠিকই, কিন্তু এই-রকম ভাবে বলিলেও বোধ হয় তাহা ঠিক বলা হয় না। বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্তির যে স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের জন্য তিনি তাহা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা চাহিয়াছিলেন পুরোপুরি অহিংসার পথে, অর্থাৎ অহিংসার পূর্ণ পরিণতি হিসাবে। স্বাধীন ভারত তাঁহার কাম্য ছিল কিন্তু অহিংসাবর্জিত স্বাধীন ভারতে তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। সাধ্য ও সাধনকে তিনি একই মূল্য দিতেন, উভয়ের গুরুত্ব তাঁহার কাছে ছিল সমান। তিনি বিশ্বাস করিতেন সাধন দোষযুক্ত হইলে সাধ্য সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সত্য ও অহিংসা বিশেষ করিয়া ভারতের বাণী। ভারত তাহার নিজস্ব পথে স্বাধীন হইবে—সে স্বাধীনতা শুধু বাহিরের চেহারায় নয়, মনেরও মুক্তি—স্বাধীন হইয়া সে জগৎকে নিজের ধ্যান ও উপলব্ধি অনুসারে পথ দেখাইবে, ইহাই গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন। 'পশ্চিমের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড' মাথায় বাঁধিয়া গর্বের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সে জগৎসভায় উপস্থিত হইবে ইহা তিনি চান নাই। তাঁহার ভারতপ্রীতি কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না,—ভারতকে তিনি পবিত্রভূমি বলিয়া মনে করিতেন—, কিন্তু সে ভারতপ্রীতি এমন ছিল না যে, তিনি কামনা করিবেন, তাঁহার স্বদেশ অপর সকল লোকের স্বদেশের উপর টেক্কা দিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বেড়াইবে। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, ফুলের কুঁড়ির মত, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশ এবং স্বদেশকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আলোবাতাসের দিকে নিজের পাপড়ি মেলিয়া ধরিবে, ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা তিনি চান যেন সেই স্বাধীন ভারত আবশ্যক হইলে জগতের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে, এই জন্য।

তিনি যে ভাবে ভারতের মুক্তি চাহিয়াছিলেন সে ভাবে কেহ তাহা চাহিল না। সংগ্রামীদের মধ্যে এইখানে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তিনি মনেপ্রাণে ষোলো আনা—ষোলো আনা নয়, আঠারো আনা—স্বদেশী ছিলেন, কিন্তু

স্বাদেশিকতার বন্ধন যাহাতে তাঁহাকে বাঁধিতে না পারে সেই জন্ম বিশ্বের দিকে একটা দরজা তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন—অহিংসার দরজা। সেই দরজা ছিল তাঁহার বৃহত্তর মানবসমাজে স্বচ্ছন্দ আনাগোনার দরজা, বসুধৈব কুটুম্বকমের দরজা, সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধের দরজা। সেই দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি—সমগ্র জগৎ যখন হিটলারের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও হিটলারের প্রতি বিমুখ, তখনও—হিটলারের কাছে চিঠি লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দরজায় দাঁড়াইয়া যখন তিনি সঙ্গীদের ডাক দিলেন, কাহারও সাড়া মিলিল না। দেখা গেল সে দরজায় তিনি একান্ত একা, ভারতের রাজনৈতিক জনারণ্যে তিনি এক বনস্পতি, দোসর কেহ নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি বলিলেন, ইংরেজের বিপদের দিনে, জীবনমরণের যুদ্ধে, ইংরেজকে সাহায্য করা হউক বিনাশর্তে কিন্তু সে সাহায্য করা হউক অহিংসার পথে, হিংসার লড়াইএর ভিতর দিয়া নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে, বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধে কংগ্রেস অহিংসনীতি সম্ভব বলিয়া মনে করে না, সমর্থনও করে না। ইংরেজ যদি তাহার স্বাধিকারের দাবি মানিয়া লয় ও যথার্থই ক্ষমতার হস্তান্তর করে তবে কংগ্রেস, তথা ভারত, যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজকে সর্বরকমে সাহায্য করিবে।

গান্ধীজী যেরকমভাবে ভারতের মুক্তি চাহিয়াছিলেন সেরকমভাবে ভারতের মুক্তি কেহ চাহে নাই। গান্ধীজীর মত আর কেহ অহিংসায় পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিল না এবং অহিংসা অবলম্বনে ভারতের প্রতিরক্ষা পর্যন্ত যাওয়ার সাহস বা দৃঢ়তা তাহাদের ছিল না অথচ ইংরেজের নিকট হইতে স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইবার জন্ম মনেপ্রাণে অহিংসা অবলম্বন করিয়া গান্ধীজীর অনুসরণ করিতে তাহাদের বাধে নাই। পুরোপুরি অহিংস বলিতে এক গান্ধীজীই ছিলেন। তাঁহারই বিশ্বাসের শক্তি বহুলোকের অন্তরে অহিংসার একটা অনুপ্রাণনা আনিয়া দিয়াছিল। স্বাধীনতার উন্মাদনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু স্বাধীনতালাভের জন্ম অহিংসাই যে একমাত্র সম্ভাব্য ও প্রকৃষ্ট উপায় এই রকম একটা নিঃসংশয় বোধ তাঁহার অনুগামীদের উদ্‌বুদ্ধ না করিলে তাহারা অহিংসা অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল কেমন করিয়া? শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনে ইহাতেই কাজ হইল। হৃদয়-পরিবর্তন বলিতে গান্ধীজী কি ও কতখানি বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট নয়। হৃদয় একটা সামগ্রিক জিনিস। মানুষের অন্তর্জগৎ বিপুল,

গভীর, অতলস্পর্শী। তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন একটা বিপুল উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপার, গুণগত এবং পরিমাণগতও বটে। এই পরিবর্তনের আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ কোথায়? হৃদয় বা অন্তরের শুদ্ধি একটা ক্রমবিকশমান ব্যাপার। বুদ্ধি ও মনোভাবের পরিবর্তনে তাহার আরম্ভ। মানুষ যদি যথার্থ সদিচ্ছা লইয়া কাজ করে, এমন কি সংগ্রামও করে, তবে সেই সদিচ্ছার স্পর্শ চারপাশের মনে গিয়া লাগিবে ইহা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত কথা। এক পক্ষের সদিচ্ছার ঢেউ লাগিয়া সকলেরই মনোভাব যে কিছু কিছু পরিষ্কার হইবে ও সেখানেও কিছু কিছু সদিচ্ছার ক্রিয়া দেখা দিবে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফল কতখানি পাওয়া যাইবে তাহা প্রারম্ভিক সদিচ্ছার আন্তরিকতা ও শক্তি এবং আরও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। গান্ধীজী সম্ভবত এই অর্থেই হৃদয়-পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন। একদিনে হঠাৎ সকলের অন্তরশুদ্ধি ঘটিয়া পৃথিবী নন্দনকাননে পরিণত হইবে এমন কথা বলিতে চাহেন নাই, তাহা বলা সম্ভবও নয়।

ভারতের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ব্যাপারটিকে একটু ভাল করিয়া দেখিলে ইহা বোঝা যাইবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পঁচিশ বৎসর ব্যাপিয়া যে সংগ্রাম এদেশে চলিয়াছিল তাহাতে শ্রীদিবাকর যে হিসাব দিয়াছেন সেই অনুসারে কার্যত সংগ্রাম চলে ৬ বৎসর ৮ মাস ২দিন। দুইটি পর্যায়ে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ সত্যাগ্রহ করে, ও বাকি চারটিতে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দেয় এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের সম্মুখে মোটের উপর অহিংসা পালনে অটল থাকে। এত বড় দেশের চল্লিশ কোটি লোকের স্বাধীনতার বিষয় বিবেচনা করিলে প্রাণহানি বা সম্পত্তিনাশ যাহা ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাণ নগণ্য বলিলেও চলে। হিংসার পথে যদি এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইত তাহা হইলে কি বিপুল পরিমাণে লোকক্ষয় ও সম্পত্তিনাশ হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উভয়পক্ষেই মনোভাবের পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন না কোন স্তরে ঘটিয়াছিল, মনের মধ্যে সদিচ্ছা ও অহিংসার অনুরঞ্জন একটু আধটু রঙ ধরাইয়াছিল, তাহা না হইলে ইহা সম্ভব হইত না আর সে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল সদিচ্ছা ও অহিংসার দরুনে। অন্য কোন কারণের কথা অনুমান করা যায় না। অহিংসায় বিশ্বাসের গুণগত উৎকর্ষ ও শক্তির তীব্রতা যেখানে খুব উল্লেখযোগ্য নয় সেখানে যদি এইরূপ ঘটিয়া থাকে তবে যেখানে তাহা আরও বেশি শক্তিশালী হইবে সেখানে আরও উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এবং যতটুকুই পাওয়া যাইবে তাহা মানব-

সমাজের পক্ষে মঙ্গলই বহন করিয়া আনিবে, তাহাতে বিদ্বেষজনিত অমঙ্গলের কোন রেশ পড়িয়া থাকিবে না।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে গান্ধীজীর অভিনব পদ্ধতি বিশ্বের মানব-সমাজের পক্ষে আশার আলো বহন করিয়া আনিয়াছে। গান্ধীজী স্বদেশের। স্বদেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া তিনি বিশ্বজগতের। তাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি এমন উপায়ের নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গান্ধীজীর ইহা আবিষ্কার, কিন্তু ভারতের আলো-বাতাস-মাটিতে সেই আবিষ্কারের আবির্ভাব। গান্ধীজীর হাত দিয়া বিশ্বজগৎকে ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।

এখানকার মাটিতেই ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সহিত চালানো যায় তাহার পরীক্ষা এখানকার মাটিতে হইয়া গেল। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপ ফললাভ করা যায় তাহার পরীক্ষা এখনও বাকি আছে। সুফল লাভ হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যায়, অন্তত মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করিবার যে সংগ্রাম তাহা আরও সভ্য, আরও সুন্দর ও আরও মানবিক প্রণালীতে যে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংগ্রামের অবসান পরবর্তী মানবসমাজের জন্য কোন অমঙ্গলের রেশও রাখিয়া যাইবে না।

আজিকার মানবসমাজে সমরসম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। মারণাস্ত্রের আর শেষ নাই। এই আণবিক যুগে অস্ত্রের পর অস্ত্র, আরও অস্ত্র, আরও শস্ত্র, আরও দূর পাল্লার, আরও নূতন, আরও ভয়ঙ্কর, জমিয়া উঠিল। কে আগে যাইবে, কাহার শক্তি বেশি হইবে, কে আগে ধ্বংস শুরু করিতে পারিবে, অপরে কত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবে? প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, মানুষের পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। এই ভয়, মানুষের অন্নবস্ত্র, মানুষের কল্যাণব্যবস্থা, মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি, মানুষের সুখশান্তি ও মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু বোঝায় তাহার সবই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভগবানের দেওয়া আলোবাতাসের মধ্যে আর মানুষের থাকিবার জো নাই। মাটির নীচে থাকার ব্যবস্থা করিয়াও আজ সে স্বস্তি বোধ করিতেছে না। আজ তাহাকে সত্য, অহিংসা, পারস্পরিক প্রীতি ও সদিচ্ছার এবং যেখানে সংগ্রাম করিতে হয় সেখানেও পরিচ্ছন্ন কৌশলপ্রয়োগের কথা শোনানো কঠিন।

কিন্তু আরম্ভ তো কোথাও করিতে হইবে! কর্মে, জ্ঞানে, হৃদয়বত্তায়, যার যেখানে যে যে সম্পদ আছে তাহা লইয়া অগ্রসর তো হইতে হইবে! গান্ধীজীর প্রচেষ্টাও সেই মানবহিতের প্রচেষ্টা, তাঁহার মত তিনি একদিক দিয়া কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন, পথ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানবজাতি সেই পথ গ্রহণ করিবে কি না, সেই পদ্ধতির আর নূতন কোন পরীক্ষা ও প্রয়োগ হইবে কি না, ভবিষ্যতই তাহা বলিতে পারে।

সমাজের পক্ষে মঙ্গলই বহন করিয়া আনিবে, তাহাতে বিদ্বেষজনিত অমঙ্গলের কোন রেশ পড়িয়া থাকিবে না।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে গান্ধীজীর অভিনব পদ্ধতি বিশ্বের মানব-সমাজের পক্ষে আশার আলো বহন করিয়া আনিয়াছে। গান্ধীজী স্বদেশের। স্বদেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া তিনি বিশ্বজগতের। তাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি এমন উপায়ের নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গান্ধীজীর ইহা আবিষ্কার, কিন্তু ভারতের আলো-বাতাস-মাটিতে সেই আবিষ্কারের আবির্ভাব। গান্ধীজীর হাত দিয়া বিশ্বজগৎকে ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।

এখানকার মাটিতেই ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যে এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সহিত চালানো যায় তাহার পরীক্ষা এখানকার মাটিতে হইয়া গেল। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপ ফললাভ করা যায় তাহার পরীক্ষা এখনও বাকি আছে। সুফল লাভ হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যায়, অন্তত মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করিবার যে সংগ্রাম তাহা আরও সভ্য, আরও সুন্দর ও আরও মানবিক প্রণালীতে যে হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংগ্রামের অবসান পরবর্তী মানবসমাজের জন্য কোন অমঙ্গলের রেশও রাখিয়া যাইবে না।

আজিকার মানবসমাজে সমরসম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। মারণাস্ত্রের আর শেষ নাই। এই আণবিক যুগে অস্ত্রের পর অস্ত্র, আরও অস্ত্র, আরও শস্ত্র, আরও দূর পাল্লার, আরও নূতন, আরও ভয়ঙ্কর, জমিয়া উঠিল। কে আগে যাইবে, কাহার শক্তি বেশি হইবে, কে আগে ধ্বংস শুরু করিতে পারিবে, অপরে কত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইবে? প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, মানুষের পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। এই ভয়, মানুষের অন্নবস্ত্র, মানুষের কল্যাণব্যবস্থা, মানুষের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি, মানুষের সুখশান্তি ও মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু বোঝায় তাহার সবই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভগবানের দেওয়া আলোবাতাসের মধ্যে আর মানুষের থাকিবার জো নাই। মাটির নীচে থাকার ব্যবস্থা করিয়াও আজ সে স্বস্তি বোধ করিতেছে না। আজ তাহাকে সত্য, অহিংসা, পারস্পরিক প্রীতি ও সদিচ্ছার এবং যেখানে সংগ্রাম করিতে হয় সেখানেও পরিচ্ছন্ন কৌশলপ্রয়োগের কথা শোনানো কঠিন।

কিন্তু আরম্ভ তো কোথাও করিতে হইবে! কর্মে, জ্ঞানে, হৃদয়বত্তায়, যার যেখানে যে যে সম্পদ আছে তাহা লইয়া অগ্রসর তো হইতে হইবে! গান্ধীজীর প্রচেষ্টাও সেই মানবহিতের প্রচেষ্টা, তাঁহার মত তিনি একদিক দিয়া কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন, পথ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানবজাতি সেই পথ গ্রহণ করিবে কি না, সেই পদ্ধতির আর নূতন কোন পরীক্ষা ও প্রয়োগ হইবে কি না, ভবিষ্যতই তাহা বলিতে পারে।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ

॥ বিধুভূষণ দাশগুপ্ত ॥

গান্ধীজী ছিলেন আজীবন সত্যাগ্রহী। সত্যের প্রতি আগ্রহই ছিল তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি। যাহা তাঁহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত তাহার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। কোন বাধাই তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐরূপ কোন কার্য যদি তাঁহার নিকট ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত তবে তাহা পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না। এইজন্য তাঁহাকে যতই তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হউক না কেন তিনি তাহা মোটেই গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার মধ্যে সত্য পথে চলার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ভ্রান্তি স্বীকারের নম্রতা ও তেজস্বিতা ওতঃপ্রোত ছিল। সারা জীবন ধরিয়াই তিনি ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বস্তরে সত্য বা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহার তপশ্চর্যার বা ক্লেশ স্বীকারের সীমা ছিল না।

তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের সংগ্রামময় জীবনে সত্যাগ্রহের জন্য তাঁহাকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি সেখানকার সরকার ও শ্বেতাঙ্গদের যে অবিচার ও অত্যাচার ছিল তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের মধ্য দিয়াই তিনি সত্যাগ্রহ অস্ত্র আবিষ্কার করেন। এই সত্যাগ্রহ অস্ত্রের তিনি একাধারে আবিষ্কর্তা ও প্রয়োগকর্তা ছিলেন। বৈজ্ঞানিক যেমন স্বীয় গবেষণালব্ধ সত্যকে যাচাই করিবার জন্য নানাভাবে পরীক্ষা চালাইয়া থাকেন গান্ধীজীও তেমনই তাঁহার এই নবলব্ধ সত্যের যাচাই দীর্ঘদিন যাবৎ বহুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে (সত্যাগ্রহকে) দুর্বলের অস্ত্র মনে করিয়া ইহাকে Passive Resistance-এর সহিত তুলনা করেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সত্যাগ্রহ দুর্বলের অস্ত্র হইতে পারে না। দুর্বল ব্যক্তি বা জাতিসকল সত্যাগ্রহ করিতে অক্ষম। কেননা সত্যাগ্রহের মধ্যে যেমন ন্যায়বিচার লাভের তেজ এবং আগ্রহ থাকিবে তেমনি থাকা উচিত হইবে প্রতিপক্ষের প্রতিও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা। প্রতিপক্ষের প্রতি প্রেমভাব বজায় না থাকিলে তাহা সত্যাগ্রহ পদবাচ্য হয় না। কেননা, সত্যাগ্রহী যখনই প্রতিপক্ষের নিকট ন্যায়ের দাবি করিবেন তখনই প্রতিপক্ষের

প্রতিও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এইরূপ পক্ষপাতহীন ব্যক্তিই সত্যাগ্রহ করিতে সমর্থ আর এইরূপ সমদর্শী ব্যক্তিই শুদ্ধ ন্যায়ের জন্য লড়াই করিতে পারেন। বলা বাহুল্য দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। এইজন্য অবশ্যই সত্যাগ্রহীকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহাশ্রম তাহারই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অন্যায়ের প্রতিকার ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এক মৌলিক অবদান। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী যে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন সেই সূত্রেই তিনি এই নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য কালের প্রয়োজনেই যেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। গীতার কর্ম্মযোগীর আদর্শ এবং থোরো, রাস্কিন ও টলস্টয়ের প্রচারিত জীবনাদর্শ হইতে গান্ধীজী যে নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাই সমাজশাস্ত্রের এই নূতন অধ্যায় রচনার কাজে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

যাঁহারা সত্যাগ্রহকে দুর্বলের অস্ত্র বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের দুর্বল ও সবল সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'বল' সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইল দৈহিক বল বা অস্ত্রবল। এই বল যাহার নাই তিনিই সত্যাগ্রহের কথা বলিয়া থাকেন, এইরূপ অভিযোগ করিবার পূর্বে সবল-দুর্বল সম্বন্ধে আর একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। 'বল' মানে শারীরিক বল বা অস্ত্রবল নয়। 'বল' মানে মানসিক বল বা আত্মিক বল। ন্যায়ের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। যেমন একজন প্রহ্লাদের বল শত শত হিরণ্যকশিপুর অপেক্ষা অধিক। একজন খ্রীষ্ট, একজন সক্রেটিস, একজন এমার্সন, একজন টলস্টয়, একজন রামমোহন, একজন বিবেকানন্দ, একজন বিদ্যাসাগর যাঁহাদের অপরিসীম চারিত্রশক্তি এবং দুর্ধর্ষ মনোবল ছিল তাঁহারা কোন দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রশক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করিতে পারেন না। শস্ত্রধারীরাই তাঁহাদের স্বার্থলেশশূন্য ন্যায়বোধের নিকট মাথা নোয়াইয়া পরাভব স্বীকার করে। তবে একথা ঠিক যে, দৈহিক বল বাড়াইবার জন্য যেমন নিয়মিত প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন তেমনি মানসিক বল বা সাত্ত্বিক বল বাড়াইবার জন্যও নিত্যনিরন্তর সাধনা করা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহ দুর্বলের অস্ত্র একথা বলার কোন অর্থ হয় না ; বরং সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার না করিলে প্রকৃত সত্যাগ্রহী হওয়াই যায় না। এজন্য সত্যাগ্রহীকে নিরন্তর আত্মানুসন্ধান করিয়া যাইতে হয়। এইভাবে যতই তিনি দুর্বলতামুক্ত

হইতে থাকিবেন, নির্মল হইতে থাকিবেন ততই তিনি সত্যাগ্রহের অধিকাধিক যোগ্য হইতে থাকিবেন। বুকের পাটা মাপিয়া সৈন্যদলে ভর্তি করা হয় কিন্তু দৈহিক যোগ্যতার মানদণ্ডে সত্যাগ্রহী নির্ণীত হয় না। সত্যাগ্রহীকে প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের জন্য মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিন্তু কোন দুর্বলচিত্ত লোক কি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে? সত্যাগ্রহীর জীবনে আঘাত সহ্য করার ও প্রত্যাঘাতের ইচ্ছাও মনে উদিত না হওয়ার মতো প্রচণ্ড মনোবলের প্রয়োজন—ইহাই সত্যাগ্রহের শক্তি। গান্ধীজী বলিয়াছেন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করিয়া প্রতিপক্ষের কঠোর হৃদয়ে চেতনা ও ন্যায়বোধ ফিরাইয়া আনিবেন। আঘাত খাইয়া জয়লাভ করিতে হইবে, আঘাত দিয়া নয়। সত্যাগ্রহীর অন্তরে থাকিবে অন্যায়কারীর প্রতি প্রেমের উৎস।

কেহ কেহ গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে আপনার এই আত্মিক তথা সত্যশক্তির সফল প্রয়োগের কোন ঐতিহাসিক নজির আছে কি? কোন দেশ আত্মিক শক্তির সাহায্যে উন্নীত হইয়াছে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত তো দেখা যায় না। দুষ্কৃতকারী কোন দৈহিক শাস্তি ছাড়াই যে কুকর্ম ত্যাগ করিবে এরূপ সন্দেহ অনেকে করেন। ইহার উত্তরে গান্ধীজী তাঁহার "হিন্দ স্বরাজ্য" পুস্তকে (দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ চলাকালে) লিখিয়াছিলেন—দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয়, ঠিক তেমনই আমি ইহাতে বিশ্বাসী। এই প্রেমশক্তি আত্মিক শক্তি বা সত্য শক্তি ইহারা সব এক। ইহা যে সর্বক্ষণ কাজ করে প্রতিপদেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের নজির তুলেন ইতিহাসের অর্থ কি তাহা তাঁহাদের প্রথমে বুঝা দরকার। যাহা ঘটিয়াছে যদি তাহাই ইতিহাস হয় তবে সেরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। কিন্তু ইতিহাস অর্থে যদি রাজামহারাজারা কি করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহাই বুঝায় তবে আত্মিক শক্তির দৃষ্টান্ত বিরল। যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বর্তমান ইতিহাস আপ্লুত বলিয়া ইংরাজীতে একটি যথার্থ প্রবাদ আছে যে, যে দেশের কোন ইতিহাস নাই, সেই দেশ সুখী। যে প্রেমশক্তি সমাজ ও সভ্যতার প্রগতির মূলে আছে তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। পৃথিবীতে কতশত যুদ্ধ, হানাহানির পরেও যে মানুষ বাঁচিয়া আছে ইহাই প্রমাণ করে যে বিশ্বজগতের মূলে আছে এই প্রেমশক্তি। সুতরাং এই শক্তির অস্তিত্ব সর্বব্যাপী, সর্বকালীন। ইহা শাশ্বত।

এই অহিংসা বা প্রেম তখনই সক্রিয় ও ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয় যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনকে এমনভাবে

পুনর্গঠিত করা দরকার যাহাতে মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে যেমন অহিংস আচরণ করিবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন কাজও তেমনি সহযোগীভাবে চালাইতে শিখিবে। অর্থাৎ সামুহিকভাবে অহিংস জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইলে সংগঠিত হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ জয়যুক্ত হইতে পারে। ইহার জন্য নূতন একশোষণ-মুক্ত সামাজিক তথা আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। ইহার উদ্ভাবনই গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য। হিংসাকে জয় করিবার বাস্তব এবং সক্রিয় পন্থারূপে সত্যাগ্রহের আত্ম-প্রকাশ। গান্ধীজীর এই অবদান মানবজাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়রূপে চিহ্নিত থাকিবে। সত্যাগ্রহ এমন এক শাস্ত্র যাহার নিত্যনূতন গুণগত বিকাশ আজিও হইতেছে। এইজন্য গান্ধীজী নিজেকে প্রথম সত্যাগ্রহী রূপে দাবি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"প্রায় সর্বজনীনভাবে এই নীতির প্রয়োগ করার দাবিটুকুই আমি করি এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে হাজার হাজার সাধারণ মানুষও যাহাতে এই নীতির সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় তাহাই প্রমাণ করার কাজ বাকী আছে।"

সত্যাগ্রহ এক বিশেষ ধরনের সংগ্রাম। ইহাতে জয় পরাজয় বলিয়া কিছু নাই। সত্যাগ্রহ ও যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ? সত্যাগ্রহও তো এক-প্রকারের প্রতিরোধ। যুদ্ধের লক্ষ্য অত্যাচার নিগ্রহ, ধ্বংস। সত্যাগ্রহ বলে হৃদয় পরিবর্তনের কথা। যুদ্ধে প্রতিপক্ষের শাস্তি বিধানই মূলকথা। সত্যাগ্রহীকে সেখানে নিজের উপরেই চরম দুঃখ হাসিমুখে আহ্বান করিতে হয়। "সত্যাগ্রহীর কখনও অধৈর্য হইলে চলে না। অধৈর্য হওয়াই হিংসার অন্য রূপ। সত্যাগ্রহী জয়ের চিন্তা করে না। জয় তাহার সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার ঈশ্বরই তাহার মালিক। দুঃখভোগই তাহার জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ যুদ্ধের ন্যায় সত্যাগ্রহে হারজিত বলিয়া কিছু নাই। আমি জিতিলাম আর তিনি হারিলেন এই রকম কল্পনা সত্যাগ্রহ শাস্ত্রে নাই। সত্যাগ্রহে উভয় পক্ষেরই জিত হওয়া চাই। যদি আমার জয় আর তাহার পরাজয় হয় তবে তাহাতেও আমারই পরাজয় হইবে—ইহাই সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য।

এখন দেখা যাক সত্যাগ্রহীর লক্ষণ কিরূপ হইবে। সত্যাগ্রহে সংস্থার কোন মূল্য নাই। ব্যক্তির ও গুণের মূল্যই অধিক, বিশেষ করিয়া যেখানে সত্যাগ্রহীকে প্রচণ্ডতম হিংসার সম্মুখীন হইতে হয়। অন্যায়কারীকে বিব্রত করার মনোভাব সত্যাগ্রহী কখনও পোষণ করিবেন না। তাঁহাকে ভয় দেখান সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য নয়। তাঁহার হৃদয় জয় করাই আসল কাজ। অন্যায়কারীকে নির্যাতিত না করিয়া তাহার হৃদয় পরিবর্তন করাই সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য। এই

দৃষ্টিতে সত্যাগ্রহীর কতকগুলি মৌলিক ও অপরিহার্য গুণের কথা গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

(১) সত্যাগ্রহীকে ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস রাখিতে হইবে, তিনিই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(২) সত্য ও অহিংসা তাহার জীবনব্রত হইবে। সেজন্য তাহাকে মানুষের মৌলিক সততায় আস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) সে পবিত্র জীবন যাপন করিবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে নিজ জীবন ও সম্পত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে।

(৪) নিয়মিত সূতা কাটিবে ও খাদি পরিধান করিবে। ভারতের পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

(৫) সকল রকম নেশা, মাদকতা হইতে সে মুক্ত থাকিবে যাহাতে তাহার যুক্তি ও চিন্তা স্বচ্ছ থাকে।

(৬) সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম শৃঙ্খলা করা হইবে স্বেচ্ছায় সে তাহা পালন করিবে।

(৭) জেলের অনুশাসনও সে মানিয়া চলিবে যদি না তাহার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

ইহাই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি যে, তাহার কাজে শত্রুর অন্তরে কখনও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় না।

সত্যাগ্রহ নানা প্রকারের হইতে পারে। সত্যাগ্রহী অন্যায়ের সহিত অসহযোগ করে কিন্তু অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে নহে। অনশনও সত্যাগ্রহের এক রূপ। কিন্তু ইহা সত্যাগ্রহীর অস্ত্রশালার শেষ অস্ত্র। সত্যাগ্রহের দ্বারা আইন অমান্য বুঝায়। আইন অমান্যের অর্থ সরকারী অন্যায় আইনের প্রতিকারের জন্য সকলপ্রকার আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হইলে অহিংস উপায়ে শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ। গান্ধীজী এইরূপ সত্যাগ্রহ প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার করিয়াছিলেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া চম্পারণে, খেড়ায় ও বারদোলীতে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। নীচে তাঁহার অর্থনৈতিক কারণে অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপিত করিব :—

চম্পারণ সত্যাগ্রহ

চম্পারণ জনক রাজার ভূমি। চম্পারণে এখন যেমন আমের বাগিচা আছে

১৯১৬ সালে তেমনি নীলের ক্ষেত ছিল। নিজের জমির প্রতি বিঘায় ৩ কাঠা করিয়া জমিতে চাষীরা মূল মালিকের জন্য নীল চাষ করিবে,—ইহা ছিল তখনকার নিয়ম। ইহাকে 'তিনকাঠিয়া' প্রথা বলা হইত। বিশ কাঠায় সেখানে এক একর হইত। বিশ কাঠার মধ্যে তিনকাঠা আলাদা করিয়া রাখার নাম 'তিনকাঠিয়া' প্রথা। গান্ধীজী ইতঃপূর্বে চম্পারণের নামও শুনেন নাই। নীলের প্যাকেট তিনি দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহা যে জমিতে হয় এবং তাহার চাষ করিতে গিয়া হাজার হাজার মানুষের উপর যে নিদারুণ নির্যাতন হয় তাহা তিনি মোটেই জানিতেন না।

রাজকুমার শুক্ল নামে একজন কৃষক এই প্রথার দ্বারা উৎপীড়িত হয়। তাই সে গান্ধীজীকে চম্পারণে গিয়া স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখিতে অনুরোধ করে। গান্ধীজী ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে চম্পারণ রওনা হন। চম্পারণের কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করিয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে তাহাদের কি অভিযোগ আছে জানিবার জন্য তিনি চম্পারণ যান। গান্ধীজী মনে করিলেন এই তদন্তে হাত দেওয়ার পূর্বে এ সম্বন্ধে নীলকরদের বক্তব্য জানিয়া লওয়া প্রয়োজন এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্তব্য। উভয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের আবেদন মঞ্জুর হইল। নীলকর সমিতির সম্পাদক তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি (গান্ধীজী) বহিরাগত বলিয়া তাহাদের ও নীলকরদের মধ্যে তাঁহার নাক গলাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে জানাইতে পারেন। গান্ধীজী তাঁহাকে নম্রভাবে জানাইলেন তিনি নিজেকে মোটেই বহিরাগত বলিয়া মনে করেন না এবং নীলচাষীদের যদি অভিরুচি হয় তবে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার সর্ববিধ অধিকার তাঁহার আছে। কমিশনার সাহেব তাঁহাকে অবিলম্বে ত্রিহুত বিভাগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। গান্ধীজী সহকর্মীদের সব ঘটনা জানাইলেন এবং বলিলেন সরকার হয়ত ইহা লইয়া আগাইতে দিবেন না ও তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহার চাইতে হয়ত অনেক তাড়াতাড়ি জেলে যাইতে হইবে। তাই তিনি মনে করিলেন যে গ্রেপ্তার যদি হইতেই হয় তবে মোতিহারী বা সম্ভব হইলে বেতিয়ায় প্রজাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হওয়াই ভাল। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ অঞ্চলে তাঁহার চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন।

চম্পারণ হইল বিহারের ত্রিহুত বিভাগের একটি জেলা এবং মোতিহারীতে

ইহার সদর। রাজকুমার শুক্লের বাড়ী বেত্তিয়ার কাছে ছিল এবং ঐ সব অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা চম্পারণ জেলার ভিতর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ছিল। রাজকুমার শুক্লের আগ্রহ ছিল যে গান্ধীজী ঐ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং তিনি নিজেও তাহা চাহিতেছিলেন। তাই তিনি সেই দিনই তাহার সহকর্মীদের লইয়া মোতিহারী রওনা হইলেন। আর ঐদিনই তাহাদের নিকট খবর পৌছিল যে মোতিহারী হইতে কিছু দূরে একজন কৃষকের উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। স্থির হইল যে পরদিন সকালে তিনি ধরণীধরবাবু সহ ঘটনাস্থলে গিয়া সেই কৃষকটির সহিত দেখা করিবেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে তাহারা ঘটনাস্থলে রওনা হইলেন। অর্ধপথ যাইবার পূর্বেই পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশ লইয়া তাঁহার জনৈক কর্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে পুলিস সাহেব তাঁহাকে সেলাম জানাইয়াছেন। ইহার অর্থ তিনি বুঝিতে পারিলেন। ধরণীধর বাবুকে ঘটনাস্থলে যাইবার পরামর্শ দিয়া তিনি পুলিস সাহেবের কর্মচারী যে গাড়ী আনিয়াছিল তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। পুলিস কর্মচারীটি তখন তাহার উপর অবিলম্বে চম্পারণ জেলা ছাড়িয়া যাইবার এক নির্দেশ জারী করিলেন। গান্ধীজীকে পুলিস সাহেবের নির্দেশের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে বলা হইলে তিনি লিখিয়া দিলেন—তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই জেলা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নন। যদি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন তবে আদেশ পালন না করার জন্য তাঁহাকে যে কোনরূপ দণ্ড দান করিতে পারেন। অতঃপর গান্ধীজীর উপর এক সমন জারী করিয়া জানান হইল যে চম্পারণ ত্যাগ করার নির্দেশ অমান্য করার জন্য পরদিন আদালতে তাঁহার বিচার হইবে।

গান্ধীজীর উপর চম্পারণ ত্যাগের নির্দেশ জারী ও তাহা অমান্য করার জন্য সমন জারীর কথা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি খবর পাইলেন যে সেদিন মোতিহারীতে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে। গোরখবাবুর বাড়ী এবং আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ গান্ধীজী রাত্রেই কাজকর্ম সারিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীসাথীরাও খুব কর্মতৎপরতা দেখাইলেন। জনস্রোত সর্বদা গান্ধীজীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল বলিয়া তাহাদের সর্বদা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছিল। এই ব্যাপারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের সহিত গান্ধীজীর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। তাঁহার উপর যে নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল আইনসঙ্গত উপায়ে তিনি তাহার প্রতিরোধ করিতে

পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি সে সব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সরকারী কর্মচারীদের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিতেছিলেন। এই সব কারণে তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়া গেল যে গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের কাউকে অসম্মান করিতে চাহেন না। তাঁহার লক্ষ্য হইল সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য করা। এইভাবে সরকারী কর্মচারীরাও গান্ধীজীর সহিত খুব ভদ্র আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জনতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে গান্ধীজী ও সহকর্মীদের সহায়তা লইতে লাগিলেন। তবে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। অন্তত তখনকার মতো জনসাধারণের মনে আর শাস্তির ভয় রহিল না এবং তাহারা তখন তাহাদের নবলব্ধ মিত্রদের প্রেমশক্তির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতেছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে চম্পারণে গান্ধীজী একেবারে অপরিচিত ছিলেন। তবুও চম্পারণবাসিগণ তাঁহার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যে তিনি যেন তাহাদের কতকালের বন্ধু। কৃষকদের সঙ্গে এই সম্পর্কের ফলে গান্ধীজী ঈশ্বর, অহিংসা ও সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। চম্পারণের সেই দিনটি তাঁহার পক্ষে এক অত্যন্ত গৌরবজনক পুণ্যলগ্ন ছিল।

বিচার আরম্ভ হইল। সরকারী উকিল অনেক বই আনিয়া গাদা করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন অনেক আইনের তর্ক উঠিতে পারে—আপীল তো হইবেই। কাজেই সব নজির ঠিকঠাক করিয়া তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে যখন বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার উকিল কে?" গান্ধীজী উত্তর দিলেন—"আমার কোন উকিল নাই।" সকলে বিস্ময় বোধ করিল, তারপর ভাবিল, ইনি নিজে যখন একজন বড় ব্যারিস্টার তখন নিশ্চয়ই নিজেই নিজের পক্ষে ওকালতি করিবেন।

কিন্তু এসব কিছুই হইল না। গান্ধীজীকে সওয়াল জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন—তিনি ১৪৪ ধারার নোটিস পাইয়া যে পত্র ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়াছিলেন তাহা নথিভুক্ত করা হউক। কিন্তু সে পত্র তখন আদালতে ছিল না। গান্ধীজী তখন কোর্টে এক বিবৃতি দিলেন—সকলে উৎকর্ণ হইয়া সেই বিবৃতি শুনিতে লাগিল।

"আদালতের অনুমতি লইয়া আমি ১৪৪ ধারার আদেশ ভঙ্গ করার মত গুরুতর কার্য কেন করিয়াছি তাহা জানাইতে চাই। আমার বিবেচনায় এই ব্যাপারটা আমার সহিত স্থানীয় সরকারের মতভেদের জন্যই উপস্থিত হইয়াছে।

আমি জনসেবার জন্য ও দেশসেবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। প্রজারা বলে যে নীলকরদের ব্যবহার তাহাদের প্রতি ভাল নয়। প্রজারা আমাকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করাতেই আমি আসিয়াছি। বিষয়টির অনুসন্ধান না করিলে তো আমি প্রজাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারি না। সেইজন্য সম্ভব হইলে আমি সরকার ও নীলকরদের সাহায্য লইয়াই এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি। আমার এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমার আসার জন্য যে কাহারও জীবন বিপন্ন হইতে পারে বা শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে আমার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সরকার অন্যপ্রকার মনে করিয়াছেন। সরকারের অসুবিধা আমি বুঝিতে পারি। সরকার যে প্রকার সংবাদ পান তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে কার্য করিতে হয়—তাহা আমি বুঝি। আইনমান্যকারী প্রজা হিসাবে সরকারের আদেশ পাইয়া তাহা মান্য করার প্রবৃত্তিই আমার স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কর্তব্যবোধকে পীড়া না দিয়া আমি এই আদেশ পালন করিতে পারি না। আমি অনুভব করিতেছি যে প্রজাদের মধ্যে থাকিয়াই আমি তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়া স্থান ত্যাগ আমি করিতে পারি না। এই কর্তব্যসংকটের মধ্যে আমাকে প্রজাদের মধ্য হইতে সরাইয়া লওয়ার দায়িত্ব আমি সরকারের উপরই ফেলিতেছি। আমার মনে হয় যে-অবস্থার ভিতর আমরা বাস করিতেছি তাহাতে আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এক্ষেত্রে আমি যাহা করিয়াছি তাহা করা ছাড়া অর্থাৎ বিনা আপত্তিতে আইন অমান্য করার দণ্ড গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। দণ্ডাদেশ কম করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আমি এই সাফাই করিতেছি না। আমি কেবল এই কথাই জানাইতে চাই—আমি যে সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া আইনভঙ্গ করিয়াছি তাহার হেতু কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার অমর্যাদা নয়। আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতর নিয়ম মান্য করা, আত্মার নির্দেশ গ্রাহ্য করার জন্যই আইনের আদেশ অমান্য করিয়াছি।”

আদালত এই প্রকার বয়ান শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা বে-আইনী ইহাই প্রমাণের চেষ্টা করা হইবে—হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল চলিবে—এই সব মামুলি ব্যাপার হইবে বলিয়া কোর্ট ও সরকারী উকিল প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। অপরাধ স্বীকার সূচক বিবৃতি দিয়া গান্ধীজী ম্যাজিস্ট্রেটকে ফাঁপরে ফেলিলেন। তিনি গান্ধীজীকে অপরাধী কি-না জিজ্ঞাসা করায় গান্ধীজী জবাব দেন যে, যাহা বলার তাহা তিনি ইতঃপূর্বেই বলিয়াছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট তবুও বলেন যে তাহাতে আপনি অপরাধী কি-না একথা পরিষ্কার হয় নাই। তখন গান্ধীজী বলেন—তিনি আদালতের সময় বাঁচাইতে চান। তিনি স্বীকার করিতেছেন যে তিনি অপরাধী। হাকিম ইহাতে আরও মুশকিলে পড়েন। তিনি বলেন যে, গান্ধীজী যদি এখনও জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যান তবে আদেশ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। গান্ধীজী বলেন, "জেলা ছাড়িয়া যাওয়া দূরের কথা, জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি এইখানে বাড়ী করিয়া বসিয়া যাইবেন।" হাকিম চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি বলেন, এই বিষয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক এইজন্য মকদ্দমার রায় স্থগিত রাখিয়া তিনি বেলা তিনটার সময় গান্ধীজীকে পুনরায় কোর্টে হাজির হইতে বলেন। তখন হুকুম দেওয়া হইবে।

তিনটার সময় কোর্টে আসিলে বিচারক তিন দিন পর হুকুম দিবেন বলিয়া দিন ফেলেন ও ১০০৲ টাকার জামিন চান। গান্ধীজী বলেন—তাঁহার কোন জামিন নাই। আর জামিন তিনি দিবেনও না। তখন তাঁহাকে বিনা জামিনেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সাজা গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজির হইবার পূর্বমুহূর্তে বিচারের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে লিখিতভাবে জানাইলেন যে, বিহারের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর মহোদয় তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি অবাধে তদন্তের কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন এবং সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে তিনি যে কোন সাহায্য পাইবার অধিকারী। এত তাড়াতাড়ি এইভাবে এইরূপ সমাধান হইয়া যাইবে একথা গান্ধীজীও ভাবিতে পারেন নাই। হাজার হাজার কৃষক প্রতিদিন তাহাদের জবানবন্দী লিখাইতে লাগিল। যেখানে বসিয়া জবানবন্দী লওয়া হইত তাহার আশেপাশে চতুর্দিকে কৃষক প্রজাদের ও তাহাদের সঙ্গীদের জন্য লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইতে লাগিল। জবানবন্দী লিখাইবার সময় পুলিস কর্মচারীরাও উপস্থিত থাকিতেন। তাহাতে জবানবন্দীতে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা কমিয়া যাইত।

প্রতিদিনই অধিক হইতে অধিকতর রায়ত গান্ধীজী ও সহকর্মীদের নিকট জবানবন্দী দিবার জন্য আসিতেছিল। তাহাতে নীলকরদের ক্রোধ বাড়িয়াই যাইতেছিল। এবং এই তদন্তকার্য যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় তাহার জন্য নানাভাবে চক্রান্ত করিতেছিল। কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এড্‌ওয়ার্ড্‌ গ্যাট্‌ গান্ধীজীকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন, তিনি একটি

সরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক এবং গান্ধীজী ঐ কমিটির সদস্য হইতে সম্মতি জানাইলে তিনি সুখী হইবেন। গান্ধীজী সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত সরকারী কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘদিন তদন্তের পর কমিটির রায় বাহির হইল। কমিটি রায়তদের স্বপক্ষে রায় দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে নীলকররা চাষীদের নিকট হইতে এযাবৎ অন্যায়ভাবে যাহা আদায় করিয়াছে তাহার একাংশ ফেরত দিতে হইবে। কমিটি ইহাও সুপারিশ করিলেন যে, 'তিনকাঠিয়া' প্রথাকে আইনবলে উচ্ছেদ করা উচিত। সরকার কমিটির রায় পুরাপুরি মানিয়া লইলেন। প্রজারা জানিতে পারিল যে, তাহারা নীলকরদের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছে। এক নির্দিষ্ট খাজনা ব্যতীত মালিককে আর কিছুই দিতে হইবে না। এই রায়ের ফলে এক বেতিয়া থানার প্রজাদেরই নীলকরদের ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিতে হয়।

এইভাবে বিগত এক শতাব্দী যাবৎ প্রজাদের উপর যে নিদারুণ উৎপীড়ন চালান হইতেছিল তাহার অবসান ঘটিল এবং নীলকরদের জুলুমের রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি হইল।

আহমেদাবাদের শ্রমিক সত্যাগ্রহ

এই সময় আহমেদাবাদের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমতী অনুসূয়াবেনের নিকট হইতে গান্ধীজীর নিকট একটি পত্র আসিল। শ্রমিকদের বেতন অত্যন্ত কম ছিল এবং বহুদিন যাবৎ তাহারা ইহার বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। শ্রমিকদের অন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য গান্ধীজী অবিলম্বে চম্পারণ হইতে আহমেদাবাদ রওনা হইলেন। সেখানে পৌছিয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। শ্রমিকদের দাবি অবশ্য ন্যায্যই ছিল। তবে শ্রীমতী অনুসূয়াবেনকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীঅম্বালাল সরাভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইতেছিল। কারণ তিনিই ছিলেন মিল মালিকদের নেতৃস্থানীয়। তাঁহাদের সঙ্গে গান্ধীজীর খুবই মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল এবং সেইজন্য সংগ্রাম আরও কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি মালিকবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিলেন এবং বিবাদটা মিটাইবার জন্য কোন সালিসীর হাতে তুলিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহারা কিন্তু নীতিগত কারণে সালিসীপ্রথা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর গান্ধীজী শ্রমিকদের ধর্মঘট করিতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ দিবার পূর্বে তিনি শ্রমিকসমাজ ও তাহাদের নেতৃবর্গের

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সাফল্যের সঙ্গে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিধানাবলী পালন করা অপরিহার্য।

(১) কখনও হিংসার আশ্রয় লওয়া চলিবে না।

(২) ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের উপর কোনরকম জোরজুলুম করা চলিবে না।

(৩) ধর্মঘট চলাকালে চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া থাকা কোনমতেই উচিত হইবে না।

(৪) ধর্মঘট যতদিনই চলুক না কেন ধর্মঘটীদের দৃঢ় থাকিতে হইবে ও ধর্মঘট চলার সময় অন্য কোন সৎপন্থায় জীবিকা উপার্জন করিতে হইবে।

ধর্মঘটের নায়কেরা গান্ধীজীর বক্তব্য বুঝিয়া তাঁহার শর্তাবলী স্বীকার করিলেন। তদনুযায়ী শ্রমিকরা এক প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, তাহাদের দাবি পূর্ণ না হইলে অথবা দাবি বিচার করার জন্য মিল মালিকেরা সালিস নিয়োগ না করিলে তাহারা কেহই কাজে যোগদান করিবে না।

প্রথম দুই সপ্তাহ পর্যন্ত শ্রমিকেরা যথেষ্ট মনোবল ও আত্মসংযমের পরিচয় দিল ও এই সময় তাহারা প্রতিদিন বিরাট জনসভায় মিলিত হইয়া তাহাদের সঙ্কল্প পুনঃ ঘোষণা করিতেছিল। সভায় গান্ধীজীকে তাহারা এই প্রতিশ্রুতি দিল যে কথার খেলাপ করা অপেক্ষা তাহারা বরং মৃত্যু বরণ করিবে।

কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। গান্ধীজী অত্যন্ত উদ্‌বেগ বোধ করিতে লাগিলেন এবং এই অবস্থায় তাঁহার কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন সকালে শ্রমিকদের সভা চলিতেছিল তখনও পর্যন্ত গান্ধীজী কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অন্ধকারেই হাতড়াইতেছিলেন। সভায় তিনি শ্রমিকদের নিকট বক্তৃতা দিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ যেন তিনি আলোর সন্ধান পাইলেন। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিজে হইতেই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—ধর্মঘটী শ্রমিকেরা আবার ঐক্যবদ্ধ হরতাল চালাইয়া মালিকদের সঙ্গে একটা রফায় না পৌছান পর্যন্ত অথবা তাহাদের চিরতরে মিলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করিবেন না।

শ্রমিকদের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। অনুসূয়াবেনের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। মজুররা চিৎকার করিয়া উঠিল—"আপনি নন, আমরাই উপবাস করিব। আপনার অনশন অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার জন্য এবারকার মত আমাদের ক্ষমা করুন। এবার আমরা

কথা দিতেছি যে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনার কাছে অনুগত থাকিব।"

উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন—"আপনাদের অনশন করার প্রয়োজন নাই। আপনাদের নিজ সংকল্পে অটুট থাকাই যথেষ্ট। আপনারা জানেন যে, আমাদের হাতে সঞ্চিত অর্থ নাই এবং জনসাধারণের নিকট হইতে দান লইয়া আমরা এ ধর্মঘট চালাইতে চাই না। অতএব বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যতটা না হইলে নয় তাহা আপনাদের কোন রকমের মজুরী করিয়া উপার্জন করিতে হইবে। তাহা হইলে ধর্মঘট যতদিন চলুক না কেন আপনাদের কোন উদ্‌বেগের কারণ ঘটিবে না। তবে আমার অনশন ধর্মঘটের একটা নিষ্পত্তি হওয়ার পরই শেষ হইবে।"

অনুসূয়াবেন এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক প্রথম দিন গান্ধীজীর সঙ্গে অনশন করিলেন তাঁহাদের উপবাস যাহাতে আরও দীর্ঘস্থায়ী না হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য গান্ধীজীকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইহার পরিণাম এই হইল যে, চতুর্দিকে বেশ একটা শুভেচ্ছার পরিবেশ সৃষ্টি হইল। এই ঘটনা মিল মালিকদেরও হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তাঁহারা একটা আপস রফার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। শ্রীআনন্দশঙ্কর ধ্রুব মধ্যস্থতা করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে এই ব্যাপারে সালিস নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে গান্ধীজীর উপবাসের মাত্র তিন দিনের মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইল। মিল মালিকেরা শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে মিঠাই বণ্টন করিয়া এই শুভ ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করিলেন এবং ধর্মঘট আরম্ভ হইবার একুশ দিনের মধ্যে এই ভাবে উহার নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

এই মিটমাট সম্পর্কে একটি রসপূর্ণ অথচ করুণা উদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। মালিকেরা প্রচুর মিঠাই তৈয়ারী করাইয়াছিল। কি করিয়া উহা পরিবেশন করা যায় সে সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠল। যে ঝাউগাছের তলায় মজুরেরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছিল সেখানেই মিঠাই বিতরণ করা ভাল। এত লোকের উপযুক্ত অন্য সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাইবে না বলিয়া সেই খোলা মাঠেই মিঠাই বিতরণ করা স্থির হয়। গান্ধীজী মনে করিয়াছিলেন যে একুশ দিন পর্যন্ত যাহারা নিয়ম পালন করিয়া আছে তাহারা এ সময়ে অবশ্যই স্থির দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঠাই লইবে। দুই তিন মিনিট স্থির থাকার পরই লাইন ভাঙ্গিয়া ভিড়ে পরিণত হইল। মজুরদের প্রধানেরা খুব চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মজুরেরা ঠেলাঠেলি করিয়া মিঠাইয়ের উপর গিয়া পড়ে ও কতক মিঠাই মাটিতে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া নষ্ট হয়। ফলে ময়দানে বিতরণ বন্ধ করিতে

হয় ও অতিকষ্টে যতটা মিঠাই বাঁচানো গিয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত অম্বালালের বাংলোয় লইয়া যাওয়া হয়। পরের দিন ঐ মিঠাই বাংলোর মাঠে বিতরণ করা হইবে শুনিয়া আহামেদাবাদের ভিখারীরা সব সেখানে জড় হয় এবং তাহারাই লাইন ভাঙ্গিয়া মিঠাইয়ের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। ইহা ছিল ঐ ঘটনার করুণ দিক। এ দেশের লোক ক্ষুধায় এত পীড়িত যে ভিখারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং তাহাদের আহার পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা সাধারণ মর্যাদাবোধও লোপ করিয়া দিয়াছে। ধনীরা এই ভিখারীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করিয়া নির্ভাবনায় ভিক্ষা দিয়া পুষিতেছেন।

খেড়া সত্যাগ্রহ

আহামেদাবাদের শ্রমিকদের হরতাল শেষ হওয়ার পর গান্ধীজী নিঃশ্বাস লওয়ারও অবকাশ পাইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে খেড়া জেলার সত্যাগ্রহের কাজ হাতে লইতে হয়। অনাবৃষ্টির দরুন খেড়া জেলায় প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছিল। খেড়ার কৃষকেরা তাই সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানাইয়াছিল যে সে-বৎসরের ভূমিকর যেন সংগ্রহ করা না হয়। এই বিষয়ে শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন।

গান্ধীজী বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের সহিত দেখা করেন। শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ড্যা ও শ্রীশঙ্করলাল পরীখ এজন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীগোকুলদাস পরীখ ও শ্রীবিঠলভাই প্যাটেলের সাহায্যে তাঁহারা কাউন্সিলে খাজনা মাফ করার জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন। সরকারের নিকট ডেপুটেশন পাঠান হইয়াছিল।

এই সময় গান্ধীজী গুজরাট সভার সভাপতি ছিলেন। সভা হইতে কমিশনার ও গভর্ণরের নিকট দরখাস্ত পাঠান হইল। টেলিগ্রাম করা হইল। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে অপমান ছাড়া আর কিছুই লাভ হইল না। তাঁহারা সভাকে ধমক দিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু গান্ধীজী সব সহ্য করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

প্রজাদের দাবি এত সামান্য ছিল যে তাহা বিরোধ করারই যোগ্য ছিল না। যে বৎসর চার আনা বা চার আনার কম পরিমাণ ফসল হয় সে বৎসর খাজনা মাফ হওয়ার নিয়ম ছিল কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা দাবি করিতেছিলেন ফসল চার আনার বেশী হইয়াছে। প্রজাদের নিকট হইতে যে প্রমাণ ছিল তাহাতে ফসল

চার আনার কমই হইয়াছিল। কিন্তু সরকার তাহা মানিবেন কেন? লোকের নিকট হইতে সালিস নিয়োগ করার অনুরোধ গেল সরকারের নিকট। তাহা অসহ্য বোধ হইল। যতটা অনুনয় করা যায় তাহা করার পর গান্ধীজী প্রজাদিগকে সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গীদের মধ্যে খেড়া জেলার সেবকগণ বাদে শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার অনুসূয়াবেন, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি ছিলেন। বল্লভভাইয়ের ওকালতিতে উপার্জন খুব বেশী ছিল ও ব্যবসা বাড়িয়া যাইতেছিল। তিনি তাহা ছাড়িয়া আসিলেন, তাহার পর তাঁহার আর স্থির হইয়া বসিয়া ওকালতি করাই হয় নাই।

সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বে নিম্ন প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক প্রজাকে দিয়া স্বাক্ষর করান হইল।—

"আমাদের গ্রামের ফসল চার আনার বেশী হয় নাই, ইহা আমরা জানি। এই কারণে খাজনা আদায় আগামী বৎসর পর্যন্ত মুলতবী রাখার জন্য আমরা সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও আদায় বন্ধ করাইতে পারি নাই। সেইজন্য আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই বৎসরের পুরা বাকী খাজনা অথবা আমাদের মধ্যে যাহার আংশিক বাকী আছে সেই আংশিক খাজনা আমরা দিব না। এই খাজনা আদায় করার জন্য সরকার আইন অনুসারে যাহা করিতে চান করিতে দিব এবং তাহার জন্য দুঃখ সহ্য করিব। আমাদের জমিও যদি বাজেয়াপ্ত করা হয় তাহা হইলেও আমরা হাতে তুলিয়া খাজনা দিয়া আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া আত্মসম্মান বিসর্জন দিব না। সরকার যদি আগামী কিস্তি আদায় সমগ্র জেলায় মুলতবী রাখেন তবে আমাদের মধ্যে যাহাদের শক্তি আছে তাহারা পুরা অথবা আংশিক বাকী খাজনা জমা দিতে প্রস্তুত হইব। আমাদের মধ্যে যাহাদের খাজনা দিবার শক্তি আছে এমন লোকদেরও খাজনা না দেওয়ার কারণ এই যে, যাহাদের শক্তি আছে তাহারা খাজনা দিলে যাহাদের শক্তি নাই তাহাদের উপর চাপ পড়িবে এবং তাহারা ভয়ে যাহা পাইবে তাহাই বিক্রয় করিয়া অথবা ঋণ করিয়া খাজনা দিতে বাধ্য হইবে এবং পরিণামে অনেকে দুঃখে পড়িবে। এই অবস্থায় গরীবদিগকে বাঁচানো শক্তিমানের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।"

জনসাধারণ প্রথম অবস্থায় প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিলেও সরকার খুব একটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছিল না। কিন্তু

জনসাধারণের দৃঢ়তা তিলমাত্র হ্রাস পাইবার লক্ষণ না দেখা দেওয়ায় সরকার অতঃপর দমননীতির আশ্রয় লইলেন। সরকারী কর্মচারীরা চাষীদের গবাদি পশু জোরপূর্বক বিক্রয় করিয়া দিতে লাগিল এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। অনেকের উপর ক্রোক পরোয়ানা জারী করা হইল এবং বহু ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসলও বাজেয়াপ্ত করা হইল।

চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় সংবাদপত্রের আন্দোলন বর্জন করা হইয়াছিল বলিয়া বাহিরের লোক উহাতে খুব বেশী আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। খেড়ার যুদ্ধ সংবাদপত্রে উঠিয়া গিয়াছিল। গুজরাটীরা এই নূতন রকম যুদ্ধের আস্বাদ ভাল করিয়া পাইয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার সাফল্যের জন্য দুইহাতে অর্থ খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্যাগ্রহ যুদ্ধ তো টাকা দিয়া চালান যায় না এবং ইহাতে ধনের আবশ্যকতা কমই আছে। গান্ধীজী নিষেধ করিলেও বোম্বাইয়ের শেঠেরা আবশ্যকের অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন।

গান্ধীজী ও কর্মীরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের সত্যাগ্রহের অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন। সরকারী কর্মচারীরা প্রজার মনিব নহে, ভৃত্য। প্রজার পয়সাতেই তাহারা বেতন ভোগ করে ইহা বুঝাইয়া তাহাদের ভয় দূর করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নির্ভয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী হইতে হয় একথা বুঝাইয়া উঠা একরকম অসম্ভব ছিল। একবার সরকারী কর্মচারীর ভয় ত্যাগ করিলে উহাদের দেওয়া অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া কে থাকিতে পারে? সত্যাগ্রহী যদি ঐরূপ অভদ্র আচরণ করে তাহা হইলে সেটা দুধের সঙ্গে বিষ মিশানোর মতোই হয়। বিনয়ের শিক্ষা যে কৃষকেরা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহা গান্ধীজী পরে বুঝিয়াছিলেন। গান্ধীজী এ সম্পর্কে বলেন—"বিনয় সত্যাগ্রহের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম অংশ। বিনয় মানে কেবল সম্মানের সহিত কথা বলাই নয়। বিনয় মানে প্রতিপক্ষের প্রতি মনে মনে সম্মানের ভাব পোষণ করা। সহজভাব রক্ষা করা ও তাহাদের হিত ইচ্ছা করা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা।"

সরকারী দমন নীতি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এমনকি শ্রীশঙ্কর লাল পরীখের খাজনা প্রজারা দিয়া ফেলিল। ইহাতে চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। শঙ্করলাল পরীখ ঐ জমি সাধারণের হিতার্থে দান করিয়া ফেলিয়া নিজের প্রজাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সরকারী দমন নীতির ফলে যাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল তাহাদের সাহস ফিরাইয়া আনার জন্য গান্ধীজী নূতন একটি পদক্ষেপ লইলেন। একটা

পিঁয়াজের ক্ষেত সরকার অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। মোহনলাল পাণ্ড্যার নেতৃত্বে ঐ পিঁয়াজের ফসল তুলিয়া আনিবার জন্য গান্ধীজী নির্দেশ দিলেন। ঐ কার্য করিলে জেলে যাওয়ার বা অন্য দণ্ড পাওয়ার ভয় ছিল তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। মোহনলাল পাণ্ড্যা তো ইহাই চাহিতেছিলেন। সত্যাগ্রহ সম্মত রীতিতে কেহ জেলে না যাইতেই সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় ইহা তাঁহার পছন্দ হইতেছিল না। তিনি ঐ ক্ষেত হইতে পিঁয়াজ উঠাইয়া আনার ভার লইলেন। তাঁহার সহিত আরও ৭।৮ জন গিয়াছিলেন।

সরকারের পক্ষে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া উপায় ছিল না। মোহনলাল পাণ্ড্যা ও তাহার সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হইল। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। জেলে যাইবার ভয় কাটিয়া গেলে সরকারী দমন নীতি জনগণের মনের জোর বাড়াইয়া দেয়। এক বিরাট শোভাযাত্রা 'আসামীদের' জেল ফটক পর্যন্ত অনুগমন করিল। এবং সেই দিন হইতে শ্রীমোহনলাল পাণ্ড্যা জনসাধারণের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে "ডুংলি চোর" (পিঁয়াজ চোর) আখ্যা পাইলেন।

এই সংগ্রামের অবসানের জন্য গান্ধীজী এমন একটা সম্মানজনক সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান করিতেছিলেন যাহা সত্যাগ্রহীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অকস্মাৎ এই রকম একটি সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। নাড়িয়াদ তালুকের জমিদার গান্ধীজীর কাছে খবর পাঠাইলেন যে স্বচ্ছল অবস্থার কৃষকেরা খাজনা দিয়া দিলে তিনি গরীবদের রেহাই দিতে প্রস্তুত আছেন। গান্ধীজী তাঁহার নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু সমগ্র জেলার জন্য একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটই এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন সেইজন্য গান্ধীজী এ সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট জানাইলেন তিনি ইতিপূর্বেই এই মর্মে নির্দেশ জারী করিয়াছেন। গান্ধীজী ইহা জানিতেন না, তবে এই ঘটনা সত্য হইলে কৃষকেরা যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পূরণ হইয়াছে। গান্ধীজী ইহাতে সন্তোষ লাভ করিলেন।

খেড়া সত্যাগ্রহ গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে এক নবচেতনার সূচনা করে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই বোধ গভীর হইল যে, তাহাদের মুক্তি তাহাদের নিজেদেরই হাতে। নিজেদের দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার উপরই তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান নির্ভরশীল। খেড়ার আন্দোলনের ফলে গুজরাটের মাটিতে সত্যাগ্রহ

দৃঢ়মূল হইল। কৃষকদের জীবনের মধ্যে শিক্ষিতবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রবেশ এই যুদ্ধ হইতেই আরম্ভ হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্রের সীমা ও মর্যাদা এই যুদ্ধ হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বারদৌলী সত্যাগ্রহ

ইহার পর ১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে পুনরায় কৃষক সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। গান্ধীজীর পরিচালনায় প্রধানতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আব্বাস তোয়েবজীর নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ ৫ মাস ২৫ দিন চলিয়া সাফল্য মণ্ডিত হয়। বারদৌলীর ৮০০০ কৃষক সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে। সরকারের অনুমোদন ক্রমে তাহাদের জমির খাজনা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই অযৌক্তিক করবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাহারা কর প্রদান বন্ধ করে। সরকার জোর করিয়া খাজনা আদায়ের সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। জমি নিলাম করেন, গরু মহিষ এমন কি কৃষকদের সামান্য আসবাব ও তৈজসপত্র যাহা ছিল সকলই ক্রোক করিয়া লইয়া যান। বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবুও সমগ্র আন্দোলনটি অহিংস ছিল। চরমতম অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও সত্যাগ্রহী কৃষকগণ অহিংস ছিলেন। ইহা সর্দার বল্লভভাইয়ের নেতৃত্বের গুণেই সম্ভব হইয়াছিল। বারদৌলী সত্যাগ্রহের প্রতি সমর্থন জানাইয়া ১২ই জুন ভারতব্যাপী ধর্মঘট হয়। ইহার পরেই সরকারের টনক নড়ে। ৬ই আগস্ট সরকার নতি স্বীকার করেন। সর্দার প্যাটেলের সহিত তাঁহারা এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তির শর্ত ছিল: (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সকল বন্দী মুক্তি পাইবেন; (২) ক্রোক করা যাবতীয় জিনিস জমিজমা গরু মহিষ বা মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে; (৩) বাড়তি কর বাতিল হইবে। চাষীরা পুরাতন হারে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই চুক্তির দ্বারা বারদৌলী সত্যাগ্রহের অবসান হইল।

এইভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অভিযান একটার পর একটা জয়যুক্ত হইয়া ভারতবাসীকে এক নবশক্তিতে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহার ফলে, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারকে একদিন ভারতীয় মাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হয়।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ

রেজাউল করীম

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ জাতির সহিত আমেরিকার বিরোধের সময় মহামতি বার্ক তাদেরকে একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেন, যখনই তারা কোন শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের মধ্যে পতিত হবে তখনই তাদের কর্তব্য হচ্ছে "Consult the genius of British Constitution।" অর্থাৎ বৃটিশ সংবিধানের নজির থেকে কিংকর্তব্য নির্ধারণ কর। বার্কের মতে বৃটিশ সংবিধান শাসনতান্ত্রিক সমস্যার অব্যর্থ জ্ঞান ভাণ্ডার। এর শিক্ষা বা নজির নিশ্চয় একটা মীমাংসার সূত্র বলে দিবে। বার্কের এই উক্তি স্মরণ করে আমরাও আজ বলব এদেশে যখনই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে কোন সমস্যার উদ্ভব হবে তখনই আমরাও যেন সর্বদাই consult the genius of Gandhi। আমরা যেন গান্ধীজির আদর্শের নিকট আমাদের বিবিধ সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করি। গান্ধীজির প্রতিভা, তাঁর আদর্শ তাঁর কর্মপদ্ধতি এত নিখুঁত ও সর্বকালোপযোগী যে, যদি আমরা কোন সঙ্কটের সময় তাঁর আদর্শ ও নির্দেশ মেনে চলি, তবে আমরা সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারব। এমন কোন সমস্যা নাই যার সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দেন নি। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উৎকট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে সেখানে সামান্য কারণে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়ে থাকে। তার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আজকের দিনে দেশের এই সময়ে আমাদের উচিত যে আমরা যেন গান্ধীজির আদর্শ, উপদেশ ও দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণ করি। তাঁর 'জিনিয়াসের' নিকট যেন নির্দেশ প্রার্থনা করি। তা যদি করি তবে সহজেই বিবিধ প্রকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

গান্ধীজি ভারতবর্ষকে যে সত্যাগ্রহের আদর্শ দিয়েছেন তা একটা পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। সত্যাগ্রহ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মোক্ষম অস্ত্র। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সত্যাগ্রহের সার্থকতা সফলতা ও প্রয়োগবিধি আমরা লক্ষ্য করেছি দীর্ঘ দিন ধরে। আমরা দেখেছি যে, ব্যাপকভাবে এই সত্যাগ্রহের ফলেই বৃটিশের দেড়শত বছরের প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে।

সত্যাগ্রহ এমন একটা পদ্ধতি যা জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে সফলতা এনে দিয়েছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিই এর একমাত্র ক্ষেত্র নয়। সামাজিক, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কট দূর করার দিক দিয়েও সত্যাগ্রহ একটা মোক্ষম পন্থা। স্বাধীনতা লাভই এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত ছিল চিত্ত শুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য সংগঠন, কুটিরশিল্পের উন্নতি, মানুষের জীবনের নৈতিক চরিত্র গঠন। এসব কাজ যে অহিংস পন্থায় হতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ গান্ধীজি বার বার দেখিয়ে দিয়েছেন। সকল অবস্থার মধ্যে সত্যাগ্রহ হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সত্যাগ্রহ বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন Counsel of perfection নয়। এর অপর নাম Soul-Force বা আত্মিক শক্তি। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের কৌশলকে কাজে রূপায়িত করা চলে এবং তা করলে ফল লাভ হবে। অতীতের বহু মহাপুরুষের জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক মহাপুরুষ সত্যাগ্রহ অথবা ঐ ধরনের কোন পন্থা অবলম্বন করে মানুষের মনের পরিবর্তন সাধন করেছেন। কিন্তু গান্ধীজি বোধহয় প্রথম মহাপুরুষ যিনি সত্যাগ্রহকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছেন। গান্ধীজির সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য কি? তার উত্তরে বলব যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যাগ্রহকে কার্যোপযোগী করাই হল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি তাঁর সবল ও সুষ্ঠু নেতৃত্বে, কি দক্ষিণ আফ্রিকাতে, কি ভারতবর্ষে প্রত্যেক দেশে বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের আদর্শকে রূপায়িত করেছেন। এবং তাতে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর জীবনের এই দিকটা সত্যই অতুলনীয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিংসাকে বর্জন করে গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অহিংসাকে একটা নূতন টেকনিক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি এক অভিনব অস্ত্র আবিষ্কার করেন। এটা এমন একটা টেকনিক যা পরিপূর্ণভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যসম্মত। গান্ধীজি প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অন্যায়কে ঘৃণা করে কিন্তু অন্যায়কারীর প্রতি করুণার ভাব দেখায়। অন্যায়কারীর সংশোধন ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য সত্যাগ্রহ প্রযুক্ত হয়। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আইন অমান্যের কথা আছে কিন্তু সে আইন সব সময় হবে 'সিভিল আইন'। সিভিল মানে এই নয় যে, সুযোগ ও সময় অনুসারে কেবল বাহ্যিক দিক দিয়ে ভদ্রতার ভাব দেখান বা ভাল করা। সিভিল বলতে গান্ধীজি মনে

করেন একটা সহজাত ভদ্রতা যা প্রতিপক্ষকে ভালবাসে ও তার সর্ববিধ কল্যাণই কামনা করে। গান্ধীজি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে কতকগুলি যুগান্তকারী অভিযান করেছিলেন। এই সব অভিযানের প্রত্যেকটিতে দেখা গেছে যে যখনই প্রতিপক্ষ বিপদে পড়েছে অথবা কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তখনই গান্ধীজি তাকে সর্ব প্রযত্নে রক্ষা করেছেন বা আশ্রয় দান করেছেন।

এখন দেখা যাক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজি কি ভাবে সত্যাগ্রহের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এদেশে দুর্ভাগ্য ক্রমে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল হয়ে উঠে। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়ে থাকে। এতে বহুলোক হতাহত হয়, বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়, সাধারণ মানুষের মন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে পড়ে। মনের এইরূপ অবস্থার সময় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে না নিজের শত্রু বলে মনে করে এবং সচরাচর শত্রুর প্রতি যে রূপ আচরণ করা হয় এক্ষেত্রে তারা সেইরূপ আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এইভাবে যদি সন্দেহ অবিশ্বাস ও ঘৃণা ব্যাপক হয়ে পড়ে, তাহলে সুস্থ মানসিকতা ও নাগরিক প্রীতি গড়ে ওঠবে না। গান্ধীজি যে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শ স্থাপন করেছেন তা এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার সম্পূর্ণ বিপরীত। গান্ধীজিকে অনেক লোক বলেছিল, "তোমার অহিংস পন্থা এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কার্যকরী হবে না।" হিংসার দ্বারাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু গান্ধীজি দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথেই দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তাদের মূল কারণ দূরীভূত হবে। তিনি আরও বলেন, আমার অহিংসা কেবল স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র নয়, দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করারও অস্ত্র। তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে, দেশে মাঝে মাঝে এই যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তা ভারতের এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকেই উদ্ভূত। ধর্মরক্ষা বলতে তারা যা বুঝে তা ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক নেতার Religo-Political দৃষ্টিভঙ্গী ত্রুটি পূর্ণ। দাঙ্গার মূলে আর একটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে বৃটিশ সরকারের কূটনীতি। গান্ধীজির মতে কোন সুস্থ মানুষ এই সব মনোভাবের দাস হতে পারে না। এদেশে কিছু সংখ্যক লোক সাম্প্রদায়িক নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিকৃত হয়ে নানাপ্রকার অপোকাণ্ড করে থাকে। তারা ধর্মের মূলনীতি ও সার কথা থেকে বিচ্যুত হয়ে এমন সব কাণ্ড করে যার সহিত প্রকৃত ধর্মের কোনই সংশ্রব নাই। এসব লোক ধর্মকে একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাকে

বৃটিশ কূটনীতি নিজেদের কাজে লাগিয়েছে তারা এই কথাটা বুঝাতে চেয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সাধারণ ঐহিক স্বার্থ নাই। তার ফলে এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করতে থাকে যে, অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি হলে তাদের লাভ হবে। কিন্তু তারা এটা বুঝে না যে, এতে নিজেদের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। এই নীতি পাশ্চাত্যদেশের Suvrival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতিরই ছায়া মাত্র। তারা Law of alliance বা সহযোগিতার নীতিকে বিস্মৃত হয়ে এইরূপ আচরণ করে। আজ দেশের নানা স্থানে ধর্ম বিদ্বেষ ও অনুদারতা জেগে উঠেছে। যারা ধর্মের সার সত্য জানে তাদের উচিত সজ্ঞানে, সচেতন ও সক্রিয় ভাবে নিজে সর্বতো-ভাবে অহিংস থেকে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মত সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে উঠলে আমাদের কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে গান্ধীজি কতকগুলি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার প্রধান কথা এই যে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হলে অথবা দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে উঠলে কেউ যেন কোন পক্ষের হয়ে পক্ষপাতিত্ব না করে। যেখানে দুই পক্ষই ভ্রান্ত, সেখানে কোন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করলে নিজেকেও ভ্রান্তির দাস হতে হবে। নিরপেক্ষ আচরণ দ্বারা বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পুলিস্ ও সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করে নিজেদেরকেই সমস্ত বিদ্বেষ বর্জন করে অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত বিষয়টিকে বিচার বিবেচনা করে দৃপ্তসাহসে বিবাদ মিটাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে তাতে যদি প্রাণ বিপন্ন হয় তবুও পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। শহীদ শচীন মিত্র এইভাবেই আত্মবলিদান করেছেন। মনে রাখতে হবে যে অন্যায়কারীর মনে শুভ বুদ্ধি ও মানবতা বোধ জাগ্রত করাই হল—সত্যাগ্রহীর আদর্শ। সর্বশেষ কথা উভয় সম্প্রদায়ের অন্যায় ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দরকার হলে কিছু দিনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গান্ধীজি এই ভাবে বহুবার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছেন।

একথা সকলেই জানেন যে গান্ধীজি দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। দেশ বিভাগ না করে জিন্না সাহেব দ্বারা উথাপিত মুসলিম স্বার্থ কি ভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য তিনি আকুল ভাবে লীগ নেতা মিঃ জিন্নার

সহিত পত্রালাপ করেন। এ সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করার জন্য কমপক্ষে চৌদ্দ পনের বার নিজেই জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধীজি যে মহানুভবতা, উদারতা ও সহনশীলতার উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি ছিলেন আদর্শ সত্যাগ্রহী। তাই বার বার জিন্না সাহেবের বাস ভবনে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জিন্না সাহেব সৌজন্য রক্ষার জন্য একবারও গান্ধীজির বাসায় পদার্পণ করেন নি। অনেকেই সেজন্য গান্ধীজির উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী তাতে একটুও বিচলিত হন নি। বরং নিজেই বার বার জিন্না সাহেবের নিকট গিয়েছিলেন বলে এতটুকু অপমান বোধ করেন নি। দেশ বিভাগ বন্ধ করবার জন্য তিনি লীগ নেতাকে বহু সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দেন। কিন্তু অনড় জিন্না সাহেব গান্ধীজির কোন প্রস্তাবেই সম্মত হন নি। সত্যাগ্রহী গান্ধী সরল মনে তাঁর কাজ করে গেছেন। ফলের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই কলিকাতার বুকে সাম্প্রদায়িকতার যে তাণ্ডব নৃত্য হতে লাগল তা বেশী দিন চলতে থাকলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারত। দেশের সেই দুঃসময়ে আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী দাঙ্গা উপদ্রুত অঞ্চলেই উৎপীড়িত মানুষের মধ্যে বাস করতে লাগলেন। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে নিজের কাছে রেখেই দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাতে তিনি সফলকামও হলেন। দেশ বিভাগের কিছু পূর্বেই নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক আকারে বেধে উঠল। গান্ধীজি সেখানে গিয়ে পথে পথে ভ্রমণ করে উদারবাণী প্রচার করে সেখানকার উপদ্রুত মানুষের প্রাণে আস্থা ফিরিয়ে আনলেন। এর অব্যবহিত পরেই বিহারে দাঙ্গা বেধে উঠলো। সেখানেও গান্ধীজি সত্যাগ্রহের আদর্শকে রূপায়িত করলেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। আবার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দিল্লীর বুকে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব নৃত্য হতে লাগল। সেটাও গান্ধীজি অহিংস পন্থায় সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দিলেন।

সত্যাগ্রহের পন্থায় কিভাবে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল নিবারিত হতে পারে তার আর একটি দৃষ্টান্ত গান্ধীজির জীবনের ঘটনা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাব কত মহান ও আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন তিনি।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক। সে সময় শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে যখন দেশের নানা স্থানে হিন্দু মুসলিমের সম্পর্কটা

অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল তখন এই সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদের প্রতিবাদে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত গ্রহণ করবেন। দেশের এই সঙ্কট কালে তিনি যে মানবতা বোধ, উদারতা, সৎসাহস ও আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেন তা সকল যুগের সকল মানুষের অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে তিনি ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা রক্তপাত ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখে তাঁর সংবেদনশীল মন বিচলিত ও ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি এসবের প্রতিকারের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন লোকের নিকট কাতর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফল হল না তখন তিনি মনে মনে বহু চিন্তা করলেন কি করে এই অবস্থার অবসান ঘটান যায়। অবশেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি অন্তরবাণী লাভ করলেন। সেই অন্তরবাণী তাঁকে বলে দিল "প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে"। তাই তিনি স্থির করলেন হিন্দু মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত গ্রহণ করবেন। এ সম্পর্কে তিনি একটা বিবৃতিতে বললেন "My penance is the prayer of a bleeding heart for forgiveness of sins unwillingly committed." অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত ভাবে যে পাপ কার্য করা হয়েছে সেই সব পাপের ক্ষমা ভিক্ষার জন্য আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের প্রার্থনাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

অতঃপর তাঁর একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত আরম্ভ হল। এইভাবে তিনি দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীদের সহিত নিজেকে একীভূত করলেন ও তাদের পাপের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন যে, একজন অপর জনের ধর্মকে আক্রমণ করবে, ধর্মস্থান অপবিত্র করবে, নির্দয়ভাবে নরহত্যা করবে, এবং সেই কাজের সমর্থন জানিয়ে দায়িত্বহীন বিবৃতি দিবে, অসত্য-ভাষণের দ্বারা আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলবে এই সব কাজ হল স্বয়ং ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা। সুতরাং এসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা একান্ত দরকার।

অনশন ব্রত গ্রহণ করার সঙ্কল্প যখন তিনি তাঁর বন্ধুদের নিকট ঘোষণা করলেন তখন তারা তাঁকে এই ব্রত থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু আদর্শ সত্যাগ্রহী গান্ধী তাঁর সঙ্কল্পে অটল হয়ে থাকলেন। সুতরাং পরের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে একুশ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক অনশনব্রত আরম্ভ করলেন। সেই দিনই তিনি হাকিম আজমল খাঁ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মৌলানা মহম্মদ আলি, প্রমুখ নেতাদেরকে একটা করে চিঠি লিখলেন। এই চিঠির ফলে তাঁরা

অবিলম্বে একটি শান্তি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি যোগদান করলেন। এদিকে গান্ধীজির অনশন চলতে লাগল। নেতারা তাঁর ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তাঁদের আগ্রহ দেখে তিনি সকলকে বললেন, "আমি মৃত্যুবরণ করবার জন্য এ অনশন ব্রত গ্রহণ করিনি বরং আরও সুন্দরভাবে পবিত্রতর জীবন যাপনের জন্যই আমার এই অনশত ব্রত। আমার প্রধান উদ্দেশ্য দেশ ও ঈশ্বরের সেবা।"

আঠারই সেপ্টেম্বর গান্ধীজির উপবাস ব্রত আরম্ভ হল। একটি একটি করে দিন গত হতে লাগল। এই ভাবে ছ'দিন কেটে গেল। অবশেষে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর একটি সর্বদলীয় সভা আরম্ভ হল। ঐ সভার একস্থানে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খৃষ্টের একটি ছবি টাঙ্গানো ছিল। আর একটু দূরে অনশনব্রতী গান্ধীজির ছবি। এই দৃশ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। দু'জনেই শান্তির দূত। ছবি দুটি সমগ্র সভার তাৎপর্যকে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুললো।

এই সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। তিনি প্রতিনিধিগণকে জানালেন যে এই সভার আলোচ্য বস্তুর সীমা খুব সংকীর্ণ। সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের ধর্মীয় কারণগুলি নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করলেন। সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সহিত অবিচ্ছেদে জড়িত আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই বৃহৎ সভা আশিজন সদস্য সংবলিত একটি ছোট সাব কমিটি গঠন করলেন। সাব কমিটির প্রধান কাজ হল একটি সর্বাত্মক প্রস্তাবের খসড়া রচনা করা। সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে যে মূল প্রস্তাব রচিত হল তাই বৃহত্তর সভায় উত্থাপিত ও গৃহীত হল।

অনশনক্লিষ্ট গান্ধীজি একটি সময়োচিত বাণী উক্ত সভার নিকট প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের ঐক্য কামনা করলেন। তিনি বললেন, প্রত্যেকে যেন অকপটে সেই সত্যকে প্রকাশ করেন যা তিনি অবগত আছেন। তারা যদি বিনা দ্বিধায় সত্যকথা স্বীকার করেন তবে তিনিও বিনা দ্বিধায় তাঁদের কথা বিশ্বাস করবেন।

অবশেষে সভাপতির আসন থেকে সর্বাত্মক প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হল। গান্ধীজি যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন সেই নীতিটাও প্রস্তাবের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হল যে, ধর্মের ব্যাপারে বিবেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। কোন ধর্মস্থান অপবিত্র করা চলবে না। যদি কোন লোক সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে

ধর্মান্তর গ্রহণ করে তার সে কাজে কোন বাধা দেওয়া চলবে না। কিন্তু চাপ দিয়ে বাধ্য করে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো চলবে না। এই মূলনীতি বিনা প্রতিবাদেই গৃহীত হল। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি ও শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, কেবল প্রস্তাব পাশ করলেই সব কাজ শেষ হবে না। হিন্দু মুসলমানের সকলের হৃদয় পরিবর্তন করাই হল আসল কাজ।

সভার কাজ শেষ হলে সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, একটা নূতন আবহাওয়া ও পরিবেশ রচিত হল। পূর্বে এই ধরনের সভাসমিতিতে কেবল দর কষাকষি হত বেশী। কিন্তু আজ সকলে বুঝলেন যে পুরাতন দর কষাকষির পরিবর্তে একটা উদার ও সহনশীল মনোভাবের স্পিরিট সর্বত্র জাগ্রত হয়েছে। পথ ও মতের পার্থক্য ও বিভিন্নতাকে স্বীকার করা হল। এক মতাবলম্বী লোকের নিকট অপরবিধ মতের সমর্থকগণও সম্মানলাভের দাবিদার হলেন। সভার প্রারম্ভে বিভিন্ন বক্তাগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। কিন্তু মূল প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সকলের মধ্যে জাগ্রত হল একটা নূতন ধরনের দায়িত্ববোধ। সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দুকে মুসলমানের জন্য এবং মুসলমানকে হিন্দুর জন্য অনেক কিছু করতে হবে। ইহাই গান্ধীজির একুশ দিন ব্যাপী সত্যাগ্রহের অপূর্ব ফলশ্রুতি।

উপবাস ব্রত পালনের একাদশ দিবসে গান্ধীজির অবস্থা আরও শোচনীয় হতে লাগল। এই সময় গান্ধীজি সি. এফ-এণ্ডরুজকে ও অপর একজনকে তাঁর সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার সময় তাঁর প্রিয় গানটি গাইতে বললেন। সে গানটি হচ্ছে কার্ডিনাল নিউম্যানের বিখ্যাত স্তোত্র "Lead kindly light, Lead Thou me on।" এর পর দাঙ্গাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ হল। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তাঁর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে লাগল। তার পর একুশ দিন শেষ হলে গান্ধীজি তাঁর উপবাস ভঙ্গ করলেন। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় একটি কঠিন অবস্থা সহজ হয়ে গেল। আজ দেশের নানা স্থানে যখন দাঙ্গাহাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ বেধে উঠে তখন আমরা গান্ধীজির অপূর্ব সত্যাগ্রহের কথা স্মরণ করি। আমরা মনে করি গান্ধীজি অবলম্বিত সত্যাগ্রহের পন্থাতেই সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। আসুন আমরা সমবেত ভাবে এই প্রার্থনা করি Lead kindly Light, Lead Thou me on। এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল হয়ে উঠলে যেন আমরা Genius of Gandijiকে অনুসরণ করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলি।

অহিংস সমাজবাদ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। তিনি ভারতীয় কৃষ্টির ভাগীরথীতে স্নান করে জলধারা আকণ্ঠ পান করে যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলেন তা উপভোগ করতে আহ্বান করেছিলেন সকলকে। সে অমৃত হচ্ছে অহিংস সমাজবাদ। তিনি নিজেই লিখেছেন যে, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে পান সেই অমৃতের সন্ধান। প্রতিদিন সান্ধ্য প্রার্থনার সময় সকলের সঙ্গে তিনি আবৃত্তি করতেন সেই শ্লোকটি:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ জগতের সব কিছুই ভগবানের। সেই হেতু নিজের কিছু নয় এই ত্যাগ বুদ্ধিতে ভোগ করবে অর্থাৎ যা নিতান্ত প্রয়োজন তা-ই নিজের কাজে লাগাবে। কারো ধনে লোভ করবে না।

কারো ধন বলতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য শুধু অন্যের ধনের কথা নয় নিজের ধনের কথাও বলেছেন। নিজের ধনে লোভ করবে না—এ কি রকম কথা! আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। যা নিজের ধন বলে লোকে মনে করে তা বাস্তবিক পক্ষে ভগবানেরই। অতএব তাতেও লোভ করা উচিত নয়। নিজের ধন বলতে যা মনে করে তারও প্রয়োজন মিটাবার মত পরিমাণই নিজের কাজে লাগাতে পারে—তার অতিরিক্ত নয়। এর চেয়ে বড় সমাজবাদ আর কি হতে পারে! ঈশোপনিষদ খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসরের অধিক সময় পূর্বে রচিত। অতএব অতি প্রাচীন কাল হতেই ভারতবর্ষের ঋষিরা সমাজবাদের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী আধুনিক যুগে লোক সমাজে তুলে ধরেছেন সেই প্রাচীন আদর্শকে তাঁর নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতে। কারণ এই আদর্শ মানব আত্মার শাশ্বত বাণী।

এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের লেখায় এই শ্লোকেরই উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু মুখে তাঁর কাছে গীতার একটি শ্লোকাংশের কথাও শুনেছি:

'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥'

—যে পাপাচারগণ শুধু নিজের জন্য পাক করে তারা পাপায় ভোগ করে। অর্থাৎ যারা সমাজের অন্য সকলের খাওয়ার কথা চিন্তা না করে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে তারা পাপী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে এই কথা বলেছেন। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক ও গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত উক্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষ ভগবদ্ বিশ্বাস ও মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেই সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল অতি প্রাচীন কালেই। এর মধ্যে হিংসা বা অত্যাচার মূলক ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। গান্ধীজী বর্তমান যুগে সেরূপ অহিংস সমাজবাদই প্রতিষ্ঠা করতে চান।

হিংসার পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। হয় দুর্বলের উপর সবলের প্রভুত্ব, কখনো কখনো সন্ত্রাসের বা গুণ্ডাদের রাজত্ব। ইউরোপে হিংসার পথে সমাজ-বাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। তা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হয়েছে প্রচুর রক্তপাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটেছে। মহাত্মাজী ঠিকই লিখেছেন 'একমাত্র সত্যাশ্রয়ী, অহিংস ও পবিত্রচেতা সমাজবাদীরাই ভারতে তথা পৃথিবীতে সমাজবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।' 'সমাজবাদে সত্য ও অহিংসা মূর্ত হওয়া চাই। সেজন্য সমাজবাদী কর্মীর ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস থাকতে হবে।' ভারতবর্ষে ইউরোপ হতে আমদানী করা সমাজবাদের অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে খুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন 'আমিই সমাজবাদী তারা নয়।' গান্ধীজীর এই উক্তিকে উপরোক্ত প্রকারের সমাজবাদীরা তাঁর নিজের মতবাদের প্রতি অত্যধিক প্রেম বা মোহ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, আর নিজেদের মতকেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এখানে বৈজ্ঞানিক শব্দটির হয়েছে নিতান্ত অপপ্রয়োগ। যেখানে যুক্তি বিচারের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে বন্দুক, কামান ও বোমা সে ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক কি করে বলা যেতে পারে! এ যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। যুক্তি বিচার দ্বারা সংস্কারের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ইউরোপের কোন কোন দেশ প্রচার যন্ত্রের কলা কৌশল আয়ত্ত করে লোককে বিভ্রান্ত করছে, এমন কি এদেশেও কিছু পরিমাণে।

এখন প্রশ্ন হল গান্ধীজীর এই অহিংস সমাজবাদের স্বরূপ কি, কি ভাবে তিনি তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কি ভাবেই বা তা ভারতে ও অন্যত্র ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা যেতে পারে!

গান্ধীজীর সমাজবাদের আদর্শ হল শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠন। তাঁর নিজের ভাষায়ই বলি 'সমাজবাদী ব্যবস্থায় সকল মানুষই সমান—কেউ উচ্চ নয়, কেউ ছোটও নয়'; 'সমাজবাদের বনিয়াদ হল আর্থিক সমতা। বর্তমানের সামঞ্জস্যহীন অসম ব্যবস্থায় অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ধন দৌলতে ডুবে আছে, অপর পক্ষে জনগণ পর্যাপ্ত আহার্যটুকুও পায় না, এ অবস্থায় রামরাজ্য হতেই পারে না।' এখানে শ্রেণী সংঘর্ষের কোন কথা নেই, তিনি চেয়েছেন শ্রেণী বিলোপ। যারা শ্রেণী সংঘর্ষ চায় তারা চিরকাল দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বজায় রাখবে। কোন না কোন ভাবে তা থাকবেই। এই জন্য এর ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হচ্ছে শ্রেণী বিলোপ। গান্ধীজী চেয়েছিলেন তা-ই। গান্ধীজী আর্থিক সমতা সম্বন্ধে এমত পোষণ করতেন যে ভাঙ্গী, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, সওদাগর ও আর সকলে প্রত্যেকে দৈনিক কাজের জন্য একই মজুরী পাবে।

এই ত হল আদর্শ। এর বাস্তবরূপ কি হতে পারে সেটা মস্ত বড় কথা। কারণ গান্ধীজী ছিলেন বাস্তব আদর্শবাদী। মানুষ সব সমান পারমার্থিক দৃষ্টিতে একথা সত্য হলেও মানুষে মানুষে তফাত আছে। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ কাল কেউ ফর্সা, কেউ কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউবা অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নও নয়। গান্ধীজী এবিষয়ে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন। গান্ধীজী লিখেছেন, 'আমরা সমান হয়েই জন্মলাভ করেছি বলে আমাদের সমান অধিকার আছে বটে, তবে সকলেরই সমান যোগ্যতা নেই। প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা অসম্ভব।··· প্রাকৃতিক নিয়মেই একজনের থাকবে বেশী উপার্জন করার ক্ষমতা আর একজনের থাকবে কম।' এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই তিনি চেয়েছিলেন ব্যবহারিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি কেবল নিষ্প্রাণ সাম্যব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চান নি। কারণ তাতে সমাজের অনিষ্টই হয়। তিনি এটা চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক মানুষই পাবে নিম্নতম সুষম খাদ্য, বাসোপযোগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, ও সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা। তিনি কৃষককে লাঙ্গল, বলদ, রবীন্দ্রনাথকে সুন্দর পাঠাগার, রমণকে বিজ্ঞানাগার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া। তাই প্রকৃত সাম্য। সকলকে এক ছাঁচে ঢালার প্রচেষ্টা অনুচিত। তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জন করবার ক্ষমতা যদি প্রত্যেককে দেওয়া হয় তবে কারও হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকবে। সেই

অর্থের মালিক নিজেকে মনে না করে অছি স্বরূপ হয়ে সমাজের সেবায় সেই অর্থ নিয়োজিত করাই তাঁর নিশ্চিত মত। ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক অনুযায়ী পথ। ইহাই অহিংস সমাজবাদের অনিবার্য আঙ্গিক। জোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয় না। হিংসা ও সমাজবাদ পরস্পর-বিরোধী। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, যে আজও সমাজে অছিবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কিন্তু ধনীদের এ ধারণা হলে তাদেরও কল্যাণ; সমাজেরও কল্যাণ। সেই কল্যাণ বুদ্ধি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজী। সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। ধনী দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান দূর করার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন তিনি। করাচী কংগ্রেসে সর্বোচ্চ আয় বিশেষজ্ঞ বাদে মাসিক ৫০০৲ টাকা নির্ধারিত হয়। সর্বনিম্ন আয়ও সে সময় বা তার একটু পরে মাসিক ৩০৲ টাকা করার পক্ষপাতী ছিলেন। একথা মনে রাখা দরকার বর্তমানে টাকার মূল্য তখনকার তুলনায় অনেক কম। টাকার মূল্য যাই হোক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের একটা হার হলে আর সে প্রশ্ন উঠে না।

যদিও গান্ধীজী ব্যারিস্টার ও ভাঙ্গীর আয় সমান হোক এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন তথাপি সে দিন এখনও বহু দূরে মনে করে বুদ্ধিজীবীর ও শ্রমজীবীর সম মর্যাদা যাতে হয় একথা বার বার বলেছেন। এজন্য প্রত্যেক লোককেই তিনি কোন না কোন উৎপাদনমূলক কাজ করতে বলেছেন। এমনকি যে কোন প্রকারের উৎপাদনমূলক কাজ করে না তার ভোটাধিকার·থাকা উচিত নয় এ মত ব্যক্ত করেছেন। অন্ন ও বস্ত্র এই দুইটি সবারই প্রয়োজন। তাই কৃষিকাজ ও চরকায় সুতা কাটা দুইটি প্রধান উৎপাদনমূলক কাজ। শহরে কৃষিকাজ সম্ভব নয়। অতএব চরকায় সুতা কাটাই সর্বব্যাপক উৎপাদনমূলক কাজ—যা ছেলে বুড়ো সবার পক্ষে সর্বস্থলেই সম্ভবপর। এ ছাড়া বৎসরের বেশ কয়েকমাস বেকার কৃষক নিজের পরিবারে অবসর সময়ে সুতা কেটে বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুতাই উৎপন্ন করতে পারে। তাতে বেকারিত্বও ঘুচে খানিকটা, সমস্ত পরিধেয় বস্ত্রও তৈরী হয়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন যা সহজে কুটীরে করা যায় তার জন্য বৃহৎশিল্প করার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির জন্য তিনি বড় কারখানা তৈরির বিরোধী ছিলেন না। ইহা অহিংস সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ণ।

অতএব মোট কথা দাঁড়াল এই যে অহিংস সমাজবাদের অর্থ শ্রেণীহীন শোষণ-

হীন সমাজ ব্যবস্থা। সেজন্য ধনী দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান দূর হওয়া উচিত। একটা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয় নির্ধারণ প্রয়োজন এজন্য। যেন প্রত্যেক কৃষক সুষম খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, একটা মান পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা পায়। শ্রমজীবী যেন বুদ্ধিজীবীর সমান মর্যাদা পায়। ধনী নিজের প্রয়োজন মিটাবার মত অর্থ বাদে তার নিজের সমস্ত অর্থের প্রয়োগ করবে অছি হিসাবে জনকল্যাণে। এই পথেই জগতে শুধু শান্তি নয়, আপামর সর্বসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। গান্ধী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কায়োমনোবাক্যে এই প্রার্থনা—ভারত এ পথ গ্রহণ করে জগতকে পথ দেখাক। তা হবে গান্ধীজীর প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন—শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান ও প্রথম কাজ। তবেই গান্ধীজীর অমর আত্মা আমাদিগকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে।

হরিজন আপনজন

সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি

রাজনীতির সংজ্ঞা এবং রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্ত ক্ষেত্রে এক নয়। গান্ধীজীর কাছে ধর্ম ও রাজনীতি হচ্ছে অভিন্ন। তাঁর কথায়ঃ

"সত্যের সাধনাসূত্রেই রাজনীতিতে আমার প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আর একথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, যাঁরা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই নাই, ধর্ম যে কি তা তাঁরা জানেন না।" [আত্মকথা (বাংলা) পৃষ্ঠা—৫১০]

গান্ধীজী অন্তরে বিশ্বাস করতেন রাজনীতির মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের প্রকৃত সেবা করে যেতে পারবেন। রাজনীতি তাঁর কাছে মানবসেবার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হাতিয়ার।

কোন্ মানুষের সেবা? যে মানুষ একেবারে নীচের তলায় আছে। যে মানুষ পুরো মানুষ নয়—তার একটা অপমানিত ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশগুলির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র দুভাবে উৎপীড়ন করে আসছে ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকে। একভাবে অত্যাচার করছে তাকে অস্পৃশ্য করে রেখে, তাকে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা না দিয়ে, আর একভাবে অত্যাচার করছে তাকে দরিদ্র করে রেখে। এই দু'টি মার ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। গান্ধীজীর সারা জীবনের সাধনা এই মানবমুক্তিরই সাধনা। তাঁর জীবনের প্রধান অংশ কেটেছে, সেই মানুষের অধিকার প্রচেষ্টায় যে মানুষ অচ্ছুৎ, যে মানুষকে স্পর্শ করলে অপর মানুষের জাত চলে যায়, যে মানুষের কাছে মন্দিরের দ্বার কখনো উন্মুক্ত নয়। এমনকি যে মানুষ পথে চললে সে পথে উঁচুজাতের মানুষের চলাটা নাকি অসম্মানের। জাতিভেদের স্বার্থপর ব্যাখ্যার অনুশাসন টেনে একদল তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষ এতকাল ধরে একশ্রেণীর মানুষের ওপর ক্ষমাহীন শাসন চালিয়ে এসেছে। বস্তুত এরাই ভারতবর্ষের উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, অপমানিত মানব সমাজ। গান্ধীজীর রাজনীতির প্রথম কথা এই মানব সমাজের সকল অত্যাচারের সম্পূর্ণ অবসান। তাঁর মানবসেবার প্রথম আলো এসে পড়েছে এদেরই অপরিচ্ছন্ন এবং অপমানিত প্রাঙ্গণে। গান্ধীজীর রাজনীতির প্রধান অংশ তাই এই লক্ষ লক্ষ হরিজনের

মুক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। হরিজন আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে গেছে। তিনি এই অচলায়তনকে আঘাত দিয়েছেন, ভেঙেছেন। যারা মানুষের মর্যাদায়, অধিকারে বঞ্চিত ছিল তাদের জন্য সমান আসন, সমান মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছেন। হরিজনের সেবাকেই তিনি নিজের জীবনে ঈশ্বর সেবা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

> "অতি প্রত্যূষে মালাবারে পা দিলুম।...যখন আমি পূর্ব পরিচিত জনপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন পূর্ব সফরকালে দেখা এক নায়াডির (Nayadi) * ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল।...অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সময় এক মর্মভেদী কথা শোনা গেল। সঙ্গীরা বললেন, 'আমরা আপনাকে এক জীবন্ত নায়াডি দেখাব।' জনপথে তার চলার অধিকার নেই, তাই সে মাঠের মধ্য দিয়ে খালি পায়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলছিল। আমি তাকে কথা বলার জন্য কাছে আসতে বললুম। স্পষ্টতঃই সে ভয় পাচ্ছিল, না জানি কখন তার পিঠে প্রহার এসে পড়ে। ভয়ে থর থর সে আমার সঙ্গে কথা বলল। আমি তাকে বললুম, 'এ জনপথে তোমার আমার চলার দাবি এক।' সে বলল, 'তা কখনও হতে পারে না। আমি যে এ-পথে চলার অযোগ্য অধম।' এখানেই এ প্রসঙ্গের শেষ হল। আমি সনাতনী অথবা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই অমানবীয় আচরণের কি কোন যুক্তি আছে? তোমরা আমাকে তোমাদের সঙ্গে হাসতে, রঙ তামাসা করতে দেখ, কিন্তু জেনে রেখো মালাবার ভ্রমণ কালে এই সকল হাসি ঠাট্টার আড়ালে সেই নায়াডির মুখ ও সেই করুণ দৃশ্য আমাকে বিঁধতে থাকবে।" [পালঘাট, মালাবার: ১০. ১. ১৯৩৪]

কেবল মালাবারের পথেই নয়, সারা জীবনব্যাপী চলার পথে মানুষের প্রতি মানুষের এই অকরুণ আচরণ তাঁকে অনুক্ষণ পীড়িত করেছে। সংগীতের যেমন ধুয়ো, শিল্পীকে যেখানে বার বার ফিরে আসতে হয়, তেমনি দেখতে পাব নানান্ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বার বার তাঁকে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতে অস্পৃশ্যতা পরিহার সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর বহুমুখী কার্যধারার

* মালাবারের এক অস্পৃশ্য জাতি।

মধ্যে যে-পরিমাণ লিখেছেন ও বলেছেন এত অধিক পরিমাণ আর কোন বিষয়ে নয়

যদিচ স্বাধীনতাই ছিল লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু তিনি যেমন বলেছিলেন সমগ্র জগতকে খুশি করার জন্য ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন না বা সত্যকে বলি দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা চান না, তেমনি তিনি বলেছিলেন, ভারত স্বাধীন হবে অথচ অস্পৃশ্য অস্পৃশ্যই থেকে যাবে এরূপ স্বাধীনতা তাঁর কাছে অর্থহীন।

> "আমার কাছে স্বরাজ মানে—আমাদের দেশের দীনতম লোকের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা। আজ আমাদের সকলের দুঃখের দিনে যদি অস্পৃশ্য ভাইদের উন্নতি না করি, তবে স্বরাজ পাওয়ার পর সেদিনের সুখের উন্মত্ততায় কি তাদের অবস্থা শোধরাব ?…ভারতবর্ষকে কেবল ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করাতেই আমার রুচি নেই, সকল প্রকার হীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া আমার পণ। এ-পিঠের বদলে ও-পিঠ পাওয়ার আমার কোন আগ্রহ নাই।" [ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১. ৬. ১৯২৪]

এক বিদেশী সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাকে যদি এক-দিনের জন্য বড়লাট করা হয় আপনি কী করবেন ?"

গান্ধীজী জবাব দেন, "লাট সাহেবের বাড়ির কাছে যে সকল নোংরা বস্তি আছে তা সাফ করব।"

"যদি লাটগিরির মেয়াদ আর একদিন বেড়ে যায় তবে ?"

"সেদিনও ঐ কাজই করব।"

গান্ধীমহারাজের রাজত্বে মানুষই বড় কথা, শেষ কথা। মানুষের অপমান তাঁর কাছে বড় বেদনার। সভ্যতার পিলসুজ মাথায় করে খাড়া যারা সমাজকে আলোকিত করছে তাদের গা বেয়ে কেবল তেল গড়িয়ে পড়বে, তারা কেবল 'অন্ধকারে, অবজ্ঞায়, অনাদরে, বঞ্চনায় দিন কাটাবে এতে সমাজের মুক্তি হতে পারে না। তাঁর হৃদয়ে অস্পৃশ্যদের স্থান যে কোথায় ছিল তা ব্যক্ত হয়েছে :

> "আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে এমন বাসনা আমার নেই; তবে যদি জন্মিতেই হয় আমি যেন অস্পৃশ্যের ঘরে জন্মাই। অস্পৃশ্যদের যে দুঃখ, যে অপমান জোটে আমি যেন তার ভাগী হয়ে নিজের ও সেই সঙ্গে তাদের দুর্দশা ঘোচাতে পারি—এই কামনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্ররূপে

জন্মাতে চাই না, যদি জন্মগ্রহণ করতেই হয় তা হলে আমি যেন অতি শূদ্র হয়ে জন্মাই।" [ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪. ৫. ১৯২০]

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে গান্ধীজী বাল্যকালের কথায় বলেছেন, "তখন আমার বয়স বার বছরও হয় নি। আমাদের বাড়িতে একজন মেথর কাজ করত। তার নাম উকা। আমি একদিন হঠাৎ তাকে ছুঁয়ে ফেলি। মা আমাকে স্নান করিয়ে শুচি করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, ছুঁলে পাপ হয় একথা মনে করা একেবারে অন্যায় ও ভুল। আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু পূজার সময় 'জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু' মন্ত্র পাঠ করা হত। এই মন্ত্র আমি জীবনে ভুলি নি।...বিষ্ণু যদি জলে স্থলে সর্বত্র তবে অস্পৃশ্য তো কেউ থাকতে পারে না।"

তিনি আরও বলেছিলেন রামচন্দ্রকেও তো একজন অস্পৃশ্য নদী পার করে দিয়েছিলেন। সেই রামকে কেন সকলে পুজো করে। মা পুতলীবাঈ ছেলেকে এর সদুত্তর দিতে পারেন নি। প্রৌঢ়ত্বে গান্ধীজী শৈশবের সেই স্মৃতির আরও উল্লেখ করেছেন। তা কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। অহমদাবাদে অস্পৃশ্যদের এক সম্মেলনে বলছেন:

> "স্কুলে পড়ার সময় আমি প্রায়ই অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করতাম। অন্যান্য ব্যাপারের মত এ ঘটনার কথাও আমি মা-বাবার কাছে গোপন করতাম না। মা বলতেন এই অশুচিতা থেকে শুদ্ধ হওয়ার সহজ ও সোজা উপায় হচ্ছে কোন মুসলমানকে স্পর্শ করা। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমি তা করতাম—কিন্তু কখনও একাজে আমার বিশ্বাস ছিল না।" [১৩ এপ্রিল, ১৯২১]

বালক বয়সে নিভৃতে, আপন মনে যে চেতনার উন্মেষ, যে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ ভাবেই ওই বয়সে করে ফেলেছিলেন তা এই যে, মানুষে মানুষে ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভেদ থাকতে পারে না, ওটা মানুষের তৈরি কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি মাত্র, পরবর্তী জীবনে তা বিরাট গণআন্দোলনে রূপায়িত করেছেন। আর এইখানেই বোধ হয় গান্ধীজীর কর্মের বৈশিষ্ট্য।

ভারতভূমির বহু সমাজ-সংস্কারক, ভক্ত, সাধক অস্পৃশ্যদের কোল দিয়েছেন, সমাজ থেকে এই ভেদবুদ্ধি দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজী একে গণ-

আন্দোলনের রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শোনা যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদিন গঙ্গাস্নান থেকে ফেরার পথে এক অচ্ছুৎ তাঁকে স্পর্শ করায় তাঁর সঙ্গী ঘৃণায় শিউরে উঠে তাঁকে পুনরায় গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হতে অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু বলেন:

এত যে পড়িলা শাস্ত্র কি তত্ত্ব শিখিলা।
এত যে করিলা শুচি, শুচি কি হইলা॥

দেখা গেল একদিন গভীর নিশীথে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মায়ের কাছে আপন অহংকে বলি দিয়ে বলছেন, 'দে মা, আমাকে এই অস্পৃশ্যদের সেবক করে দে। আমি যে দীনতমের চেয়ে দীন এ বোধ আমার জাগিয়ে দে মা।' মন্দির বাড়ীর নিকটে মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি অন্ত্যজগণ বাস করত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন সেই অস্পৃশ্যদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে মুখে দিতেন এবং ঝাড়ু দিয়ে নরদমা, পায়খানা সাফ্ করতেন আর আপন দীর্ঘ কেশ দিয়ে আঙিনা ঝাঁট দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল তাঁর বাণীতে —"আমরা এখন বৈদান্তিক নই, পৌত্তলিক নই, তান্ত্রিকও নই। আমরা এখন কেবল ছুঁৎমার্গী, আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘর, আর ঈশ্বর হয়েছেন ভাতের হাঁড়ি।" তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন—"ভুলিও না, নীচ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" এই দীন পতিতদের তিনি ডাকলেন 'দরিদ্র নারায়ণ' নামে। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের নবতম নায়ক, যাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় গণ মানসে অস্পৃশ্যতা বর্জনের নতুন স্পন্দন শুরু হল। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে গোঁড়া হিন্দুরা উপলব্ধি করলেন যে, ছয় কোটি হিন্দুকে বাদ দিয়ে ধর্মের নামে এত বড় অধর্ম আর চলবে না।

গান্ধীজী তখন তরুণ ব্যারিস্টার। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই থাকেন। কিছুদিনের জন্য কোন কাজে এসেছেন জন্মভূমি রাজকোটে। এসে দেখেন প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছে। এই রোগ যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। কমিটি গঠিত হল সেবাকার্যের জন্য। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কমিটির কোন সদস্য অস্পৃশ্যদের ঘরে বা পল্লীতে যেতে রাজী নয়। কিন্তু গান্ধীজী পিছপাও হলেন না। নিজেই অস্পৃশ্যদের বাড়ী গিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজে লেগে গেলেন। এটা ১৮৯৬ সালের কথা। অর্থাৎ আজ থেকে ৭২ বছর আগে এক দেওয়ানপুত্র ব্যারিস্টারের পক্ষে নিজের দেশে অস্পৃশ্যদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে এভাবে পরিচ্ছন্নতার তদারকী করা বড় সহজ কাজ ছিল না।

বছর কয়েক পরে গান্ধীজী দ্বিতীয় বার স্বদেশে আসেন। তখন কলকাতায় কংগ্রেস বসেছে। উনিশ শো এক সাল। সেই প্রথমবার তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। উক্ত কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে তিনটি প্রকরণ আছে। তা থেকে গান্ধীজীর কথায় আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উদ্ধৃতি করা যেতে পারে। এর প্রায় দুই দশক পরে যে কংগ্রেসকে দিয়ে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রস্তাব পাশ করান, একে গণ-আন্দোলনের রূপ প্রদান করেন উনিশ শো এক সালে সেই কংগ্রেসে অস্পৃশ্যতার চিত্র কী ছিল?

"এখানেও অশুচি হইতে বাঁচার, অস্পৃশ্যদের হইতে আত্মরক্ষার প্রযত্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম। দ্রাবিড়ী পাক্‌শাল একেবারে নিরালায় ছিল। পাছে 'দৃষ্টি দোষ' ঘটে অশুচির পরশ লাগে তাই কলেজ কম্পাউণ্ডে তাদের জন্য চাটাইয়ের রসুই ঘর তৈরি করা হইয়াছিল। দম বন্ধ হওয়ার মত ঘন ধোঁয়ায় ভরতি ওই পাক্‌শালায় আহার, আচমন ইত্যাদি সকল ক্রিয়া তারা সমাপন করিত।...এই কি বর্ণধর্ম না তার ভেঙচানি?—এই প্রশ্ন মনে ধাক্কা দিয়াছিল। কংগ্রেসের যারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল একে অন্যের বেলায় এতটা ছুঁতাছুত যদি তারা মানিয়া চলে তবে যাদের তারা প্রতিনিধি ছিল সেই জনসাধারণের একে অন্যের প্রশ্নে কতটা ছুঁৎমার্গী হওয়া সম্ভব এই ত্রৈরাশিকের কথা ভাবিয়া আমার মন দমিয়া গিয়াছিল।

"যত্রতত্র নোংরা।...পায়খানা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। পায়খানার সেই চিত্র, দুর্গন্ধের কথা মনে হইলে এখনও গা ঘিন ঘিন করে।

"স্বেচ্ছাসেবকদের সব দেখাইলাম। তারা সাফ্ জবাব দিল, 'ও কাজ আমাদের নয়। মেথরের।' একটা ঝাঁটা চাহিলাম। যার কাছে চাহিলাম সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ঝাঁটা যোগাড় করিলাম। পায়খানা পরিষ্কার করিলাম।...এখানেই শেষ নয়। রাতে কেউ কেউ ঘরের সামনের বারান্দায় কাজ সারিত। সকাল বেলা স্বেচ্ছাসেবকদের সেই মল দেখাইয়া ছিলাম। তা সাফ্ করিতে কাউকেই পাওয়া যায় নাই। তা সাফ্ করার গৌরবও আমারই লাভ হইয়াছিল।" [আত্মকথা (বাংলা) পৃষ্ঠা—২৩২-৩৩]

এর কয়েক বছর পর গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্ণধার হন কংগ্রেস শিবিরে একদল স্বেচ্ছাসেবক ভাঙ্গীর কাজ করতেন। এক অধিবেশনে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই একাজ করেছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সাফাই কাজের জন্য দুহাজার শিক্ষক ও ছাত্র মেথরগিরির তালিম নিয়েছিল এবং কংগ্রেস এ-প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ভারতে অস্পৃশ্যতা নামক কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

প্রথম প্রথম এই আন্দোলন অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন নামে অভিহিত হলেও পরে 'হরিজন আন্দোলন' নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়। 'হরিজন' শব্দটি সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন, "এই নামটি আমার উদ্ভাবিত নয়। বছর কয়েক পূর্বে কতিপয় পত্রলেখক অভিযোগ করেন যে, কেন আমি 'অস্পৃশ্য' শব্দটি নব-জীবন পত্রিকায় ব্যবহার করছি। অস্পৃশ্যের শব্দগত অর্থ হচ্ছে যাকে ছোঁয়া উচিত নয়। আমি তাঁদের একটি ভাল নাম খুঁজে বের করতে বলি। একজন 'হরিজন' শব্দটি গ্রহণের সুপারিশ করেন।" এই শব্দটি প্রথমে গুজরাটের এক সন্তকবি ব্যবহার করেন। হরিজনের অর্থ হরির জন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত। গান্ধীজীর এই নামটি পছন্দ হয় এবং সারা দেশে তাঁরই আন্দোলনের ফলে সকলের মুখে মুখে নামটি শোনা যায়। ১৯৩৩ সালের পর গান্ধীজী তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকার নামও 'হরিজন' রাখেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত এই সাপ্তাহিকের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নিজ আদর্শধারা মতামত প্রচার করেন। বস্তুত শেষ দুই দশকে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের মুখপত্র ছিল 'হরিজন'।

অধুনা সমাজে মানুষের মহত্ত্বের পরিমাপ নিরূপিত হয় কে কি করে তা দিয়ে, কে কি সে বিষয়ে ততটা আমরা মন দিই না। অর্থাৎ আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে যেন 'টু ডু', 'টু বি' নয়। গান্ধীজী বলেছিলেন তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁর জীবন থেকে কর্ম বিচ্ছিন্ন ছিল না। যা বলেছেন, সমগ্র জীবনে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা সকলেই নীতিগত ভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রতিফলন সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় না। নোয়াখালীর পল্লীতে পল্লীতে গান্ধীজী যখন তাঁর জীবনের এক চরমতম পরীক্ষায় ব্যাপৃত তখন একদিন হরিজনদের অবস্থা দেখে বলেন, দেবতার মন্দিরে গিয়ে যেমন আমরা তাঁকে উৎসর্গীকৃত বস্তু প্রসাদ রূপে গ্রহণ করি তেমনি আমাদের খাদ্যবস্তু গ্রহণের পূর্বে হরিজনদের দ্বারা তা স্পর্শ করিয়ে পবিত্র চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজীর নিজজীবনেই শুধু নয় পারিবারিক জীবনেও অস্পৃশ্যতা বর্জনের নানা ঘটনা উল্লেখনীয়।

ডারবানে গান্ধীজীর বাসা ছিল বিলেতী ঢঙে। প্রতি ঘরে প্রস্রাবের পাত্র থাকত। তাঁর সঙ্গে তাঁর অধীন যে সকল কেরানী কাজ করত গান্ধীজী তাঁদের প্রস্রাব-পাত্র তো পরিষ্কার করতেনই, স্ত্রীপুত্রদের দিয়েও করাতেন। পত্নী কস্তুরবাকে একবার অসন্তুষ্ট চিত্তে নীচুজাতের কেরানীর প্রস্রাবপাত্র পরিষ্কার করতে দেখে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

"...পঞ্চমের* ঘরের সন্তান এই খৃষ্টান কেরানী নূতন আসিয়াছিল। আমরা ছাড়া নূতনদের পাত্র আর কে সাফ্ করিবে। অন্য নূতনদের পাত্র কস্তুরবা সাফ্ করিত। কিন্তু ওটা যে ছিল পঞ্চমের পাত্র; কস্তুরবা অতটা যাইতে পারিল না। আমাদের দুইয়ে ঝগড়া হইল। আমি পরিষ্কার করিব এও তার ভাল লাগিতে ছিল না, আর নিজেও সে করিতে পারিতেছিল না। চক্ষু হইতে মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছে, রক্তচক্ষু হইতে ধিক্কার ঠিকরাইতেছে, পাত্র হাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছে কস্তুরবার সেই চিত্র আজও আমার চোখে ভাসিতেছে।...কস্তুরবা ওই বাসনটা লইয়া গেল। কেবল তাতেই আমার মন উঠিল না। কাজটা হাসিমুখে না করিলে আমার সন্তোষ কোথায়! গলার স্বর চড়াইয়া বলিলাম 'এমন অবুঝ ব্যাপার আমার ঘরে চলবে না।'

"কথাটা তীরের মত তার বিঁধিল। সে জ্বলিয়া উঠিল। 'তোমার ঘর নিয়ে তুমি থাক। আমি চললুম।' আমি ঈশ্বর ভুলিলাম। নিজেকে ভুলিলাম। দয়ামায়া উবিয়া গেল। তার হাত ধরিলাম। সিঁড়ির শেষেই বাইরের দরজা ছিল। বেচারী অবলাকে আমি দরজার কাছে লইয়া গেলাম। দরজা অর্ধেক খুলিলাম। কস্তুরবার চোখ হইতে দরদর ধারায় জল ঝরিতেছিল। বলিল, 'তোমার লজ্জা নাই, আমার আছে। লজ্জার তুমি মাথা খেয়ে বসেছ। বাইরে আমি কোথায় যাব।...

"বড়াই থাকিল, অন্তরে লজ্জায় মরিলাম। দরজা বন্ধ করিলাম। স্ত্রী যদি আমায় না ছাড়িয়া যাইতে পারে আমিই কি তাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি?" [আত্মকথা (বাংলা)]

১৯১৫ সালে গান্ধীজী আহমদাবাদের নিকট সবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। এর কয়েকমাসের মধ্যেই দুদাভাই নামক এক হরিজন স্ত্রী-কন্যাসহ

* দাক্ষিণাত্যের এক অস্পৃশ্য জাতি।

আশ্রমে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গান্ধীজী এতে সম্মত হন। কিন্তু আশ্রমের সহায়ক বন্ধুগণ এতে অসন্তুষ্ট হলেন। ক্রমশঃ আশ্রমে বর্ণহিন্দুদের যাতায়াত কমে গেল। তাঁদের অর্থসাহায্য থেকে আশ্রম বঞ্চিত হল। অর্থাভাবে আশ্রম প্রায় অচল। কিন্তু গান্ধীজী টললেন না। "সঙ্গীদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমাদের একঘরে করা হইলেও, কোথা হইতে কোন সহায়তা না আসিলেও, আমরা আহমদাবাদ ছাড়িয়া যাইব না। অন্ত্যজদের বস্তিতে গিয়া তাদের সঙ্গে থাকিব, সাহায্য যদি বা যা আসে তা দিয়া চালাইব নয়ত মজুরী করিব।"

গান্ধীজীর সংস্পর্শে থেকে রক্ষণশীল মনোভাব সম্পন্না কস্তুরবার মন থেকেও ছোঁয়াছুঁয়ির ভাবটা কখন যেন একেবারে মুছে গেছল। প্রসঙ্গত তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ একান্ত কাছাকাছি দেখেছেন এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ারের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"১৯২৯ সালে প্রথম বার আমি যখন আশ্রমে আসি তখন লক্ষ্মী নাম্নী এক কিশোরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটিকে বা ও বাপুর কন্যারূপে জানতাম এবং বা মায়ের মতই তার স্নেহচর্যা করতেন। আশ্রম থেকে ফেরার পর এক বন্ধু বক্রোক্তি করলেন, 'ভালই, আশ্রমে ঝাড়ুদারের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তো?' আমি বিস্মিত হলাম। সেখানে তো কোন ঝাড়ুদার বা ঝাড়ুদারের কোন সন্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। বন্ধুটি আবার বললেন, 'মহাত্মাজী কি এক মেথরের মেয়েকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন নি?' এতক্ষণে আমি বুঝলাম যে, লক্ষ্মী এক ঝাড়ুদারের মেয়ে, বা-র আপন মেয়ে নয়। সেবাগ্রামে বা হরিজন চাকরবাকরদের তাঁর পরিবারের লোকের মতই আচরণ করতেন। তিনি জেলে প্রায়ই তাদের কথা মনে করতেন। এ বিষয়ে যখনই কোন আলোচনা হত তিনি বলতেন, 'ভগবান যখন আমাদের সকলকেই সৃষ্টি করেছেন তখন উচ্চনীচ ভেদ-ভাব কী করে থাকতে পারে? অনুরূপ মনোভাব পোষণ করা অনুচিত।'

"......আগাখাঁ প্রাসাদে আমাদের যারা দেখাশোনা করত সেই সিপাহীদের দলে একজন কি দু'জন মুসলমান সিপাহী ছিল। বা তাদের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন এবং অন্যান্যদের মত সুন্দর আচরণ করতেন। রান্নাঘরেও এদের সাহায্য নিতেন। হিন্দু পূজা-পার্বণে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করার সময় তিনি এদের ভুলতেন না আবার মুসলমান পর্বাদি উপলক্ষেও এদের নানা প্রকার দ্রব্যাদি দিতেন" [কস্তুরবা (ইং), সুশীলা নায়ার, পৃ. ৫৫-৫৬]

সেবাগ্রাম আশ্রমে এক হরিজন কর্মী একদিন বললেন, "আমি চুল ছাঁটতে ওয়ার্ধা যাব।"

"কেন এ-গ্রামে চুল ছাঁটা যায় না?"

"এ-গ্রামে অচ্ছুৎ নাপিত নেই। সবর্ণ নাপিত আমার চুল ছাঁটবে না।" শোনা মাত্র গান্ধীজী বললেন, "তাই বুঝি? তা হলে আমি আর কোনদিন ওই নাপিত দিয়ে কাজ নিতে পারব না।"

সেবাগ্রাম আশ্রমেরই আর একদিনের ঘটনা। ভীম নামে এক নাপিত গান্ধীজীর চুল ছাঁটছে। গান্ধীজী বললেন, কেমন ভীম, হরিজনদের কামাতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো? ভীম ইতস্ততঃ বোধ করল। গান্ধীজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই রকম করে হরিজনদের চুল ছাঁটতে পারবে তো? চুল ছাঁটা তখন খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। ভীমকে তখনও দ্বিধাগ্রস্ত দেখে গান্ধীজী বললেন, আর কাজ নেই ভীম। তুমি তা হলে এই মাঝখানেই আমার চুল ছাঁটা বন্ধ কর। ভীম তখন বলে উঠল, 'আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে অন্যান্যদের মত তাদেরও ক্ষৌরী করব।' গান্ধীজী খুশী হলেন।

গান্ধীজী ব্রত বা সংকল্প গ্রহণের অপরিহার্যতার কথা সর্বদা বলতেন। তাঁর প্রবর্তিত আশ্রমসমূহে রোজ প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল এবং শেষ জীবনে তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনা সভা তথা প্রার্থনান্তিক ভাষণের কথা বিশ্ববিশ্রুত। উক্ত প্রার্থনায় একাদশ ব্রত গ্রহণের সংকল্প করা হত। এই একাদশ ব্রতের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ব্রতও আছে। বিভিন্ন ব্রত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে য়েরোডা জেল থেকে গান্ধীজী ৯. ৯. ১৯৩০ সালে লিখছেন, "...অস্পৃশ্যদিগকে অস্পৃশ্যতা মুক্ত করার যে ঐহিক বা রাজনৈতিক লাভ আছে তাহাকে ব্রতধারী তুচ্ছ গণ্য করিবে। ব্রতধারীর কার্য হইবে, উক্ত প্রকার ফল লাভ হোক আর নাই হোক অস্পৃশ্যতা নিবারণকে ব্রতরূপে আচরণীয় ধর্ম মনে করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে আপনার জন করিয়া লওয়া।...এই অস্পৃশ্যতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখিব যে, এই পচন কেবল যে মুচি মেথর বলিয়া যাহারা গণ্য তাদের সম্পর্কেই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়।..এই অস্পৃশ্য ভাব বিধর্মীদের প্রতি আসে, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া যায়।" [জীবনব্রত বা গান্ধীবাদ, পৃ. ২০]

মন্দির প্রবেশ নিয়ে গান্ধীজীকে বহুবার ভারতব্যাপী আন্দোলন করতে হয়েছে। এই সঙ্গে তাঁর 'হরিজন টুর' এর (১৯৩৩-৩৪ সালে) কথাও স্মরণীয় হয়ে আছে। আসাম প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের পর তিনি ১৯৩৪-এর ২৫শে এপ্রিল দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ শুরু করেন। সেখানে সনাতনীগণ কালো পতাকা দেখিয়ে গান্ধীজীর বিরোধিতা করেন এবং পরদিন দেওঘরে তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়। গাড়ীর পেছনের কাচ ভেঙে যায়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়ী থেকে নেমে পড়েন এবং বিরোধীদের ভিড়ের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যস্থলে হাঁটতে শুরু করেন। পরে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তিনি পুনরায় দেওঘরে আসতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। এর পূর্বে পূর্বপুরুষগণ দেওঘর দর্শন করে গেছেন। কিন্তু তিনি ঠিক একই উদ্দেশ্যে সেখানে আসেন নি। গতবারে তিনি যখন দেওঘরে আসেন তখন এমন সভা হয় নি যেখানে তিনি হরিজনদের কথা বলেন নি। এবারেও তাই করবেন। তিনি আরও বলেন দেওঘরের এই ঘটনা থেকে তাঁর পায়ে হেঁটে হরিজন টুর করার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গান্ধীজী ভারতের সুদূর গ্রামে গ্রামে এই কাজের জন্য পায়ে হেঁটে চলেছেন। ঘন বৃক্ষের ছায়ায় শিবির স্থাপন করে দিনের পর দিন অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা বলেছেন। হরিজন ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে ওড়িস্যার পুরী জেলার ডেলাং-এ গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের অধিবেশন বসে। এখানে একটি ঘটনা ঘটে—যাতে গান্ধীজী দুঃখে, বেদনায় প্রায় ভেঙে পড়েন। পত্নী কস্তুরবা এবং মহাদেব দেশাইর স্ত্রী দুর্গাবেন পুরী শহর থেকে ফিরে আসার পর তিনি জানতে পারেন তাঁরা বেড়াতে গিয়ে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। কথাটা শোনার পর গান্ধীজী অত্যন্ত আঘাত পেলেন। সে রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর রক্তের চাপ বেড়ে গেল। সকলে বড় দুর্ভাবনায় পড়লেন। রাজাগোপালাচারী বললেন, মহাত্মাজী আপনি না স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক? আপনার কি বিচলিত হওয়া চলে? মহাত্মাজী উত্তর দিলেন, আমি কি জড় পাথর? আমি যা অধর্ম বলে মনে করি তা যদি আমার সহধর্মিণী মেনে চলে তবে আমার থাকল কি? কস্তুরবা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

গান্ধীজী পরদিন মিটিং-এ এসম্পর্কে বলেন, যে, অস্পৃশ্যতা পরিহার অহিংসার এক উচ্চতম অঙ্গ। অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন যদি না হয় তবে হিন্দুধর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে। যেখানে হরিজনেরা প্রবেশ করতে পারে না সেখানে আমাদেরও

প্রবেশাধিকার নেই। এমন স্থানে কস্তুরবা বা তার সঙ্গী সাথীরা কি করে যেতে পারে? "এই দুঃসহ সংবাদই আমার শেষ হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রক্তচাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে যন্ত্রে তা ধরা পড়েছে, কিন্তু ঐ যন্ত্র অপেক্ষা তা আমার ভাল করেই জানা ছিল। আমার দশা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল—যা মেশিনে ধরা পড়ার কথা নয়। গীতা আমাদের নিরাসক্তির শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই নিরাসক্তির অর্থ এই নয় যে, একান্ত আপনজন তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে জেনেও ঐ জাতীয় আঘাত থেকে উদাসীন থাকতে হবে।"

বহু আগে থেকেই গান্ধীজী তাঁর জীবনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কর্মসূচী অনুসরণ করে চললেও এর সর্বভারতীয় রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের ২৬শে অক্টোবর হরিজন সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অবশ্য তখন এই সঙ্ঘের নাম ছিল 'অ্যান্টি আনটাচেবিলিটি লীগ'। পরে এর নামকরণ করা হয় 'হরিজন সেবক সংঘ'। সেই থেকে সুদীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন রূপে হরিজনদের উন্নতির প্রয়াস চলে এসেছে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে—বর্তমানে কেরল রাজ্যের ভাইকম সত্যাগ্রহ ইতিহাস বিশ্রুত। এই স্থানের ভাইকম মন্দির অতি বিখ্যাত। কিন্তু মন্দিরের কথা দূরে থাক, মন্দির অভিমুখে যে পথগুলি গেছে সেখানে প্রবেশ করাও অস্পৃশ্যদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২৪ সালে গান্ধীজীর সম্মতি নিয়ে ওখানে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। পথ সমূহ রাজসরকারের শক্ত বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত। সত্যাগ্রহীরা রাজার সেই নিষেধের বেড়া ভেঙে মন্দির পথে প্রবেশ করতে চান। বেড়ার একদিকে রাজপ্রহরীর দল, অন্যদিকে সত্যাগ্রহী। প্রত্যহ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলে। প্রখর রোদে সত্যাগ্রহীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, এক বুক জল জমে যায়—সত্যাগ্রহীরা তারই মধ্যে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন। সত্যাগ্রহীদের বিনয়, ধৈর্য ও সংকল্প দেখে লোকে মুগ্ধ হয়। এইভাবে দিনের পর দিন যায়। বছর পূর্ণ হলে সত্যাগ্রহীদের ধৈর্যভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল। গান্ধীজী তখন তাঁদের কাছে এসে বললেন, হাজার বৎসরের অন্ধ সংস্কারের আগল ভাঙার জন্য এক বছরের দুঃখ ভোগ যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। ধৈর্য হারালেই অহিংস যুদ্ধে হারতে হবে। সত্যের পথে গভীর দুঃখ ভোগ, অটল ধৈর্য ও জলন্ত বিশ্বাসই আমাদের পাথেয়।

এই সত্যাগ্রহের ফলে ত্রিবাঙ্কুরের সবর্ণ হিন্দুদের জনমত ক্রমে অবর্ণদের অনুকূলে আসতে থাকে। রাজপথ, কূয়া, পুকুর ইত্যাদি ক্রমশঃ হরিজনদের জন্য

মুক্ত হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ অবশেষে ১৯৩৬ সালে প্রায় দু'হাজার মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করেন—এর মধ্যে কন্যাকুমারী অন্যতম। মন্দির দ্বার মোচনের এই প্রভাব সারা ভারতে হরিজনদের অনুকূলে ছড়িয়ে পড়ে।

গান্ধীজী নির্দেশিত আঠার প্রকারের গঠনমূলক কাজ সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। এই আঠার প্রকারের গঠনকর্মের মধ্যে হরিজন আন্দোলন অন্যতম। কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি যে গুটি কয়েক কর্মসূচীর কথা বলেন তার মধ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জন একটি।

নঈতালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে গান্ধীজীর গঠনকর্মসূচীতে শেষ সংযোজন। শিশু মনে যাতে ছোঁয়াছুঁয়ির ভেদভাব সৃষ্টি না হয়, যারা ময়লা সাফ্ করে তাদের প্রতি পৃথক দৃষ্টি যাতে শিশু বয়স থেকে গড়ে না ওঠে সে জন্য তিনি বলেছিলেন, "নঈতালিম সাফাই সে শুরু হোতী হায়" —নঈতালিম সাফাই কাজ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে।

১৯৩১-৩২ সাল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন ভারতবর্ষে অপূর্ব গণজাগরণ। এই শক্তিকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারের নানা প্রকারের প্রচেষ্টা চলছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন, ভারতে ছ'কোটি অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হবে—এরা রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। গান্ধীজী বুঝলেন এই কূটচালের ফলে হিন্দুসমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। হিন্দুধর্ম ও সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অস্পৃশ্যতা বর্জনের দ্বারা সমাজে ঐক্য সাধনের যে প্রচেষ্টা এতদিন করে এসেছেন তা বিফল হবে। গান্ধীজী তখন যারবেদা জেলে। কারও সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ নেই। এই মহাসঙ্কট থেকে ভারতকে বাঁচানর জন্য পথের দিশা চাই। এ নীতিকে সর্বতোভাবে রুখতে হবে। তিনি স্থির করলেন আমরণ অনশন করে এই সর্বনাশের প্রতিরোধ করবেন। ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র ভারতে, সারা বিশ্বে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি। তিনি লিখেছেন, "যে সম্মান মহাত্মাজি সকলকে দিতে চেয়েছেন সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারে না দিতে ধিক তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড় ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারিনে। সেই ভীরুতার ক্ষমা নেই।" [মহাত্মা গান্ধী]

সারা ভারতে সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন—কি করে মহাত্মার প্রাণ-রক্ষা হবে। রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্য উপেক্ষা করে যারবেদা জেলের দিকে ছুটলেন। এদিকে নানা জায়গায় শত শত মন্দির, রাজপথ, কূপ, জলাশয় হরিজনদের জন্য মুক্ত হতে লাগল। সার্বজনীন পংক্তিভোজের বহু ব্যবস্থা হল। কিন্তু গান্ধীজীর অবস্থা ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হতে লাগল। অবশেষে ভারতের অবর্ণ-সবর্ণ সকল রাজনৈতিক দল একত্রে বসে একটা বোঝাপড়ায় এলেন। অবর্ণ-সবর্ণ উভয়ের জন্য যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী বহাল রেখে তাঁরা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর বিরোধিতা করলেন। বৃটিশরাজ পরাজিত হলেন। অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব তাঁরা পরিত্যাগ করলেন। মৃত্যু শয্যাশায়ী মহাত্মাজীর জয় হল। রবীন্দ্রনাথ তার আগেই শান্তিনিকেতন থেকে উৎকণ্ঠার বোঝা নিয়ে গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার জন্য যারবেদা এসে পৌছলেন। গান্ধীজী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্রত সমাপন হল। অনশন ভঙ্গ করলেন তিনি। কবি নিজে গাইলেন গান্ধীজীর বড় প্রিয় গান, "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।" সেই সময়কার দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এখানেই রূপ ধারণ করল। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞ সম্ভবা।"

অস্পৃশ্যতারূপী পাপকে দেশ থেকে নির্মূলনের জন্য গান্ধীজী নানান রূপে চেষ্টা করে গেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধনের কথা বলা হয়েছে। একি তাঁরই প্রচেষ্টার ফল নয়? আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে—

"অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গের বিলোপ সাধন করা হল, সমাজ-ব্যবহারে যে কোন অস্পৃশ্যতা-স্বীকার নিষিদ্ধ করা হল। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কারও উপর কোনো অসামর্থ্য চাপিয়ে দিলে অথবা তার কোনো অধিকার অস্বীকার করলে সেই অপরাধ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবে।"

অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের পক্ষে এ এক পরম আশ্বাসের বাণী। দীর্ঘদিন ব্যাপী অস্পৃশ্যতা পরিহারের অন্দোলন সত্ত্বেও এবং ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন আইনে পরিণত হলেও অস্পৃশ্যতারূপী পাপ এখনও সমাজে রয়েছে এবং তা যে কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে তীব্রতর হয়ে উঠে সে

সংবাদও অবিদিত নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সামাজিকতায় বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে হরিজনদের এখনও দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যখন এ জিনিস আইনে পরিণত হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা মেনে চললে আইনত তা দণ্ডনীয় হবে তখন এ নিয়ে আর আন্দোলন কেন, জিনিসটা পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ মূলতঃ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন দেশ। এখানে রাষ্ট্র-ভাবনার চেয়ে সমাজ ভাবনা অত্যধিক। আমরা রাষ্ট্রনির্ভর না হয়ে অনুশাসনের ব্যাপারে মুখ্যত সমাজ নির্ভর। এখানকার সমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে, গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা পরিহার করার মত মানসিকতার সৃষ্টি যদি না হয় তবে আইনের সাহায্যে তা করা কষ্টসাধ্য। শাসনতন্ত্রে তো মানুষের অধিকারের অনেক আইনের কথা লেখা আছে। তবুও 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' গান্ধীজী সারাজীবন হরিজনদের আপনজন করে নেওয়ার জন্য সেই মানসতা সৃষ্টির প্রয়াস করে গেছেন।

সত্যাভিসার

শ্রীঅমিতাভ সাহা

ইউক্লিড-বর্ণিত সরল রেখার মতো গান্ধীজী-পরিকল্পিত রামরাজ্যের ধারণা সমকালীন বিচারে আপাত অসম্ভব মনে হলেও, অবাস্তব মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। গান্ধীজী স্বাধীন ভারতে এক 'রামরাজ্য' বা সর্বোদয়ী রাষ্ট্র সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারতের ধ্যানরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর সত্যসন্ধ দৃষ্টিতে। সেই সম্ভাব্য রূপের আভাসও আমরা পাই তাঁরই লেখায়, 'এমন এক শাসনতন্ত্র কায়েম করার আমি চেষ্টা করব, যার ফলে ভারত সব রকম দাসত্ব এবং অভিভাবকত্বপাশ থেকে মুক্তি পাবে···। এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ করে যাব, যেখানে দরিদ্রতমও অনুভব করবে যে, এ তারই দেশ ; এমন এক ভারত যেখানে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ থাকবে না···। এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান নেই। ···বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ। আমরা অপর কাউকে শোষণ করব না বা কারও দ্বারা শোষিত হব না বলে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র।···প্রত্যেকে লেখাপড়া জানবে এবং প্রতিনিয়ত তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। নিঃস্ব কেউ থাকবে না এবং শ্রমিকেরা সব সময়েই কাজ পাবে।···মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী রত্নখচিত প্রাসাদে বাস করলে এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আলো হাওয়া বিবর্জিত পর্ণকুটিরে থাকলে চলবে না।'

গান্ধীজী সত্য-সাধক, অহিংসা-মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি। তাঁর কাছে 'সত্য আর অহিংসা একই মুদ্রার দুই পিঠ।' আর এ তো সর্বজনমান্য যে সত্য ছাড়া শাশ্বত কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। কল্যাণের উদ্‌বোধক গান্ধীজীর চিন্তা ও বাক্য তাই সত্য ও অহিংসা আধারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা—উত্তর ভারতের ধ্যানরূপ রূপায়ণের মূল উপাদান হিসেবেও তিনি সত্য ও অহিংসাকেই গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান সমস্যাকাতর অস্থির মানসিকতার কাছে তার আবেদন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, সর্বকালের ইতিহাসে তার মূল্যায়ন হবে স্থায়ী কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সম্ভাব্য পন্থারূপেই। তাঁর চিন্তাকে দেশ-কাল-ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সামগ্রিক মানবকল্যাণের প্রয়োজনেই তিনি নিয়োগ করেছিলেন ; তবে,

সেই চিন্তাকে বাস্তবরূপ দেবার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভারতকে। কেন না, তাঁর মতে, 'ভারত মুখ্যত কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়।...সব কিছুই আমি ভারতবর্ষের কাছে পেয়েছি বলে আমি তার সঙ্গে এত দৃঢ় সংলগ্ন। আমি নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করি যে, ভারত দুনিয়াকে এক নূতন বাণী শোনাবে।'

সর্বোদয়ী রাজ্যের সম্ভাব্য রূপ ও তার পরিণতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, 'আমার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বয়ং কোনও লক্ষ্যবস্তু নয়, এ হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাবার অন্ততম সাধন মাত্র।...তবে জাতীয় জীবন যদি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত হবার মতো শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে আর জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটে না। তখন প্রজ্ঞামূলক নৈরাজ্যবাদের স্থিতি আসে।...এই জাতীয় আদর্শ রাষ্ট্রে তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার চিহ্ন থাকে না, কারণ এখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নেই। তবে মনুষ্য জীবনে কোন আদর্শের পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্তি হয় না। এইজন্যে থোরো কথিত সেই চিরায়ত উক্তির সার্থকতা—সেই সরকারই সর্বোত্তম যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে।' সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা রোগ-নিরাময় অপেক্ষা মানবদেহের আভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি যেমন স্থায়ী কল্যাণকর, তেমনি রাষ্ট্রদেহের ক্ষেত্রেও বিবিধ অন্যায়ের প্রতিকার ও অসাম্য-শোষণ-দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিরোধ, ব্যক্তি-মানসের সামগ্রিক নৈতিক বিকাশের দ্বারাই হওয়া উচিত, এবং এরূপ হওয়াটা যে অসম্ভব নয়, বরং স্থায়ী কল্যাণকর, এই দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধীজীর ছিল। গান্ধীজীর সকল পরিকল্পনার কেন্দ্র ব্যক্তি—রাষ্ট্র নয়। তাই, তাঁর ন্যাসবাদের কল্পনাতেও গান্ধীজী রাজা-জমিদার-জোতদার-ধনিক শ্রেণীর শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উপর আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। আদর্শের সিদ্ধির জন্য প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ বাস্তবে না ঘটলেও তার দ্বারা সর্বোত্তম যতটুকু লাভ হয়, তার ফলেই সিদ্ধিও নিকটতর ও সহজলভ্য হয়। গান্ধী-দর্শন ও ইচ্ছার উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখা যেতে পারে।

গান্ধীজী স্বরাজের যে কল্পনা করেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তা অর্জিত পরিচালিত ও রক্ষিত হবে সত্য ও অহিংসার দ্বারা। তাঁর এই স্বরাজের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তার একদিক হচ্ছে রাজনৈতিক এবং অপরদিক অর্থনৈতিক। এ ছাড়া আরও দু'টি দিক আছে। তার একটি হলো নৈতিক ও সামাজিক দিক, এবং অপরটি উদারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম। এগুলিকে তিনি

আখ্যা দিয়েছেন স্বরাজের চারটি বাহু বলে, এবং মনে করতেন, এর যে কোন একটি দিক বিপন্ন হলে, স্বরাজরূপ সমগ্র চতুর্ভুজটিই বিকৃত হয়ে যাবে। আবার, ন্যায়সঙ্গত কার্য দ্বারা অর্জিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কোনও জাতিকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী করতে হলে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার. স্বরাজ হচ্ছে তারই সমষ্টি। এই উভয় ব্যাখ্যা থেকে যে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হতে পারি, তা হলো, আত্মসচেতন কোনও জাতিকে ব্যাপকতর অর্থে স্বাধীন এবং শক্তিশালী করতে হলে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার, তা রচিত হবে চারটি বিশেষ দিককে ভিত্তি করে। সেই দিকগুলো হলো, প্রথমতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তৃতীয়তঃ নৈতিক ও সামাজিক দিক, এবং চতুর্থতঃ উদারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম।

প্রথমোক্ত, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাধারণ অর্থে ভারত লাভ করেছে। এবং ভারতবর্ষের মুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বল জাতিগুলিকে পাশ্চাত্য দেশসমূহের প্রাণান্তকারী শোষণ পাশ থেকে মুক্ত করার যে ইচ্ছা গান্ধীজী পোষণ করতেন, তাও আজ মোটামুটি সফল। এই স্বাধীনতা-লাভের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অবদানের মূল্যায়ন করবে মহাকাল। যাই হোক, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত আজ সফল।

দ্বিতীয়োক্ত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। সুস্থ স্বাবলম্বী গ্রামীণ সভ্যতার পুনরুজ্জীবন, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সংগঠন এবং তার মাধ্যমে ভারতের সাতলক্ষ গ্রামের কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বেকার ও মরশুমী বেকারের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের অবসান ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ধনের সমবণ্টন, শরীর শ্রম প্রভৃতিকে তিনি নির্দেশ করেছেন এই স্বাধীনতা লাভের উপায় রূপে।

ভারতীয় জনজীবন ও সভ্যতা মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। আমাদের সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশও হয়েছিল গ্রামকে কেন্দ্র করেই। স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী স্বার্থ সেই গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশের আপাত সকল প্রয়াস করেছিল। 'ভারতের নগরসমূহের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী গ্রামে উৎপন্ন হয়ে শহরে চালান আসত। শহরগুলি বিদেশী মালের বাজারে পরিণত হওয়ায় এবং সস্তা ও খেলো বিদেশী মাল বাজারে স্তূপীকৃত করে গ্রামগুলিতে অর্থাগমের রাস্তা বন্ধ করায় ভারত দারিদ্র্যদশায় পতিত হল।' জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনামূলক হারে জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে বাড়লো প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এই দুরবস্থার সঙ্গে 'গ্রামীণ মহাজনি

ব্যবস্থার' প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে জমির মালিকানা ক্রমশঃ সঞ্চিত হলো গুটিকয়েক জোতদারের হাতে। কর্মপ্রত্যাশীরা ছুটলো শহরে। আর যারা অসহায়ের মতো পড়ে রইলো পিছে, অনশন, অর্ধাশন, দারিদ্র্য, হতাশা, রোগ আর অকালমৃত্যু হলো তাদের সর্বক্ষণের সাথী। অথচ তারাই এদেশের শতকরা আশীভাগ জনশক্তি। এদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, 'একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি অন্য কোনও চিন্তার আগে তার ক্ষুধা-তৃপ্তির কথাই চিন্তা করে। একদানা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে সে তার স্বাধীনতা ও আর সব কিছুকে বিক্রয় করে দেবে। ভারতের নিযুতসংখ্যক ব্যক্তির এই দশা। তাদের কাছে ভগবান, স্বাধীনতা এবং এই ধরনের অপরাপর শব্দগুলি শুধুমাত্র কতকগুলি অর্থবিহীন অক্ষরের সমাহার। এই সব ব্যক্তিদের যদি আমরা স্বাধীনতার বা মুক্তির আস্বাদন দিতে চাই, তাহলে, তাদের ন্যূনতম উপজীবিকার সুযোগ, যাতে তাদের গৃহকোণে বসে কোনও কর্মের মাধ্যমে তারা পায়, সেই কর্মের সংস্থান আমাদের করে দিতে হবে।' তাই গান্ধীজী তাঁর ধ্যানের ভারতে কল্পনা করেছেন সত্য ও অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের, প্রতিটি গ্রামকে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, বা গ্রাম-একম্ রূপে সংগঠিত করবার।

অতিপরিচিত একটি শ্লোগানের প্রতিধ্বনি করে একথা বলা যায়, 'লাঙ্গল যার জমি তার'—এর নীতিতে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন। তবে এই শ্লোগানের উদ্ভাবকদের সঙ্গে তাঁর পন্থাগত পার্থক্য ছিল। 'অহিংস নীতি অনুযায়ী কৃষি-শ্রমিকেরা জোর করে দূরের বাসিন্দা মালিকদের সত্ত্ব কেড়ে নেবেন না।' তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'জাতীয় সরকারই এ সম্পর্কে কৃষাণদের স্বার্থ-রক্ষা করবেন। তবে, এই (সরকার বা প্রতিনিধিত্বমূলক) ব্যবস্থা-পরিষদ যদি কৃষাণদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে চূড়ান্ত প্রতিকারের জন্য অবশ্যই তাদের সামনে আইন-অমান্য ও অসহযোগের পথ খোলা থাকবে। অহিংস সংগঠনের শক্তি, নিয়মানুবর্তিতা এবং ত্যাগই হচ্ছে অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ।' প্রসঙ্গান্তরে, অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন বা সত্যাগ্রহের সম্পর্কে গান্ধীজীর বক্তব্য দ্বিধাহীন,—'অহিংস আইন অমান্য কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার।···চিন্তা, বাক্য বা কর্মে সত্যাগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন—কোন রকমের হিংসারই সম্বন্ধ নেই।···সত্যাগ্রহ সৌম্য, এ কখনও আঘাত করে না। সত্যাগ্রহ কদাচ ক্রোধ বা আক্রোশের অভিব্যক্তি হবে না। ···অহিংস আইন অমান্যকারীকে স্বেচ্ছায় তাঁর কার্যের ফলে প্রাপ্য শাস্তি ভোগ

করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।...এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নীতি হবে কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ভালবাসা দ্বারা বিরোধীপক্ষের হৃদয় জয় করা।' অতীত ও বর্তমানে সংঘটিত বহু কৃষাণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করা হয়তো অসমীচীন হবে না, যে সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি কৃষক-আন্দোলনের তুলনায় চম্পারণ সত্যাগ্রহ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছিল। শোষিত শ্রেণীর সম্পর্কে জাতীয় সরকারের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, '...এই সব লোকেদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে হলে ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের ঐকান্তিক কর্তব্য হবে এদের অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সুযোগ সুবিধা দিয়ে যে বোঝার চাপে তারা আজ পিষে মরছে তার হাত থেকে তাদের মুক্ত করা।... এ হবে বিত্তহারা ও সর্বহারাদের সংগ্রাম। এতে ভয় পেলে জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে পড়বে।' খাদ্যাবস্থার উন্নয়নের জন্য কৃষিবিপ্লব আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ সুবিধার সঙ্গে কৃষাণদের স্বার্থে ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সাধনের ব্যাপারে সরকার ও কৃষাণ উভয় পক্ষের ভূমিকার উপরই গান্ধীজী জোর দিয়েছেন।

সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ভূমিকাকে স্বীকার করলেও তার অসংযত প্রসারকে গান্ধীজী চিরদিনই গর্হিত বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে যে জীবন্ত যন্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্রকে প্রয়োগ করা উচিত নয়। যন্ত্রের উপযুক্ত প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার সহায়তা করা এবং তাঁর শ্রম লাঘব করা। বর্তমানে যে ভাবে যন্ত্রশিল্পের ব্যবহার হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থার প্রতি বিন্দু-মাত্র দৃকপাত না করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয় এবং সম্পদ ক্রমাগত সঞ্চিত হয় মুষ্টিমেয় জন কয়েকের হাতে।'

এই সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে। অর্থনৈতিক মান-দণ্ডের বিচারে ভারত যে অনুন্নত দেশ, অতিবড় ভারত প্রেমিকও নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করবেন না। স্বাভাবিক কারণেই এদেশে কৃষি বা কর্ষণযোগ্য জমির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে এতো বেশী যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোনও উপযুক্ত কাজ এতে থাকে না। এর স্বাভাবিক সমাধান হতে পারতো কৃষির পাশাপাশি সরকারী ব্যবস্থাপনা ও পরিপোষণাধীনে গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন। এর ফলে, মূলধন-সংগ্রহের জন্য আমাদের অতিরিক্ত অর্থ-সংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশী ঋণের দায় বইতে হতো না, জাতীয়

স্বর্ণ-ভাণ্ডারের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত নোট ছাপাবার প্রয়োজন হত না, গ্রামময় ভারতের কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বেকার বা মরশুমী বেকারের কর্ম-সংস্থানের দুর্ভাবনা এভাবে ভাবতে হত না, জাতীয় আয়ের বর্তমান অসম বণ্টনের সমস্যা আমাদের ভারাক্রান্ত করত না। গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কিছু পরিমাণ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই করা হয়েছে বিগত দুই দেশকে। কিন্তু সমজাতীয় উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রসারকে রোধ না করার, এবং কোনও ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার ফলে, অসম প্রতিযোগিতায় সেই গ্রামীণ শিল্পগুলি আজ ক্ষয়িত-শক্তি ক্ষীণ-প্রাণ। ফলে, নাগরিক বা শিক্ষিত বেকারত্বের বৃদ্ধি তো এই সময়কালে হয়েছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাও পরিবর্ধমান। ৪৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নিয়ে শুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩ লক্ষে। তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে ও শেষে এই সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৯০লক্ষ ও ১ কোটি ২০ লক্ষ। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে ২ কোটি ৩০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করতে হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে নূতন শ্রমিক সৃষ্ট হবে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ এবং লোক-সভার এস্টিমেটস্ কমিটির মতে এর অধিকাংশ আসবে গ্রাম থেকে। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল রেখে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে, দ্রব্যমূল্যের দর আকাশছোঁওয়া হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিটি শিল্পে মন্দা ও ফলে কর্মচ্যুতি, ছাঁটাই ইত্যাদি এখন দৈনন্দিন ঘটনা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাথমিক যাচাই হয় যে ক্রয়ক্ষমতা-বৃদ্ধি দিয়ে, অপ্রতিরোধ্য কারণে তাই আজ সঙ্কুচিত। আজ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থা 'পরিকল্পনার'ই অবদান। বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েই গান্ধীজী তাতে রাষ্ট্রের মালিকানার শর্ত আরোপ করেছেন। হয়তো এ শর্তও সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে জাতীয় আয়, কয়েকটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আয়ের যোগফলেরই প্রতিফলন মাত্র হত না।

বৈদেশিক ঋণের সম্পর্কেও গান্ধীজীর বক্তব্য দৃঢ় প্রত্যয়ে নিশ্চিত, 'বিদেশের দানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, আমাদের 'মাটি থেকে যা পাওয়া যায়, তাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো সাহস ও যোগ্যতা আমাদের থাকা চাই। নচেৎ স্বাধীন জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার যোগ্যতা আমাদের থাকবে না।' আমাদের আত্মাভিমান বহু ক্ষেত্রে আমাদের সান্ত্বনার কারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রার্থীর প্রাপ্য করুণা ছাড়া

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আর খুব বেশী কিছু আহরণ করতে পারে নি উন্নততর দেশগুলি থেকে। অথচ ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব করতেন, 'রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিশ্ব পীড়িত, মুমূর্ষু। পৃথিবী একটা বিকল্প পথ অনুসন্ধান করছে। আমার মনে কেন জানি না এই মূঢ় আশা যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই প্রাচীন দেশ আর্ত বিশ্বকে বাঁচার পথ দেখাবে।' তাঁর এই আশার সম্পূর্ণ বিপরীত আমাদের বর্তমান আচরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্যের অনুসরণে বলা যায় যে, আমরা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার মূর্তি গড়িয়ে এখন পূজা করছি।

স্বাধীনতা-লাভের প্রাক্কালে, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে প্রকাশিত 'পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছিল, 'মুদ্রামূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে। নীতিগতভাবে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ রাখা প্রয়োজন। অর্থব্যবস্থা এমন একটি নমনীয় উদ্ভিদের মতো যা' সামান্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগও সহ্য করতে পারে না।' কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অসহায়তার চরিত্র ও কারণ আজ আর অপরিজ্ঞাত নয়। ফলস্বরূপ বেড়েছে আর্থিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। বৃটিশ অর্থ-বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম বেভারিজের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, সার্বজনীন বেকারত্বের বিষময় ফল বাহ্যিক অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মানসিক ক্ষেত্রে সক্রিয়—শুধুমাত্র অভাব বা দারিদ্র্যকেই এ সৃষ্টি করে না, ভয় ও ঘৃণাকেও এ জন্ম দেয়।' কৃষির উপর নির্ভরশীল, ভারতের শতকরা আশীভাগ যে জনশক্তি বৎসরের অধিকাংশকাল বেকারত্বজনিত কারণে দুর্দশাগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িত, তাদের প্রসঙ্গে গান্ধীজী তাই বলেছেন, 'ক্ষুৎ-প্রপীড়িত কর্মহীন ব্যক্তির নিকট, ভগবান, শুধুমাত্র কর্ম ও তার পারিশ্রমিক হিসাবে আহার্যের রূপেই আবির্ভূত হতে পারেন। কর্মের বিনিময়ে আহার্যের সংস্থান করার জন্য ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চোখে, পরিশ্রম ছাড়া যারা আহার করে, তারা পরস্বা-পহারী। ভারতের শতকরা আশী জন ব্যক্তি বৎসরের অর্ধেক সময় বাধ্যতা-মূলক পরস্বাপহারী। এটা জানার পরও, ভারতবর্ষ যে একটা বৃহৎ কারাগার, এ বিষয়ে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? ক্ষুধার মুক্তিই ভারতকে চরকার কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। চরকার আহ্বানই ভারতের মহত্তম আশ্রয়। কারণ, এ আহ্বান, প্রেমের আহ্বান এবং প্রেমই স্বরাজ…।' এ বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 'আমার বহু ভুলভ্রান্তির

জন্যে হয়তো ভাবীকাল আমার প্রতি দোষারোপ করবে, তবে চরকার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা দেবার জন্য যে তারা আমার প্রশংসা করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এর জন্যে আমার সবকিছু আমি পণ করেছি। কারণ চরকার চাকার প্রতিটি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে বেরিয়ে আসে শান্তি, শুভেচ্ছা ও প্রেম।…চরকা আমার কাছে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।' এ বিষয়ে অক্সফোর্ডের অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জি, ডি, এইচ্ কোলের মন্তব্য চমকপ্রদ, 'কুটিরজাত বস্ত্র খদ্দরের উন্নয়নের জন্যে গান্ধীর যে আন্দোলন সেই খদ্দর, অতীতের রোমন্থন প্রয়াস সম্ভূত ভাববিলাসীর পরিচ্ছদ মাত্রই নয়, পরন্তু গ্রামভারতের দারিদ্র্যমোচনের ও জীবন ধারণের মানোন্নয়নের একটি বাস্তব সম্মত প্রচেষ্টার চিহ্ন।' ভারতবর্ষের মতো জনসংখ্যা-বহুল, অনুন্নত দেশে মূলধন মূলক বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের চেয়ে, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও আনুষঙ্গিক ফললাভের ক্ষেত্রে, শ্রমমূলক ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প প্রয়াস যে অধিকতর উপযোগী সেই সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। লোকসভার এস্টিমেট্স্ কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টেও সরকারকে, বেকার সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধানের জন্য গ্রামীণ শিল্পের প্রসার-পরিকল্পনা কার্যকরী করা ও তার জন্য পৃথক আর্থিক বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, 'অহিংস স্বাধানতার মূল চাবিকাটিই হল আর্থিক সাম্য। আর্থিক সাম্যের জন্য কাজ করার অর্থই হলো পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের অবসান ঘটানো।…ধনী ও ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান যতদিন থাকবে, ততদিন অহিংস শাসন-পদ্ধতি স্পষ্টতঃই অসম্ভব ব্যাপার। নূতন দিল্লীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও তারই কাছে গরীব দুর্দশাগ্রস্ত কুটিরের মধ্যে যে পার্থক্য, স্বাধীন ভারতে তা একদিনও টিঁকতে পারে না।…ধন ও ধনজ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তা সাধারণের মঙ্গলের জন্যে ব্যয় না করলে অহিংস ও রক্তাক্ত বিপ্লব অবধারিত।'

গান্ধী-দর্শন ও শিক্ষার মৌল আবেদনের স্বরূপই নৈতিক। সেই নীতিবোধ শত্রুকেও হিংসা করতে বারণ করে। তিনি মনে করতেন, 'আমাদের বিরোধ ব্যক্তির সঙ্গে নয়, তার কর্মপন্থার সঙ্গে,' এবং '…আমরা ঘৃণাকে ঘৃণার দ্বারা, অন্যায়কে অন্যায়ের দ্বারা, হিংসাকে হিংসার দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারব না। অন্যায়ের জবাব কল্যাণকর পন্থায় দেবার জন্যে আমাদের সতত চেষ্টিত হতে হবে।' ভগবৎ-বিশ্বাস, এবং সত্য ও অহিংসার প্রতি অবিচল আস্থা ব্যক্তি-মানসে যে নৈতিক শক্তির সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা বৃহত্তম সামরিক

শক্তিরও যে নেই, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাঁর সকল বক্তব্যকে তিনি স্থাপন করেছিলেন নৈতিক ভিত্তির অক্ষয় শাশ্বত আশ্রয়ে।

পানাসক্তির অপকারিতা সম্পর্কে গান্ধীজীর বক্তব্য অত্যন্ত ঋজু, 'আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র সুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করব। যদি প্রয়োজন হয় সুরা বর্জন করার জন্য ভারত বরং অশিক্ষিত থাকুক, তাও স্বীকার। পানদোষের কবলে যে জাতি পড়েছে, ধ্বংস ছাড়া তাদের আর অন্য কোনও গতি নেই।...আমার মতে মদ্যপান চৌর্য-বৃত্তি এমন কি বোধ হয় বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও হানিকর।...আমি যদি মাত্র এক ঘণ্টার জন্যেও ভারতবর্ষের সর্বাধিনায়কের পদ পেতাম, তাহলে সব চেয়ে প্রথমে আমি কোনও ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সব মদের দোকান বন্ধ করে দিতাম।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি ভারতের কোনও একটি রাজ্যে জনৈক বিধানসভা-সদস্য বিধানসভা প্রাঙ্গণে সদস্যদের জন্য সস্তাদরে মদের দোকান খোলার প্রস্তাব এনেছিলেন। এই বৎসর, অর্থাৎ, গান্ধী-শতবর্ষ শুরুর বৎসরের 'পরিকল্পনা'র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের মধ্যে দুই কোটি টাকা, মদ্য বিক্রয় ব্যবস্থা শিথিল করার ফলে বর্ধিত আয় থেকে পাওয়া যাবে বলে সরকার আশা করেছেন। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি স্তরে বহুবিধ দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই মদ্যপানের প্রসারও ঘটেছে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই মদ্য আজ সামাজিক পানীয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

জনসংখ্যার অপ্রতিরোধ্য ঊর্ধ্বগতিকে রোধ করবার প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজীও উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সামাজিক কল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি গর্ভনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কারের পরিবর্তে আত্মসংযমের উপায় অনুসন্ধান করার উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'কৃত্রিম উপায় সমূহ পাপকে প্রোৎসাহিত করে।...কৃত্রিম উপায়ের শরণ নেবার ফলে আত্মসংযমের ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে সম্ভাব্য কোনও তাৎকালিক লাভের তুলনায় এ মূল্য অত্যধিক।' আর তাছাড়াও, 'বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে গর্ভরোধক সাজ-সরঞ্জামের প্রবর্তনের ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সমাজ-জীবনকে কলুষতামুক্ত করার কাজে ব্রতী সংস্কারকদের কাজ এখনকার মতো প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।' কেন না, 'শুধুমাত্র বিবাহিতদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব।' নৈতিকতার

যে স্থিতিতে গান্ধীজীর সকল বক্তব্য ও শিক্ষা সংস্থাপিত, সেই স্থিতিতে উত্তীর্ণ হবার সাধনায় যাঁরা ব্রতী, আত্মসংযম তাঁদের কাছে প্রাথমিক আচরণীয় নীতি। সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজ সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারলে গান্ধীজীর এই বক্তব্যের যাথার্থ্যে সন্দেহ করবার কোনও কারণ থাকবে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সামাজিক অবাধ যৌনবিহারের যে সম্ভাবনার প্রতি গান্ধীজী ইঙ্গিত করেছেন, সমাজ-বিজ্ঞানীরা এবং জনসাধারণ নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে চিন্তিত হবেন।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন বলে তিনি মনে করলেও, সেক্ষেত্রেও তাঁর নীতির দৃঢ়তাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কোন অবস্থাতেই বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের পৃথক করে রাখা চলবে না, —কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েও নয়। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও ঋজু, 'আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, আসন সংরক্ষণ ও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, আপনাদের (হরিজন) সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের ব্যবধানকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে···বয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংযুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার ফলে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে আপনাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।'

শিক্ষা সম্পর্কে, বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার জনক গান্ধীজীর বক্তব্যও ছিল এমনি সহজ ও অনাড়ম্বর। তিনি বলেছেন, 'শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বা বিরাট দেহটি কিংবা হৃদয় বা আত্মাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। পরিপূর্ণ মানুষটি সৃষ্টি করতে হলে, এই তিনটি বৃত্তির যথোপযুক্ত ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এই বুভুক্ষু জনগণের দেশে বুদ্ধির সঙ্গে খাটতে শেখানই হচ্ছে আমার মতে একমাত্র প্রাথমিক এবং প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা। যে কোনও পরিকল্পনা যদি শিক্ষার দিক থেকে শুরু এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার আর্থিক বনিয়াদও পোক্ত হতে বাধ্য। ··জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে প্রত্যেকের প্রয়োজনে লাগানো উচিত, এই নীতির প্রতি জোর দেওয়াই হচ্ছে নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এর ফলে স্বভাবতঃই বনিয়াদী শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি শরীর ও মনের যুগপৎ উন্নতি সাধিত না হয়, তাহলে শুধু মনের বিকাশ এক অকিঞ্চিৎকর একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।' প্রাথমিক স্তরে যদিও সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও সেই সম্পর্কে যথোচিত নীতি অবলম্বিত হয় নি। পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থায় দেহই যে শুধুমাত্র অবহেলিত, তাই নয়, মনুষ্যত্বজনোচিত

সৃজনী-প্রতিভাকেও কাজে লাগাবার কোনও সুযোগ থাকে না। তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশব-কালেই ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়াস পরিকল্পনার অপমৃত্যু ঘটে, এবং গতানুগতিক শিক্ষার অন্ধ আবেগে তাড়িত হয়ে একটিমাত্র পরিণতিকে লক্ষ্য করেই অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় দিন-যাপন করে এবং কৃষি ও শিল্পসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমরা এই অন্ধ গতানুগতিকতার শিকার হই। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, বনিয়াদী শিক্ষাক্রম চালু হওয়ার ফলে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এমন এক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে, যেখানে 'স্বত্ববান' ও 'নিঃস্ব'দের ভিতর বর্তমানের মতো কোনও কৃত্রিম পার্থক্য থাকবে না এবং প্রত্যেকেরই জীবনধারণোপযোগী জীবিকা এবং স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাকবে। তাই এই শিক্ষাক্রমকে তিনি সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সামাজিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করতেন।

গান্ধীজীর জীবনে ধর্মের স্থান দেশপ্রীতিরও ঊর্ধ্বে। তাঁর বক্তব্য, 'অহিংসা ধর্মের দ্বারা ভারতের সেবা করার জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।···আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাতৃবক্ষ সংলগ্ন শিশুর মতো ভারতকে আমি আঁকড়ে থাকি।···সে বিশ্বাস লুপ্ত হলে ভবিষ্যতে অভিভাবককে খুঁজে পাবার আশা বিরহিত অনাথ বালকের মত মনে হবে।'

গান্ধী-সাযুজ্য সত্য-সন্নিহিতির কল্যাণকেই স্বাগত করে। সত্য বাতাসের মতোই স্বচ্ছ, সর্বব্যাপী,—তেমনি নিরাবয়ব। তাই সত্য আপাত মনোগ্রাহী বা সহজবোধ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য 'গান্ধীর অহিংসানীতি ও অর্থনৈতিক ভাষ্য সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের কেউই মেনে নিতে পারে নি।' সাধারণভাবে এই মেনে নিতে না পারাটাই বোধ হয় সত্যের রাসায়নিক পরীক্ষার প্রথম পর্যায়। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, সত্য অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত। মিথ্যার ধূম্রজালে সত্যের হিরণ্ময়প্রভ মুখ সাময়িক আচ্ছাদিত থাকলেও সত্য আপন-জ্যোতিতে পুনরুদ্ভাসিত হবেই। তেমনি গান্ধী-দর্শনও আগামীকালের দিঙ্‌মণ্ডলকে উচ্ছ্বসিত উদ্ভাসিত করবে তার জ্যোতিচ্ছটায়—এই বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে। কেন না, সত্য ছাড়া গান্ধী-জীবন ও দর্শনের অপর কোনও ভিত্তি নেই। গান্ধীজীর জাগতিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেশবাসীকে জানাতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, '···আমাদের জীবনে আলো নির্বাপিত,—তমসায় আচ্ছন্ন সর্বদিক।' ভরসা আছে, এই তমসাকে অতিক্রম করে সূর্য আবার উঠবেই।

বাঙলা বাঙালী ও গান্ধীজী

সমসাময়িক বাঙালীর চোখে গান্ধীজী

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব বাঙালীর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল, আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিলে, গান্ধীজীর মতবাদ ও কর্মনীতি কোন্ কোন্ বাঙালী নেতা সমর্থন করেন, আর কোন্ কোন্ বাঙালী নেতা উহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, আন্দোলনের ইতিহাসের দিক হইতে এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকিলেও, উহা লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। বিষয়টা ব্যক্তিগত এবং বিশেষ বিতর্কিত হইয়া পড়িবে, সেহেতু অবাঞ্ছিতই মনে করি। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বাঙালীর চোখে গান্ধীজী কি আকারে ও প্রকারে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য, আমার বুদ্ধিতে অসাধ্য। সকলের চোখের দৃষ্টি এক রকম নয়, দৃষ্টি কাহারো স্বচ্ছ, কাহারো ঘোলাটে হইতে পারে, কেহ বস্তুর একাংশ দেখেন, বাকি অংশে চোখই পড়ে না, ব্যক্তির বদ্ধমূল ধারণা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইতে পারে। অন্ধের হস্তী দর্শনের 'দর্শন'তো সুবিদিত। সুতরাং গান্ধীজীর জীবন, জীবন-দর্শন ও কর্মধারা সম্পর্কে (প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বিশাল ও হিমালয়ের মতো সুউচ্চ যাঁর জীবন, জীবন-দর্শন আর সংখ্যাতীত কর্মকীর্তি) কোন একজন বিশিষ্ট বাঙালীর কোন একটি অভিমত ধরিয়াও গান্ধীজীসম্পর্কে তাঁহার প্রকৃত মতামত বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেওয়া উচিত নহে।

রায় দেওয়া নিরাপদ নহে

এ-স্থানে একজন বাঙালী ঐতিহাসিকের কথাই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর প্রদর্শিত অহিংসার পথেই— অস্ত্র ও ভায়োলেন্সের পথে নয়; উহার প্রয়োজন হয় নাই, কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন কোন ইতিহাস লেখকের এবংবিধ একতরফা দাবির বিরুদ্ধেই বাঙালী ঐতিহাসিক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে 'ভায়োলেন্স', 'রাজনৈতিক হত্যা', 'টেররিজম্' বিশ্বের একটি স্বীকৃত কার্যকরী উপায়। গান্ধীজীর অহিংসার আত্মিক প্রভাবে বৃটিশের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয় নাই। অহিংসার ব্যর্থতা প্রমাণ করিতে গিয়া সেই দিক হইতেই গান্ধীনীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন।

এ-স্থলে লক্ষ্য করিবার, বাঙালী ঐতিহাসিক গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের সাফল্যের দাবির বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপরের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু লইয়া, গান্ধীজীর নিজের কোন উক্তি বা দাবি লইয়া কিন্তু নহে! গান্ধীজী সত্য ও অহিংসায় পরম বিশ্বাসী, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, তাঁহার অহিংসা নীতির দ্বারাই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন! বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের বক্তব্য পাঠ করিলে মনে হইবে, তিনি গান্ধীজীর অত্যন্ত বিরোধী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, গান্ধীজীর জীবন-দর্শন ও আদর্শের প্রতি তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করেন, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অতুলনীয় অবদান স্বীকার করিতে. তিনি মুক্তকণ্ঠ। সুতরাং কোনও বাঙালীর কোন একটি উক্তি ধরিয়াই পক্ষে বিপক্ষে স্থির করা নিরাপদ নয়। তাই আমরা সাধারণ ভাবে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব কর্মাদর্শ এবং বাঙালীর উপর উহার প্রভাব সম্পর্কে যা অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সেবক গান্ধী

দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের খ্যাতি ছিল গান্ধীজীর। মহামনা গোখলের বিশেষ প্রিয়পাত্র রূপেই গান্ধীজী প্রথম বাংলায় আসিলেন প্রধানতঃ আফ্রিকার ব্যাপারে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সাধু, সত্যনিষ্ঠ গুরুদাস বন্দ্যোধ্যায়, ত্যাগব্রতী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ প্রমুখ বাংলার শিরোভূষণগর্ণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন গান্ধীজী। বিবেকানন্দকে যে দেখাই চাই,—ছুটিলেন পদব্রজে বেলুড়—দেখা হলই না, তিনি চিকিৎসার্থ কলিকাতায়। এস্থলে গোখলের কথা একটু বলি। "বাংলা আজ যা ভাবে, সারা ভারত কাল তাই ভাবে।" গোখলের এ-কথা সবাই জানি, কিন্তু মহামনীষী ভারতসেবক গোখলে বাঙালীর প্রতি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন কয়জন বাঙালীর ধারণা তার কাছাকাছি যায় জানি না। বঙ্গ বিভাগ রদের দাবিতে মাননীয় গোখলে সুপ্রীম লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে 'বাঙ্গালী জাতির' (Bengali race) জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। আজিকার বাঙালী যুবকদের তাহা পাঠ করা ভাল মনে করি। তাহাতে দম্ভ নয়, দেখা দিবে বিনম্র শ্রদ্ধা! অসম্ভব. নয়, গোখলের বাঙালী সম্পর্কে ধারণা. গান্ধীজীকে কিছুটা প্রভাবিত করে বা!

১৯০১ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধী যোগ দেন 'সেবক'রূপে। তাহা

দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, কিন্তু দেখিয়াছেন এমন কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকের মুখে শুনিয়াছি : "কাজে কি অপূর্ব নিষ্ঠা। 'সেবক' গান্ধীর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য সেখানেই ফুটিয়া উঠে! 'বেয়ারার' ও মেথরের কাজ সব কাজকেই গান্ধীজী সমান মর্যাদা দিয়া সেদিন শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত রাখেন না, কংগ্রেস নেতা ও প্রতিনিধিগণকেও এই আদর্শ সেবকটির নিকট বেশ কিছু শিক্ষালাভ করিতে হয়। প্রকৃত সেবক বুঝি সংস্কারকও হইয়া থাকেন!

ভারত জাতির আদর্শ সেবক ও সংস্কারকের যে ভূমিকা (যাহার অনুসরণে আবদুল গফুর খানের 'খুদাই খিদমদ্‌গার') গান্ধীজী তুলনাহীন নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভব হয় আস্তিক্যবুদ্ধিতে,সত্য-নিষ্ঠায়, আর ফাঁকির দ্বারা কোন মহৎ অধিকার লাভ করা যায় না, এই প্রত্যয়ের দরুনই। যে মানুষের অধিকার আমি চাই, সেই অধিকারে আমারই দেশবাসী অসংখ্য মানুষকে বঞ্চিত রাখার গ্লানি হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে ইহাই তো সত্যনিষ্ঠা। জাতীয় জীবনের পুঞ্জীভূত আবর্জনা দূর করা, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন, দেশসেবকেরই ধর্ম। স্বাধীনতার জন্যও ইহা প্রয়োজন। তাই দেখি, স্বামী বিবেকানন্দও জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার নিষ্ঠুর নিপীড়ন সম্পর্কে জাতির তরুণদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন : "হে ভারত···এই কাপুরুষতা—এই ঘৃণিত নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ?" অর্থাৎ দুরাশা!

বাঙালীর দৃষ্টিতে গান্ধীজী

১৯২০ সালে গান্ধীজীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই গান্ধীজীর সত্য অহিংসা নির্ভীকতা ত্যাগ নিষ্ঠা মানবিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে বাঙালীর মধ্যে একটা প্রত্যয় জাগিয়া গিয়াছে। এক কথায় সে প্রত্যয় : গান্ধীজী অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত একটি খাঁটি মানুষ, বিপ্লবী বাঙলার দৃষ্টিতে গান্ধীজী একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। বিপ্লবী বাঙালী যেন গান্ধীজীর মতো—আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—এমন একজন দিশারিকেই কামনা করিতেছিল।

একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়, প্রকৃতই গান্ধীজীর সাধনা ও বাঙালীর সাধনা এক-অভেদ। বাঙালীর সাধনার প্রেরণা পুষ্ট হইয়াই যেন গান্ধীজী দেখা দিলেন নবভাবে, নবরূপে, ভাবধারাকে কার্যতঃ রূপায়িত করিতে। সে বস্তুটি কি। মনীষী অরবিন্দের উপলব্ধি India has a soul, it is indivisible, indissoluble," ভারতাত্মার বাণীমন্ত্রের" সাধক বাঙালী। ভারতের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা

আসলে কি বস্তু ? বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ বলেন : "Our Nationalism is a religion that has come from God." ভগবৎ আদিষ্ট এই জাতীয়তা। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন : "সত্যই যখন ভগবৎ বাণী আসিল বাঙালী তখন সেই বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। মুহূর্তে বাঙালী সেই বাণী গ্রহণ করিল।···বাঙালী জাতি সহসা জাগিয়া পলকে স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া মুক্তি পথ চিনিল এবং সমগ্র ভারতকে ঐ পথের সন্ধান দিয়া আহ্বান করিল (লক্ষ্য করিবার সমগ্র ভারতকে ···আহ্বান করিল) জাতির দৈন্য ও দুর্গতি সত্য নয়, জাতির আছে মৃত্যুহীন জীবন, এই জীবন লাভই উহার নিয়তি, আজ বাঙলা এই সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল

বাঙলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দী ভরিয়া রাম-মোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ প্রমুখ মনীষী বিপ্লবী যুগন্ধরগণ। প্রাচীন ভারতের সাধনালব্ধ সত্য ও উপনিষদের অমৃত বাণীই হইল নব ভারতের বাণী ; ভারতের, বিশ্বের সর্ব মানবের পক্ষে অমৃত বাণী, যেন সেই—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এক ভগবান—এক সত্য—বিভেদ নয়, অনৈক্য নয়। কিন্তু এই সত্যেরও বিকৃতি ঘটে। ধর্মের নামে অধর্মের প্রাদুর্ভাব, আসিয়া যায় অনাচার ব্যভিচার, ঐক্যের স্থলে অনৈক্য। তখন সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই যুগে যুগে মহামানব বিপ্লবীগণের আবির্ভাব !

ভিন্ন ধর্ম, ধর্মমত, সেহেতু বিরোধ ? কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা তাহাই রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বে প্রমাণ করেন ! বিবেকানন্দ সেই সত্যই প্রচার করেন, "ধর্ম-ব্যবসায়ী মূঢ়গণ যত বাধাই দিক্ বিশ্বের ভাবী ধর্ম-বোধ—not to hate but love, not to fight but help." গান্ধীজীর প্রার্থনা : "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান!" এই ভজন সেই সত্যই স্মরণ করায়। তাহারও পূর্বে এই বাঙলায় শ্রীচৈতন্যদেব সত্য ও মানবতা বিরোধী মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রেরণা আনিয়া দেন কথায় নয়, আপনি আচরি ধর্ম ! এমন কি ধর্মাচরণে শাসনের নিষেধাজ্ঞায় তাঁর অহিংস গণঅভিযান—প্রেমঘন মূর্তি গৌরাঙ্গেরই সত্যাগ্রহ !

বিপ্লবী বাঙলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সত্যনিষ্ঠ ভগবৎপ্রেমী এই সব

মহা বিপ্লবিগণ। এই পটভূমি মনে রাখিবার!—এই বাঙলাকেই গান্ধীজী চিনিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন, প্রেম ভালবাসা দিয়াছেন। তেমনি সন্দেহ নাই, বাঙলার সাধনার প্রতিচ্ছবির নব-রূপ গান্ধীজীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াই গান্ধীজীকে বাঙালী শ্রদ্ধা করিয়াছে ভালবাসিয়াছে।

স্বদেশী যুগ

বাঙলার স্বদেশী যুগকে বঙ্গ-বিপ্লব যুগ, অগ্নিযুগও বলা হয়। সেই অগ্নিযুগ হালের আগুন লাগাইবার যুগ নয়। দেশপ্রাণতার ত্যাগ তপস্যার তেজের আগুনে অগ্নিশুদ্ধ যুগ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা-র যুগ। স্বদেশী, ঘরে ফেরার, পর প্রত্যাশা পরিহারের, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—এই চেতনা সৃষ্টির যুগ। স্বদেশী শিক্ষা, সাহিত্য সঙ্গীত আচার আচরণের যুগ, দেশ ভক্তির দিব্য-দর্শন দানের যুগ। স্বদেশী সর্বগ্রাহী, সর্বগ্রাসী। গান্ধীজী বাঙলার এই স্বদেশী যুগ দেখিয়াছেন—বাঙলার স্বদেশীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

গান্ধীর আবির্ভাবে চিত্তরঞ্জন

রাওলাট-বিল-জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড—মণ্টেগু রিফর্ম প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য নয়। লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসে (১৯২০) অসহযোগ কর্মনীতি লইয়া গান্ধীজীর বলিষ্ঠ আবির্ভাব। গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বাঙলার দ্বিধা ও সংশয় জনিত বাধা বিরূপতা ছিল। কিন্তু (১৯২০) নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়া গিয়াও শেষ পর্যন্ত (মনে রাখিতে হইবে চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাঙলার বিপ্লবী-সংস্থার অন্যতম নায়ক) মহাত্মাজীর মতাদর্শ ও কর্মনীতি শিরোধার্য করিয়া লইলে গান্ধীজীর নেতৃত্বের হইল জয় জয়কার। গান্ধীজীর ডাকে যে সাড়া মিলিয়াছিল তাহা বাঙলারই যোগ্য; ত্যাগের রাজা চিত্তরঞ্জনের পাশে ও পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"-র পথে কত না বাঙলার গৌরবের সন্তানগণ। স্বদেশী যুগের পরে আবার বাঙলায় নবযুগের বান ডাকিল—জয় মা বলে সবাই তরী ভাসাইল। কলেজ ছাড়িল ছাত্র, অধ্যাপক চাকুরী, আইনজীবী আদালত ছাড়িলেন, খেতাব ছাড়িলেন খেতাবধারী। বয়কট, কারাবরণ, এ বুঝি শেষ নাই! গান্ধীজীর ডাকে, চিত্তরঞ্জনের জলন্ত প্রেরণায় বাঙলায় সে এক অভিনব অহিংস অসহযোগের জয়যাত্রা। এর বিশদ পরিচয় দিবে আন্দোলনের ইতিহাস।

'কিন্তু' ছিল

তবে এমন ব্যাপক সাড়ার মধ্যেও কিছু 'কিন্তু'ও ছিল। মনীষী বিপিনচন্দ্র 'ম্যাজিক'-বনাম 'লজিকে'র কথা বলেন, অরবিন্দের সহকর্মী (বন্দেমাতরমে) সুলেখক শ্রীবি. সি. চাটার্জী তাঁর "Whither India"-গ্রন্থে গান্ধীজীর অসহযোগ কর্মনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। স্বরাজের সঙ্গে খিলাফৎ মেশানো বিপ্লবী বাঙলা পছন্দ করে নাই। উহার পরিণাম ভাল হইবে না, মনে করিয়াছে।

কিন্তু গান্ধীজীর অবদান ও উহার মূল্য নির্ণয়ে বাঙলা বিন্দুমাত্রও ভুল করে নাই।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

এ-স্থলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথাটা তুলি। গান্ধীজীর চরকা প্রবর্তন, চরকায় স্বরাজ কথা উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' ব্যাপারটা কিছুটা হুজুগ মনে করিতেন। একদিন শান্তিনিকেতনে কথা প্রসঙ্গে আমাদের বলেন: "সরলাকে (সরলা দেবীচৌধুরাণী) বললুম, "তুই কি সত্যিই চরকা কাটিস্—না, চরকার হাতল ধরে ফটো তুলিস?" (প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-তে তিনরঙ্গা ছবি উঠিয়াছিল সরলাদেবীর, চরকার হাতল ধরে আছেন) বললেন, "শরৎ এসেছিল (ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও তখন চরকা প্রবর্তনে উৎসাহী) আমাকে চরকা বুঝাতে। শরৎকে আমি বললুম, চরকা কাটলে সুতো বেরোয় এ আমি মানি, কিন্তু তাতে কি করে স্বরাজ বেরোয়, যে রাষ্ট্রিক স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা তোমরা দেশের লোককে শোনাচ্ছ—বুঝাচ্ছো—তা বুঝি না। এরূপ আশা জাগালে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝে দিন কয় চরকা কাটার হিড়িক তুলতে পারে—কিন্তু জাতির চরিত্রে চরকা কাটার নিষ্ঠাটুকুও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না।" কবিগুরুর এ সব কথায় অনেকে মনে করিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বিরোধী, তাঁর মূল্য বোঝেন নাই। (শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর অবস্থান সত্ত্বেও) তাই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান সম্পর্কে কি বলেন, তা দেখা যাক্। গান্ধীজীর অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে লিখিত এক পত্রে প্রসঙ্গত বলিতেছেন—"ভারতের ন্যায় একটা পরাধীন নিরস্ত্র জাতি যে অসহায় নহে, নিরস্ত্র বলিয়াও যে অসহায় নহে মৃত্যুজয়ী সংকল্পে সে জাতিও যে বীর্যবত্তা দেখাইতে পারে, একটা বিরাট জাতির সাধারণ নরনারীর চেতনায় এই প্রত্যয় আনিয়া দেওয়ার মতো বড়ো কাজই মহাত্মার শ্রেষ্ঠ অবদান।" গান্ধীজীর প্রকৃত

অবদান সম্পর্কে সত্যদ্রষ্টা কবিগুরু যে ভাব ও ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

অহিংস আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে গান্ধীজী শর্তহীন ভাবে বৃটিশকে ভারত ত্যাগের চরমপত্র দিয়াই নিরস্ত্র ভারত-জাতির কণ্ঠে ভাষা দিলেন—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে—আর কোনও ওজর, কোন শর্ত নাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী নায়কদের কণ্ঠে গান্ধী-নেতৃত্বের জয়ধ্বনি উঠিল।

ক্লৈব্য, কাপুরুষতাই লজ্জার

সত্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সংগ্রাম-নিষ্ঠাই বড় কথা। সত্য স্বাধীনতা আত্মমর্যাদা রক্ষা করা মানুষের ধর্ম—মনুষ্যত্ব। নিরস্ত্র অসহায় বলিয়া অন্যায়-অবিচার স্বাধীনতার অমর্যাদা সহিয়া গেলেই অহিংস হওয়া যায় না, দুর্বলের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ যথেষ্ট থাকে, থাকিতে পারে, আবার স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া সংগ্রামে নিহত হইলে বা সংগ্রামে জয়ী হইলে তাহাও হিংসাকর্ম (অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া সত্য রক্ষার্থে যুদ্ধ করা যায়) অপাঙক্তেয় হইতে পারে না। ক্লৈব্য ও কাপুরুষতাই লজ্জার, পরিত্যাজ্য। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম ভীরু বা কাপুরুষের তথাকথিত অহিংসা নহে। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর নিম্নোক্ত উক্তি স্মরণীয়। জাতির পরাধীনতার অন্তহীন গ্লানির প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "স্বাধীন মানুষ হিসাবে যদি আমরা বেঁচে থাকতে না পারি তা হলে আমাদের সানন্দে মৃত্যু বরণ করে নেওয়াই শ্রেয়। কাপুরুষের মতো মাতৃভূমির অসম্মানের নীরব সাথী হওয়া অপেক্ষা আমি বরং চাই ভারত বীরের মতো অস্ত্রধারণ করে আত্মসম্মান রক্ষা করুক।"

একটি সঙ্গত খেদ

স্বাধীনতাকামী বাঙলা গান্ধীজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে,—বিপ্লবী বাঙলা গান্ধীজীকে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিপ্লবী মনে করে—ইহা আমরা দেখিয়াছি।

'গান্ধীজীর আত্মকথা'র প্রকাশক নিবেদনে এই মর্মের খেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, শিক্ষিত বাঙালী গান্ধীজীর প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা পোষণ করিলেও গান্ধীজীর জীবন, জীবন-দর্শন তাঁহার ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক পরিচিত নহেন, ফলে গান্ধীজীকে ভাল করিয়া জানেন না।

কথাটা সত্য।

কিন্তু তাহার কারণ কি? গান্ধীজীকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করে অথচ তাঁহার ভাবধারার সম্যক পরিচয় লওয়ার প্রয়োজন বোধ নাই। ইহার একটি বড় কারণ আমাদের মতে—গান্ধীজীর বাণী ও কর্মনীতি যেন বাঙালীর নিকট নূতন নহে।

এদের ভাব যেন এই—গান্ধীজীর ধর্মমত? ও তো রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াই গিয়াছেন! গান্ধীজীর স্বদেশী, বয়কট, নন্ কো-অপারেশন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বল্‌ছো তো? স্বদেশী যুগে সে তো আমরাই বলিয়াছি, তাঁত-চরকা তাও নূতন নয়। অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ? শ্রীচৈতন্য বিবেকানন্দ আচণ্ডালে কোল দিয়া, ছুতমার্গ পরিহারে ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার কথা পূর্বেই বলিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমানে ঐক্য? স্বদেশী যুগে "হিন্দুমুসলমান, এক মার সন্তান তফাত কেন করো-জী", এ তো বাঙালী আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। দেশের জন্য দুঃখ বরণ, আত্মত্যাগ ও জীবনদানে বাঙ্গালী আমরাই অগ্রণী।

এ যেন সবজান্তার শ্রেষ্ঠত্বের উন্নাসিক অভিমান? অথবা গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়? ফলে অমন যে সমৃদ্ধশালী বাঙলা সাহিত্য তাতেও গান্ধীজীর অত বড় বিরাট আন্দোলনের ছাপ বিশেষ দেখি না।

জাতীয় সাহিত্য জাতির আত্মার বাণী। জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও চারণ সাহিত্যিক হাত ধরাধরি করিয়া চলে। 'স্বদেশী যুগে তাহাই দেখা গিয়াছে। কোথাও মুক্তিকামী বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিক পথ দেখাইতেছে, কখনো বা বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে—কল্পনাকে হার মানাইয়া চলিয়াছে বাস্তব ঘটনা, অকুতোভয় অভিযানের চরণ-ছন্দে সাহিত্যের শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পরবর্তী কালে এমনটি হয় নাই।

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর আবির্ভাব, তাঁহার ভাবধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও আন্দোলন শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সম্মুখে এক মহান নূতনতর গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন। গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ সত্যাগ্রহ, আদর্শের জন্য নিয়ত সংগ্রাম-নিষ্ঠা অপূর্ব। গান্ধীজী স্বয়ং তাঁহার আদর্শ ও কর্মনীতির জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহার কর্মনীতি ও আদর্শের দর্শন তিনি দান করিয়াছেন, তাঁহার অজস্র ভাষণে লিখনে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের

সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অংশ তাহাতে কতটুকু ?

স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যের যে চিরন্তন আবেদন দেখি, ছোট বড় অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের প্রয়াস দেখি, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তাহা দেখি না। অসহযোগের অধ্যায়ে কবি নজরুল ইস্‌লাম ও দু' একজনের যে প্রেরণা দেখি তাহাও পূর্বেকার সেই বিপ্লবী যুগেরই প্রেরণা। যথা :

"কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙ্গালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে কি রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার ?
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তাঁরা দিবে কোন প্রতিদান !"

অথবা : "আমরা আপনি মরে মড়ার দেশে আনবো বরাভয়
মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি মৃত্যু জয়ের ফল
মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল !"

এসব সঙ্গীতে শ্রোতার মনে যে প্রেরণা জাগায় তাহাও পূর্বেকার বিপ্লবের দুর্গম পথ যাত্রারই প্রেরণা। কবির আবেদনে যে সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহাও অসহযোগ পূর্ব বিপ্লবের সুর। গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মধ্যে যে মহান বীর্যবত্তার সংযত সাধনা আছে তাহার প্রেরণা আসিতেছে না।

ইহা লক্ষ্য করিবার ও বুঝিবার যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, চলিয়াছে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী অভিনব মুক্তিসংগ্রাম, তখনো কিন্তু বাঙলার সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই না। একজন দরদী সমালোচক বলিতেছেন, "বাঙলার মাসিকপত্রগুলি পাঠ করিলে একজন বিদেশী লোক বুঝিতেই পারিবে না আমাদের দেশে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম চলিতেছে। যখন পরাধীনতার দুঃখে আগুন জ্বলিবার কথা তখন বাঙলা সাহিত্যে চোখের জলে বান ডাকিতেছে ; যখন অহিংস মুক্তিসংগ্রামের যাত্রীদের তূর্যধ্বনি শুনাইতে হইবে, তখন বাঙলার মাসিক সাহিত্য যৌন সমস্যার সূক্ষ্ম আলোচনা লইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছে।" অথচ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা পাইবার মতো নবতর উপাদান গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে যথেষ্ট ছিল।

বাঙালীর এই-'সবজানি' ভাবের দরুন দয়ানন্দের আর্যসমাজও বাঙলায় কার্যকরী প্রেরণা আনে নাই। দয়ানন্দের আদর্শ বা বাণী, 'সব-ঠিক'— 'ও সব আমাদের জানা' বলিয়া যেন আর কাজে গুরুত্ব দিতে হয় নাই!

বড় কথা জানার, শোনার গৌরব করার অসুবিধা বিপত্তি এইখানে। অথচ গান্ধীজীর অবদানের প্রধান কথাই হইল বচন নয়, প্রবচন নয়, বাণীদান নয়—আচরণ; ভাব বিতরণ নয়, উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ। 'গান্ধীজীর আত্মকথা'র প্রকাশকের নিবেদনে বলা হইয়াছে—বাঙালী গান্ধীজীর প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছে, অথচ গান্ধীজীকে ভাল করিয়া জানে নাই। ইহার কারণ, সবজান্তা বলিয়া সম্যক জানার উৎসাহ নাই, ইহাই আমাদের মনে হইয়াছে। বিস্ময়কর এই কারণটার স্বরূপ জানা আবশ্যক মনে করিয়াই ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম।

বিদ্রোহ ও বিপ্লব

বিপ্লব আর বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। একটা অসুর মায়ের কণ্ঠ নিপীড়ন করিতেছে, যে করেই হউক ঐ অসুরটাকে টেনিয়া ফেলিয়া দিবার আশু সীমিত ও সাময়িক এই লক্ষ্য সিদ্ধ হলেই বিদ্রোহের ইতি। কিন্তু বিপ্লব তাহা নহে। ধর্মে রাষ্ট্রে সমাজে স্বাদেশিক ও জাগতিক পরিবর্তিত অবস্থায় রূপান্তর সাধনের দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চালাইয়া যাওয়াই বিপ্লবীর ধর্ম। বিপ্লবের ইতি নাই, শেষ কথা নাই। পতন-অভ্যুদয়ের বিশ্ববিধান মানিয়াই চলে বিপ্লবীর বিঘ্নসংকুল দীর্ঘ সাধনা। গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, তাই তাঁহার মধ্যে দেখি অপরিসীম ধৈর্য।

বাঙলার মরমী কবির গানটি মনে হয়:

"তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?"

বিশ্বস্রষ্টা "যুগযুগান্তে ফুটাচ্ছেন ফুল—তাঁর তাড়াহুড়া নাই।"
সৃজনধর্মী গান্ধীজীরও তাড়াহুড়া নাই। অশেষ ধৈর্য। বলেন, অধৈর্য হিংসারই নামান্তর।

জনগণের আপনজন গান্ধীজী

বিপ্লবী স্বতঃই আত্মবিচার-পরায়ণ। বিপ্লবী বাঙলা বিচারে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য 'আয় আজি আয় মরিবি কে' ডাকে

বাঙলা সাড়া দিয়াছে, ত্যাগ দুঃখ বরণে, আত্মবিলুপ্তিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু তাহা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেই সীমাবদ্ধ—তাহা অতিক্রম করিয়া জাতির জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রেরণা আনিতে পারে নাই (যদিও স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে শুনাইয়াছিলেন—শক্তি আছে ঐ অবজ্ঞাত অন্ত্যজ দরিদ্র জনগণের মধ্যে)। গান্ধীজী ভারতের আপামর সাধারণকে ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে একাত্ম হইয়া জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণকে ডাকিয়া পাইলেন—জনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দিল। জাতির মুক্তিসংগ্রামে জনগণের অংশ-গ্রহণ গান্ধীজীর অবদান। বিপ্লবী বাঙলা এই অনন্যসাধারণ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিলেন।

বাঙলার প্রতিভূরূপে সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই মহান অবদান সম্পর্কে বলেন, "তিনি ভারতের অবজ্ঞাত বঞ্চিত দরিদ্রজনের পর্ণকুটিরে নামিয়া আসিলেন, তাহাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলিলেন, কোন শাস্ত্র বচন শুনাইয়া নয়, আচরণে একাত্ম হইয়া গেলেন, জনগণ সার্থক নাম দিলেন মহাত্মা। বস্তুতঃ ভারতের সর্বজনকে এমন আপন করিয়া লইতে আর কে পারিয়াছে।" বাক্, মানস ও আচরণে এক, মহাত্মাজীর ডাকে ভারতের জনগণ নূতন আশায় উদ্‌বুদ্ধ ও উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

যেখানে ব্যথা সেখানে গান্ধীর সেবার হাত

জাতির যেখানে ক্ষত, ব্যথা, সেখানেই গান্ধীজীর সেবার স্পর্শ। অভীষ্টের প্রতি এ যেন সাধিকার সেই, "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" সর্ব ভারতের বিশাল বিবিধ সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু নোয়াখালির ব্যাপারে মানবিকতার ডাকে সত্য ও অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ গান্ধীজীর আত্মিক অভিযান! বিপ্লবী বাঙলা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীকে স্বীকার করিতে হইয়াছে গান্ধীজীর এই পন্থা উৎকৃষ্ট— তবে কঠিন। কলিকাতায়—কংগ্রেস বিদ্বেষে আরম্ভ, মুসলিম লীগের দাঙ্গা এবং পরবর্তী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত খুন জখম হত্যা Great Killing-এর পাপচক্র যখন নরঘাতী হিংস্রতায় উন্মত্ত তখন গান্ধীজী শান্তি ও ঐক্যের বাণী লইয়া দেখা দিলেন, অবস্থান করিলেন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম গৃহে। আরম্ভ করিলেন আমৃত্যু অনশন। হিন্দু-মুসলিম নেতৃবর্গ মিলিয়া শান্তি ও ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দলিলে স্বাক্ষর করিলেন। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিয়া শুধু বলিলেন,

আপনারা প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হউন। বিপ্লবী বাঙলার বিপ্লবী ছাত্র নেতা শচীন মিত্র শান্তির মিছিল লইয়া 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' রবে রাজপথে বাহির হইলেন, শান্তি প্রচার কালে ঘাতকের হিংস্র ছুরিকায় শচীন নিহত হইলেন। (অন্যত্র স্মৃতিশ)। গান্ধীজী শুনিলেন শচীনের মহামরণের কথা। আদর্শের জন্য শচীনদের এই প্রয়াস ও মৃত্যুবরণকে অভিনন্দন জানাইলেন। গান্ধীজীর ডাকে বাঙলা কিভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ শচীনের কথা উল্লেখ করিলাম।

তফাত দেখি না

কোন কোন বাঙালীর মুখে অভিযোগ শুনিয়াছি, গান্ধীজীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা বড় নয়, অহিংসা বিশ্বপ্রেমই তাঁহার নিকট বড়। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি এই, "ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। যদিও বর্তমানে নিঃসন্দেহে আমার সমগ্র জীবন, শক্তি ও সময় ভারতের স্বাধীনতার জন্যই নিয়োজিত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস সফল হইলেই আমি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের ব্রতে আত্মনিয়োগ করিব।" বিপ্লবী বাঙলার কথা কি? বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ১৯২২ সালে ঘোষণা করিতেছেন, "ভারতের স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করিতে হইবে (must have) কারণ সমগ্র বিশ্বমানবের রূপান্তর—নব জন্মের জন্যেই তাহার একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নয়—ইহা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাইবার একটি উপায়। লক্ষ্য হইল সামরিক যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বমানবের শান্তি-সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি।" গান্ধীজীর লক্ষ্যের সঙ্গে তফাত আছে কি?

দেশপ্রেম সম্পর্কে গান্ধীজী—"আমার দেশপ্রেম মানবিকতা। আমি দেশপ্রেমী, কারণ আমি মানব-প্রেমী। I will not hurt England or Germany to serve India." বাঙলার দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের সুরেই উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি: "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।" বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ সেই কথাই শুনাইয়াছিল।

হিংসাশ্রয়ীর ভয়

গান্ধীজীর প্রবর্তিত মানবপ্রেম, সত্য ও অহিংসার কর্মনীতিই বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করিবে নিরস্ত্র নিপীড়িত মানুষের মনে এই প্রত্যয় দেখা দিয়াছে।

ভগবৎ বিশ্বাসীর আত্মিক বলই জয়ী হইবে, অবিচারীর অস্ত্রবল কদাচ নয়। গান্ধীজীর নিকট এই সত্যও তাহারা শুনিয়াছে। কিন্তু বিচিত্র এই মানুষের সমাজ! বিশ্বমানবের কল্যাণকামী মহামানব যখন সত্য অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন, তখন এক শ্রেণীর মানুষই সেই সত্যকে হিংসায় উন্মত্ত হইয়া আঘাত করে। আঘাত করে, কারণ সত্য ও অহিংসার প্রভাবকে উহারা ভয় করে। একটা জঘন্য হীনমন্যতার দরুন উহারা বিদ্বিষ্ট ও হিংস্র হইয়া উঠে, নিশ্চিত পরাভবের আতঙ্কে। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত সত্য, যীশুর মানবপ্রেমের সত্যকে যাহারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহারাই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যীশুর সত্যকে হত্যা করা যায় নাই। গান্ধীজীর অনুগামী মার্টিন লুথার কিংকে যাহারা হত্যা করিয়াছে তাহারা কিং-এর অহিংস কর্মনীতির সত্যকে ভয় করিয়াই তাহা করিয়াছে। গান্ধীজীকে তাঁহার স্বদেশবাসী যাহারা হত্যা করিয়াছে, গান্ধীজীর সত্য, অহিংসা ও মানবিকতার প্রভাবকে ঠেকানো যাইবে না এই ভয়ে ভীত হইয়াই তাহা করিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর জীবন-দর্শন সাধনা ও সত্যকে হত্যা করা যায় না। আজ সমগ্র বিশ্ব গান্ধীজীর সত্য অহিংসা ও মানবতাবোধকেই শ্রেয় লাভের পথ বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অস্ত্রবলের উপর আত্মিক বলেরই জয় হইবে ইহাই গান্ধীজীর ধ্রুব বিশ্বাস। এ-স্থলে সম্রাট নেপোলিয়নের উক্তি প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করিতেছি। নেপোলিয়ন বলিতেছেন, "আমি সেণ্ট হেলেনার প্রস্তর গাত্রে শৃঙ্খলিত। আমার দেহ মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া যাইবে, অথবা কীটের আহার্য হইবে।" "Behold the destiny of him whom the world call the Great Napoleon. Behold again the destiny of kingdom, established by love, fraternity and brotherhood by the mighty Jesus. It is everspreading, expanding and ever abiding, whereas my kingdom is languishing because, I wanted to establish it with might of the sword." অস্ত্রবলের ব্যর্থতা সম্পর্কে নেপোলিয়নের এই সুন্দর স্বীকৃতির মূল্য সামান্য নহে।

লোকোত্তর-চরিত্র

এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করি। মহাত্মাজী নির্দিষ্ট ছক্ কাটিয়া পথ চলেন নাই—প্রতি পদক্ষেপের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যও তাঁহার সর্ব চিন্তা-কর্মের

নেতা, নির্দেশক ভগবানের আলো নির্দেশের অপেক্ষা করিয়াছেন। ভুল হিমালয়ান ব্লাণ্ডার হইলেও নিজের অক্ষমতা, ভুল স্বীকার করিয়াছেন—নেতা ভগবানের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করিয়াছেন। এ-হেন "লোকোত্তরানাং চেতাংসি" যিনি তাঁহার সকল কর্ম সকলের পক্ষে সহজবোধগম্য না হইবারই কথা।

আত্মিক বলই জয়ী হইবে

বল প্রয়োগের দ্বারা নিজের ইচ্ছা পূরণের প্রয়াস, অপর মতকে নিঃশেষ করিয়া নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার উন্মাদ কামনা, হিংসা জিঘাংসার পাপচক্রে নরহত্যার সংখ্যা বাড়াইতে পারিলেও কাহারো নিশ্চিন্ত নিরাপদ হইবার উপায় নাই। বিশ্বের যুদ্ধ, কাটাকাটি, হানাহানি তাহা প্রমাণ করিয়াছে। গান্ধীজীর কথা, বলপ্রয়োগ কখনো গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতা, শান্তি-নিরাপত্তার অনুকূল হইতে পারে না, কিন্তু অবিদ্বেষ, সহনশীলতা, সহাবস্থান, সমঝোতা, মানবিকতা-বোধের দ্বারা তাহা নিশ্চয় হইতে পারে। আজ বিশ্বের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে এই বলপ্রয়োগ ও হিংস্রপ্রবৃত্তি সমাজক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সমাজের বিভিন্ন 'ফ্রন্টে' আজ জোরজুলুম ও হিংস্র আঘাত হানিয়া নিজ ইচ্ছা পূরণের উন্মত্ততা যেন রাষ্ট্রনায়কদের শুনাইতেছে, "তোমার শিখানো বিত্তা শিখাবো তোমায়।" গান্ধীজীর প্রত্যয়—মানুষের এই বিপত্তি খণ্ডনের একমাত্র পথ বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার এবং সত্য মানবিকতা ও অহিংসার পথ আশ্রয়। এই বিশ্বাস রক্ষা করা যে, আত্মিক বলই অস্ত্রবলের উপর জয়ী হইবে। বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষ গান্ধীজীর নির্দেশিত পথকেই মানুষের শ্রেয় লাভের পথ বলিয়া মনে করিতেছেন। আত্মিক বলের জয় হইবেই। তাহা কবে ও কেমন করিয়া হইবে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান জানেন। তবে তাহা নিশ্চয় হইবে। গান্ধীজী অবিচলিত প্রত্যয়ে বলেন, "I want India to recognise that she has a soul (শ্রী অরবিন্দ বলেন India has soul ইত্যাদি) that cannot perish and that can rise triumphant above every physical weakness and defy the physical combination of a whole world."

গান্ধীনীতির জয়, ভারতের জয়, জগতের জয়। জয় জগতের বাণী গান্ধীজীর একান্ত অনুগামিগণই রূপায়িত করিতে পারেন। মহাতিরোভাবের পর যুগে যুগে তাহাই হইয়াছে।

প্রার্থনা—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা গান্ধীজীরও প্রার্থনা—অধিকন্তু এই প্রার্থনা জাতির জীবনে রূপায়িত করার আচরণই গান্ধীজীর বাণী।

বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে ভারতবর্ষকে আর এক দফা শাসনসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেবার নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ধরে দু'একজন করে অন্তরীণ বন্দী ও ১৮১৮ সালের তিন আইনের রাজবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হতে থাকে। ১৯২০ সালের শেষভাগে রাজবন্দীদের যে কয়জন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের একে একে রাজসাহী জেলে একত্র করা হয়। অত বছর কোনো কোনো বন্দীদের পৃথক রাখার নীতি অনুসৃত হয়েছে ; এখন সে-নীতি আর রইল না। এইভাবে এখন ঢাকা আর আলিপুর জেল থেকে নিয়ে আসা হল আমার সহকর্মী ও বন্ধু কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষকে। আরও কয়জন এলেন। কয়েকজন আগে থেকেই রাজসাহীতে ছিলেন। এই দুই বন্ধুকে পেয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার সুযোগ জুটলো। তিন বৎসর পৃথক পৃথকভাবে যা চিন্তা করেছি, তা একটা সুস্পষ্ট কর্মধারায় পরিণত করার চিন্তায় আমরা মন দিলাম। রাজসাহী জেলে একটা সুবিধা ছিল—গোপনে বাংলার উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতাম। তা থেকে একটা আন্দাজ করার সুযোগ হল—মহাত্মা গান্ধী তার অল্পদিন পূর্বেই ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দেশের সামনে দিয়েছেন কত বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রস্তাব জনসাধারণের ভিতর—দেশের মানুষের অন্তরে। পাঞ্জাবে—বিশেষতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত ইংরেজের বর্বর অত্যাচার কাহিনী ছড়িয়ে যায়নি সেদিন বোধ হয় ভারতে অগণিত অশিক্ষিতের একখানি দূর পল্লীও এমন ছিল না। আর সেই সঙ্গে সমগ্র মুসলমান সমাজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন খলিফা ও খিলাফতের উপর যে অবিচার হয়েছে সেই কাহিনী জেনে।

এর ভিতর কলকাতায় হয়ে গেল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন। সেখানে চিত্তরঞ্জন দাস ঐ দুই জুলুম অন্যায়ের সঙ্গে জুড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন স্বরাজের দাবি। এর ভিতর আমাদের দু'একজন মুক্ত রাজবন্দী বন্ধুও সর্বভারতীয় নেতাদের কারও কারও সঙ্গে আলোচনা

করেছেন। এঁদের এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তি অকাট্য—খিলাফতের প্রতি অবিচারে সকল ভারতীয়ের মনে সাড়া জাগেনি নিশ্চয়; পাঞ্জাবের অত্যাচার কাহিনী সমগ্র ভারতীয়ের প্রাণে স্পন্দন যা সৃষ্টি করেছে, কালে তা মৃদু হয়ে আসা আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বরাজ, অর্থাৎ একটা মুক্তজীবন—তার প্রতি আকর্ষণ হবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে তারই মনে প্রাণে, আর সে আকর্ষণ শেষ হয়ে যাবার নয়। স্বভাবতঃই বন্ধুদের এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তি একটা রাজনৈতিক ধারা ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল: ভারতরাষ্ট্রের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই ধরনের জুলুম, অন্যায়, উপেক্ষা ততদিন অনিবার্য; চলতেই থাকবে। মহাত্মা গান্ধী সহজেই এ যুক্তি মেনে নিয়ে স্বরাজের দাবিকেও তাঁর প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান-পত্রের অঙ্গীভূত করে নিলেন। উৎসাহ উদ্দীপনা চরমে উঠলো। গান্ধীজির অসহযোগের কর্মসূচীও গৃহীত হল—অধিকাংশ নতুন কংগ্রেস সদস্য ও খিলাফত কর্মীদের সমর্থনে। সে কর্মসূচীতে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন—ইংরেজের দেওয়া উপাধি, সরকারী চাকরি, শিক্ষায়তন ও আদালত-বর্জন—এসবে মোটামুটি সকলের সমর্থন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চান ব্যবস্থাপক সভাও বর্জন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না, ঐ কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি লালা লাজপৎ রায়ের মতো প্রবীণ, প্রতিষ্ঠাবান নেতারা এর ঘোর বিরোধী। এঁদের বাধা সত্ত্বেও অধিকাংশের ভোটে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু এটি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। ডিসেম্বরে নাগপুরে হবে সাধারণ অধিবেশন। সেখানে এ প্রস্তাব পাস করাতে হবে। তাছাড়া, সেদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী এইসব নেতার অসম্মতি সত্ত্বেও কেবল মাত্র ভোটের জোরে পাস করিয়ে নেবার অর্থ সামান্যই—গান্ধীজি তা জানেন। এবং ভোটের এরকম অপব্যবহার তাঁর নীতিবিরুদ্ধও। তাই নাগপুরের জন্য শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা চললো দুই তরফেই। আইন সভা প্রবেশের পক্ষে প্রধান মুখপাত্র সেদিন বাংলার উদীয়মান নেতা চিত্তরঞ্জন দাস।

এর ভিতর, বোধ হয় ১৯২০ সালের শেষদিকে হাজারীবাগ জেল থেকে রাজসাহী এলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত—আমাদের এক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী। তাঁকে পেয়ে আমাদের আলোচনা দানা বাঁধবার সুযোগ পেল। অতদিন আমরা তিনজনে ভেবেছি—একটা জাতি শুধু গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার কল্পনা করতে পারে না—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মতো একটা

বিশাল নিরস্ত্র দেশ কিছু অস্ত্র কোনোভাবে সংগ্রহ করে তা-ই নিয়ে যুদ্ধ করে ইংরেজের মতো একটা শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের কল্পনা করতে পারে না; তা বরং সম্ভব ছিল বিংশ শতাব্দীর আগে। বিপ্লবীর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই—এই মন্ত্রে দীক্ষিত যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও রাসবিহারীর সহযোগিতায় জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারত বিশ্বযুদ্ধের কালে স্বাধীন হবার গোপন আয়োজন করেছিল। তারপর, আজ কোন্ পথ—সেই আলোচনাই আমাদের।

যুগযুগের নিদ্রায় অভিভূত জাতিকে জাগানো এক, বিপ্লব আর। ছ'য়ের পথ ভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ ইতিপূর্বেই তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার কথা তাঁর দেশ ও দলকে জানিয়েছেন: বৈজ্ঞানিক উন্নত পন্থা ও আধুনিক অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যত বেশি ব্যবহৃত হবে পরাধীন জাতিকে তত গণ-সমর্থনে বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে হবে। তিনিই আবার তাঁর দল যুগান্তরকে ১৯০৭-০৮ সালে অসাড় জাতির জীবনে চমক লাগাতে বোমা পিস্তল ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশের ফল ফললো ১৯০৮ সালে বোমা পিস্তল হাতে প্রফুল্ল চাকি আর ক্ষুদিরাম বোসের আত্মদানে। আর, শ্রীঅরবিন্দেরই ইঙ্গিতে তাঁর দক্ষিণহস্ত যতীন মুখার্জি জাগরণের প্রসারকল্পে ভারতের এ-যুগের হলদিঘাট ময়ূরভঞ্জের চষাখণ্ডে চার জন সহযোদ্ধা নিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধে আত্মদান করে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা আর এ-আচরণের ভিতর কোনো অসংগতি নেই। তাঁর শিক্ষা বিপ্লবের পথ সম্পর্কে; আর, তাঁর আচরণ বা নির্দেশের লক্ষ্য জাতির জাগরণ আর, সেই লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণের আত্মদান। এরই ফলে জাতি জাগবে; তখন গণ-অভ্যুত্থানের পথ অনুসন্ধান ও সেই পথে আয়োজন।

যুগান্তরকে বিপ্লব-পথের বাঁকে বাঁকে আত্মসমাহিত ধ্যানে পথ খুঁজতে হয়েছে। আজ এক বড় বাঁকের সামনে সে। যতীন্দ্রনাথ আজ নেই। রাসবিহারী দেশান্তরী হয়েছেন। বাংলায়, পাঞ্জাবে, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে, যুক্তপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে আরও অন্যত্র বহু সমর্পিতপ্রাণ বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের জীবন দিয়ে গেছেন; অনেকে নির্মম অত্যাচার সহ্য করার পর আন্দামানে নির্বাসিত। যুদ্ধের যুগে জার্মানীর সাহায্যে উত্থান-প্রয়াসের এই ফল। আর, এই হল প্রস্তাবিত রাওলাট আইনের সূত্রপাত এবং এই আইন প্রস্তাবেরই বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন। যুদ্ধের কালে পরাধীন জাতি বিদ্রোহের আয়োজন করে ইংরেজের বিবেচনায় যে স্পর্ধা দেখিয়েছে, তারই

প্রতিশোধ পাঞ্জাবে ও জালিয়ানওয়ালাবাগে পাশবিক অত্যাচার। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে নতুন জ্বালানির ইন্ধন পড়লো; এমনি করেই ১৯০৭-০৮ সালের এবং ১৯১৪-১৫ সালের বিপ্লবীদের আন্দোলন ও আত্মত্যাগ যে জাগরণ নিয়ে এল, তা-ই পরের যুগের বৃহত্তর বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন সম্ভব করে তুললো।

বহু শতাব্দীর নিদ্রিত ভারতীয়ের বুকে যখন সবে আগুন জ্বলে উঠছে, তখনই কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মর্যাদার অহিংস যুদ্ধের সেনাপতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম পদার্পণ করলেন। তার পূর্বে তিনি তিন চার বছর ধরে চেষ্টায় ছিলেন মহামতি গোখ্‌লে প্রতিষ্ঠিত সেবা প্রতিষ্ঠান "সারভ্যাণ্ট্‌স্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির" সভ্য হয়ে নীরব জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে। কিন্তু একান্ত অনুরক্ত বন্ধু হয়েও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সে চেষ্টায় বাদ সাধেন। শাস্ত্রীজির মত: গান্ধীর মতো একজন নৈরাজ্যবাদীর ও-প্রতিষ্ঠানে স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরপর বিশ্বযুদ্ধের অবসান; রাওলাট আইনের প্রস্তাব; তার বিরুদ্ধে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং পাঞ্জাবের অত্যাচার; আর খিলাফতের প্রতি অন্যায়ে মুসলমান সমাজে উত্তেজনা।

ভারতবাসীর মনে তখন পর্যন্ত গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রবণতা সবে জাগছে—সেই বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ রায়, বিপিন পালের সর্বভারতে প্রচারণায় এবং পরে, যুদ্ধের যুগের বাংলার, পাঞ্জাবের ও অপরাপর প্রদেশের স্বাধীনতাকামীদের আপনভোলা আত্মত্যাগের ফলে। এর সঙ্গে যুক্ত হল এখন গান্ধীর ধর্মপ্রাণতা। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে প্রধানতঃ এই ধর্মপ্রাণতার জন্যেই আস্থা তাঁর প্রতি অপরিমেয়। ক্রুদ্ধ ভারত আবেগকম্পিত হয়ে উঠলো। নেতাদের মতপার্থক্যে নিরস্ত থাকতে সে নারাজ। কোনো নেতাই এ-আগ্রহের ঐকান্তিকতাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনের পর ডিসেম্বরে নাগপুরে তার বাৎসরিক অধিবেশন। তারই আয়োজন চলেছে—এমন সময় মনোরঞ্জনদা এলেন রাজসাহী জেলে। আমাদের তিন জনের মাথা যখন কয়েকমাস ধরে রাতের পর রাত ভবিষ্যৎ কর্মধারার আলোচনায় একত্র সমাবিষ্ট, চতুর্থ একটি অভিজ্ঞতর মস্তিষ্ক তার সঙ্গে যুক্ত হল। শুধু তাই নয়—তিনি হাজারিবাগের সংবাদ পরিবেশন করলেন, ওখানে হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ

চন্দ্র গুহ প্রমুখ দলের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলে ঐ একই মতাবলম্বী। এছাড়া, আমাদের নিবিড় আলোচনায় আরও একটি কথা ধরা দিল। কংগ্রেসের এত বছরের আবেদন নিবেদনের রাজনীতি সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার এদেশে চলছে বরাবরের মতো দেশবাসীর সমর্থনে, সহযোগিতায়। গান্ধীজির প্রস্তাব মতো আন্দোলন তার জায়গায় নিয়ে আসছে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ; অর্থাৎ, সরকারের সঙ্গে সামান্য হলেও, কিছু প্রতিরোধের সম্পর্ক। ইতিমধ্যে, গোপনে-পাওয়া কাগজের খবর: অন্তরীণ থেকে কিছু পূর্বে মুক্ত আমাদেরই সহকর্মী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বসন্তকুমার মজুমদার এবং আরও কেউ কেউ অসহযোগের কর্মসূচীর সমর্থনে সারা বাংলায় ঘুরে ঘুরে জনমন মাতিয়ে তুলবার কাজে সহায় হয়েছেন। আমাদের চিন্তাধারার সমর্থন পেলাম।

অল্প পরে মনোরঞ্জনদা চলে গেলেন বরিশাল জেলে; কয়েকদিন পরে সেখানে গ্রামে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। জেল থেকে মনোরঞ্জনদাকে ছেড়ে দেওয়া হল। চারু আর কুন্তলও মুক্তি পেলেন একের পর এক। ডিসেম্বরের বোধ হয় শেষ দিকে আমার মুক্তির পর মনোরঞ্জনদা আমায় ডাকলেন হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী) আর মধুদার (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) সঙ্গে আলোচনায় বসতে। এঁদের তিন জনের অনুজ্ঞা: নাগপুরে যাও, গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা কোরো—এক বছরে স্বরাজ দেবেন বলেছেন তিনি—এ প্রতিশ্রুতির অর্থ কি। তা থেকে বুঝবে, এ আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই বা কতটা। গেলাম নাগপুর। বাংলায় সে যুগের অন্তরীণে আর রাজবন্দীতে মিলে প্রায় দেড় দুই হাজার। তাঁদের ভিতর তখন গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থক আমরা ছয় জন। অহিংসা, আইন সভা প্রবেশ, তাঁত চরকা প্রভৃতি বহুদিকে গান্ধীজির আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। কিন্তু গণ-চাঞ্চল্য যা জেগেছে বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থে তা আমরা কাজে লাগাতে চাই। তাই তাঁকে দিতে চাই free hand—এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার পথে তিনি কোনো বাধা না বোধ করেন—সর্বান্তঃকরণে সেদিন তাই চাই আমরা। তাই তখনকার মতো আমরা তাঁর পূর্ণ সমর্থক। এমন কি, আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবন চাটার্জি, চারু ঘোষ—এঁরাও চিত্তরঞ্জনের সমর্থক। গান্ধীজিকে সমর্থন করতে নাগপুরে যাই আমরাই এই ছয়জন একসঙ্গে—অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, গিরীন ব্যানার্জি, পূর্ণ দাস, ভূপতি মজুমদার, কুন্তল আর আমি।

কি করে গান্ধীজির সাক্ষাৎ পাই? সন্ধ্যাবেলা কুন্তল আর আমি গান্ধীজির

ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যাচ্ছি—কে একজন ক্যাম্পের দরজার পাশে রাখা বেঞ্চি থেকে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করে। প্রায় মিনিট খানেক জোর করেও তার মুখ তুলে ধরতে পারছিনে। অবশেষে স্বর শুনলাম যখন সে কাঁদছে আর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলছে, ভূপেনদা, ভূপেনদা। স্বর শুনে চিনতে দেরি হল না। গোবিন্দ, তুমি এখানে কোথা থেকে? গোবিন্দ টেনে নিয়ে আমাদের বেঞ্চিতে বসায়।

কটকের গোবিন্দ মিশ্র ছিল ১৯১৪ সালের উড়িষ্যার দশপালা স্টেটের খন্দ উপজাতির বিদ্রোহের নেতা—তখন বয়স তার পনের ষোলর বেশি হবে না। বিদ্রোহ ইংরেজের অত্যাচারে যখন শান্ত, কটকের গিরীশ ব্যানার্জি ছিলেন (পরবর্তী ডাক্তার) সুরেশ ব্যানার্জির দলের স্থানীয় সংগঠক। পলাতক গোবিন্দকে তিনি পাঠান কলকাতায় সুরেশদার মেসে। আর, বিধু রায় (পরবর্তী বিজ্ঞান কলেজের খয়রা প্রফেসার, ডক্টর) আর অরবিন্দ মুখার্জিকে খবর দেন গোবিন্দ সম্বন্ধে। বিধু আমার সহপাঠী। কিন্তু সে পড়ে বিজ্ঞান, আর আমি দর্শন; আর অরবিন্দ স্কুল জীবনে খুলনায় চাকুর এবং পরে কলকাতায় আমার সহকর্মী ও বন্ধু; আরও পরে দেশবন্ধুর কাগজ "বাংলার কথা"র মুদ্রক ও প্রকাশক—কিরণ শংকর রায় যখন সম্পাদক। অরবিন্দ আর বিধু আমায় বলে, গোবিন্দ থার্ড ক্লাসে (ইদানীংকার ক্লাস এইট) পড়তো, ওকে বিনা সার্টিফিকেটে কোনো স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারিস্? কটক থেকে সার্টিফিকেট বের করতে গেলে গোবিন্দ ধরা পড়ে যাবে। ওর নাম ইংরেজ সরকার পায়নি, নিজনামে ভর্তি হতে অসুবিধা নেই। গোবিন্দকে নিয়ে যাই পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশায়ের কাছে, তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। আগেও এ-রকম কাজে আমাদের সহায়তা করেছেন। এখন তাঁর এডোয়ার্ড ইন্‌স্টিট্যুশনে গোবিন্দকে ভর্তি করে নিলেন।

কিন্তু আমি যখন ১৯১৬ সালে পলাতক হই, গোবিন্দও কিছু পরে স্কুল ছেড়ে সারা ভারত পর্যটন করে; জানা অজানা, নতুন প্রাচীন রাজনৈতিক কর্মী আর নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। কোথাও তৃপ্তি না পেয়ে অবশেষে জুটেছে গান্ধীজির ক্যাম্পে সাবরমতীতে। এখন সে আমায় পেয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় গান্ধীজির সামনে। কুন্তল সঙ্গে। গোবিন্দের চোখে তখনও জল। আমায় নিয়েই বলে, বাপুজি, এই সেই ভূপেনদা, যাঁর কথা আপনাকে অত বলেছি। মুখের দিকে

তাকিয়ে গান্ধীজির চোখে স্নেহ ঝরে পড়ে। পাশে জায়গা দেখিয়ে বলেন, বোসো। বসে বলি, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। বললেন, আমারও আছে তোমাদের সঙ্গে। জবাবে বলি, আমরা তো শুধু এই দুই জনই নই। আমাদের সগুমুক্ত বিপ্লবী আরও এসেছেন—আপনার প্রোগ্রামের সমর্থক ; তাঁদেরও কথা বলা প্রয়োজন আপনার সঙ্গে।

—যাও, ডেকে নিয়ে এস।

দু'জনে চলে এলাম। বাকী চারজনকে খুঁজে নিয়ে গেলাম।

যখন আমরা গেছি গান্ধীজির ক্যাম্পে, আরও অনেকে জুটেছেন তাঁর পাশে—কাকা সাহেব কালেলকর, আচার্য কৃপালনি, আচার্য রামদেব, পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্বেদী, চম্পারণ সত্যাগ্রহের নেতা রামরক্ষা ব্রহ্মচারী ; তাঁর অনুগত সহকর্মী রামবিনোদ সিং এবং তাঁরা আরও দশবার জন। বেশ একটি ভিড়। অভিবাদনাদি অন্তে বসতে, গান্ধীজি নিজের কোলের উপর হাত দু'খানি জড়ো করে নিজেই শুরু করলেন : তোমরা বাঙালী বিপ্লবীরা গত কয় বছর ধরে যা করেছ, যে ত্যাগনিষ্ঠা দেখিয়েছ, যে ক্লেশ দুঃখ বরণ করেছ তার তুলনা কম। আমার নিজেরও ও-সাহস হত না···এমনি করে কতকটা যেন স্বগতোক্তি করে চললেন। ঘর খানি নিস্তব্ধ নীরব—সকলেই নিজের নিজের কানের ভিতর সমাহিত। স্তব্ধতা ভেঙে অকস্মাৎ আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী বলে উঠলেন, আমাদের বাঙালীদের গুণ কেউ দেখতে পায় না, তারা ঈর্ষান্বিত···। ঘরের হাওয়াই যেন বহু স্তর নেমে এল।

কথাটার অর্থ বলা প্রয়োজন। এই রকম সময়েই গান্ধীজির এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—"The Sin of Secrecy" তাঁর Young India সাপ্তাহিকে। তার ভিতর গোপন ষড়যন্ত্রের নিন্দা ছিল। পড়ে আমাদের মনে তাঁর প্রতি কিছু উষ্মা জন্মে। প্রবন্ধের মূলে যে-ইতিহাস ছিল অন্য বন্ধুরা জানতেন না, আমি আর কুন্তল জানতাম। খালাসের পর যেদিন আমি কলকাতায় পৌছাই, সেইদিন রাত্রে কুন্তল আর আমি যাই চন্দননগর—ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা পলাতক বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তিনি এক কাহিনী বলেন : এক কাশ্মীরী মহিলা তখন চন্দননগরে। তাঁর স্বামী রেওয়া স্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার। ভারত জুড়ে বহু মুসলমান নেতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লিপ্ত ছিলেন এক ষড়যন্ত্রে। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে সোভিয়েট রুশিয়া থেকে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এই সময়ের কিছু আগে তুরস্কের ভিতর

দিয়ে এসেছে আফগানিস্তানে আমানুল্লা সরকারের হাতে। আমানুল্লা সরকার অস্ত্রগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাইরে—যেখানে কাবুল সরকারেরও কর্তৃত্ব নেই, ইংরেজেরও না—সেখানে জমা করে দিয়েছে উপজাতীয় শাসন-কর্তাদের হাতে।

যে ষড়যন্ত্রের ফলে এই অস্ত্র সংগৃহীত হয়, তার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আছে রাওলাট রিপোর্টে "রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র" বলে অধ্যায়ে। দেওবন্দ্ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মৌলানা মহম্মদ হাসান এফেন্দি এই ষড়যন্ত্রের সর্বপ্রধান নেতা ; অধ্যাপক বরকতুল্লা জাপানে এর সহায়ক ; ভারতে ওবেদুল্লা সিদ্ধি ; আর ইউরোপে যুগান্তরের বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকরমন পিল্লে ডেকে এনে সহযোগী করে নিয়েছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে। কিন্তু যুগান্তরেরই তারক দাস বিরোধী—বিপ্লব প্রয়াসে সাম্প্রদায়িকদলের সহযোগিতা নিতে তিনি রাজী নন। এসব যুদ্ধের কালের কথা।

যুদ্ধ অবসানের পর অস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এখন সেগুলি ভারতে এনে বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করে দিতে হবে—অসহযোগ আন্দোলনের কালে এক ভারত-জোড়া বিদ্রোহের লক্ষ্যে। বাঙালী বিপ্লবীদের এদিকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে বলে মহিলাটির ধারণা। তিনি কলকাতায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে উপদেশ দিয়েছেন এঁদের সাহায্য নিতে। মৌলানা আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি, শওকত আলিও ঐ ষড়যন্ত্রের সামিল এবং সেই সন্দেহেই ইংরেজ সরকার যুদ্ধের সময়ে যেমন আটক করেন মৌলানা মহম্মদ হাসান এফেন্দিকে মাল্টায়, তেমনি আজাদকে রাঁচিতে আর আলি ভাইদের মধ্যপ্রদেশের ছিন্দ্ওয়ারায়। এখন বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মৌলানা আজাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে এই ছদ্মনামধারী ম্যাডাম দাস চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক প্রশস্ত বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছেন। তাঁর খবর ও বিশ্বাস—অতুল ঘোষ ও ভূপেন দত্ত বলে দু'জন নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী আছেন—তাঁরা পারেন একাজ করতে। তিনি শুনেছেন. অতুল ঘোষকে পুলিস ভয় পায় ; আর ভূপেন দত্ত ধরা পড়ার পর পুলিসের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে এমন উদ্ধত সব উক্তি করেছেন যে, পুলিস তাঁকে রীতিমত সমীহ করে। অতুলদার ধারণা, মহিলা জানেন বা সন্দেহ করেন, তিনিই অতুল ঘোষ। যা-ই হোক, শেষ রাতের দিকে অতুলদা গেলেন আমাকে আর কুন্তলকে নিয়ে ম্যাডাম দাসের কাছে।

কি তেজস্বী কথা বলার ধরন এই প্রৌঢ়ার! তিনটি ভাষায় অনর্গল তোড়ে

কথা বলে যেতে পারেন—ফরাসী, ইংরেজী আর উর্দু। এঁর মা এক ফরাসী মহিলা, বাবা কাশ্মীরী পণ্ডিত। কথা শেষে বললেন, কলকাতায় কোনো বড় হোটেলে এক নির্দিষ্ট দিনে ভাল ঘর নেবেন—আমি যাব মৌলানাকে নিয়ে; তখন সব কথা হবে। হ্যারিসন রোডে তখন ক্যালকাটা বোর্ডিং বলে ছিল এক অভিজাত ধরনের হোটেল। এক সন্ধ্যায় নাকে মুখে রুমাল বেঁধে এক ফিটন করে এলেন মৌলানা; ম্যাডাম দাস আগেই এসেছেন। কথা কুন্তলের সঙ্গে—কুন্তল উর্দু ভালো জানতো, স্কুল জীবনে কিছুকাল হাথরাসে পড়েছিল। আমি মাঝে মাঝে দু'একটা কথা জুড়ে দিই মাত্র। মৌলানা ইংরেজী বেশ বুঝতেন, কথা বলতে কম পারতেন। আলোচনা শুনে আমি বলি, ভেবে এবং পরামর্শ করে দেখব; শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানাব।

এখানেই পরবর্তী ইতিহাসটুকুর উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গ শেষ করা প্রয়োজন। অল্প পরেই আমরা মৌলানাকে জানাই, অসহযোগ আন্দোলনের কালে ও-রকম কোনো বিদ্রোহের আয়োজনে যুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে। আমাদের হিসাবে সর্বভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে এ-চেষ্টা ক্ষতিকর হবে। পরের কথায় আভাসে প্রকাশ পাবে, শ্রীঅরবিন্দ এ-ধরনের কাজ এই সময় হাতে না নিতে আমাদের বলেন। এবং তখনকার দিনের আমাদের পলাতক নেতা যাদুদাও একাজে হাত দিতে সোজাসুজি বারণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের কালে কলকাতায় এক নতুন বিপ্লবী দলের সৃষ্টি হয়। এর স্রষ্টাটি ছিল ইংরেজ পুলিসের গুপ্তচর। তারই দেওয়া খবরের ফলে অসহযোগের সিলেটবাসী এক মুসলমান বক্তা অস্ত্রগুলি সহ পরে সীমান্ত প্রদেশের বাইরে গ্রেপ্তার হয়ে যান।

আমাদের বক্তব্যে ফিরে আসি। চন্দননগরের ঐ আলোচনার কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা যাই নাগপুর। এই যা বলেছি, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে গান্ধীজি "Sin of Secrecy" প্রবন্ধে কাদের কাজকর্ম সম্পর্কে লিখেছেন তা কুন্তলের ও আমার জানা ছিল। এখন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীর কথাগুলি গান্ধীজি মাথা নীচু করে শুনছেন, আর, প্রতিটি কথার পরে বলে চলেছেন, "Yes...Yes..." কিছু সময় শুনে আমি হঠাৎ বলি, মহাত্মাজি, আজ চলি। সকলেই যেন নিষ্কৃতি পেলেন। প্রণাম করে ফিরে এলাম।

অনেক রাতে অপর তিন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় সহকর্মী এলেন আমার ঘরে। বলেন, গান্ধীজির সাথে আলোচনা তো করতেই হবে। তোমারই প্রয়োজন বেশি—তুমি এসেছ যুগান্তরের প্রতিনিধি হয়ে। আবার সময়

স্থির কর। আমরা কেউ যাব না, তুমি একলাই যাবে। একটু কাল আমি নীরব—গুরুতর আলোচনা, আমার একলা যাওয়া উচিত হবে না। বলি, কঠিন ব্যাপার। গান্ধীজি এখন কি সময় দিতে পারবেন ? গোবিন্দের কাছেই শুনেছি গান্ধীজি বেজায় ব্যস্ত তখন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের তাঁর প্রোগ্রাম—বুঝে উঠতে পারছেন না অনেকে অনেক-কিছু। গান্ধীজি রাতে ৩।৪ ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পান না। আলোচনা করতে হয় এক এক প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা করে। তার উপর পর দিন থেকে চলবে দুপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন, সকালে ও সন্ধ্যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আর বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা। যাই হোক্, বলি, চেষ্টা করব। কিন্তু একেবারে একলা যাব না, কুন্তল সঙ্গে থাকবে। বহুগুণের ভিতর কুন্তলের মস্ত একটি গুণ—কোনো কথা তার কাছে পড়তে পায় না—কথায় সামান্য ফাঁক যদি তার কানে বাজে—মনে হয়, যুক্তিতে ত্রুটি আছে, অমনি সে শান্ত ধীর কণ্ঠে কথাটি তুলবে অল্প কথায় ; আর, নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকবে। বন্ধুরা বলেন, কুন্তল থাকলে আপত্তি নেই, তাকে নিয়েই যেয়ো।

ভোরেই যাই পরদিন। গোবিন্দেরই শরণাপন্ন। গান্ধীজি বলেন, এখন কি আর সময় করা যাবে ? কিন্তু তোমরা তো সব রকম কষ্ট করতেই অভ্যস্ত। শেষ রাতে ৪টায় এস। থাকি কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে ৩ মাইল দূরে নাগপুর শহরের ভিতর। বাংলা থেকে তখন গান্ধীজির সমর্থক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি এবং 'আরও দু' একজনের সঙ্গে এক বাংলোতে। ডিসেম্বরের নাগপুর— কন্‌কনে ঠাণ্ডা আমাদের বাঙালীর পক্ষে ; অমন সময় কোনো টাঙা, এক্কা পাবার উপায় নেই। যা-ই হোক্ উপস্থিত হই সময় মতোই। গান্ধীজি বলেন, বল তোমাদের কথা।

বলি—আপনার বহুমূল্য সময় বেশি নেব না, সোজাসুজি কথা পাড়ছি : আপনি বলেছেন, এক বছরে স্বরাজ দেবেন। কথাটার অর্থ কি এই ?—এক বছরের ভিতর দেশ আপনার কর্মসূচী মেনে নিলে আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতের পার্লিয়ামেন্ট বলে ঘোষণা করবেন ?—You will proclaim Congress as the parliament of free republican India ?

হ্যাঁ, ঠিক এই আমি করতে চাই—Yes, that's exactly my idea.

আমি বলি, তা যদি হয়, তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, আমরা মনে করিনে, but it will at once raise the struggle to a revolutionary

pitch—কিন্তু তা করলে তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষ একটা বিপ্লবী পর্যায়ে উঠে যাবে; এবং এই কারণে আমরা বিপ্লবীরা এই এক বছর সর্বান্তঃকরণে আপনার কর্ম-সূচী মেনে কাজ করব—এর ভিতর আমাদের পুরোনো কর্মধারায় কোনো চেষ্টাই করব না। আমাদের কিন্তু ধারণা, দেশের জাগরণ ঘটলে ইংরেজের অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে—অস্ত্র আমাদের যত দুর্বলই হোক। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের সংঘাত ছাড়া দেশ স্বাধীন হবে না।

গান্ধীজি বলেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস, দেশ জেগে উঠলে ইংরেজকে দেশ ছেড়ে যেতেই হবে। কারণ, দেশের লোক জেগে উঠে তাদের নিজেদের শাসনভার তারা যদি নিজেরা হাতে তুলে নেয়—তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার-আচার, আইন শৃঙ্খলা দেখার ব্যবস্থা নিজেরা করে এবং তার জন্যে উপযুক্ত সব সংস্থা গড়ে তোলে তখন এদেশে থেকে ইংরেজের দেশ শাসন করার কোনো নৈতিক সমর্থনই, moral justification-ই থাকবে না। হেসে বলি, মহাত্মাজি, আমাদের বিশ্বাস নয়—ইংরেজ ভারতকে তাঁবেদার করে রাখতে কোনো রকম নৈতিক সমর্থনের কথা ভাবে। তার নির্ভর তার সঙীনের উপর। সে যে পশুশক্তির আশ্রয়ে এদেশে আছে তা তার অজানা নয়। মহাত্মাজি শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, আচরণ-নীতি হিসাবে—policy হিসাবে তোমরা উপস্থিত অহিংসার পথ বেছে নিচ্ছ, তাতে আমি খুশী; কিন্তু সর্বান্তঃকরণে আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাতাম যদি তোমরা তোমাদের রাজনীতির ভিতরই—as principle—অহিংসাকে গ্রহণ করতে। বলি, না মহাত্মাজি তা আমরা পারিনে। আপনাকে সেকথা দিলে আমাদের পক্ষে অসততা হবে।

এর পর, গান্ধীজিরই ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আরও চারটি বিভিন্ন বেলায় আলোচনা হয় হিংসা-অহিংসার পন্থা নিয়ে। প্রধানতঃ তিনি গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে অহিংসার সমর্থন জানান; আমিও তখন প্রায় প্রতি প্রাতে গীতা পড়ি, গীতার কথা তুলে বরং হিংসার সমর্থন জানানো আমার পক্ষে সহজ হয়। শেষ পর্যন্ত আমি বলি, আমাদের এ-আলোচনা আর চালানো নিরর্থক—আমিও আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিনে, আপনিও আমাকে মানাতে পারবেন না। গান্ধীজি তখন পাশে কাকাসাহেবকে দেখিয়ে বলেন, ইনিও তোমার মতো একজন হিংসার পন্থী—অ্যানার্কিস্ট ছিলেন—এখন পুরোপুরি অহিংসার পথ মেনে নিয়েছেন; এঁর সঙ্গে আলাপ কর। "অ্যানার্কিস্ট" কথাটি শুনে আমি বলি, না মহাত্মাজি, I am not an anarchist; rather, you are one; you

want a stateless society; we only want a free independent India with our Indian state—আমি নৈরাজ্যবাদী নই, আপনিই বরং তাই, কারণ, আপনি চান রাষ্ট্রবিহীন সমাজব্যবস্থা; আমরা কেবল চাই মুক্ত, স্বাধীন ভারত, সেখানে ভারতীয়দের পরিচালিত রাষ্ট্র। গান্ধীজিসহ সবাই হেসে ফেলেন। এই কয়দিনের আলোচনায় কাকাসাহেবসহ এঁরা সবাই ছিলেন নীরব শ্রোতা; এখন গান্ধীজির উক্তিতে কাকাসাহেব উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন। কিছু সময় পরিচয়জাতীয় আলাপই মাত্র হল। কিন্তু এঁর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়। কিছুকাল যোগাযোগ ছিল; সাবরমতীতে কয়বার দেখাও হয় পরের দু'বছরে। তারপর তো আবার জেলে—সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন। এইভাবে কত পরিচয় হয়েছে, কত ভেঙেছে—সারা-জীবনেরই মতো।

গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার আমার আর একটি প্রসঙ্গ ছিল। যাদুদা (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়), অমরদা (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), অতুলদা, নলিনদা (নলিনীকান্ত কর), সতীশদা (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী), মোটাদা (মন্মথ বিশ্বাস—প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়, তাঁর দাদা) এবং পাঁচুগোপালদা (পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়) তখনও পলাতক—১৯১৫ সাল থেকে এঁদের এক একজনের নামে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেশ মোটা মোটা হুলিয়া জারি ছিল। আমরা সবাই মুক্ত হয়ে এসেছি—এঁদের নিয়ে এখন কি করা যায়? সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দননগরের মতিলাল রায় এঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। বাংলার পুলিস বলছে, তাদের আপত্তি নেই। বোধ হয় মনে করে, বিপদ লুকিয়ে থাকার চেয়ে চোখের সামনে থাকাই ভাল। আমি খালাসের পর যে রাত্রে চন্দননগর যাই, অতুলদা সেই রাত্রেই আমাকে নিয়ে যান মতিবাবুর কাছে। তিনি কোনো বিপদের আশঙ্কা করেন না। আমি ভরসা পাইনে—ইংরেজের পুলিসকে বিশ্বাস নেই। গান্ধীজিকে এখন সব বলি। তিনি বলেন—অত ভাবছ কেন? এঁদের সব অস্ত্রশস্ত্রসহ আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন না? আমার প্রশ্ন: তারপর? গান্ধীজি বলেন,—এঁরা তো সবরকম বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েই নেমেছিলেন। আমি বলি, আমরা এঁদের ছাড়তে রাজী নই। এঁরা যতদিন জীবিত, বিপ্লব প্রয়াসের প্রতীক জীবিত রইলো ভবিষ্যতের জন্যে। গান্ধীজির

সঙ্গে একমত হতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করে চলে আসি। সর্বভারতীয় অন্য অনেক নেতার সঙ্গেও এঁদের নিয়ে আলোচনা করি। তাঁদের মত নানাবিধ।

ইতিমধ্যে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব নিয়ে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে মৌলানা মহম্মদ আলির বক্তৃতায় যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব মেনে নিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিজয়রাঘব চারিয়া প্রমুখ আর সকলেও সমর্থন করলেন। চিত্তরঞ্জন বিপুল উপার্জনের ব্যারিস্টারি ত্যাগ করবেন—ঘোষণা করলেন ; গান্ধীজির পুরো প্রস্তাব কংগ্রেসে সহজেই পাস হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন আইনব্যাবসা ত্যাগ করে রাস্তার ভিখারীর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন। দেশবাসী তাঁকে "দেশবন্ধু" আখ্যা দিল। জনগণের ভিতর বিপুল সাড়া জাগলো।

গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের আলোচনা শেষ হবার পর উত্তরবঙ্গের কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু সুরেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত দাশগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ ভবেশ ব্যানার্জি—আরও কে কে ছিলেন—আমায় বললেন, গান্ধীজির সঙ্গে কথা হল ; এইবারে একবার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করে আসুন ; ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সহায় হবে, পুরোনো কর্মীদের আস্থা বাড়বে—এতবড় পরিবর্তনের সময় এটা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন আমরা তখন সকলেই অনুভব করছি। কিন্তু বন্ধুদের আগ্রহ প্রবল। আমার ও কুন্তলের যাওয়া আসার খরচ অনেক অংশে তাঁরাই স্বেচ্ছায় বহন করলেন। আর দিলেন চট্টগ্রামের সূর্য সেনের এক বন্ধু। আমাদের নাগপুরে আসা থাকা এবং ফিরবার খরচাও তিনিই বহন করেছিলেন।

গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের আলোচনার সব কথাই জেনে কলকাতা ফিরছেন তখন আমাদের অপর চার সহযাত্রী—গিরীনদা, পূর্ণদা, ভূপতিদা আর অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। হরিদারাও এই চেয়েছিলেন আমার কাছে ; যদি আমি নাগপুর থেকে আর কোথাও যাওয়া স্থির করি, কোনো বাধা থাকবে না। তাঁরা এঁদের মুখেই সব জেনে জেলায় জেলায় যাঁর যাঁর কর্মক্ষেত্রে চলে যান।

শ্রীঅরবিন্দ তখন পর্যন্ত সব সময় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকতেন না। বিকেলে ঠিক সাড়ে তিনটায় বারান্দায় বেরিয়ে বসেন। বড় একখানি টেবিলের পাশে দেয়ালের কাছে তাঁর নির্দিষ্ট একখানি চেয়ার ; টেবিলের দুই পাশে আগন্তুকদের জন্যে দুইখানি চেয়ার ; আর, সামনে লম্বা একখানি ঠ্যাস বেঞ্চি। যেমন যেদিন হয়, আলোচনার পর শ্রীঅরবিন্দ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আবার ভিতরে চলে যান। বাড়ীটি খুঁজে গিয়ে আমরা "অমৃত" নামে এক মাদ্রাজী সাধককে (ইনি

এখনও আশ্রমে আছেন—ওখানকার হিসাবপত্রের দিকটা দেখেন) আমাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে সমুদ্রের ধারে স্ট্যাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিজয় নাগের এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিই।

সময় মতোই শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাতে যাই। প্রণাম করে বসতেই বলেন, বল কি কথা। আমাদের ঐ কয়বছরের ক্রিয়াকলাপ, ভারত জার্মান ষড়যন্ত্র, যুদ্ধকালে উত্থানচেষ্টা, তার পরিণতি, জেলের বাইরে এসে কেন আমরা নাগপুরে যাই, গান্ধীজির সঙ্গে কি কথা হয়—সব রিপোর্ট করি। শুনে বললেন, গান্ধীজিকে কথা দিয়ে ঠিকই করেছ। এখন পন্থা এই—Carry the message of revolt to the people—জনগণের কাছে বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছে দাও। কিন্তু নিজেদের ভাসিয়ে দিও না। Don't make a fetish of non-violence, a religion of non-violence—অহিংসাকে নিজেদের ধর্ম করে তুলো না। গান্ধী এসেছেন বিরাট এক শক্তি নিয়ে—দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন, but I don't believe, he can bring independence—কিন্তু তিনি দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে যেতে পারবেন, আমি বিশ্বাস করিনে। শ্রীঅরবিন্দ কথা তখনও বাংলায় যা শুরু করেন, একটা দুটো কথার পরই ইংরেজীতে চলে যান।

অনেক কথাই হয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। তার ভিতর একটা বিশেষ কথা তিনি বলেন। তার উল্লেখ প্রয়োজন। গান্ধীজি এই যে শক্তির বন্যা নিয়ে এসেছেন, এ যেন বানের জলের মতো যেমন এসেছে তেমনি চলে না যায়। একে ধরে রাখার মতো দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর—যেখানে দু'পাঁচটি করে কর্মী থাকবে আজকের এই উৎসাহ উত্তেজনার এক একটি আশ্রয়স্থল হয়ে। ভবিষ্যতে বিপ্লব প্রয়াসে শক্তি যোগাবে তারা। এর পর যুগোপযোগী ভাবের প্রভাবে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগে গড়ে ওঠে এই আদর্শে বহু প্রতিষ্ঠান—বাংলায়, বিহারে, পাঞ্জাবে, অন্যত্র: বাংলার জেলায় জেলায়—বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শংকরমঠ আগেই ছিল, এখন হল দৌলতপুরে, ডায়মণ্ডহারবারে, উত্তরপাড়ায়, হুগলীতে, বিক্রমপুরে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়, সিলেটে, বগুড়ায়, পুর্ণিয়ায়, পুরুলিয়ায়, অমৃতসরে—আরও অন্যত্র। অনেক বৎসর ছিল এর অন্ততঃ অনেকগুলো। দু'একটা কোনোমতে এখনও টিঁকে আছে। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় এবং আরও কোথাও কোথাও বিপ্লবপ্রচেষ্টার প্রসার ও

অগ্রগতিতে এদের দান অনস্বীকার্য।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রাজনীতির কথা হয়ে যাবার পর যাদুদা, অমরদাদের প্রসঙ্গ তুলি। তিনি উপদেশ দেন সুরেন্দ্রনাথ-মতিলাল রায় যে চেষ্টা করছেন, তোমরা তার সাহায্য নাও। আমার আপত্তির কথা তুলি। শ্রীঅরবিন্দ জবাবে বলেন, এই যে-আন্দোলনের সামিল হবে বলে গান্ধীজিকে কথা দিয়ে এলে, সে-আন্দোলন চলাকালে বিপ্লবের আয়োজন তোমরা কিছু করবেও না, করতে পারবেও না, উচিতও হবে না। এঁরা সেক্ষেত্রে অলস জীবন কাটাবেন, এত বছর এক রকম বসেই কাটিয়েছেন—এটা demoralising, এঁদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আত্মরক্ষাতেই শক্তির অপচয় হচ্ছে, এঁরা পালিয়ে থাকলে তোমাদেরও শক্তির অপচয় হবে।

বাংলায় ফিরে বুঝি, নির্ভুল অরবিন্দের যুক্তি। আমি জেল থেকে আসার পর অতুলদা যাদুদাকে খবর দিয়েছিলেন। পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে শুনি, তিনি চন্দননগরে এসেছেন। দেখা করি। তিনি বলেন, আর লুকিয়ে কাটানো অসম্ভব। পলাতক জীবনের শেষ দু'বছর যাদুদারা কাটান মানভূম জেলার বর্ধিষ্ণু এক মুসলমান গ্রামে। সেখানে তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার; দরকার মতো হোমিওপ্যাথিও করেন। ও-অঞ্চলে বেশ সম্ভ্রান্ত। নলিনদা তাঁর কম্পাউণ্ডার, আর, মোটাদা (মন্মথ বিশ্বাস) পাচক। চারদিকে যেসব প্রতিষ্ঠাবান পরিবারের ভিতর আছেন, তাঁরা অনেকে খিলাফত আন্দোলনে জড়িত। ডাক্তার সাহেব সে-আন্দোলনে যোগ দেবেন না—এ তাঁদের অসহ্য। তাঁরা যখন তখন যাদুদাকে মিটিং-এ যোগ দিতে আহ্বান জানান। তাঁর পক্ষে আর কাটান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। যাদুদা আরও বলেন—এছাড়া, আমরাও এখন ক্লান্ত। বেরিয়ে আসার সুযোগ হলেই আসতে চাই। এখন পথ ভিন্ন। গান্ধীজিকে আমাদের সকলের তরফ থেকে আন্দোলনে যোগ দেবার কথা দিয়ে ভাল করেছ। যাদুদাও ডাক্তার। তিনি সেই আনন্দমঠের শেষ অঙ্কের চিকিৎসকেরই মতো যেন সত্যানন্দের হাত ধরে এক বিদ্রোহের যুগ থেকে বিরতির পর বিপ্লবের আর এক অঙ্কের—আর এক প্রশস্ততর পথে আসার পক্ষপাতী। তারপর কালের আর সুযোগের প্রতীক্ষা। এঁদের জীবনে হয়তো ঐ শেষ। নবতর কর্মী, নতুন উৎসাহের নেতা সব সৃষ্টি হবে। হবেই তো। বিপ্লব কি থেমে থাকার বস্তু? সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণাই তো বিপ্লবের প্রেরণা।

এর পর থেকে কয়েক বৎসর ধরে কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য ক্রমে প্রকট হতে থাকে। বলেছি—কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আগেই ছিল। শুধু বিপ্লব-প্রচারকে বিস্তৃতি দেবার প্রয়োজনেই সেসব তখন সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত আমাদের যা ব্রত ছিল, গান্ধী-মনোভাব তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ; আদর্শমাত্র এক : বিপ্লব। প্রথম পার্থক্য ফুটলো আইনসভায় প্রবেশ নিয়ে। ইংরেজের পথে কাঁটা সৃষ্টি যখন যেভাবে যা বা যতটুকু পারা যায়—এই ছিল আমাদের মনোভাব। এতে জাতির ভিতর উত্তেজনা সজীব রাখতে সাহায্য হয়। সাময়িকভাবে আমরা কেউ কেউ এই মনোভাব চেপে গিয়েছিলাম মাত্র। বাংলার সেদিনের অবিসংবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন যেদিন খোলাখুলি গান্ধীজির আইনসভা বর্জন নীতির বিরোধিতায় দাঁড়ালেন, অনেক জেলা তাঁর বিরোধী। সুভাষ আর যাদুদা হিসেব করে দেখলেন—ময়মনসিং, হুগলী আর বরিশাল জেলার সমর্থন পেলেই বাংলা-কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের সংখ্যাধিক্য হয়ে যায়। এই তিনটি জেলায় মোটামুটি যুগান্তরের মধুদা, ভূপতিদা আর মনোরঞ্জনদার নেতৃত্ব। এখন সুভাষ আর যাদুদার উপদেশে মধুদার আর ভূপতিদার পরামর্শে এই দুই জেলা যখন আইনসভা প্রবেশের পক্ষপাতী হয়ে গেল চিত্তরঞ্জনের নীতি অনায়াসে বাংলার কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হল।

তার আগে চিত্তরঞ্জন যখন জেলে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব হয়। গান্ধীজি এর বিরোধী। চিত্তরঞ্জনের মত ছিল, এক একটি ধাক্কায় ইংরেজ যখন কিছু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, জাতির মনে তখন নিজের প্রতি আস্থা জাগে ; বিপ্লব-পথে অগ্রগতিতে এর প্রয়োজন আছে, জনগণের ভিতর বিপ্লবের ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজির বিরোধিতায় মালবীয়াজি বিফল হন। দেশবন্ধু মর্মাহত। এল ১৯২২ সাল। অত্যাচারে উত্তেজিত জনতা উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় গান্ধীজির অহিংসানীতি ভুলে কয়েকজন পুলিসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই কারণে, গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। কারান্তরাল থেকে চিত্তরঞ্জনের ভগ্নমর্মের ভাষা ফুটে ওঠে—হিমালয়ের মতো বিরাট ভুল। ইংরেজ সরকারের সাহস হয়—অল্পদিন পরেই গান্ধীজিকে জেলে পোরে। দেশে প্রায় কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয়নি। উত্তেজনা নিজেই তিনি শেষ করে দিয়েছেন তখন।

এইবারে এল আমাদের দিন। গান্ধীজিকে এক বছরের অঙ্গীকার দিয়েছিলাম। এক বছরের বেশি হয়ে গেছে। গান্ধীজি শুধু আন্দোলন সংবরণ করেই নেননি, নিজেও কারারুদ্ধ। চট্টগ্রামে চলছে তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। সেই সুযোগে যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় বারজন একত্র হয়ে স্থির করেন, এখন থেকে আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করব। কিন্তু তার ব্যবহার এখনও নয়। এর পরই কলকাতা ও তার আশেপাশে তিনচারটে জায়গায় পুরোনো বিপ্লবী চেষ্টার বহিঃপ্রকাশের ব্যর্থ অনুকরণে অস্ত্রপ্রয়োগের কয়েকটি ঘটনা ঘটে। আগে বলেছি অসহযোগ আন্দোলনের কালে কলকাতায় এক নতুন বিপ্লবী দল দেখা দেয়। আমরা জানতাম, পুরোনো এক বিদ্রোহী দলের এক বিশ্বাসঘাতক পুলিসের চর হিসাবে এই দল সৃষ্টি করে। দলের সবাই অসৎ নয়; কিন্তু তারা উৎসাহবশে সময় ও লোক চিনতে ভুল করে। ঐ পুলিসের চরের প্ররোচনায় এই সব অসাময়িক এবং ব্যর্থ ঘটনা ঘটে। এই নকল বিপ্লবচেষ্টায় দেশবাসীকে ভুল বুঝায় এবং এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে তারই অজুহাতে আমাদের কয়েকজন পুরোনো সন্দেহভাজনকে ১৯২৩ সালে আবার সেই ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী করে। ইংরেজের পুলিস চায় না বিপ্লব প্রসারের কাজ আমাদের অব্যাহত ভাবে চলে। আর এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজ আরও জোরদার করার চেষ্টায় গ্রেপ্তারের কিছু পরে আমাদের ছয় জনকে পাঠায় বার্মাদেশের তিনটি জেলে। তার ভিতর বেসিন জেল থেকে জীবন (চ্যাটার্জি) আর আমি বাংলা পুলিসের এই নতুন ধরনের কীর্তিকাহিনী—এজেণ্ট প্রোভোকেটর ব্যবহারের কাহিনী—লিখে পাঠাই তখন বিলাতে সেই যে প্রথম শ্রমিকদলের সরকার হয়েছে তার কাছে। এ ১৯২৪ সালের ঘটনা।

এই দরখাস্তের এক নকল গোপনে ডাকে পাঠাই বেসিন থেকে চিত্তরঞ্জনের কাছে। ইতিমধ্যে আমরা দু'জন বদলি হই বর্মার ম্যাণ্ডালে জেলে। সেখানে যাওয়ার কিছুদিনের ভিতর খবর পাই, প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স করে সুভাষ বোস, সত্যেন মিত্র, হরিদা, মধুদা প্রমুখ অনেককে একদিনে গ্রেপ্তার করে। বিলাতের সরকারের কাছে আমাদের মেমোরিয়াল বা দরখাস্তেও আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি—দেশে অস্ত্রের সাহায্যে বৈপ্লবিক সংঘটন ঘটানো যখন সত্যিকার বিপ্লবীদের কাম্য নয়, তখন পুলিসী চর দিয়ে ঐসব ঘটনা ঘটানো সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত। ম্যাণ্ডালেতে কিছুদিনের ভিতর বুঝতে পারি, বেসিন থেকে ঐ মেমোরিয়ালের নকল যেটি আমরা দেশবন্ধুর উদ্দেশে পাঠাই তা ধরা

পড়ে গেছে। আবার চেষ্টা করে পাঠাই ম্যাণ্ডালের এক বাঙালী ব্যবসায়ীর কাছে। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এবং বিপদ কাঁধে নিয়ে ঠিক সময়মতো সেটি এনে পৌছে দেন দেশবন্ধুর হাতে। দেশবন্ধুর আহ্বানে তখন তাঁরই বাড়ীতে চলছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা—একমাত্র আলোচ্য ঐ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স। গান্ধীজি এ-পর্যন্ত মেনে নিতে পারেননি ঐ অর্ডিন্যান্সের লক্ষ্য বিপ্লবী দল নয়, স্বরাজ্যদল। সভার কাজ শেষ করে গান্ধীজি উঠছেন; মেমোরিয়ালের নকলটিতে লালকালির দাগ দেওয়া কয়েকটি অংশের উপরেই মাত্র দেশবন্ধু চোখ বুলাতে পেরেছিলেন। দিয়ে দেন গান্ধীজির হাতে। হাওড়া স্টেশনে যাবার পথে পড়ে তিনি স্টেশন থেকেই ঘোষণা করে যান, ঐ অর্ডিন্যান্স আর ধরপাকড়ের লক্ষ্য বিপ্লবান্দোলনের ধ্বংস নয়; কংগ্রেস সভ্যদের আইন সভা প্রবেশ আন্দোলনের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে—এবিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। গান্ধীজির কাছ থেকে দীর্ঘ সেই মেমোরিয়ালের নকল ফেরত পেয়ে দেশবন্ধু নিজ দায়িত্বে সংবাদপত্র মারফত তার সমস্তটা সারা ভারতে প্রচার করেন। কিছুকাল ধরে ভারতের রাজনীতিতে আরও কিছু ঘটনা ঘটার পর গান্ধীজি বলেন, আমি সম্পূর্ণ ভাবে স্বরাজ্যদলের পক্ষে এখন—মায়ের কোলে শিশু যেমন আত্মসমর্পণ করে আমিও তেমনি করছি স্বরাজ্যদলের কাছে। এ-সব ইতিহাসের জানা ঘটনা।

দ্বিতীয়বার জেল থেকে মুক্তি পাই আমরা ১৯২৮ সালের জুলাইতে। ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন; আয়োজন চলছে। আগের বছর জওহরলাল ইউরোপ আর মস্কো ঘুরে এসে মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেন। উদ্দেশ্য: পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার ও কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো। অপর দিকে, কলকাতা কংগ্রেসের আগে থেকে চলছে বিলাতের সরকারের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্যে দেশের সকল দল মেনে নিতে পারে এমন এক শাসনতন্ত্রের খসড়া খাড়া করার চেষ্টা। এর জন্যে এক কমিটি হয়েছে হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, লিবারেল দল, কংগ্রেস—সব পরিচিত রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধি ছিলেন সে কমিটিতে; মতিলাল নেহরু কমিটির চেয়ারম্যান। এই নেহরু কমিটির রিপোর্টে দেশের শাসনতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস। প্রত্যেক দলই নিজের নিজের সম্মেলনে এই রিপোর্ট পাস করলে সেই পাকা খসড়া বিলাতের সরকারের কাছে পেশ

করা হবে। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে এটা পাস করাবার কথা।

আমাদের খালাসের কিছুদিন পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা এ, আই, সি সি-র এক সভা হবে দিল্লীতে। এই সভার কালে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগেরও এক সভা ডাকা হয়। সেখানে একে জোরদার করার চেষ্টায় নতুন যে-কমিটি হল—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তার সভাপতি, জওহরলাল নেহরু আর সুভাষ বোস যুগ্ম-সম্পাদক। আমাদের বিপ্লবান্দোলনের—বাংলার, পাঞ্জাবের, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের অনেকে এর সদস্য হলেন। মাদ্রাজে যখন লীগটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এঁরা অনেকে তখন ছিলেন জেলে বা অন্তরীণে।

ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে ডোমিনিয়ন স্টেটাস আদর্শের নেহরু রিপোর্ট আলোচনান্তে গ্রহণ করার কথা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সামনে এ এক চরম চ্যালেঞ্জ। যে-রাত্রে ঐ আদর্শ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐ আলোচনা, গভীর রাত্রে তখনকার কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম দুই নেতা, গান্ধী ও মতিলালের চাপে শ্রীনিবাস, জওহরলাল ও সুভাষ—তিনজনই রাজী হয়ে গেলেন, তাঁরা বাধা দেবেন না। গোপনে খবর পেয়ে আমাদের প্রৌঢ় নেতা হরিদা শীতের খোলা মাঠে শিশির ভেজা খড়ের উপর শুয়ে পড়লেন। আমরা তিনজন—আমি, অরুণদা (গুহ) আর অমর ঘোষ ভলাণ্টিয়ারদের কাজের তদারক করতে বেরিয়ে টর্চের আলোতে সে-দৃশ্য দেখি, আর কাছে গিয়ে হরিদার বিলাপ শুনি : এতগুলি বিপ্লবী ছেলে এমন করে প্রাণ দিয়ে গেল ; আর, আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ;—ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিতর, অর্থাৎ, বিদেশীর গোলামীর আওতায় স্বাধীনতা আদর্শ হিসাবে মেনে নেবে বিনা বাধায় ?

নানা উপায় আলোচনা করি। কিরণশঙ্কর রায় তখন বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারি। সকালে হবে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা। তার আগে কিরণবাবু প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক পুরোনো মুলতুবী সভা ডাকলেন, আমাদের অমর সেখানে পদত্যাগ করলেন, আর তাঁর জায়গায় শরৎ বোসকে এ, আই, সি, সি-র সভ্য করে নেওয়া হল। এ, আই, সি, সি-র সভ্য মাত্রেই বিষয় নির্বাচনী সমিতিরও সভ্য। এর আগে আমরা শেষ রাত্রে শরৎবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে রাজী করিয়ে আসি। নামকরা লোক চাই বাধা দিতে। তাই এতসব করতে হল। বিষয় নির্বাচনী সভায় শরৎবাবু জানিয়ে দিলেন—কোনো আপত্তি তিনি মানবেন না ; কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর সংশোধন প্রস্তাব তিনি তুলবেনই।

সারাদিন সুভাষকে অনুনয় বিনয়, ধমকধামক করলাম আমরা অনেকে। সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ও তার ভিতর একজন; তাঁর স্বভাবসুলভ বিদ্রূপ-বাণও তিনি সংবরণ করলেন না। সুভাষের এক কথা: কথা দিয়ে ফেলেছি। অবশেষে বি, পি, সি, সি-র কর্মী ও সভ্যদের এক সভা ডাকা হল। সভার জরুরী আহ্বানে বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেণ্ট সুভাষ না এসে পারলেন না। অনেকে অনেক রকম করে বুঝালেন। শেষকালে সুভাষ নতি স্বীকার করলেন সতীন সেনের একান্তমনের আবেদনে: বাংলার নেতা শরৎ বোস নন, বাংলার নেতা সুভাষ; শহীদ বিপ্লবীর বাংলা চায়—পূর্ণ স্বাধীনতা হবে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ; আর, এ-কথা সারা বিশ্বের সামনে ফুটে ওঠে সুভাষের কণ্ঠে। সুভাষ তখন তাঁর জি, ও, সি-র মাথার হেলমেট পাশে নামিয়ে রেখে আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলেন, আপনারা যদি চান, আমি বিরোধী প্রস্তাব তুলব। সমবেত কণ্ঠে উঠলো হর্ষধ্বনি।

সুভাষ আমাদের দু'একজনকে একান্তে ডেকে বললেন—বুড়োদের কাছে হারব, জানি; দুঃখ নেই। কিন্তু মাত্র যেন দু'একশ ভোট না পাই—এইটে দেখো। আমি বলি, তা হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আহার নিদ্রা ভুলে তখন থেকেই আমরা ঘুরতে শুরু করি বিভিন্ন প্রদেশের ক্যাম্পে। আমাদের পরিচিত তখন বিশেষতঃ উত্তরভারতের অনেক বিপ্লবী ও তাঁদের সহকর্মী সব। কংগ্রেসেরও সভ্য তাঁরা। আঁধারে তাঁরা যেন আলো দেখেন—সুভাষ বোস পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বিরোধী প্রস্তাব তুলবেন। বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সুভাষ ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সরকারী তরফে প্রধান গণনাকারী নিযুক্ত করেন; আর, বিরোধী তরফে আমাকে। শেষরাতের দিকে গণনা শেষ হল। যতদূর মনে পড়ে, তেইশ শ'র কিছু বেশি ভোট পড়েছিল। আর, আমরা হেরেছিলাম চারশরও কিছু কম ভোটে। আমি একটু আপসোস করতে কিরণবাবুর ধমক: যান মশাই, গান্ধীর বিরুদ্ধে পৌনে চারশ' ভোটে হার—এ হার তো হল গান্ধীর! সুভাষের আনন্দ চোখেমুখে উপ্‌ছে পড়ছে!

কিন্তু এর পেছনে কিছু ঘটনা ঘটে—তার রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রচুর, এবং সেজন্য উল্লেখ প্রয়োজন। গান্ধী যখন শুনলেন, সুভাষ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন তিনি আহত হয়ে বলেন, একটা কথার ঠিক থাকবে না? আর বলেন, আমি তো পূর্ণ স্বরাজ আদর্শের বিরোধী নই, কিন্তু আমি ভাবি—এর সমর্থনে শক্তি কোথায়?—Where is the sanction behind it? এর

পর তিনি যে-প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে দেন এবং যে-প্রস্তাব কংগ্রেসকে দিয়ে পাস করিয়ে নেওয়া হয়, সে প্রস্তাব এই অর্থবাচক : উপস্থিত এক বছরের জন্য কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস আদর্শ মেনে নিচ্ছে ; কিন্তু এই এক বছরে যদি বিলাতের সরকার ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না দেয়, আগামী বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশন পূর্ণ স্বরাজ আদর্শ ঘোষণা করে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন (Civil disobedience movement) শুরু করবে। এই আন্দোলনই শক্তি সৃষ্টি করবে—Sanction behind the demand for Purna Swaraj বা Complete Independence। গান্ধীজি এই কথাটিই বারবার বলেছেন : জাতির শক্তি সামান্য, অথবা নেই ; সেই অবস্থায় তার তরফ থেকে একটা গালভরা দাবি জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান করতে পারে না —এতে সে বিশ্বের সামনে খেলো হয়। এ-যুক্তি তখন আমরা মানিনি। কিন্তু কথাটি পরে আমরা মর্মে মর্মে বুঝেছি—যখন দেখেছি অনেক সময় অনেক অসার দাবি তোলা হয়েছে ; আর তা আদায়ের জন্য উদ্ভট ছেলেখেলা সব করা হয়েছে।

যাই হোক্‌, কলকাতা কংগ্রেসে আমাদের উদ্দেশ্য সর্বভাবেই সিদ্ধ হল। ১৯২৮ সালে আমাদের মুক্তির পর যুগান্তরের মুখপত্র বের করা হয় "স্বাধীনতা"। হরিকুমার চক্রবর্তী আর অরুণ চন্দ্র গুহ এর প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ঘোষিত হন। গান্ধীজির সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য এই কাগজে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতা কংগ্রেসের পর থেকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা আইনকে প্রায় অগ্রাহ্য করে খোলাখুলি বলতে থাকে : অসহযোগ অন্দোলনের বেলা যেমন দেখা গেছে, ইংরেজের পুলিশ নিরস্ত্র দেশবাসীকে পশু তাড়াবার অস্ত্র লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শুধু আঘাত হানেনি, উপরন্তু অপমান করেছে—এবারেও যদি তা করে, জাতির তরফ থেকে বিপ্লবী শক্তি তা সয়ে যাবে না। প্রত্যাঘাত করবে—ক্ষমতা তার যত কমই হোক্ ; আঘাতে প্রত্যাঘাতে দেশের লোকের মনে আগুন জ্বলবে— নিদ্রিত দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার এই প্রশস্ত পথ। এই কথা বলতে গিয়ে আদর্শকে সাধারণ মানুষের মনের মতো করে তুলতে গান্ধীজিকে আমরা ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছি ; অহিংসা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছি ; তাঁর তাঁত-চরকা নিয়ে হাসির উদ্রেক করতেও দ্বিধা করিনি। এতদূর গেছে তখন আমাদের বিরোধিতা। কিন্তু সব মিলে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে যে ১৯৩০ সাল থেকে বাংলায় সর্বত্র এবং তার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ছোঁয়াচ লেগে

বাংলার বাইরেও বিপুল, গভীর এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে—চরম হিংসার অভিব্যক্তি হয়েছে, অস্ত্র-প্রয়োগের প্রচুর ঘটনা ঘটেছে—সিপাহী বিদ্রোহের পর তার সঙ্গে তুলনীয় প্রায় কিছু নেই। ঐ কয় বছরে অনেকে শহীদ হলেন, অনেকে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আন্দামানে বছরের পর বছর কাটালেন।

১৯৩০ এর এপ্রিলে ভারতীয় বিপ্লবের এই অংকে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর ধরা পড়ে আমরা প্রায় আট বছর জেলে কাটাই। শেষ দিকে তখনকার শাসন-তন্ত্রে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। বাংলাকে অহিংসার পথে নিতে তিনি গান্ধীজির সহায়তা চান। গান্ধীজীর ধৈর্যের অভাব নেই। এলেন বাংলায়। রাজবন্দী, অন্তরীণ আর দণ্ডপ্রাপ্ত বহু বন্দী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বন্দীর সঙ্গেও আলোচনা করলেন। সে-আলোচনায় কারও কারও কাছে একটা ইঙ্গিত পেলেন—পথপ্রদর্শক অনেক বিপ্লবী নেতা রাজবন্দী বা ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বন্দী; তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করুন। ছয়সাত বছর পেশোয়ার থেকে ত্রিচিনাপল্লী পর্যন্ত নানা জেলে কাটাবার পর আমাদের ষোলজনকে তখন আনা হয়েছে হিজলির ছোট জেলে। গান্ধীজি গেলেন সেখানে; মহাদেও দেশাই সঙ্গে। খোলাখুলি কথা হল গান্ধীজির সঙ্গে;—বরং বলব, খোলা কথা যা হয়, তার ভিতর নির্মমতার অভাব ছিল না। সব এখানে বলা সম্ভব নয়; আবার, অনেক কথা ভাষায় তখন যা ফুটিয়ে বলা হয়নি তা খুলে না লিখলে লেখার অর্থ থাকবে না। নাম পরিচয় এখানে কিছু কিছু দিতে হবে, তা দেওয়া সে যুগে আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

আমিই বলি : মহাত্মাজী, ইদানীং এত লোককে যে এত কিছু সইতে হয়েছে, এত লোকের প্রাণ গেছে, প্রধানতঃ আপনিই দায়ী তার জন্যে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি যখন হয়, তার আগে আমরা বক্সা ক্যাম্প থেকে লিখে পাঠাই— আপনি যদি বিপ্লবীদের উপেক্ষা করেন, আর ভগত সিং, সুখদেও, রাজগুরুর ফাঁসি হয়ে যায়, কোনো চুক্তি, কোনো আইন-শাসন মানবে না বিপ্লবীরা; তারা তাদের যথাসাধ্য করবে শোধ তুলতে। আমাদের এ-চিঠি মনোমোহন ভট্টাচার্য্য আর কিরণশংকর রায় লর্ড আরউইনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের আগেই আপনার হাতে পৌছে দিয়েছিলেন; তাঁদেরই কাছ থেকে অপর চিঠি নিয়ে তেজবাহাদুর সাপ্রু পৌছে দিয়েছিলেন লর্ড আরউইনকে এবং আলেচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। আরউইন কিছু করবেন, সে ভরসা আমরা করিনি। লাহোরের ওঁদের তিনজনের ফাঁসি হয়ে গেল। চট্টগ্রামের অনন্ত, গণেশ—ওঁদের অনেকের ফাঁসি

হবে দেশবাসী আশঙ্কা করেছিল; আমাদেরও সে-আশঙ্কা ঐ চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন হয়নি জানেন? তার একমাত্র কারণ, আরউইনকে আমরা সতর্ক করেছিলাম—লাহোরের ওঁদের ফাঁসি দিলে বিপ্লবীরা কোনো প্যাক্ট মানবে না। এটাকে আমরা নিষ্ফল হুমকিতে শেষ হতে দিতে চাইনি। বক্‌সায় সহবন্দী ভূপেন রক্ষিতরায়কে বলি, বাইরে খবর দিন—লাহোরে তিনজনের ফাঁসির পর যেন পনের দিন না কাটে, জবাব শুরু করতে হবে। ভূপেনবাবুর বাইরের বন্ধুদের অনুভূতি আমাদের চেয়ে কিছু কম তীব্র ছিল না। ২৩শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিল ক'দিন? ঠিক পনের দিনের দিন বিপ্লব প্রসার প্রয়াসের ১৯৩০-এর অংকের এই দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শুরু হয় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডির হত্যা দিয়ে।

বেশ উঁচু গলাতেই বলি কথাগুলি গান্ধীজিকে হিজলিতে। আর বলি, আপনি কিন্তু আইন অমান্যের বন্দীদের মুক্তিতেই খুশি হয়ে গেলেন। বিপ্লবীদের কথা তুললে আপনার অহিংসার জাত যেত? আপনি এবং আরউইন আমাদের কথা উড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জাতির মুখ চেয়ে আমরা কিন্তু ১৯৩০এর ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ও সিম্পসন হত্যার পর সমস্ত বিপ্লবী আঘাত প্রত্যাঘাত বন্ধ রাখি ঐ ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত। তার পর আর থামে নাই। বিদ্যুতের পর বিদ্যুত ঝল্‌কানি চলে চার পাঁচ বছর ধরে। আমাদের বহু স্নেহভাজন, দেশের সব অমূল্য সম্পদ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমরা হারিনি; বিপ্লব এগিয়ে গেছে—আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অপরপক্ষে আপনি যদি আইন অমান্যের বন্দীদের যে চোখে দেখেছিলেন, সেই চোখে বিপ্লবীদেরও দেখতেন, ইংরেজ কি করতো না করতো জানিনে; বিপ্লবীরা আপনাকে জাতির নেতা বলে মেনে নিয়েছে, আপনার ইঙ্গিতকে অসম্মান দেখাত না। কিন্তু এঁদের আপনি অপাংক্তেয় বলে ধরেছিলেন। তাই ঐ তিন চার বছরে অতগুলি জীবন গেছে।

Then the blood of all these people is on my head?—এই সব মৃত্যুর জন্য দায়িত্ব তাহলে আমারই? ক্ষুব্ধ, মর্মাহত, ম্রিয়মাণ কণ্ঠের কথা কোনোমতে বের হয়। আমি তখন উত্তেজিত, আমি থামছিনে। মহাদেও দেশাই আমায় শান্ত হতে ইঙ্গিত করছেন। অবশেষে বললেন, বাপুজীর রক্তের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে, ট্রেনেরও সময় হয়ে গেছে। গান্ধীজিও বলেন, হ্যাঁ, এইবারে উঠি, আবার আসব, আপনাদের সঙ্গে দু'দিন কাটাব; সব কথা

হবে তখন। আর তাঁর হিজলিতে আসা হয়নি। আমাদেরই কিছুদিন পরে একদিনের জন্যে নিয়ে আসা হয় কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে। একই ট্রেনে আনা হয় মেদিনীপুর জেল থেকে শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত ও উষা মুখার্জিকে। গান্ধীজিকে আর কথা শুনানো নিরর্থক মনে করে সহজ হাসি আনন্দের ভিতরই কথা শেষ করি। অল্প দিনের ভিতর সব রাজবন্দীদেরই ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া হয়।

অপর একটা দিক দিয়ে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে চিন্তা-জগতে ক্রমে গান্ধীজির অনেকখানি কাছাকাছি আসতে শুরু করি। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। বহুকাল আগে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাই কথাটা অন্য প্রসঙ্গে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে ছাড়া বিপ্লবের নতুন পথের সন্ধান চলে না ভারতের মতো ইতিহাসের দেশে। কি অবস্থায় আমরা বাল্যে দেশকে দেখেছি ; তার পর থেকে কি ভাবে চলছে ঐ তিনচার দশক ? এর সঙ্গে তুলনায় ইউরোপের রেনেসাঁস, বুদ্ধির মুক্তির, বিজ্ঞানের উন্নতির ও পরবর্তী শিল্প ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব-গুলির ভিতর দিয়ে তার অগ্রগতি—ভাবতে গেলে মনে হয়, আমাদের গতি কত দ্রুত! অথচ, আজও কত মন্থর! কি যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা! যাক্ সে কথা।

১৯৩০ সালে জেলে গিয়েই আমরা বুঝতে পারি—শীঘ্র মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর দেশ চলছে এক বিরাট ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে। দেশকে যেখানে দেখে এসেছি, কয়েক বছর পরে গিয়ে সেখানেই তাকে আমরা পাব না। কোথায় পাব ? কি করব আমরা তখন ? বুঝবার জন্যে যেমন গভীর ধ্যানে ধারণা, তেমনি পড়াশুনা শুরু করি—কি পদ্ধতিতে আমরা এতকাল চলেছি ; আজকের দুনিয়ায় কোন্ মত আর কোন্ পথের প্রাধান্য ; এবং দেশের অবি-সম্বাদী নেতা গান্ধীই বা কি চান, কোন্ পথে নিয়ে চলেছেন দেশকে—জানতে হবে, বুঝতে হবে। বিপ্লবের অব্যাহত ধারা বেয়ে চলতে গিয়ে এতকাল আমরা নোঙরে নৌকা বেঁধে একই জায়গাতে দাঁড় ফেলে মরছিনে—নদীর বাঁকে বাঁকে প্রবাহ প্রশস্ততর হয়েছে ; স্রোত আর তরঙ্গও তুমুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কম্পাস দেখে বুঝতে চাই, যে লক্ষ্যে চলেছি তাতে কোন্ বাঁকের কোন্ ধারাপথ ছেড়ে কোন্ ধারায় তরী বাইবো। তারপর তুফান উঠুক, হাল ভাঙুক—শুধু দেশকে এগিয়ে নিতে তার জনগণের সঙ্গে চলতে হবে, জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে। তাই গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যা করব ইতিপূর্বে "স্বাধীনতায়"

বলেছি—তাই করেছি—অস্ত্র বিস্ফোরক সংগ্রহে, ব্যবহারে সামিল হয়েছি।

তারপর বুঝতে চাই, সেদিনের দুনিয়া কোন্ পথে বিপ্লব চায়—বুঝতে চাইলাম সোশ্যালিজম্, কম্যুনিজম্, মার্কসিজম্, লেনিনিজম্। সুবিধা জুটে গেল: ভারত সরকারের অতি গোপন সার্কুলার দেখলাম পশ্চিম পাঞ্জাবের এক জেলে—ঐ সব বিষয়ে কোনো সাহিত্য যেন রাজবন্দীদের হাতে না পড়ে। অত্যন্ত কড়া নির্দেশ। অল্পদিনেই বুঝলাম, কি ভাঁওতার সাহায্য নেয় বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিক—ওরা জানে, যত কড়া ওদের নির্দেশ, ততো কড়া নেশায় ধরবে এই সব বন্দীদের। এদিকে, জেলে ঢুকাবার বেলা দিব্যি জেগে ঘুমোয়। আমরা চাই রীডের "Ten Days that Shook the World". প্রত্যেক বই সম্বন্ধে বোকা সেজে সংক্ষিপ্ত পরিচয় চায় আমাদেরই কাছে। আমরা লিখে দিই: একটি সিনেমার গল্প। বইখানি এসে গেল। হাজার হাজার টাকার এমনি সব বই এসেছে জেলে, আন্দামানে আর বিভিন্ন ক্যাম্পে এই উপায়ে এবং এমনি সব নানা উপায়ে। সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন দেশে কয়েক শতাব্দীর অচেনা অজানা যে দুর্ধর্ষ চরিত্র সৃষ্টি করেছে মৃতপ্রায় জাতির ভিতর ১৯৩০ সাল থেকে, তা দেখে আঁৎকে ওঠে ইংরেজ জাত। পাঠায় বাংলা শাসন করতে ধুরন্ধর স্যার জন অ্যাণ্ডারসনকে। ঐ চরিত্রের বিনাশে অন্য যে কোনো অশুভই নগণ্য অশুভ—lesser evil বলে অ্যাণ্ডারসনী সরকার বুঝে নিয়েছিল। তাই অ্যাণ্ডারসনের অ্যাণ্টি টেররিস্ট ক্যাম্পেন বহুমুখী অস্ত্রের একটি হিসাবে আবিষ্কার এবং ব্যবহার করে এই সাম্যবাদী সাহিত্য। অমানুষিক নিপীড়নের সঙ্গে—কর্মীর উপর দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও তার পরিবারের উপর—অনেক সময় প্রতিবেশীর সাহায্যে সকল রকম নিগ্রহের সঙ্গে—সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিক্ষা পুস্তক সিনেমা, গানবাজনা, খেলাধুলো প্রভৃতি জাতির বহুমুখী অমূল্য সম্পদের বিকৃতির ভিতর একটি হিসাবে ব্যবহার করে সাম্যবাদী সাহিত্যেরও বিকৃতি—বিকৃত সংকলন ও বিকৃত ব্যাখ্যা।

দল ভাঙাভাঙি বহু চলে। বহু চর এই উদ্দেশ্যে কাজ করে জেলে, বন্দীশালায়, আন্দামানে। তার রেশ আজও মিলিয়ে যায়নি সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে। সেদিন ইংরেজ সরকারের স্বার্থে যা চলতে দিয়েছে, তা-ই চলেছে, যা দেয়নি, তা চলেনি। এর কুয়াশা আজও কাটেনি। শহিদস্মৃতি তর্পণে পর্যন্ত আজও অনেক শহিদের স্থান হয় না—ভুলবশে নয়, বেশ গণে গণে। প্রচারের পথ ইংরেজ সরকার ধরেছিল suppressio veri, suggestio falsi—

সত্যকে চাপা দাও, মিথ্যার ইঙ্গিত তুলে ধর। যে-নাম, যে-ঐতিহ্য গৌরবের, তাকেই করে তোলো গ্লানির। এই বিকৃতির পথ যেমন সেদিনও ছিল অনেকের পক্ষে সুগম পথ, আজও তা-ই রয়ে গেছে যার যার নিজের ধন্দায়, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে। তাই ইতিহাসের অগ্রগতি বুঝতে সন্দেহে থম্‌কে দাঁড়াতে হয় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়।

যাই হোক—উপস্থিত আমাদের সুযোগ জুটলো ; আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে চাইলাম। সেই সেণ্ট সাইমন, প্রুধঁ, বাকুনিন থেকে শুরু করে মার্কস্, লেনিনের মতামত বুঝতে চেষ্টা করলাম ; আর সেই খ্রীষ্টপূর্ব স্পার্টাকাস আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৮৩০, ১৮৪৮ এর প্রায় ইউরোপ জোড়া বিপ্লব চেষ্টা ; প্যারি কম্যুন হয়ে অ্যানার্কিস্ট, পপ্যুলিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলন শেষে মেনশেভিক, পরে বলশেভিক বিপ্লব এবং লেনিন, ট্রটস্কি, স্ট্যালিনের হাতে বিপ্লবী রুশিয়ার সংগঠন বুঝতে যতটা পারি পড়াশুনো করে চলি। বুঝি, সে যুগে অনেক দেশে সাম্যবাদের ভিতর বিপ্লবী সম্ভাবনা প্রচুর। আবার এ সন্দেহও আমাদের মনে এল : ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা দুনিয়াতেই এসেছে অল্পবিস্তর একটা ক্ষিপ্র গতি—যাতে কম্যুনিস্ট বিপ্লবপন্থা দুনিয়ায় প্রসারলাভ করবে। কিন্তু ও থেকে আর যা সংগঠন হবে তা বিভিন্ন দেশে সেই সব দেশের ইতিহাসের সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারার সঙ্গে—কতক বর্জন করে কতক মিশে গিয়ে থিসিসে, অ্যান্টিথিসিসে কোথাও সংঘাতে, কোথাও ওতপ্রোত হয়ে অবশেষে কিছুকালের মতো এক বিরাট সমন্বয়ের যুগও আসছে। মনে হল, সমন্বয় আসছে, সাম্যবাদের অনেকটা ছেড়ে গান্ধীবাদের অনেকটা নিয়ে।

গান্ধীবাদও সাধ্যমতো বুঝতে চেষ্টা করি ; তা নিয়েও পড়াশুনা করি। তাতে বুঝি, গোঁড়া গান্ধীবাদও আজকের দুনিয়ায় অচল। ওকেও অন্ততঃ যন্ত্র-বিরোধিতা ছাড়তে হবেই। সেই প্রাচীনকালের গ্রাম্যজীবনের মানকে আজকের জীবনে আদর্শ করার কথা ভুলতে হবেই। ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলন আর গান্ধীবাদী আন্দোলনের ভিত্তিভূমি স্পষ্ট করে দেখতে চাই—দেখি, সাম্যবাদীরা একটা গোটা আন্দোলনের ভিত্তিভূমিকেই পরীক্ষার খাতা টোকার মতো করে টুকেছে, কাজেই জীবন-পথে ওদের কোনো সম্বলই জোটে নাই—টুকে পাশ করা ছেলেদের মতো। দৃষ্টান্ত শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলে। অথচ, কখনও বুঝতে চেষ্টা করে নাই, ভারতবর্ষে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কোথায়। ফলে

দাঁড়িয়েছে কি ? নানাদলে বিভক্ত কম্যুনিস্টরা যাদের শ্রেণীসচেতন দল ধরে, তারা সব কেরানী জাতীয়—clerical classes. বিশ পঁচিশ হাজার শ্রমিকের মিছিল পেছনে ছুটলেই সেটি শ্রেণীসচেতনের দল হয়ে ওঠে না। কারণ, নেতারা ওদের শ্রেণী চেনান না, চেনান পয়সা—আরও বেশি পয়সা। শ্রেণীসচেতন করার উপার কি ?—না, কর ধর্মঘট, কর সাধারণ ধর্মঘট—দু'টাকার জায়গায় ন'সিকে মাইনে হবে। শ্রমিকের হয়ে ওঠে ঐ কেরানী-আদর্শের জীবন, আর জীবনের মান—ফর্সা জামাকাপড়। সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি। ছাত্র-শিক্ষকরাও দলে পড়ে ঐ হয়ে উঠছে—ঐ আদর্শ, ঐ মান। শ্রমিক ছাত্র-দুই-ই হারাচ্ছে তাদের নিজস্ব বিপ্লবী চরিত্র : কোনো লক্ষ্য, কোনো আদর্শের জন্যে মরিয়া চরিত্র—যা হবার হবে, ভাববার ক্ষমতা।

ভারতের সর্বপ্রথম শ্রমিক কর্মী জামসেদপুরের মণি ঘোষ শ্রমিককে তার স্বাধিকার আর পারস্পরিক সহযোগিতার বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে সর্বহারা উৎপাদকের নতুন সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে শিক্ষা দিয়ে বস্তিতে বস্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলছিলেন ১৯২৮ সাল পর্যন্তও। ইতিমধ্যে, ১৯২৬ সালে আজমীঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশী প্রভাবে এবং অর্থানুকূল্যেও প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্টদল "শ্রমিক কৃষক দল" নামে ;—এল দু'টাকার বদলে ন'সিকের আদর্শ, আন্দোলন আর ধর্মঘটের ঝোড়ো হাওয়া। লোভের ঝঞ্ঝায় শিক্ষার, সচেতনতার ধীরতা ধুলো হয়ে দিগন্তে উড়ে গেল। তারপর সর্বহারার দল যা গড়ে ওঠবার উঠেছে এদেশে। ওদেশে যারা মন্ত্র পেয়েছিল : শিকল ছাড়া তোমাদের হারাবার মতো কিছু নেই। এখানে তারা তর্ক করবে—আছে না ? ফর্সা জামাকাপড় ? তার জন্যে ন'সিকে যেখানে পাবে, সেখানে যাবে ;—যা করে মুসোলিনি দাঁড়িয়েছিলেন ইটালিতে। আর, এই ধরনের শ্রেণী সচেতন সব দলের নেতাদের পাল্লায় পড়ে ক্রমবর্ধমান বেকাররা হয়ে উঠছে মার্কস্ যাদের বলেছিলেন lumpen proletariat, কার্লাইলের ভাষায় ragtag and bobtail—কর্মে উদাসীন, অপরাধপ্রবণ, পরিবারবিদ্বেষী, সমাজবিদ্বেষী ভবঘুরের দল—দারিদ্র্য যাদের গা-সওয়া—যে কোনো উপায়ে রাতারাতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার ফিকিরে ঘুরছে। ঠিক ঐ কেরানী চরিত্র। বামপন্থী বলে যে কয়টি দল গড়ে উঠেছে প্রায় সব এই কেরানী চরিত্রের দল।

এই সব উপদলের কোনো কোনোটি বর্তমানে একটি অত্যন্ত সরল পন্থা খুঁজে পেয়েছে অস্ত্রবলে আর নীতিহীনতায় পরাক্রান্ত চীনে। সেখান থেকে

তারা চেঙ্গিস, কুবলাই, হুলাগু খাঁর মতো ঝড়ের বেগে এসে ভারতে প্রবলদের ঠাণ্ডা করে দিয়ে কম্যুনিস্ট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাবে। এ-বিশ্বাসও আছে—যারা আজ আন্দামান নিকোবরসহ সমগ্র দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় কোনো না কোনো প্রাচীন বা কাল্পনিক যুগের সাম্রাজ্য ফিরে চাইছে বা অস্ত্রবলে দখল করার হুমকি দিচ্ছে, তারাই আবার এসে ভারতে মুক্ত মানবের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে সুড় সুড় করে পিকিং প্রত্যাবর্তন করবে। বেজায় সোজা ফরমুলা। খুব মনোরম তাদের কাছে সচেতন ভারতের শক্তি গড়ে তোলার চরিত্রবল নেই যাদের; স্বাধীনতার জন্যে যারা জীবনে তিলেক দুঃখত্যাগ সহ্য করেনি বা মুহূর্তের একাগ্র, সর্বসমর্পিত ধ্যানও করেনি, তাদের দিবাস্বপ্নের এর চেয়ে শক্ত ভিত্তি কোথা থেকে জুটবে? এমন অসার, উদ্ভট, ধারকরা শ্রেণী সংগ্রামবাদের কথায় "লালচীন সালাম" পোস্টারের মতো পথের জঞ্জাল ছাড়া আর কি সঞ্চয় আনতে পারে? এসব সরে গেলে সাম্যবাদের সঙ্গে গান্ধীবাদের সমন্বয় এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে ভারতের ইতিহাসকে। কতদূর পর্যন্ত চলবে তা আজও অজানা। চলতে চলতে স্পষ্ট হবে—আমরাও চলব, ইতিহাসও চলবে। চলার বুদ্ধি থামলে ইতিহাসও থেমে যাবে—এদেশের ঐ মার্ক্সিস্টদের হিসাবে যেমন হেগেল-মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টিক্‌সও থেমে বসে আছে; চলে কখনও বা চলেছে লেনিন স্টালিন, আর ইদানীং খ্রুশ্চেভ সুসলভের, অপরদিকে মাওৎসে তুঙের অনুজ্ঞায়। ঐসব মস্তিষ্কসমবায় ভারতের ইতিহাসে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের অগ্রগতিকে থামতে বললে থেমে যাচ্ছে; চলতে বললে, যখন যেভাবে বলছে, সেইভাবে চলছে।

পরের কথা আগে বলেছি। আবারও বলছি: ১৯৪১ থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত জেলে বসে কিন্তু দেখলাম, গান্ধী চলমান—বলছেন, যারা বলে, আমি যন্ত্রবিরোধী, তারা আমার মত বুঝতে চায় না, শুধু ক্যারিকেচার করে। আমি শুধু বলি, যন্ত্র মানুষের দাস হবে, মানুষ যন্ত্রের দাস হবে না: এ তো সমাজ-ব্যবস্থা বদলের কথামাত্র। সাবরমতীর নদীর স্রোত সাগরমুখী চলে—চোখে পড়লো। গান্ধীবাদের সঙ্গে যেন আমাদের সামঞ্জস্য চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের পরে ঢেউ সৃষ্টি করে সাগর যেমন দিগন্তে বিলীন হয় সীমাহীন আকাশে, আমাদের বিপ্লবধারাও যেন এইবারে তেমনি মিলিয়ে যেতে চাইছে গান্ধী-আদর্শের সঙ্গে। যে-বিপ্লবের কল্পনা আমাদের ছিল সে-বিপ্লব বিদ্রোহের পর বিদ্রোহের নরমুণ্ডের সঙ্গে নরমুণ্ডের মালা গেঁথে গেঁথে চলে;

বিদ্রোহান্তে সৃষ্টির পরে সৃষ্টির ফুল গেঁথে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক সচেতনতা, বৈপ্লবিক সংগঠন। সংগঠনের পরে আবার বিদ্রোহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়, বিপ্লবেরও তেমনি ঐ তিনটি স্তর। বিপ্লবে মানবচরিত্রের উন্মেষ। গর্কি রুশিয়ার ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ নিয়ে যেমন তিনখানি উপন্যাস লেখেন, ১৯১৭ সালের বিপ্লব নিয়ে তেমনি তিনখানি নাটক লিখতে শুরু করেন: দু'খানির বেশি লিখে যেতে পারেননি। ঐ দু'খানিতেই বিপ্লবের আগের আর বিপ্লবযুগের চরিত্রের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। এ তো আমাদের জীবনেরও অভিজ্ঞতায় দেখা। এমনি স্রোত চলে। সেই স্রোতে আজ আমরা এসে পাচ্ছি এক সমাজের আদর্শ হয়তো গান্ধীবাদের শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শই; সেই আদর্শের জন্যে চাই এক নবতর মানব চরিত্র। আজকের বিপ্লব আর, বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া—এই সবের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠছে সেই চরিত্র। সেই চরিত্রের মানুষের সমাজের দিকেই আমরা চলেছি।

ফিরে যাই সেই পুরোনো কথায়। এই তৃতীয়বার জেল থেকে আমরা মুক্তি পাই ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে। এরপর ৯ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় আমাদের নতুন নীতি: এইবারে কংগ্রেসে সচেতন কৃষক শ্রমিকের বৈপ্লবিক শক্তি সমাহিত করে কোনো আলাদা সংস্থা নয়, কংগ্রেসকেই গড়ে তুলব বিপ্লবী সংস্থা করে। ইতিহাসের প্রবাহ থেমে নেই। এসে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ওয়ার্ধায় ডাকলেন গান্ধীজি আমাদের। গেলাম চারজন—হরিদা, মধুদা, মনোরঞ্জনদা আর আমি। গান্ধীজির প্রশ্ন: এখন কি করণীয় তোমরা ভাবছ? আমিই মুখ খুলি। বলি, এই যে বামপন্থীরা বলছেন, England's danger is our opportunity—ইংল্যাণ্ডের বিপদেই আমাদের সুযোগ, এটা আমরা মনে করি, ধারকরা কথা; এবং না বুঝে ধারকরা। সিনফিনরা এ রব কবে তুলেছিলেন? ১৯১৪ সালে নয়; ১৯১৬ সালে যখন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙতে শুরু করেছে আয়ার্ল্যাণ্ডের, ইংল্যাণ্ডের, সারা দুনিয়ারই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেলা দেখেছি—একটা বড় যুদ্ধের দিনে প্রথমটা আমাদের দেশের মতো কাঁচামাল তৈরির দেশে, দেশের জিনিস বেশি দামে বিকোয়, বাইরের জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়, সাধারণ লোক খুশি থাকে। কোনো গণ-সংগ্রামের সময় সে নয়। কিন্তু লড়াই কিছুকাল চলার পর দেশের জিনিস বাইরে যেতে পারে না বলে তার দাম কমে, বাইরের জিনিস আসতে পারে না বলে তার দাম বাড়ে। সাধারণ লোকের হয় তখন বিপদ। দুর্গতি চলতে

চলতে প্রাচুর্যের ভিতরও দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু সত্যিকার দুর্ভিক্ষ এসে পড়লে আর মানুষের কোনো উৎসাহ থাকে না ; বরং কপালের দোষ দিয়ে মরে তবু কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ঠিক তার আগে—on the eve of the famine হচ্ছে দেশ জোড়া বিপ্লবের সময় ও সুযোগ। তার জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মনোরঞ্জনদা এর সঙ্গে যোগ করেন—পথ জুড়ে থাকবেন না ; যদি মনে করেন নেতৃত্ব দিতে পারবেন, সে কথা স্পষ্ট করে বলুন। আর, যদি তা না মনে করেন অল্পবয়স্করা হৈচৈ করছে, তাদের হাতে ছেড়ে দিন, যা পারে, করবে। বিষাদকরুণ কণ্ঠে গান্ধী বলেন, দেখ, বিশ বছর আগে আমার যে স্বাস্থ্য ছিল, উদ্যম ছিল, সর্বোপরি, নিজের উপর যে আস্থা ছিল, আজ আর আমার তা নেই। তখন অন্দোলন বানচাল করতে ওরা যদি কোথাও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা জাতীয় একটা কিছু ঘটিয়ে বসতো, আমার বিশ্বাস ছিল, নিজে ছুটে গিয়ে যা হোক্ একটা কিছু সুরাহা করতে পারবো। আজ আর সে বিশ্বাস আমার নিজের পরে নেই। তবু যাও তোমরা, আশা হারিয়ো না। দেখি, কি করতে পারা যায়। চুপচাপ বসে শুনছিলেন জওহরলাল, আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বাইরে মাঠে অপেক্ষা করছিলেন জয়প্রকাশ, রামমনোহর, অশোক মেহতা, আর তাঁদের সে যুগের সি এস পির দল। পর পর এক এক দলের সঙ্গে আলোচনা চলবে ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার আগে।

ফরোয়ার্ড চালাই তখন। প্রতি সপ্তাহে প্রধান আলোচ্য—কি করে সেই দিনের পরিবেশে হতে পারে এক নিরস্ত্র জনতার বিপ্লব-অভ্যুত্থান। আমাদের পুরোনো পন্থায় সম্ভব নয়। কম্যুনিস্টদের পন্থা তো ধর্মঘট, স্ট্রাইক, হরতাল। আজকের দুনিয়ায় ওর যা পরিণতি তার পরিচয় পেয়েছি বিশেষ করে মুসোলিনির ইটালিতে, পরে হিট্লারের জার্মানিতেও। অথচ আমাদের সনাতন দেশের কম্যুনিস্টদের পাথুরে মাথায় ওর বেশি আসবে না—কারণ, মার্কসের, লেনিনের মতামত ওরা বুঝেছে 'ক্যাপিটাল' দূরের কথা, Eighteenth Brumaire এর মতো কোনো গোটা লেখা থেকে নয় বা মার্কস্‌কে লেনিন যেভাবে বুঝলেন এবং রূপান্তরিত করে রূপ দিলেন তা বুঝে নয় ; ওঁদের লেখার বুকনির সংগ্রহ থেকে। কিছুকাল পরে তো ওরা স্টালিনের রুশস্বার্থের ডায়ালেক্‌টিক্‌সের ধারায় ইংরেজের যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধ বলেই ঘোষণা করে বসলো। গান্ধীপন্থাই বা কতটা চলে বা কিভাবে চলে ঠিক বুঝে উঠছিনে। নিজেরা আলোচনা চালাই।

একটি কথা যেন দূর থেকে ছায়ার মতো পড়ছে নিজেদের মনের পরে। গান্ধীর কথার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে। নিরস্ত্র এতবড় একটা জাত যদি বিপ্লবোত্থান চায় কি করে হতে পারে তা? অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করা যায় না, তা নয়। চট্টগ্রাম ১৯৩০ সালে তার একটা উপায় চিনিয়ে গেছে। কিন্তু দেশজোড়া বিপ্লব হবে এপথে? হতে পারে বড় জোর একটা বিদ্রোহ, একটা ক্যু (Coup)। আমাদের বহু প্রাচীন ইতিহাসের দেশ—অত্যন্ত জটিল ইতিহাসের এদেশ বিভক্ত ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা প্রভৃতির অসংখ্য বিভাগে। এদিকে অভিজ্ঞতা আমাদের তিক্ত সেই অসহযোগ আন্দোলনের দিন থেকে: আমাদেরই একান্ত আপনার লোক শ্রদ্ধেয় নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী ক্ষেপিয়ে তুললেন মালাবারের মোপ্‌লাদের। আমার কাছে রিভলভার চেয়েছিলেন। পারি নাই দিতে; ১৯১৬-১৭ সালের যুগের যা ছিল, তা কোথায় কোনটা কার হাতে পড়েছে তার সন্ধান পাইনি। উদ্‌ভ্রান্তভাবে অস্ত্রের সন্ধানে মাদ্রাজ শহরে এসে পলাতক নীলকণ্ঠ ধরা পড়ে যান। আর সুযোগসন্ধানী সাম্রাজ্যবাদী এক সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত আর দাঙ্গার রূপে পরিণত করলো তাঁর গণ-অভ্যুত্থান প্রয়াসকে।

জাগরণের অভাব যতটা, তাকেই মাত্র মেটাবার চেষ্টা হয় অস্ত্র দিয়ে। কিন্তু নিদ্রা যেযুগে ছিল অসাড় সেই যুগে জাতের ভিতর চমক জাগাতে অরবিন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন বোমা পিস্তলের সাহায্য নিতে। পরের যুগে তন্দ্রালস জাগরণকে আঘাত হানতে যুদ্ধ করে মৃত্যুযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে যুদ্ধের যুগের উত্তেজনা মিশে জনজাগরণের উষায় গান্ধী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ চিনলেন। আর, এই বিস্তৃতিকে গভীরতা দিল সূর্য সেনের যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে—আন্দোলনের বিস্তৃতি আর গভীরতার যুগেও কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে—জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ শ্রেণীরও অধিকার বোধ না জেগে পারে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চাইনে আমরা; বিদ্রোহ চাইনে, ক্যু (Coup) চাইনে—চাই বিপ্লব; ভারতজোড়া সমগ্র জনসমুদ্রকে জোয়ারের টানের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে উত্তাল করে তুলতে হবে। কোথায় চলে যাবে ভেসে সে জোয়ারের বন্যায় রাজনৈতিক দাসত্ব! দূর থেকে ছায়ার মতো এই ছবি পড়ে আমাদের মনের পরে। কোন্ শক্তিতে তুলতে পারে অমন করে সমগ্রকে? আর কিছু নয়, শুধু সমগ্রের অধিকারবোধ আর মুক্তির দাবি। সূত্র কি? উপায় কি? জানিনে, বুঝিনে। শুধু বুঝতে চাই—ফরোয়ার্ডে সেদিন তাই বলি—বিপ্লবের মূলে কি তা বুঝি। সূত্র কি—তা খুঁজে পাচ্ছিনে। কিছুদিন

পরে তা পাই; গান্ধীজিই পান। কি করে পান, কি সে সূত্র—সেই কথাই বলছি এইবারে।

মৌলানা আমাদের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করেন কলকাতায়। তিনিও স্বীকার করেন, আমি বা নেহরু বা আর কেউই ঠিক বুঝছিনে; এইটুকু কেবল বুঝি, গান্ধী না হলে আমাদের দিয়ে কোনো গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়।

এর পর যা বলছি, তার ভিতর যেমন আগেও করেছি, তেমনি কিছু কিছু পরবর্তী ঘটনাকে আগে টেনে এনে গান্ধী-বিপ্লবপন্থাকে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। আমরা চলতে চলতে তখন যা ভেবেছি, তাতে ছিল সেই পন্থার অস্পষ্ট, ঈষৎ ইঙ্গিত মাত্র। আমরা—আমি আর অরুণদা—ভাবি আর বলাবলি করি এই যে গান্ধী ছাড়া দেশে কোনো সত্যিকার গণ-আন্দোলন সম্ভব নয় তার কারণ এই: এই মানুষটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন প্রতিটি দিকে বিপ্লবের পথে, বিদ্রোহের পথেও নয়, সংস্কারের পথেও নয়। এই যে সহস্র বৎসরের অচ্ছুত আমাদের—শ্রীচৈতন্যদেবের পথে শুধু তাঁদের সঙ্গে একত্র বসে খাওয়া দাওয়া করে বৈষ্ণবদের মতো আর একটা সম্প্রদায় খাড়া করতে চাইছেন না; মন্দিরের দরজা খুলতে হবে ওঁদের জন্যে—বলে আত্মসম্মানবোধ জাগাতে চান ইনি। বিপ্লবের পথ তো এই আত্মসম্মানবোধ জাগানোর পথই। মুসলমানকেও পেতে হবে—শুধু তাঁর ধর্মকে না বুঝে মুখের সম্মান স্বীকৃতি জানিয়ে নয়—হিন্দু মুসলমানে মিলন না হলে স্বরাজ হবে না বলে। কেন স্বরাজ হবে না? বিপিন পাল তো বলেছিলেন—বাদ দিয়ে চল না ওদের, নিজের গরজেই আসবে ওরা—চার ভাগের একভাগের বেশি তো নয়। কিন্তু গান্ধী চাইলেন দেশজোড়া, সমগ্র সমাজের অঙ্গজোড়া বিপ্লব—চাইলেন মানুষের মনের গভীরে রয়েছে যে-ব্যাধি, সেই ব্যাধিকে সমাজ দেহের গায়ে ফুটিয়ে তুলে তাকে নির্মূল করার পথ। এই পথই বিপ্লবের পথ।

বিপদ আছে এপথে—হয়তো সাংঘাতিক বিপদই। যেমন আম্বেদকর (পরবর্তী দিনে) অসহিষ্ণু হয়ে নিয়ে নিলেন এক বিদ্রোহের পথ—বললেন, সব অচ্ছুতরা, মাহাড়রা হিন্দুসমাজ ছেড়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কর। যেমন, জিন্না (পরবর্তী দিনে) অসহিষ্ণু হয়ে নিলেন এক বিদ্রোহের পথ—আমরা ভিন্ন জাতি, nation—এবং চাইলেন—ভিন্ন দেশ—পাকিস্তান। অবিপ্লবীর চোখে চরম বিপদ, শেষ বিপদ। বিপ্লবী গান্ধীও এ বিদ্রোহে ভেঙে পড়লেন। নিঃশেষ হয়েই গেলেন

তাঁর বিপ্লব ধর্মের অনুসরণে। তাঁর বিপ্লবী আত্মা দেখেছিল ভিন্ন আদর্শ—সে আদর্শ হয়তো শুধু ভারতীয় মানব-সমাজের মুক্তির দাবিতেই শেষ হয় নাই—আরও বিরাটতর সার্থকতা খুঁজেছিল—হয়তো ভারতীয় বিপ্লবনেতার নিজের অন্তরেরও অজ্ঞাতে।

কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মানুষ সে চোখে দেখতে পারে না, দেখতে চায়ও নাই। তারা মুসলমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতেই কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো; সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসলো। গান্ধীজি তখনকার দেশের জাগ্রত বা অর্ধজাগ্রত অধিকাংশের দাবিকে অস্বীকার করতে পারলেন না। এই এল তৃতীয় পক্ষের—সুযোগসন্ধানী সাম্রাজ্যবাদীর সুযোগ। ভারত দুই ভাগ হয়ে যাক, ওদের কি আসে যায়? বরং অতীতের প্রয়োজন মেটাতে সেই ১৮৫৭ সাল থেকেই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আর, এখনও দেখলো, দুই ভাগ যদি হয়ে যায়, সুবিধাই হবে তার—নানা ধরনের সুবিধা। এর জন্যে দায়ী করি আমরা অনেকেই গান্ধীকে। দায়ী তিনি এই অর্থে যে, তিনি বিপ্লবী চেতনা—অধিকারবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন জাতির সর্বশ্রেণীর ভিতর। তারপর কিন্তু তিনি সমাধানের যে-সূত্র দিয়েছিলেন, তা দেশ নেয়নি—এমন কি, তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গরাও না।

সে সমাধানের সমান্তরাল সমাধান আমরা পাই রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে—যেপথে লেনিন পুরোনো জার সাম্রাজ্যের মধ্যএশিয়া প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলকে পৃথক হতে দেননি। ভারতের জিন্না ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মুসলমানের চেয়ে সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুগের মিত্র শক্তিদের সাহায্য পুষ্ট আনোয়ার পাশা ও তাঁর সশস্ত্র প্যান ইসলামিক দল বেশি ছাড়া কম শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু লেনিনের দেওয়া একটি সূত্র ঐসব অঞ্চলের মুসলমানের পৃথক হবার প্রবৃত্তিই অনেকটা নিরস্ত করে আনে। সে-সূত্রের মোদ্দা কথা এই: সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুকে বলবে—তোমরা ইচ্ছা করলে পৃথক, সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পার। তোমাদের ইচ্ছার কেউ বিরোধিতা করবে না। আর সংখ্যালঘু বলবে, পৃথক হয়ে দুর্বল হতে আমরা কোনোমতে রাজী নই। আমরা সম্পূর্ণ এক হয়ে একই রাষ্ট্রে বাস করতে চাই।

আমাদের কিন্তু হল বিপরীত—আমাদের সংখ্যালঘুই চাইলো পৃথক হতে, দরকার হলে বিদেশীর সাহায্যে; আর, সংখ্যাগুরু চাইলো সংখ্যালঘুকে একত্র ধরে রাখতে—প্রয়োজনে জোর করেও। তার ফল যা ফলবার ফললো। লেনিনের কথা হয়তো গান্ধী ভাবেন নি। যতীন মুখার্জি, সূর্য সেন, আরও

অনেকের কথা এখানে তুলব না। লেনিন আর গান্ধী—এই দুটি মানুষকেই দৃষ্টান্ত ধরে একটি কথা বলবার আছে এখানে। প্রতিটি মানুষের অধিকারবোধ, আত্মকর্তৃত্বের অধিকার যে চেতনায় জাগে সেই চেতনাই বিপ্লবী-চেতনা। আর, এই চেতনা যে মানুষের সর্বচিন্তার, সর্বকর্মের প্রেরণার উৎস, সেই মানুষটিই বিপ্লবী। এই জন্যেই লেনিন আর গান্ধী এই দু'টি মানুষ বিপ্লবী। তাই সংখ্যালঘু সমস্যার ঐ একই সূত্র—লেনিনের ঐ সূত্রের মর্মকথা গান্ধীজির চোখে ধরা দিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতাদের, অন্তরঙ্গদের চোখে নয়। গান্ধীর ঐ দৃষ্টির আভাস আমরা পাই ১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব ফেঁসে যাওয়ার পর ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেখানে। এটি গান্ধীরই রচিত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের কোনো অঞ্চলের লোকের সমবেত দাবি যদি হয় পৃথক সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্র, কংগ্রেসের সেখানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার কোনো কথা চিন্তাও করা চলে না। প্রতিবিপ্লবী ভারতের কাগজ বললো, এটা মুসলিম তোষণ-নীতি। গান্ধীজির সহযোগীরাও প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেননি। একমাসের ভিতর এ. আই. সি. সির সভায় জগতনারায়ণলাল প্রস্তাবে গান্ধীজীর প্রস্তাব নাকচ করে' দেয়। সংখ্যালঘুর পৃথক রাষ্ট্রের অধিকার নীতিহিসাবেও অস্বীকৃত হল। জাগ্রত সংখ্যালঘুর আত্মসম্মানের পক্ষে এটা বিষম গ্লানিকর। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বিষবৃক্ষের একদিকে মুসলিম লীগের বাড়াবাড়ি অপর দিকে—নাথুরাম গোড্‌সের বীজ বপন হল।

কিন্তু এ বিচারের স্থান এখানে নেই। আমাদের শুধু বক্তব্য—মুসলমানের ভিতর অধিকারবোধ জাগাবার জন্যে গান্ধী দায়ী। কিন্তু যে সমাধান কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত চাইলো তার জন্যেও নয় এবং শেষ মুহূর্তে দেশ বিভাগ মেনে নেবার প্রস্তাবও গান্ধীর নয়। গান্ধীজি তখন এক পরিত্যক্ত নেতা, সম্পূর্ণ একক ; শেষে নোয়াখালিতে, বিহারে যে গান্ধীকে আমরা পাই, সে এক বিধ্বস্ত বিপ্লব নেতার আত্মা যেন নিজেকেই আবার খুঁজেপেতে গড়ে তুলতে চাইছে তার বিপ্লবী সত্তার অমর, অমোঘ বাণীতে—কি এমন আপদপাত হল ভিন্ন দেশে ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনে ? মানবসমাজের অঙ্গ থেকে তো বেরিয়ে গেল না। মানবসমাজ তো আজকের দুনিয়াজোড়া বিপ্লবের পর এক পরিবার হয়ে শান্তিতে বাস করবেই। তার ভিতরই হবে স্থান হিন্দুর তার হিন্দুত্বে বিশ্বাস নিয়ে ; মুসলিমের তার ইসলামের ধ্যানে ধারণায় সংহত হয়ে। তারা ভাই ভাই নয় শুধু, তারা একাত্ম। আমাদের ধারণায়—সকল 'নেতি' বিচারের শেষে পাওয়া এই বিপ্লবী গান্ধীর

বিপ্লব ধর্ম। কিন্তু এ রুদ্ধকণ্ঠ আত্মার আপন মর্মবাণী। আগেভাগে জন্মে যে বিপ্লব-ঋষি—তার এ-ই হয়তো পরিণাম। এর দৃষ্টান্ত এই একই নয় ইতিহাসে। কিন্তু গান্ধীর কাজের বিচার যাঁরা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন আছে। সমগ্র সত্তা দিয়ে যা পাইনি, তা দিয়ে বিচার চলে, বিশ্লেষণ চলে। কিন্তু তা দিয়ে বিপ্লবীর মৃত্যু বা জীবন কোনটাই বরণ করা যায় না, বুঝতেও পারা যায় না। সত্তা দিয়ে যা পাওয়া যায়, সেখানে বুদ্ধি, অনুভূতি, সংকল্প—সব এক হয়ে যায়—সেখানে কোনো জড়তা, আড়ষ্টতা, আচ্ছন্নতার, শিথিলতার, আবিলতার স্থান নেই।

এই বিপ্লবী গান্ধীর অন্তর্দৃষ্টিতে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে বিপ্লব পথের সংকটকালে ধরা দিল ঐ ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম। আমাদের সকল সন্ধানের শেষ মিললো যেন। ফরোয়ার্ডে লিখতে লিখতে কলম যেখানে অচল হয়ে এসেছে, সে কলমকে যেন ঠেলে একাজ এগিয়ে দিল একটি ইঙ্গিতে। আর কোনো বাধা রইল না। বাংলার প্রত্যেকটি কাগজই বিরোধিতা করছে—বুঝতে চাইছে না—বিরোধিতা করছে এই প্রোগ্রামের। কারণ, গান্ধী-বিরোধিতাই—ইংরেজীতে যাকে বলে প্যারাডক্স্—সেই অনুযায়ী বামপন্থা; আর, বামপন্থার সমর্থক না হলে কাগজ কাটে না সেদিনের আব-হাওয়ায়। প্যারাডক্স্ কোথায়? না, যে-গান্ধীচিন্তা চায় প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, তাই হল দক্ষিণপন্থা, প্রতিক্রিয়াশীল; আর, যে-পন্থা বলে—আমাদের ক্ষমতা দাও, আমাদের ডিক্টেটর বানিয়ে দাও, আমরা সুখ সুবিধা স্বাধীনতা যার যা প্রয়োজন বেঁটে দেব, তা-ই হল কিনা বামপন্থা! কি দোষ করেছেন তাহলে হিট্‌লার আর মুসোলিনি? এ-পিঠ আর ওপিঠ: এক ক্ষেত্রে আমি একলাই সর্বাধিনায়ক; অপর ক্ষেত্রে, আমাকে ক্রমাগত 'হাঁ-জি' বলার মতো, 'ডিটো' দেবার মতো—'ডিটো না দিলেই তরলীকৃত (liquidated)—কাজেই অবধারিত ডিটো দেবার মতো পাঁচজনকে পাশে রেখে সর্বাধিনায়ক! আমরা ফরোয়ার্ডে বলি এসব কথা। আর, মৌলানা আজাদ আলোচনা করেন প্রায় প্রতিটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের। তার এক এক কপি এমন কি, ভিজে প্রুফ কপি—নিয়ে যান ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার জন্যে। আমরা ভাবি: ফরোয়ার্ড ইংরেজী সাপ্তাহিক; এদেশে বেশি কাট্‌তির জন্যে নয়—ওর অজ্ঞাত লক্ষ্য—জাতির শিক্ষক দৈনিক কাগজ, তার দৈনিক চিন্তার আবিলতা দূর করতে সাহায্য করবে; তাকে নতুন চিন্তায়, নতুন আদর্শের ইঙ্গিত দেবে। কিন্তু

প্রায় সব কাগজের দৃষ্টি যে ঝাপ্‌সা করে রেখেছে সেদিন ব্যবসা বুদ্ধিতে; বামপন্থার বুক্‌নি না হলে যে কাগজ কাটে না সেদিনের অ্যাণ্ডার্সনের সৃষ্টি বামপন্থীদের বুক্‌নির আবহাওয়ায়!

ফরোয়ার্ড কিন্তু টানে কিছু সংখ্যক চিন্তাশীলকে। একটু গল্প অপ্রাসঙ্গিক হবে না; ফরোয়ার্ডের সেদিনের বক্তব্যও মোটামুটি বলা হয়ে যাবে। ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ "ক্যালকাটা রিভিউ"য়ের সম্পাদক। হঠাৎ এক অপরাহ্নে আমাদের এই বাড়ীতে উপস্থিত; ফাদার দঁতেইন সঙ্গে। উভয়েই অপরিচিত। ডঃ মুখার্জি দরজায় এসে বলেন, ফরোয়ার্ডের এডিটরের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। কি লেখা মশাই···অমন কাটাকাটা যুক্তি···। কিছুক্ষণ আলাপের পর বলেন, চলুন আমার সঙ্গে। নামে জানি; দূর থেকে শ্রদ্ধা করি অনেক বছর থেকেই। এখন নীরবে অনুসরণ। কতজনের সঙ্গে যে পরিচয় করান! সব আজ আর বলা সম্ভব নয়। ফাদার লালমাঁর বাড়ী একদিন। এই তিন ব্যক্তি ছাড়া উপস্থিত মাখনলাল সেন, সজনী দাস, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মল বোস, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধেন্দু ঠাকুর, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, ডঃ হেম রায়···আরও কে কে। মাখনবাবু জিজ্ঞেস করেন, ভূপেন, যাসব লিখছ, বিশ্বাস কর?

জবাব একটু উদ্ধত—বিশ্বাস যা করিনে, তা লেখার অভ্যাস নেই আমার।

—এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ থেকে দেশে বিপ্লব আসবে?

—বিপ্লব কেউ সৃষ্টি করতে পারে না; অনুকূল অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোথাও কখনও হয়ও না; কিন্তু বিপ্লব-নেতৃত্ব চুপ করে বসে থাকে না। তাকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হয়—লেখা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে, সময়োপযোগী ঘটনা ঘটিয়ে; এবং তারপর সময়ে বিপ্লবের রশ্মি হাতে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। এই যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ—এর ভিতর গোড়ার কথা ধরে নেওয়া হয়েছে—যিনি যেখান থেকে ভারতীয় বা প্রাদেশিক আইন সভার; কি এ, আই, সি, সির; পি, সি, সির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি সেখানকার স্থানীয় নেতা। এক একটা থানা অঞ্চলই ধরি—এঁদের সব প্রভাব রয়েছে সেখানে। একটি থানার লোকসংখ্যা ধরুন পঞ্চাশ ষাট হাজার। এঁদের সভায় এঁদের ডাক শুনলেন পাঁচ দশ হাজার। তাদের ডেকে বললেন, ইংরেজের লড়াইয়ে—এটা আমাদের লড়াই নয়, এটা ইংরেজের লড়াই; এ লড়াইয়ে সাহায্য দেওয়া আমাদের প্রয়োজনে নয়; ওরা আমাদের বাধ্য করছে;—

ওদের এ লড়াইয়ে একটি লোক দেব না, একটি পয়সা দেব না।

লড়াইয়ে যখন ইংরেজ বিপন্ন, এই তো তখন বিপ্লবের মন্ত্র। এই মন্ত্র এক এক অঞ্চলের লোককে শুনিয়ে এঁরা এক একজন ধরা দিলেন। এঁদের স্থান তখন নিলেন আরও উৎসাহী সব যুবক নেতা। একটি থানায় থাকে বিশ, পঞ্চাশ, একশ বন্দুক। বিপ্লবের নির্দিষ্ট দিনে এঁদের ডাকে এলেন দু'পাঁচ হাজার নির্ভীক উৎসাহী লোক। গুলি করে ক'জনকে মারবে? পঞ্চাশ? একশ? বাকীরা হাতিয়ারগুলি বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতায় ছিনিয়ে নিয়ে শাসনের চেয়ারে বসবে—থানা থেকে মহকুমায়, মহকুমা থেকে জেলায়, সেখান থেকে প্রদেশে। নিরস্ত্র বিপ্লবের এ-ই পথ, এই স্বরূপ। সব জায়গায় হয়তো হবে না। না-ই বা হল।

মাখনবাবুর আর সজনীবাবুর মতো বেশ সরব, অসামান্য তর্কপটু ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক! কিন্তু আমিই বা আমার বিশ্বাস ছাড়ব কেন? আমার মতে সায় আছে—বেশ বুঝি—ডঃ মুখার্জির, নির্মলবাবুর, প্রিয়রঞ্জনবাবুর, তারাশংকর-বাবুর, বিদেশী দু'জনারও এবং আরও কারও কারও। কিন্তু তাঁদের চোখ শুধু নীরব সমর্থনই জানায়। সারা ভারতের বিদ্যাবুদ্ধিজীবী আরও লোকের সমর্থনের আভাস পাই ১৯৪১ সালে আবার জেলে যাবার আগে ও পরে। আমরা জেলে যাবার পর, ফরোয়ার্ডে আমাদের সহযোগী এতদিন ছিলেন যতীশ ভৌমিক আর হেমন্ত তরফদার; তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত সুধীর ঘোষ, আরও কয়েক বন্ধু। আমাদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম দক্ষতা ও বৈপ্লবিক আস্থাবিশ্বাস নয় এঁদের—এঁরা যে বয়সে তখনও যুবক। এল ১৯৪২। এঁরাও ধরা পড়েন বা অন্তরীক্ষ থেকে বিপ্লবের শক্তি যোগান। মাখনবাবুও তখন তাঁদের একজন; তিনি কিন্তু ছিলেন বয়সে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অনেক বড়। ফরোয়ার্ড ইতিমধ্যে কয়েক বছরের মতো উঠে যায়।

জেলে বসে দেখি, চমৎকার পরিবেশ। আর, সেই পরিবেশে প্রধান বিপ্লবী সেনানায়ক গান্ধী রব তুললেন: দেশ ছাড়, ইংরেজ, ভারতে তোমার স্থান নেই, ভারত ছাড়। আর, তাঁর সহকারী সেনানায়ক আজাদ, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেহরুর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে তুমুল তাণ্ডব—বিপ্লবের সেনানায়কের ইঙ্গিতে সৃষ্ট তাণ্ডব। তার পরের ইতিহাসের এ প্রবন্ধে স্থান নেই। এখন কেবল আমাদের বক্তব্যটুকু বলবার আছে। ১৯২১—১৯৩০—১৯৪২—যেন বহুযুগের দুর্বল জাতিকে তিনটি স্তরে গান্ধী বিচক্ষণ সেনানায়কের মতো তৈরি করে নিয়ে

অবশেষে সংগ্রামক্ষেত্রে নামালেন। প্রথম শুধু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ—তার দুঃখত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয় স্তরে লবণ আইনের মতো সাধারণ আইন ভাঙা, তার শাস্তিও সাধারণ। কিন্তু তার পর? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এক পদক্ষেপে যেন বেজায় বেশি দূর। এখানে যুক্তি কিন্তু সংস্কার পন্থায় পাঁচ আর পাঁচের যোগে দশ নয়; বিপ্লব পন্থায় পাঁচ আর পাঁচের পূরণে পঁচিশ (অগ্রগতি arithmetical progression-এ নয়, geometrical progression-এ।)

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন × (পূরণ চিহ্ন) ভারতের পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সারাভারতের বিপ্লব চেষ্টা—সুভাষের যুদ্ধও এর সামিল—কিছু পরে এলেও যুদ্ধের ঐ কয়েকবছরের সশস্ত্র বিপ্লব চেষ্টার একই গোটা ইতিহাস, সেই ইতিহাসেরই অঙ্গ আই, এন, এর; সুভাষের পূর্ব এসিয়ার, পূর্ব-ভারতের লড়াই; ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন আর, সমগ্র বিপ্লবান্দোলন—এই দুইয়ের পূরণফল ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়" আন্দোলন। যে বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে ১৯৩০-এর আইন অমান্যের গণসংগ্রামের পূরণের কথা বলছি, সেই সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনের ভিতর আরও ধরে নিয়েছি ভারতের ইতিহাসে যে-অতুলনীয় মানবচরিত্রের পরিচয় দিয়েছে সেই সশস্ত্র বিপ্লবপ্রয়াস, সেই চরিত্র-মহিমার শক্তিকেও। আবার বলি, এই পূরণ ফলই ১৯৪২-এর গণ-সংগ্রাম। অর্থাৎ, ইতিহাসকে গান্ধী অস্বীকার করতে পারলেন না। সশস্ত্র প্রয়াসকেও এবার তাঁর স্থান দিতে হল। ১৯২২ সালে তা তিনি দেননি। এবারে সশস্ত্র বিপ্লব পন্থাকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি বলে গেলেন—যে যার মতো এগিয়ে যাও। তিনি গেলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে—সব কয়জন সহকারী সেনানায়কও সেই-সঙ্গে। অস্ত্রের, বোমার খেলাও যেমন চললো সারা ভারতে, অহিংস পন্থায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠাও তেমনি হতে রইলো মেদিনীপুরে, বালুরঘাটে, বালিয়ায় সাঁতারায়, আরও অন্যত্র।

বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় চতুর্থ বৎসরে যে দুর্ধর্ষ উত্তেজনা আর ক্ষুব্ধতা জেগে উঠেছিল তা-ও বিপ্লবে কম সহায় হয়নি। সে-ক্ষুব্ধতা কোন নীতি বাক্য, কোনো অনুশাসন মেনে অহিংস থাকবে মানবজাতির এমন স্নায়ু বা চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে? গান্ধীর দিনে দূরের কথা, আজও হয়েছে? বরং ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে চলে আজ সে এসেছে, কোনো নীতির চেয়ে মানুষের জীবন যাত্রার বাসনা এবং সেই বাসনার সৃষ্ট প্রয়োজন প্রবল—এই নীতিতে। এবং সে বাসনা পূরণে অপেক্ষা করা

চলবে না। যা পার এই মুহূর্তে ভোগ করে নাও—কারণ, কাল তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, ভোগের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসবে। মানুষের স্নায়ু যত ভাঙছে, এই উগ্রতাও অকল্পনীয় রূপ নিচ্ছে। দুনিয়াজোড়া সমগ্র ছাত্রসমাজ চঞ্চল; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত বেকার। এমনি সব স্নায়ু-ভাঙা, কেরানী চরিত্রের অধ্যাপক সার্ংরের—খুদে সার্ংরের—দলে দেশ ছেয়ে গেছে। এঁদের কাছে কোনো সুস্থ বিচার-বুদ্ধি আশা করা যায়? প্রতিক্রিয়ার এই এক দিক, নৈতিক দিক; আর এক দিকের কথা পরে আসছে, রাজনৈতিক দিকের কথা।

কিন্তু বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া কোথায় কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে, আর কোথায় কি করে তার শেষ—সে বিচারেরও স্থান এ নয়। জাতিকে গান্ধী যখন শেষ সংগ্রামের অনুজ্ঞা দিয়ে কারারুদ্ধ হলেন, তিনি মোটের উপর স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন আইন অমান্য আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন আর যুদ্ধের উত্তেজনা এই তিনের পূরণ ফলকে। আর সেই পূরণ ফলই দাঁড়ালো পাঁচবছর পরে ভারতকে ইংরেজ যা দিল, আর কংগ্রেস যা মেনে নিল সেই বিভক্ত দেশের স্বরাজ। এই স্বরাজের মানে গান্ধীজির কাছে স্বাধীনতা নয়—ভারতের পক্ষে স্বরাজের মানে নিজহাতে নিজের ভবিষ্যৎ—জাতির শক্তি, সামর্থ্য, স্বাধীনসত্তাকে তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় ফুটিয়ে তোলার অধিকার। সেই শক্তি সামর্থ্য আর সম্ভাবনাই আজকের দীনহীন ভারতকে আবার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অর্থে মুক্তমানবের, পূর্ণতর মানবের ভারতে, এক নতুন আদর্শে গড়ে-ওঠা ভারতে রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে এসে গেছে এক প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়ার কথাই আসছে। এই প্রতিক্রিয়া শেষে ভারতে যদি আবার কোনো বিপ্লবী-নেতৃত্ব দেখা দেয়, এই আদর্শই চালাবে সে-নেতৃত্বকে এক সার্থকতর বিপ্লবের লক্ষ্যে।

একটি কথা আমার এখনও বলা হয়নি—কি অর্থে আমরা নিজেদের বিপ্লবী মনে করি; আর গান্ধীকে সেখানে কি অর্থে সগোত্রে টানছি, তার গোড়ার কথাটুকু। সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবধর্মের মূলে রয়েছে অধিকারবোধ। ভারতীয়দের সে-অধিকার লুঠ করে নিয়ে বিদেশী আমাদের গোলাম করে রেখেছিল; নানা-ভাবে, নানা কারণে, সেই অধিকারের অভাববোধ শৈশবে একদিন সুপ্তির ঘোরে আমাদের বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। সেদিন অন্ধকারে পথ হাতড়েছি দংশনজ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে;—জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার কোনো বাঁধা পথ দেখাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। হাতের কাছে যা পেয়েছি, পড়েছি—পড়েছি বঙ্কিমের আনন্দমঠ; যোগেন বিদ্যাভূষণের ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি…। তার

পর বিপ্লবের পথে এসেছি অরবিন্দের দেখানো আলোতে। বিপ্লব কি—ভাবতে শিখছিলাম। বিপ্লবী কে?—চিনতে শিখছিলাম। তার পর সেই ঈষৎ জাগা মনে দেখছিলাম গান্ধীকে দূর থেকে সেই ১৯১৯-২০ সাল থেকে।

বিপ্লবী জীবনের মূল মন্ত্র চিনলাম:

"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

"ভক্তি।"

বুঝলাম, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকে আর বিপ্লবীতে তফাত কোথায়। আবার এই আলোকেই চিনতে শিখেছিলাম—কে বিপ্লবী। বিপ্লবীই বিপ্লবী চেনে। ইমার্সন বলেছেন পর্বত-শিখর থেকেই শুধু পর্বতশিখর দেখা যায়। আর, বিপ্লবী বিপ্লবীই, সে রাজনীতিক নয়। ক্বচিৎ কোনো ক্ষেত্রে বিপ্লবী আগে বিপ্লবী, পরে রাজনীতিক। রাজনীতিক বিরাট, রাজনীতিক বিচারশীল, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ। নেহরু রাজনীতিক, আজাদ রাজনীতিক, প্যাটেল রাজনীতিক, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজনীতিক। এঁরা বিপ্লবী নন; গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন এঁদের বিপ্লবের জন্যে নয়; ইংরেজের কাছ থেকে স্বরাজ আদায়ের জন্য। গান্ধীকে চিনলাম, গান্ধী বিপ্লবী; আর বিপ্লবীর ভিতর বৃশ্চিক-দংশনে যে কতখানি ক্ষ্যাপামি জাগাতে পারে তার পরিচয় পেলাম দেশের সর্বসাধারণের পর্যন্ত চোখে ফুটে উঠলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে—জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা যখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনে যুগান্তরের তরফ থেকে জার্মানীর সঙ্গে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, চম্পকরমণ প্রমুখের স্পষ্ট যে-সন্ধি হয় তার বিশেষ একটি শর্ত ছিল, কয়েকজন জার্মান অফিসার ছাড়া ভারত নেবে কেবল অস্ত্র আর অর্থসাহায্য; কোনো আক্রমণোদ্যত জার্মানবাহিনী (invading German army) ভারতের দিকে অভিযান চালাতে পারবে না। রাসবিহারী, সুভাষ যুগান্তরেরই লোক। তা সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনে জাপানের সঙ্গে তাঁরা এই ধরনের কোনো সন্ধি বা শর্তের দাবি করেছিলেন—এমন প্রমাণ আমরা পাইনি। সে যা-ই হোক, ভারত যখন ইংরেজের দাসত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে তখন আবার জাপান তার নবজাগ্রত অপরিসীম শক্তি-মদে মাতাল হয়ে কয়েকদিনে পূর্ব এসিয়া গ্রাস করে ভারতের দিকে অভিযান চালিয়েছে। সুভাষ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভারত জাপানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সমস্ত ভারত, ভারতের বিদ্বান বুদ্ধিমান

বিহ্বল ভীত হয়ে পড়লেন—এমন কি, গান্ধীর একান্ত অন্তরঙ্গরাও।

মাথা ঠিক রাখলেন একমাত্র বিপ্লবী গান্ধী। তিনি বললেন, মাভৈঃ। যে জাতির প্রতিটি মানুষ তার জাতির অধিকারবোধে—তা নয় শুধু, তার মানবীয় আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, বিশ্বের কোন্ শক্তি দাস করে তাকে? সে কি আর কারও দাসত্ব মেনে নেয়? আর মেনে যে নেয় না তার দাসত্ব কতক্ষণের? আর, মানতে যে শুরু করে আর ঝিমোতে শুরু করে সে অবশেষে গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর, দাসত্বকে অস্বীকার করতে যে শেখে তার দাসত্ব হাঁসের গায়ের জলের মতো। আমাদের জাগ্রত সত্তার প্রতিরোধ—নিরস্ত্র প্রতিরোধই ইংরেজ, জাপানী—দুই জাতেরই গোলামীর বিরুদ্ধে। তাই করব আমরা। সারা জাতি প্রাণ পায়। একটি মানুষের বিশ্বাসে একটি জাতি প্রাণ পায়। এই মানুষটিই বিপ্লবী। আর এ-ই ভারতের ইতিহাসে ১৯৪২।

ইতিহাসে সোজা গাছটি গজিয়ে উঠে আপন প্রসাদেই বরটি দেয় না, ফলটি ফলায় না। নানাদিকের আকাশ জল বাতাস আলো নানাভাবে বহু প্রক্রিয়ায়, বহু সাধনায় ফলটি ফলায়। তেমনি ফললো ভারতের ঐ ১৯৪৭-এর স্বরাজের ফল। কত কি মিলে আগস্টে এই ফলটি পাকালো ঐতিহাসিক তার বিচার করুন। তুর্গেনিভ, টলস্টয়, পেইন, থেরো, রাস্কিনের কথা তুলব না—মানবতার অধিকারের কথা তাঁরা তুলেছিলেন। গান্ধী যেভাবে তাকে বছরের পর বছর মাটির ভেতর রস সঞ্চার করে উপ্ত করে তুলেছিলেন, তাঁদের হয়তো সেদিন আসেনি, সে-সুযোগ মেলেনি। কিন্তু নানা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা পাবার আগ্রহে বিদ্রোহ ইতিহাসে স্মরণাতীত কাল থেকেই চলেছে; ক্রীতদাসের, শ্রমিকের, কৃষকের—বিভিন্ন শ্রেণীর নিজ নিজ অধিকার আদায়ের চেষ্টাও শতাব্দীর পর শতাব্দী করেছে; সফল চেষ্টাও করেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি মানুষের প্রাথমিক অধিকারের পর্যায়ে। এই অধিকারবোধেরও শক্তি অসামান্য। এই অধিকারবোধে জাগ্রত আমেরিকা প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই অধিকার বোধই আরও মরিয়া করে তুলেছে যখন ফরাসী জাতিকে বুরবঁ বংশের জুলুমে, তখন তার অন্যতম নেতা দাঁতঁ সেই মরিয়া শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন একটি শব্দে l'audace, l'audace, encore de l'audace—দুঃসাহসিকতা, আরও বেশি দুঃসাহসিকতা। এই দুঃসাহসিকতার জোরেই বিপ্লব-বিধ্বস্ত, দুর্বল ফ্রান্স রুখেছিল—বেশ সফলতার সাথেই রুখেছিল ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বরে তদানীন্তন পরাক্রান্ত প্রুশিয়ার বিরাট

শক্তিকে ভালমির যুদ্ধক্ষেত্রে।

এই প্রাথমিক অধিকারবোধও যে সীমাহীন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা থেকেও আসতে পারে বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তি; সফল বিপ্লবেরই শক্তি। গান্ধীবিপ্লবের মূলমন্ত্র যেটি পাই, তা এই অধিকার বোধ থেকে স্বতন্ত্র। আরও গভীর সে বস্তু, ব্যাপকও। তাকে স্পষ্ট ভাষায় রূপ দেওয়া যায় শুধু মানবীয় মর্যাদাবোধ বলে—human dignity বলে। সে-ভাষাটি এক খণ্ড বিপ্লবের এক অজ্ঞাত, অখ্যাত নেতার মুখে শুনেছিলাম—তিনি উয়ে (Hue´)। কিন্তু ১৯৩০ সালে, ফরাসী ইন্দোচীনের অভ্যুত্থানকালে। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মর্যাদার যুদ্ধের অনেক পরে; তাঁর ভারতে স্বরাজ আন্দোলন শুরু করার দশ বছর পরে। তাই, ১৯৪৭ সালে ভারত যে সীমাবদ্ধ স্বরাজের অধিকারী হল, তা থেকে এই মর্যাদা বোধের মন্ত্র এশিয়ার সর্বত্র, আরব সাগর পেরিয়ে আফ্রিকার সব জাতের মর্মে ছড়িয়ে গেল, আটলান্টিকের পরপারে নিগ্রোর ভিতরও; সারা দুনিয়ারই অশ্বেতকায়দের ভিতরও। ধীরে ধীরে জাতিকে তৈরি করে নেবার কৌশলও তারা চিনলো।

ডায়ালেক্‌টিকসের অনতিক্রম্য নিয়মে যে কোনো আদর্শ তার পরিপূর্ণ পরিণতির আগেই বিরাটতর আদর্শে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে ইতিহাসের বিবর্তনকে সার্থক করে তোলে। ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামও এই ভাবে বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতার সংগ্রামের পূর্ণতার দিকে ছুটলো। ভারতের মতোই বহু শতাব্দীর দাসত্বে, অজ্ঞতায় নিমজ্জিত সব জাতি একের পর এক রাজনৈতিক দাসত্ব মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে মন দিল। এটা বিশেষ করে সম্ভব হল শেষ ত্রিশ বৎসর ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম গান্ধী নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের নীতি নিয়েছিল বলে। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপেই সাফল্য লাভ করে নাই; ১৯৪২ এ পূর্ণ অহিংসই থাকে নাই। তবু ডায়ালেকটিসের নিয়মে সে সারাবিশ্বের নির্জিত জাতিদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে স্বরাজলাভেপথিকৃৎ হয়ে দাঁড়ালো। এ-ই ইতিহাসের খেলা, বিবর্তনের পথ।

এই সব জাতির ভিতর ঐ মর্যাদাবোধ জাগতে ইংরেজ দেখে নাই, তা নয়; যুদ্ধের যুগের তার মিত্র শক্তিরা দেখে নাই, তা নয়। মিত্র শক্তিদের ভিতর আমেরিকা দূর থেকে সব দেখে বুঝে বুদ্ধি দিল: যুদ্ধে জেতা আর সাম্রাজ্য রক্ষা করা—এই দুই লক্ষ্য একসঙ্গে বজায় রাখা চলবে না। বিলাতে চার্চিলের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল; ক্রমে সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হতে শুরু করলো।

জাতির পর জাতি স্বাধীনতা পেল, স্বরাজ পেল। উৎসাহ বেড়ে চলেছে। মূলগত মর্যাদাবোধের জাগরণ চলছে। আবার, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে—আবারও বলি—প্রতিক্রিয়াও চলছে;—ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় যেমন মেটার্নিকের উত্থান, রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় যেমন মুসোলিনির উত্থান, গান্ধী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ারও তেম্‌নি ভিয়েৎনাম যুদ্ধ যে ফাসিস্ট প্রতিক্রিয়ার প্রতীক, সেই বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার উত্থান।

কেউ হয়তো বলবেন, চীনের মাওবাদের প্রতিক্রিয়া ভিয়েৎনামের ফাসিস্ট প্রতিক্রিয়া। একথা বললে কার্যকারণের সম্পর্ককে বিপরীত করে বলা হবে—কার্যকে কারণ ধরা হবে। আগে বলেছি, জাতীয় অধিকারবোধ থেকে ভারতীয় বিপ্লব ধারার শুরু। তারই পরিণতি গান্ধীবাদের মূলগত মানবীয় মর্যাদাবোধ। এই মর্যাদাবোধ চায় স্বাবলম্বন। সেই স্বাবলম্বনের প্রতীক চরকা; প্রতীকই মাত্র—স্বাবলম্বনের—আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক। ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের, উৎপাদনযন্ত্রের দাস হবে না। ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে চাই স্বাবলম্বন। প্রতিটি জাতিরও আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিষ্ঠার জন্যে তেমনি চাই স্বাবলম্বন। কেন সে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের, কলোনিয়াল জাতিদের—রাজনৈতিক দিকে, অর্থনৈতিক দিকে? এই আত্মমর্যাদাবোধই ১৯৪৭ সাল থেকে সমস্ত নির্জিত জাতিদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে করে চলেছে।

ফল পাকার পরে পচে—জল হাওয়ার স্পর্শে। ডায়ালেক্‌টিক্‌সের মতেও সব পরিণতির চরমে আসে বিকৃতি—ইতিহাসের অপর কোনো না কোনো দিকের তথ্যের, তত্ত্বের, নীতির অম্‌নি পরিণতির পরবর্তী বিকৃতির সঙ্গে মিশ্রণে; এমন কি, শুধু স্পর্শেই—গরম দুধ যেমন কেটে যায় সামান্য অম্লরস মিশলে। ভারতীয় দর্শন-চিন্তায় বলেছে সত্ত্বমুখী রজোগুণের কথা। তেমনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদমুখী—অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীর প্রভাবে। রুশিয়ার Dictatorship of the proletariat—সর্বহারার একচ্ছত্রিত্ব ছিল গণতন্ত্রমুখী মার্কসের, এঙেল্‌সের, লেনিনের প্রভাবে। পরবর্তীকালে স্টালিনের এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্ট ফাসিস্ট প্রভাবে হয়ে ওঠে তা প্রতিক্রিয়ামুখী বিশেষতঃ বিশ্বজোড়া ভিয়েৎনাম যুদ্ধ মনোভাবের প্রাবল্যে। ভারতের আন্তর্জাতিকতা দূরে থাক্‌, তার গণতন্ত্র-প্রীতিরই আজ শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে বিশ্ব-ফাসিজম্‌ আর প্রতিক্রিয়ার চাপে। ফলে, যেমন বিকৃতি ঘটছে ভারতের জাতীয়তাবাদের, তেমনি রুশ সাম্যবাদের। আর, এই দুই বিকৃতির

সংমিশ্রণই আজকের চীনের মাওবাদ। তেঁতুল গাছে তেঁতুলই ফলছে—বাঘা তেঁতুল ; তা অমৃত ফল দেবে কি করে ?

কথাটার আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ভারতে যে-বিপ্লবান্দোলন, তার মূলে ছিল সেদিনের ভারতের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, একান্ত সাধ্য জাতীয়তাবাদ—এমন কি, ইটালির ইরিডেন্টিস্টদের মতো জাতীয়তাবাদ ; সমগ্র ভারতবাসীর এক জাতীয়ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ প্রথম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পূর্বে ঢাকা থেকে পশ্চিমে মুলতান অবধি প্রচার করেছিলেন বিগত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠতম নেতা আর বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ। আজ এই জাতীয়তাবাদ রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে, পরিণত হয়েছে মাওৎসে তুংয়ের নয়া সাম্রাজ্যবাদে। আমাদের জাতীয়তাবাদের বিকৃতির সঙ্গে বোলশেভিকবাদের বিকৃতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে এক বীভৎস, গণতান্ত্রিক ভারতের, বিশ্বের গণতান্ত্রিক জাতিদের চরম ভীতির কারণস্বরূপ লাল চীনের নয়া সাম্রাজ্যবাদ।

এই যে বিকৃতি—এই বিকৃতিকে সূত্র ধরে এক Counter-Imperialist-এর —এক বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীর—বিরুদ্ধে অপর সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজোড়া প্রচার : ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কম্যুনিজম্ বিরোধী যুদ্ধ। জাতীয় স্বাধিকার-বোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—একথা স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ; বললে, নবজাগ্রত জাতি সবারই চোখে ফাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীর নগ্নরূপ ধরা পড়ে যায়। সুতরাং বলা হচ্ছে কম্যুনিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এম্‌নি এক একটি বিকৃত নামের প্রয়োজন হয় এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলদের। ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের ইংরেজ নাম দিয়েছিল "টেররিস্ট"। সেদিন ইংরেজের হাতের পুতুল ভারতীয় কম্যুনিস্টরা মুখে মুখে, কাগজে, বইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বলতো 'টেররিস্ট"—এরা বিপ্লবী নয়, এরা বিভীষিকাসৃষ্টিপন্থী। প্রতিক্রিয়াশীলদের এই প্রকৃতি। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে তাকে এক বিকৃত আখ্যা দেওয়া এদের সাধারণ নীচ প্রবৃত্তি। আগে বলেছি, ভারতের সেদিনের বিপ্লবীরা যে-চরিত্র দেখিয়েছিল তাতে পিলে চম্‌কে গিয়েছিল অ্যাণ্ডার্সনের অনুচরদের। আজ মুষ্টিমেয় ভিয়েৎ-কঙের হাতে তেম্‌নি শিক্ষা হচ্ছে মার্কিনীদের। হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে ওরা টের পাচ্ছে জাতীয় স্বাধিকারবোধের কি শক্তি। ভিয়েৎনামের পক্ষে—যেমন ছিল কোরিয়ার পক্ষে, যেমন ছিল লাওসের পক্ষে—যার যার—স্বাধিকারবোধই তার মৌল প্রেরণার উৎস, শক্তির উৎস। কম্যুনিজম্ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ গৌণ।

আজকের দিনের অর্থনীতিতে যে কোনো জাতির পক্ষে কোনো-না-কোনো ধরনের সোশ্যালিজম্ অপরিহার্য। স্কুলের ছাত্রও তা সহজেই বোঝে। সুতরাং ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কম্যুনিজম্ বিরোধী যুদ্ধ একথার কোনো মানে হয় না; ওটা স্পষ্টতঃ ভিয়েৎনামীদের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

যে কথা বলছি—সেই প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ছড়িয়ে গেছে পুরোনো কম্যুনিস্ট দেশেও। পার্সিয়ায় (ইরাণে), চীনে—জারসাম্রাজ্যের কালে যে সব 'কনসেসান" বা বাণিজ্যিক, সামরিক, আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার এবং রুশ নাগরিকরা যেসব ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার সুখ সুবিধা উপভোগ করতো, বোলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিন কম্যুনিজমের আদর্শ-নিষ্ঠায় সে সবই ফিরিয়ে শুধু দেননি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওনা অর্থের বহু অতিরিক্তও দিয়ে দিয়েছেন;—যেন জারের যুগে এই সব জাতিদের প্রতি যে অপমানসূচক ব্যবহার করা হয়েছিল তার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ। সেদিনের সেই আদর্শ প্রীতির ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সোভিয়েট সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে উৎপাদনের দিকেও; সেই ঢেউ দেখা গিয়েছিল প্রতিক্রিয়া যখন ছেয়ে যাচ্ছে তখন পর্যন্ত স্টাখানভের দ্রুত সম্পদসৃষ্টিতে—গানের সুরে সুরে উৎপাদনে; সৃষ্টিকে আনন্দে পরিণত করেছিল। এই তো সত্যিকারের বিপ্লবের চরিত্র।

তারপর? আজকের দ্রুত বিস্তারশীল প্রতিক্রিয়ার দিনে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিস্টদের শেষ করে; কিন্তু ফাসিবাদকে বিশ্বময় করে তোলে। এই যুদ্ধের কালে হটস্প্রিং, ডাম্বার্টন ওকস, পট্স্ড্যাম, ইয়ালটা, সান্ফ্রানসিস্কোয় মিত্র শক্তিদের বৈঠক হয়। পাশাপাশি গোপন সব সম্মেলনও হয়। সোভিয়েট রুশিয়াও এর সামিল তখন। এই সব সম্মেলনে যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্বব্যাপী ফাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই সব বৈঠকের আলোচনা আর সিদ্ধান্তও যেমন সর্বসাধারণে প্রকাশ হয়, গোপন সম্মেলনগুলোর কথাও অপ্রকাশিত থাকে নাই। সে-যুগের কোনো কোনো পত্র পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়, তার ধারা এই: যুদ্ধোত্তর যুগে দুর্বল দেশগুলির স্ব-নির্ভর হয়ে উঠবার চেষ্টা দেখা দেবেই, তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংকট অনিবার্য। সে বাণিজ্যকে বাঁচাবার উপায় কি? মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয়ের ব্যবসায়ের আর প্রসার সম্ভাবনা অল্পই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেরুদণ্ড-স্থানীয় তখন হবে বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রগুলির নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বিশেষতঃ যুদ্ধের দিনে অবশ্যম্ভাবী নবাবিষ্কার যুদ্ধোপকরণ। সেসব ক্ষেত্রে সত্যোত্থিত বা সত্যসৃষ্ট দরিদ্র দেশের অগ্রগামী হয়ে

ওঠা দীর্ঘ প্রয়াস ও কালসাপেক্ষ। আর, সে ব্যবসায়ের অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন হবে নতুন রাষ্ট্রদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে দিককেও ছোট করে দেখলে চলবে না আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে।

এই ব্যবসা আর এই নব সাম্রাজ্যবাদ চালু রাখবার যন্ত্র হিসাবে ঐ সব বৈঠকে আবিষ্কৃত হয় সম্মিলিত জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি সংস্থা। এসবের লক্ষ্য যেন কেবল মঙ্গলময়ের দিকে চোখ রেখেই যুদ্ধ না হতে দেওয়া আর দুর্বল জাতিদের সহায়তা—ইউ.এন.ও—যেন ভ্যাটিক্যানের আধুনিক সংস্করণ—এই ভণ্ডামিরই সন্তান সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এই চক্রান্তে উদ্ভাবিত এই বাণিজ্যের জগতেও, এই অস্ত্রের ব্যবসায়েও বেশ উৎসাহ সহকারে নেমে পড়েছে, দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে সেই ১৯১৭ সালের দীক্ষায় দীক্ষিত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্ররা পর্যন্ত। আর, সেই বিপ্লব দীক্ষায় দীক্ষিত ইদানীংকার অহিরাবণ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র আর এক পা' এগিয়েছে: নিজেদের সাম্রাজ্যবিস্তারে বা বিলুপ্ত বা কল্পনায় উদ্ভাবিত সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলে দাবি করে হারানো (?) সাম্রাজ্যোদ্ধার (!!) কল্পে চরম মারণাস্ত্রভূষণে ভূষিত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখানে নেমে এসেছে আজ কম্যুনিজমের মানব প্রীতি! প্রতিক্রিয়ায় সবই সম্ভব।

হিট্‌লার নিজেকে বলতেন ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট। সেই সূত্র ধরে মাওৎসেতুং ইম্পিরিয়ালিস্ট কম্যুনিস্ট—কম্যুনিস্ট ইম্পিরিয়ালিস্ট নয়, ইম্পিরিয়ালিস্ট কম্যুনিস্ট—সাম্রাজ্যবাদী সাম্যবাদী। মাও আগে সাম্রাজ্যবাদী, পরে সাম্যবাদী। চীনের সাম্রাজ্য প্রসার-কামনা আগে; তার উপায় স্বরূপ সাম্যবাদের আধুনিকতা। চীনের মুসলমানের প্রতি, তিব্বতবাসীর প্রতি আচরণ তার symptom, লক্ষণ। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, সূঁচের ছেঁদা দিয়ে বরং উট গলে যেতে পারে কিন্তু ধনী কখনও স্বর্গের দরজাপথে ঢুকতে পারবে না। সাম্রাজ্যে যার লোভ, সে কখনও কম্যুনিস্ট হতে পারে না। এই গেল আজকের চীন। আর, আজকের রুশিয়া? লেনিন চীনকে, পারস্যকে সব কনসেসান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর, ১৯৬৫ সালে হাঙ্গেরির প্রতি, আর, এই অতি হালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি কি বর্বর নির্মমতাই দেখাচ্ছে সাম্যবাদের গোড়াঘর রুশিয়া!

আর, আমাদের গান্ধী কংগ্রেস? সেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, তার পরিচালিত সব সরকার, আর সেই সব সরকার চালায় যে ব্যুরোক্রাসি—এর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে গেছে আজকের দুনিয়াজোড়া ফাসিস্ট প্রতিক্রিয়ার প্রভাব। বিপ্লবীদের

চরম আত্মদান, গান্ধীবাদের ত্যাগ আর সত্যনিষ্ঠা—তারই প্রতিক্রিয়ায় বিলাস ব্যসনের লোভের ষড়যন্ত্র আজ কংগ্রেস সংগঠনে, কংগ্রেস সরকারে। কোথায় সেই জাতি গঠনের বিশাল উদারতা! আর আজ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার, প্রদেশের, জেলার, প্রতিটি পাড়ার স্বার্থের, ঈর্ষার কলহ! দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের এক অংশকে বেঁচে থাকার মতো খাবারটুকু দেবে না প্রাচুর্যের সৌভাগ্য ভোগ করে যখন অপর কোনো অংশ। ভাষার সাম্রাজ্য বিস্তারে সহকর্মীর মাথা ভাঙছে। দেশপ্রীতির সুষমা ফুটে উঠছিল যে-স্নেহ করুণায়, তা আজ অবসিত। পাশ্চাত্যের বিলাস ব্যসনের নেশাও এই বিকৃতিতে মিশে গেছে। অতীতে কে কি একটু দুঃখত্যাগ সয়েছে কি না সয়েছে সুদে আসলে তাই তুলে নিতে ফাসিজম্, ফাসিস্ট ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত সমাজ-দেহে! মিথ্যা আর দুর্নীতির প্রাবল্যে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত আজ সর্বত্র। বিদ্যাসাগর বলতেন, আমার মতে আমার নিজের এমন হওয়া কর্তব্য যে সকলে সেরকম হলে পৃথিবীই স্বর্গ হয়ে উঠবে। গান্ধীরও কথা—আমার জীবনই আমার বাণী। আজ ভূতলে স্বর্গ সৃষ্টির সেই কল্পনা নেমে এসেছে পাপের উত্থান সৃষ্টিতে!!! কি নরকের কীট এক একটি প্রভুত্ব করছে আজ প্রতিটি রাষ্ট্রে। এ থেকে বুঝা যায় আজকের এই প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ঐসব রাষ্ট্রের মানুষগুলো কোন্ স্তরে নেমেছে। তার সঙ্গে তুলনা করতে হয় সেই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঐ রাষ্ট্রের বা প্রদেশের মানুষগুলো কোথা থেকে কোথায় উঠেছিল। আক্ষেপ সত্যিই আসে, From what height fallen to what depth! কিন্তু—"কার নিন্দা কর তুমি, মাথা করো নত। এ আমার এ তোমার পাপ।"

মাও পন্থীর, সার্ত্রের পন্থীর (এদেশে বিশেষতঃ যাঁদের মতে ছাত্রের ভবিষ্যতের চেয়ে শিক্ষকের আয় বৃদ্ধি বড়, তাঁদের) প্রচার আর কংগ্রেস পন্থীর আচার আচরণ আজ শ্মশানের ছাইয়ে পরিণত করেছে ন্যায় নীতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা—জাতির জীবনে মহৎ যতটুকু যা অবশিষ্ট ছিল তাকে।

কিন্তু সৃষ্টির কি এখানেই শেষ? শেষ পথ মেটার্নিকও দেখাননি; মুসোলিনিও দেখাননি; আজকের বিশ্বজোড়া ফাসিস্ট ষড়যন্ত্রকারীরাও দেখিয়ে যেতে পারবেন না। শেষ কথা মানবীয় মর্যাদাবোধের কথা। গোড্‌সের হাতে মৃত্যুর পরপার থেকেও বলে যেতে থাকবেন গান্ধী—যা বলেছিলেন নোয়াখালির প্রান্তর থেকে; পন্টিয়াস পাইলটও শেষ কথা শেষ করে দিয়ে যেতে পারেনি। নোয়াখালির শেষ কথা রয়ে গেল চিরদিনের ইতিহাসে: দুর্বলের

প্রতিহিংসার পথ যে নেয়, সে মানবীয় মর্যাদাবোধ হারিয়েছে। দুর্বল যে তাকেও একথা বুঝতে হবে। জানতে হবে দুর্বলকে—যার হাতে সে মার খেয়েছে, সে মানুষ নয়, সে অসুর—তাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব মানব-সমাজের অঙ্গ হিসাবে দুর্বলেরও। সবল যে তাকেও মানতে হবে—মানবতা হারিয়ে অসুরের স্তরে নেমেই সে দুর্বলকে আঘাত হেনেছে। কিন্তু তাকে মানুষ হয়ে উঠতে হবে—মানুষ বলতে যা বুঝায় তা-ই হতে হবে। এমনি করে এই মর্যাদাবোধের ভিত্তিতেই শুধু সৃষ্টি হতে পারে মানবের এক পরিবার।

এ এক চির চলমান নিত্য বিবর্তনশীল বিপ্লবের ধারা।

লেনিন পর্যন্তও প্রচলিত পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের কতকটা যান্ত্রিক ধারণায় সাম্যবাদ ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সে ধারণা সংক্ষেপে এই: মানুষের সম্পদ সৃজন শক্তির সীমা নেই। মানুষের সমাজে অগণিত মানুষ চিরদিন অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত জীবন কাটাবে—এ তার নিয়তিও নয়, তাঁর মানবিক আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিচয় নয়। মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাচুর্য আলো বাতাস জলের মতোই সহজ লভ্য করে তোলা চলতে পারে বিজ্ঞানের বলে, মানুষের শক্তি স্ফুরণের ফলে। সাম্যবাদীরা সমাজযন্ত্র, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে দাঁড় করাবে সর্বহারার একনায়কত্ব; আর, এই এক-নায়কত্বের কর্তৃত্বে সম্পদের ঐ প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে। তখন আর পৃথক শ্রেণী-চেতনা বা শ্রেণীও থাকবে না; এবং সেই শ্রেণীহীন সমাজে অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্র শুকিয়ে শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়বে। বাইরের দিক থেকে দেখে এখানে আদর্শে, গান্ধীবাদের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। ইউরোপীয় সাম্যবাদীরা দারিদ্র্য বণ্টন ক'রে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। গান্ধীবাদও আধুনিক বিজ্ঞান আর শিল্পের উন্নতিকে গ্রহণ করে প্রাচীন আদর্শের জীবনের নিম্ন মানকে পেছনে ফেলে এসেছে। তবু দু'য়ের গতিপথে ব্যবধান আছে।

প্রতীচ্য সাম্যবাদ প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্যে সর্বহারার একনায়কত্ব অপরিহার্য মনে করেছে। গান্ধীবাদের গণতন্ত্র ও সত্যাগ্রহের পন্থায় এই একনায়কত্বের স্থান নেই। সে দেখছে, ঐ সর্বহারার একনায়কত্ব না হতেই প্রাচুর্য সৃষ্টির লক্ষণ বার বার এখানে ওখানে ফুটে ফুটে উঠছে। ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে আজই দর পড়ে যাবে ভয়ে হাজার হাজার টন ফল তরকারী মাটির নীচে চাপা দিচ্ছে; অনেক বছর পশ্চিম গোলার্ধে লক্ষ লক্ষ টন গম সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়—যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অপর গোলার্ধে প্রতি বছর অনাহারে শেষ হচ্ছে। সত্যাগ্রহের

পথে—মানবীয় মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার পথেই এ সমস্যার সুরাহা করতে চায় গান্ধীবাদ।—মানবীয় মর্যাদাবোধেরই অঙ্গ মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ করুণার অনুভূতি। এ-প্রবৃত্তিগুলি দুর্বলের ভূষণ নয়, মানবীয় মর্যাদাবোধে সবল যে, তার চরিত্র সম্পদ। মানুষ যখন নিজেকে মানুষ বলে দেখে তখনি সে অনুভব করে, এই প্রবৃত্তিগুলিই তার সম্পদ। একদিকে প্রাচুর্যের ধ্বংস, অপর দিকে মানুষের অনাহারে মৃত্যু—মানুষের নিজের কাছে নিজের অপমান। মানুষের এই মর্যাদাবোধই গান্ধী-সত্যাগ্রহের শাণিত অস্ত্র। এই সত্যাগ্রহের অস্ত্র এখানে এসেই থামতে চাইছে না—আজকের দুনিয়ার আরও স্বপ্ন সে দেখছে। বিশ্বমানব পরিবারের জন্যে যখন সে চাইছে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বস্তু, তখন মানুষের আর যন্ত্রের শক্তির অপচয় হচ্ছে রণ-সম্ভার সৃষ্টিতে। এ-ও বন্ধ করবার কল্পনা সাম্যবাদী একনায়কত্ব করে না ; করতে পারেও না। তা করলে করতে পারে শুধু গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ।

এই অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বিপ্লব-ঋষি গান্ধীর চোখে ধরা দিয়েছিল ইতিহাসের কোন্ স্তরে এসে ?—বৃহত্তর দিকে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন অস্ত্রের আবিষ্কার এমন জায়গায় পৌঁছাতে চলেছে, যেখানে জাতির পরে জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কয়েক দিনে, কয়েক ঘণ্টায় ; আর, অতি ছোট গণ্ডীর ভিতরও যখন অধিকারবোধ জেগে উঠছে শুধু বড়র বিরুদ্ধে ছোটর, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অন্ত্যজের নয়, পিতার বিরুদ্ধে সন্তানের, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের···অস্ত্রের পথ হিংসার পথ তখন কোথায় নিয়ে যেতে পারে সমাজকে, মানুষকে ? মানুষ তো red in tooth and claw—রক্তমাখা দাঁত আর নখ নিয়ে জন্মায়নি।

মানুষজগতও এগিয়ে চলেছে, গান্ধীবাদও এগিয়ে চলেছে, বিপ্লবধর্মও এগিয়ে চলেছে। এই 'চরৈবেতি'ই (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এগিয়ে চলার বার্তা) বিশ্বসৃষ্টির ধর্ম—আগুনের ধর্ম যেমন পোড়ানো। বিশ্বের প্রতিটি তথ্যের,তত্ত্বের এগিয়ে চলাই তেমনি ধর্ম। আগে বলেছি : বিশ্বের ইতিহাসের বিবর্তনে অনেক সময় পশ্চাদ-পসারণের ছদ্মবেশেও ইতিহাসের পাতায় এগিয়ে চলার রেখাপাত হয়। ভারতের ইতিহাসে যেমন গান্ধীবাদের তেমনি ভারতীয় বিপ্লববাদের পূর্ণতা পরিণতি পাবার আগেই আজ যে তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়ার ধুয়ো উঠেছে, এই ধুয়োই সূচিত করে বর্তমান পশ্চাদপসারণের ছদ্মবেশ ছিন্ন হয়ে নতুন দিনের আলোতে তার পরিণতির ইতিহাস আসছে এক দীর্ঘ শতাব্দীর জন্যে। অজ্ঞানের প্যালা

ছিল অস্ত্র—সেই ইতিহাসের আদিম যুগ থেকেই। কিন্তু চরিত্র দৌর্বল্যের কোনো প্যালা নেই। তা নামতে নামতে শেষ স্তরে বিদ্যুৎ ঝল্‌কানির মতো একবার দেখিয়ে গেছে ভারতের বিপ্লবীরা মানুষ কি হতে পারে—কি তার হওয়া উচিত—মানুষের দুনিয়ায় মানুষ পরিচয়ে বেঁচে থাকতে হলে তাদের আদর্শ ছিল: ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা: নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেই তারা জীবনকে উপভোগ করেছে। সেই চরিত্রই ফুটে ওঠার কথা গান্ধীবাদের সত্যাগ্রহে। উঠতেই চলেছিল। কিন্তু এসে গেল বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া। আজকের ঐতিহাসিক আর তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায় যে দুর্বল মানব চরিত্র ভাসিয়ে তুলেছে এর অবসানে এমন মানুষের আবির্ভাব ফুটে উঠতে চাইছে যারা পিকিং, মস্কো, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্কের সব কারখানায়—অস্ত্রের কারখানায়, আণবিক বোমায় কারখানায় উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, বানাব না এই সব অস্ত্র, ধরব না এই সব অস্ত্র। কাকে মারতে ধরব? স্বেচ্ছায় মানব জাতের ধ্বংস কামনা করব, আমিও কি মানুষ হয়ে জন্মাইনি? মানুষ হয়ে জন্মে কোন্ মাও, কসিগিন, দ্যগল, উইলসন, জনসনের কুকুর হতে যাব?

সেদিন আসবে একজন চীনা জাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধে যখন দেখবে যে, সে একজন তিব্বতীকে যে উলঙ্গ করে চাবুক মারছে, সে নিজের আত্মারই অবমাননা করছে, চাবুক যেন তারই বুকে পড়ছে; একজন মার্কিনী যখন দেখতে পাবে, ভিয়েৎনামের এক নাগরিক—কোনো শত্রুতার হেতু নেই তার সঙ্গে—অনায়াসে তার সঙ্গে ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে বসে খেতে পারে, আর তারই নিজের হাতের বোমার আঘাতে শেষ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, তার আত্মা আপন মমত্ববোধেই আহত হবে, যেন তার মায়ের পেটের ভাই-ই ছট্‌ফট্ করে মরছে; একজন মুসলমান যখন একজন হিন্দুকে কারও আদেশে আঘাত করবে, তার মানব ধর্মই তাকে বলবে, সে দাস্যবৃত্তি করে তার ইসলামকেই নিজহাতে ছোট করেছে; একজন শ্বেতাঙ্গ যখন এক কৃষ্ণকায়ের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেখবে তারই ক্রুশ বিদ্ধ পরিত্রাতার মুখে থুথু দিয়েছে—যে মুখ থেকে দু'হাজার বছর আগে নিসৃত হয়েছিল দশ অনুজ্ঞা; একজন রুশবাসীর আপন অন্তরই যখন বলবে, অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার দরুন মানুষের জাতি হিসাবে রুশজাতির জাতীয় অপমান হচ্ছে অনেক বেশি যখন চেকোশ্লোভাক জাতিকে অপমান করা হচ্ছে—রুশবাসী নিজেকেই যেন পশুর স্তরে টেনে নামাচ্ছে—এই অভিমানবোধে সে নিজেই যখন বুক উঁচু করে দাঁড়াবে চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় মর্যাদার সমর্থনে।

মানবমনের এই পরিবর্তন আনবে কোনো একনায়কত্বের শক্তি? মানুষের যুক্তি-শক্তি (sense of logic) বলে একথা? এখানে গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহ যদি বর্জন করতে হয়, বিকল্প হিসাবে মেনে নিতে হবে একমাত্র মাওবাদ—সে কল্কি অবতারের কল্পনা: সমগ্র মানব সমাজ আণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে যাবে; সেদিনের নোয়ার নৌকায় থাকবে কেবল কয়টি চীনা যুবক যুবতী; আর হয়তো লুকিয়ে নৌকার গলুইয়ে ঝুলে থাকবে কয়জন মার্কিনী। তা থেকে নতুন বিশ্বামিত্রের নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হবে।

হয় এই পরিকল্পনা। নয়তো গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহ ভবিষ্যতের সকল দ্বন্দ্ব সমস্যা মীমাংসার, মানুষের সর্ববিধ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অস্ত্র। এ দুয়ের মাঝামাঝি আছে শুধু অলস—যা কিছু হোক, আমার কি?—মনোভাব। ইতিহাসের বিবর্তনের সহজ চিন্তায় যে-স্তর আনা সম্ভব, সে স্তর কোনো একনায়কত্বে আনতে পারে না। একনায়কত্ব নিয়ে আসতে পারে আরও একনায়কত্ব। কম্যুনিস্ট একনায়কত্বের ধারণা যেমন এনেছে ফাসিস্ট একনায়কত্ব। এ ঐতিহাসিক সত্য। এই দুষ্ট চক্রই এই vicious circleই আজ বিশ্ব ছেয়ে গেছে।

সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে প্রতিক্রিয়ার রাহু তখনই করেছে পূর্ণগ্রাস। তার পরের যে গোটাদুই বছর—তার স্থান মরা ইতিহাসের শুক্‌নো পাতায়। তার বাইরে নেই। ভাবগত নাথুরাম নেমেছিল নোয়াখালিরই মাঠে। বিপ্লবের নিত্য সত্য যা সৃষ্টি করে করে চলে নব নব সত্যযুগ তার কণ্ঠ "হা রাম" বলে ওখানেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওখানেই শেষ গান: "আসবে পথে আঁধার নেমে—"। এসেছিল, অকল্পনীয় আঁধারই নেমে এসেছিল। সেদিন নেহরু, প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ নেই পাশে; বিপ্লব-চেতনায় দেউলে নেতৃত্বের গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গান্ধী এক পরিত্যক্ত নেতা সেদিন।

সম্মুখে দুর্যোগের আঁধারের নীচে এক দিগন্তবিস্তৃত সাহারা—তৃষ্ণার বারিহীন, মরুমরীচিকাও বিলুপ্ত; বিদ্যুত ঝল্‌কায় নাই সেদিন পাছে পথিক পথ দেখে। চলেছে এক অর্ধ-অনাবৃত, স্খলিতপদ শিথিল-অঙ্গ পরিত্যক্ত মানব সীমাহীন অজানা পথে এক অনিশ্চিত লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে। সামনে শুধু জমাট বাঁধা আঁধারের মতো ক'টি কালো ছায়া—কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, মায়া ঘোষ, রাণী রক্ষিত, বেলা চৌধুরী…কাদের ছায়া ওগুলো সব?—যতীন মুখার্জির, সূর্য সেনের দীনেশ মজুমদারের, বিনয় বোসের, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের, মাতঙ্গিনী

হাজরার···। পথ চেনে না ওরা। কিন্তু পথের সাথীকে চেনে। আঁধারেও হাত ধরতে ভীতি জাগে না। ওরা নির্ভীক, ওরা নিশ্চিত, ওরা নিশ্চিন্ত। সাথীকে ছাড়া আর ওরা জানে : ইতিহাসের শেষ নেই ; পতন অভ্যুদয়ে আরও এগিয়ে চলবে সে—

পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে আমরা তাকে অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেন না, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সে মহামৃত্যুঞ্জয়······

২০।১০।৬৮

গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আলোচনার আরম্ভ হইতেই পারে না, দিল্লীর সেণ্ট-স্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক পাদরী চার্লস ফ্রীয়ার এন্‌ড্রুজ-এর (**Rev. C. F.** Andrews) কথা যদি অবতারণা না করি।

এন্‌ড্রুজের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় লনডনে ১৯১২ সালে। কীভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন, সে-তথ্য তিনি তাঁহার 'হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট' গ্রন্থে (What I owe to Christ বাংলা অনুবাদ ঋণাঞ্জলি) বিবৃত করিয়াছেন।

ভারতে ফিরিয়া ১৮১৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি এনড্রুজ সর্বপ্রথম শান্তি-নিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ তাঁহাকে মুগ্ধ করে; তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তবে খৃষ্টানী পাদরী সংঘের শতেক বন্ধনে বাঁধা জীবন—তাহা হইতে মুক্তি লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে; তজ্জন্য তাঁহাকে কী সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নহে। সংক্ষেপত বলি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে মিশনারী সংঘের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করা সম্ভব হয় নাই; তিনি ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিলেন ও 'উৎসর্গ' কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করিলেন।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এন্‌ড্রুজ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায়। কবি দেশে ফিরিলেন ১৯১৩ সালে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ আসিল ১৩ নভেম্বর—দেশে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ সপ্তাহ পরে। অতঃপর ২৩শে নভেম্বর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০) শান্তিনিকেতনে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে কবি-সংবর্ধনা হইল। ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে এন্‌ড্রুজ ও তাঁহার বন্ধু পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে আসিলেন; তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছেন। তথাকার গুজরাটী ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (M. K. Gandhi) তথাকার ভারতীয় শ্রমিক ও বাসিন্দাদের নেতারূপে 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স' বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অবতীর্ণ

হইয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয়দের উপর তথাকার সরকার-পক্ষীয়রা নানাভাবে উৎপীড়ন ও অপমানকর আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে আইন-অমান্য আন্দোলন। ভারত সরকার প্রত্যক্ষভাবে কিছুই করিতে পারেন না, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিবের দপ্তরাধীন। ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ সরজমিনে গত বৎসর (১৯১২) মহামতি গোখ্‌লে দেখিয়া আসিয়াছিলেন ; এইবার এন্‌ড্রুজ পিয়ার্সন চলিলেন।

ইঁহাদের যাত্রার পূর্বদিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে যে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে ইঁহাদের যাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন রবীন্দ্রনাথ। বিদায়কালে ছাত্রদের যে সভা হয় তাহাতে পিয়ার্সন বলেন, "আমি এবং আমার বন্ধুর (এন্‌ড্রুজ) পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে, শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।" সেইদিন হইতে গান্ধীর সহিত শান্তিনিকেতনের যোগসূত্র বাঁধা পড়িল।

কিন্তু আমার প্রশ্ন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্যাদি রবীন্দ্রনাথ কি এই প্রথম অবগত হইলেন? আমাদের মতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আদর্শে কবি তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অপরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালের মডার্ন রিভিউ (ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, পৃ. ১৯২) পত্রিকায় গান্ধীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মন্তব্য বিবিধ প্রসঙ্গ মধ্যে ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "Mr. M. K. Gandhi, the well-known Indian leader of the Transvaal, with many others of his way of thinking, have been sent to jail for not registering themselves according to the notorious anti-Asiatic regulations of that colony. All honour to these sturdy patriots."

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির নাম ও কার্যাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই এন্‌ড্রুজকে এক পত্রে লেখেন, "You know our best love was with you, while you were fighting our cause in South Africa along with Mr. Gandhi and others."

এন্‌ড্রুজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌছিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে গান্ধীর আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন। নবগঠিত Uuion of South Africa-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্মাট্‌স এর (Jdn Christian Smutts 1870-1950)

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীমাংসার জন্ত এনড্রুজ গান্ধীকে লইয়া প্রিটোরিয়া যান, এবং বহু বাক্-বিনিময়ের পর একটা সমঝোতায় তাঁহারা উপনীত হন। এই সব তথ্য এনড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া জানাইতেছেন।

ভারতীয়দের সহিত স্মাট্সের সাময়িকভাবে সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেলে গান্ধীজি দেশে ফিরিয়া আসাই স্থির করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে লনডনে গিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ঔপনিবেশিক সচিবের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু তখন বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, উপনিবেশে ভারতীয় শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময় কাহারও নাই, অতঃপর গান্ধী ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

বোম্বাই পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীরা ডারবান (Durban) হইতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের বোলপুর বিদ্যালয়ে আশ্রয় পাইয়াছে। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থা এনড্রুজের ইচ্ছানুসারে নিষ্পন্ন হয়। শান্তিনিকেতনে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসিয়া নূতন বাড়িতে আশ্রয় লয়। রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তর ভারতে ইতস্তত ভ্রমণরত। গান্ধীকে লিখিলেন—(কোথায়, কোন্ ঠিকানায় জানি না)

"Dear Mr. Gandhi"—ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র মি. গান্ধীর নামে লিখিত। "That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India, has given me real pleasure ..... We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Santiniketan fruitful."

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ১৫ই নভেম্বর ১৯১৪। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেখিয়া তাঁহার ভালই লাগিতেছে। তবে তাহাদের সম্বন্ধে এনড্রুজকে লিখিতেছেন যে, এই ছাত্রদের "has disciplines where they should have ideals. They are trained to obey which is bad for a human being, for obedience is good, not because it is good in itself, but it is a sacrifice. These boys are in danger of forgetting to wish for anything, and wishing is the best part of attainment."

দুইদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন (১৮ নভেম্বর ১৯১৪) যে, ইহাদের System of training সম্বন্ধে মনের সন্দেহ কিছুতেই যাইতেছে না।

গান্ধীজি ও তাঁহার পত্নী কস্তুরীবাঈ তাঁহাদের পুত্র দেবদাস এবং ফিনিক্স বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ও কর্মীদের দেখিবার জন্য বোলপুর আসিলেন ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি—তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। তথাচ তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্রমে দুইদিন থাকিতে না থাকিতে তার-বার্তায় জানিতে পারিলেন পুনায় গোখ্‌লের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়াই গান্ধী সস্ত্রীক পুনা যাত্রা করিলেন। অতঃপর ৬ই মার্চ গান্ধীজি পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; যে স্থান তাঁহার পুত্র ও ছাত্রদের আশ্রয় দিয়াছে, সেই স্থানটি সম্বন্ধে ভালো করিয়া জানিতে চান।

গান্ধীজি ৬ হইতে ১১ মার্চ শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্বভাবমতে আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদের সহিত মিলিত হইয়া ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায় স্বাবলম্বী জীবন যাপনে উদ্‌বোধিত করিলেন। তখন আশ্রমের পাকশালায় 'ব্রাহ্মণ' পাচকরা রন্ধন করিত, ব্রাহ্মণ ছাত্ররা ইচ্ছা করিলে পৃথক ভাবে ভোজন করিতে পারিত। গান্ধীজির মতে 'আশ্রমে' এ শ্রেণীর জাতিবিচার বাঞ্ছনীয় নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানস্থিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ে ও জোহান্স-বার্গের তোলস্তয় (Tolostoy) ফার্মে জাতিভেদ মানা হইত না, শেষোক্ত আশ্রমে মুসলমান ও খৃষ্টান কর্মীরা একত্র পান ভোজন রন্ধনাদি করিত। রবীন্দ্রনাথ তখন সুরুলের কুঠিবাড়িতে আছেন, 'ফাল্গুনী' নাটক সদ্য শেষ করিয়াছেন। গান্ধীজির সহিত আশ্রমে জাতি-বিচার মানিয়া চলার ঔচিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইলে কবি বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোনো দিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজ বিষয়ক মত বা বিশ্বাস নিরাকৃত করিবার জন্য কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করেন নাই। তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে সাফল্য মণ্ডিত হইলেও ছাত্র ও কর্মীদের অন্তরের পরিবর্তন হইবে না। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন দৈহিক শক্তি বা নৈতিক জুলুম বা চাপের দ্বারা কার্য-সিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে গান্ধীর সহিত রবীন্দ্রনাথের চরম পার্থক্য। এই প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইলেন। তারপর পঁচিশ বৎসর (১৯১৫-১৯৪০) নানা ক্ষেত্রে, নানা ভাবে উভয়ের মতের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল।*

* ১০ মার্চ ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে স্বাবলম্বন নীতি প্রবর্তিত হয়—ছাত্র, পাচক, মেথরের সকল কাজ শিক্ষক ছাত্ররা করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু প্রশ্ন—মতের দ্বন্দ্বই ঘটিয়াছিল—মত ঐক্যের কোনো সামান্য ভূমিকা কি ছিল না ? আমাদের মনে হয় ছিল। সার্থক বিশ্লেষণ হইলে দেখা যাইবে পূর্ব-দিকে যাত্রা করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণান্তর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করা যায়, আবার পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেও আপন কুটীরে আসিয়া পৌছানো যায়। ভারত-ভাবনায় উভয় উভয়ের পরিপূরক,—দেহীর কোমল ত্বকের সহিত কঠিন অস্থির যেমন অচ্ছেদ্য বন্ধন। আজ গান্ধীজির জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রত্যেক ভাবুক ও কর্মীর পক্ষে ভারতের দুই প্রান্তবাসী দুই মহাপুরুষ—যাঁহাদের জীবন ও জীবিকা আর্ট ও অর্থনীতি বিষয়ে মতামতের মিলনসূত্র পাই না—তাঁহাদের জীবনদর্শন আলোচনার গবেষণাকেন্দ্র শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতেই স্থাপিত হওয়া উচিত। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির মর্মর বা কন্‌ক্রীট মূর্তি স্থাপন দ্বারা তাঁহার অক্ষয় ভাবনাকে অমর করা যাইবে না।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে পর্ণকুটীর আপন স্ত্রী পুত্রাদির বাসের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন ও যেখানে গান্ধীজি, কস্তুরীবাঈ, দেবদাস, মণিলাল ও ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীরা বাস করিয়াছিলেন, সেই জীর্ণ 'নূতন বাড়ি' মেরামত করিয়া গান্ধী দর্শন আলোচনার ও গবেষণার কেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে। সেই পর্ণকুটীর হইবে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

* * * *

অর্ধশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে। গত দশ বৎসর ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকরা নানাপথে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের দমন করিবার জন্য যুদ্ধপর্বে ভারতরক্ষা আইন (Defence of India) অর্ডিনান্সরূপে চালু হইয়াছিল। অর্ডিনান্সের আয়ুকাল যুদ্ধশেষের পর মাত্র ছয় মাস। তজ্জন্য যুদ্ধ শেষে ভারতরক্ষা বিষয়ক বিশেষ বিধিটিকে আইন সঙ্গত করিবার প্রয়োজন-বোধে গবর্মেণ্ট এক কমিটি গঠন করেন। বিলাতের রৌলট্ নামে জনৈক জজ্ এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। সেইজন্য এই রাজদ্রোহ তদারকী কমিটি রৌলট্ আইন নামে কুখ্যাত। গান্ধীজি এই আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে এই আইনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য হরতাল পালনের আহ্বান জানাইলেন। ইহার পর এক সপ্তাহ মধ্যে যে সব ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হইল, তাহা ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া আছে। নিরুপদ্রব অহিংসা-হরতাল-পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে জনতার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল

আস্ফালনে জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পাঞ্জাব সরকার ফৌজিশাসন ঘোষণা করিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিলেন। পুলিসের গুপ্তচর হংসরাজের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগে উৎসব করিতে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ সেনাপতি ডায়ারের আদেশে ভারতীয় সৈন্যরা নিষ্ঠুরভাবে গুলি করিয়া তিন শতাধিক লোককে হত্যা ও কয়েক সহস্রকে আহত করিল (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)।*

পাঞ্জাবে ফৌজি আইন প্রবর্তিত হইবার দুই দিন পরে (১২ এপ্রিল) রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এক পত্র লিখিয়া কলিকাতার দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এ পাঠাইলেন; উহা প্রকাশিত হয় ১৬ই। ইতিমধ্যে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু সে-বার্তা বাহিরে রাষ্ট্র হয় নাই,—কঠোর ফৌজি আইন ভেদ করিয়া কোনো সংবাদ প্রদেশের বাহিরে আসিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ কোনো দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র মধ্যে তিনি লেখেন—"মাতৃভূমির সেবার জন্য আপনি এমন একটি সময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন, যখন দেশের দরকার আপনার মুখ হইতে ভারতের সেই শাশ্বত আদর্শের কথা শ্রবণ। ধর্ম বিজয়ের পথে দেশকে আপনি চালনা করুন।...আপনি অন্যায়ের প্রতিরোধে যে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন তার কোনো ছিদ্রপথ দিয়া পাপ প্রবেশ করিয়া যেন আমাদের আত্মিক স্বাধীনতাকে দুর্বল করিয়া না দেয়—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।..."

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কবি বহুদিন পরে জানিতে পারেন। এবং জানা মাত্র এই নৃশংসতার প্রতিবাদে ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে চারি বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত 'স্যর' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া (১৯১৯ জুন ২) বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্যর' উপাধি ত্যাগের পর ১লা অগস্ট গান্ধীজি তাঁহার কাইসর-ই-হিন্দ পদক ও বুয়র যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত পদক গবর্মেণ্টকে প্রত্যার্পণ করেন।

স্বাধীনতার আন্দোলন ত্বরিত বেগে বহু মুখে ধাবিত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাভূত তুর্কীর সুলতান-তথা-ইসলামের খলিফার রাজকীয় সম্মান অত্যন্ত সংকুচিত ও সীমিত হইলে, ভারতীয় মুসলমান এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তেজিত। গান্ধীজি এই ধর্মীয় ব্যাপারে ও বহির্ভারতীয় রাজনীতিক বিষয়কে

* তেরো বৎসর পূর্বে এই নববর্ষের দিনে (১৯০৬) বরিশালে পুলিসের লাঠিতে বাঙালী 'স্বদেশী' স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম রক্তপাত হইয়াছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত যুক্ত করিয়া ভাবিয়াছিলেন বিদেশীর দ্বারা লাঞ্ছিত ইসলামের ধর্মগুরু খলিফার ইজ্জত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত মুসলমানকে হিন্দুর সহায়তা দান করা উচিত। মুক্তির আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার পথে যে চালিত হইল, তখন গান্ধীজি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব ও খিলাফত আন্দোলন সমর্থন লাভ করিল। অধিবেশনের পর গান্ধীজি সদলে শান্তিনিকেতনে আসেন—তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মর্মকথা প্রচার-উদ্দেশে পাশ্চাত্য দেশে সফরে আছেন। গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসী সদস্তদের আশ্রমে আতিথ্যদানের ব্যবস্থা এনড্রুজই করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত বলা উচিত রবীন্দ্রনাথ ও এনড্রুজ কেহই ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে বহির্ভারতের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আমদানির পক্ষপাতী ছিলেন না। তবুও এনড্রুজ মনে প্রাণে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী—ভারতকে স্বাধীন (Independent) করিয়া বৃটিশের অপসারণ দাবি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এই সময়ে,—তখনও দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-আমেরিকা সফর করিতেছেন; তিনি সেখান হইতে পত্রধারায় এনড্রুজকে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার মতে অসহযোগনীতি নঙাত্মক। তাঁহার পত্রধারা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ দ্বারা বৎসর-কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করিবে এই স্বপ্নে বিভোর। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী বা মহাত্মাজির মতের বিরোধী জানিয়া জনতা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিলেন (১৬ জুলাই ১৯২১)। মাসেক কালের মধ্যে 'শিক্ষার মিলন' ভাষণে পরোক্ষভাবে গান্ধীর অসহযোগ-নীতির সমালোচনা প্রকাশিত হইল। ইহার পরেই 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে (২৯ অগস্ট ১৯২১) সমালোচনা আরও স্পষ্ট ও তীব্র হইল।

বাহিরের উত্তেজনা কবিকে স্পর্শ করিল না। তাঁহার আর্টিস্ট সত্তা মহা-সমারোহে কলিকাতায় 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব উদ্‌যাপন করিল। জনতা কবির এই আচরণে আরও রুষ্ট হইল। অতঃপর য়ুরোপ-আমেরিকার সহযোগিতায় 'বিশ্বভারতী' (১৯২১ ডিসেম্বর ২২) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশ্বমানবতার সময় নহে! দেড় মাস পরে সুরুলে গ্রামোন্নতির জন্য (Rural Reconstruction) প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। ইহার অর্থ আসিল আমেরিকা

হইতে, কর্মীরূপে আসিলেন 'এলমহার্স্ট' ইংলণ্ড হইতে। জনতার মতে রবীন্দ্রনাথের এই সব আচরণ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে দুর্বল করিতেছে। গান্ধীজি বলিয়াছেন বৎসরকাল মধ্যে স্বরাজ পাইবে। জনতা উন্মত্ত। অকস্মাৎ অহিংস আন্দোলন অত্যন্ত বীভৎসভাবে উত্তর ভারতের চৌরিচোরা গ্রামে প্রকট হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে বরদৌলীতে কংগ্রেস পরিচালক মণ্ডলী সমক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশব্যাপী করিবার জন্য গান্ধীজি কার্যসূচী পেশ করিয়াছিলেন। দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের দ্বিধা ঘুচিতেছে না। তিনি গুজরাটের সাহিত্যিক নানালাল দলপতরামকে এক 'খোলা পত্রে' তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। পত্রখানি 'বেঙ্গলি' দৈনিকে ১লা ফেব্রুয়ারি (১৯২২) প্রকাশিত হইল। কবির বক্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিক ও বণিক সমাজের সহিত ভারতের অসম্বদ্ধ, অসংযত, অশিক্ষিত জনতার তুলনা হইতে পারে না। কবি বলেন, পৃথিবীর মহাপুরুষগণ প্রেম ক্ষমা অহিংসার ধর্ম প্রচার করিয়াছেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য—প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা জীবনের কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাফল্য লাভের জন্য নহে।

বেঙ্গলি কাগজে যেদিন এই পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল (৩রা ফেব্রুয়ারি) তাহার পরদিন চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, দেশের প্রতি প্রেমের প্রকাশ হইল—নির্দয়ভাবে দেশবাসীকে দগ্ধ করিয়া। এদিকে শান্তি-নিকেতনের অদূরেই ৬ই ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসীদের উন্নতি ও গ্রামের সংস্কার বৈজ্ঞানিকভাবে করিবার জন্য শ্রীনিকেতন স্থাপিত হইল। একজন স্তব্ধ হইয়া নিরালায় কর্মে ব্রতী, অপরজন দেশব্যাপী আন্দোলন, অশান্তি সৃষ্টি করিয়া ভীরু নির্জীব জনতাকে পথ চলিতে বলিলেন—তিনি বলিলেন, পথ ভুল হয় হোক, চলতেই হইবে। জনতার মনে দুর্জয় সাহস আনিলেন গান্ধীজি একথা তাঁহার কঠোর বিচারকরাও স্বীকার করিবেন। কবি জানিতেন দীপান্বিতা কালে ঘরে ঘরে দীপ জ্বালাইতে হয়, গ্রাম দগ্ধ করিয়া যে আলোক হয়, তাহা একবারই আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কিন্তু তারপর আর সেখানে গৃহদীপ জ্বলে না।

চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ডের পর, গান্ধীজি বুঝিলেন অশিক্ষিত জনতার পক্ষে অহিংস সত্যাগ্রহনীতি পালন করা সম্ভব নহে। তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা ত্বরায় অভীষ্ট সিদ্ধি-প্রয়াসী। সেইজন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন ও দেশবাসীকে গঠনমূলক কর্মে ব্রতী হইবার জন্য বলিলেন—সেই গঠনমূলক কার্য হইল—চরকা কাটা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান,

মাদক দ্রব্য বর্জন ও মামলা মোকদ্দমা বন্ধ করিবার জন্য স্থানিক সালিসী মজলিস গঠন। এই কর্মসূচী আন্দোলন দ্বারা দেশব্যাপী করিতে হইবে। 'চরকা' আপামর জনতা গ্রহণ করিবে—ইহাই গান্ধীজির অভিমত। সেই বার্তা প্রচার-জন্য গান্ধীজি বাংলাদেশ সফরে আসেন ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন (২৯শে মে ১৯২৫)। চরকা কাটা, খদ্দর পরা প্রভৃতি বিষয় লইয়া দুই মহাপুরুষের মধ্যে আলোচনা হইল। বলা বাহুল্য মতৈক্য হইল না। রবীন্দ্রনাথ দিব্যচক্ষে যেন দেখিতে পাইলেন—এ আন্দোলন ভারতব্যাপী হইলেও সফল হইতে পারে না। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সদাই সঞ্চরমাণ,—আদিমকালের যন্ত্র আধুনিককালে অচল। তাই মানুষ নিত্যনূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া চলিতেছে। আজ চরকা খদ্দরের কী দশা—তাহা সর্বজনবিদিত।

গান্ধীজি এইবার শান্তিনিকেতন বাস কালে শ্রীনিকেতনের গ্রামোদ্যোগ ও শিক্ষাসত্র নামে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় দেখিয়া যান। শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও এলমহার্স্টের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন ১৯২৫ সালে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠেই আরম্ভ হইয়াছিল।*

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীনিকেতনে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় গ্রাম-বালকদের জন্য স্থাপিত হয় ১৯২৪ সালে। ইহার এক দশক পরে গান্ধীজি প্রবর্তিত ওয়ার্ধা (Wardha) শিক্ষাবিধির খসড়া প্রণীত হয়। বৃটিশ যুগের শেষ পাদে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু শাসনসংস্থায় অধিষ্ঠিত হইলে বুনিয়াদী শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হয়।** কিন্তু গান্ধীজির অতি-কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাবিধি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি আর্টিস্ট ও জীবনশিল্পী—খেলা ও কাজ, চারুকলা ও কারুকলা, সংগীত ও নৃত্য, গৃহাভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও গৃহের বাহিরে উদ্যান রচনা—এ সবই তাঁহার শিক্ষাবিধির অন্তর্গত।

মূলগত মতভেদ হইতে মতান্তরে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পরস্পরকে বহুবার সমালোচনা করিয়াছিলেন। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল, সে-কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে উভয়েই অহিংসাবাদী ও বৃটিশ কূটনীতির কঠোর

* তখন শিক্ষাসত্র শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের গৃহের নিকট ছিল। ১৯২৬এ তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। এখন 'শিক্ষাসত্র' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। তুলনীয়—গ্রাম্য তথাকথিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি; সাধারণ 'পাঠশালা' ছাড়া সেগুলি কিছুই নহে—আমার ঘরের কাছেই একটা আছে বলিয়া জানি।

** এই শিক্ষাবিধি শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের শিক্ষাবিধির বিস্তারিত রূপ—এ তত্ত্ব ঐতিহাসিক সত্য।

সমালোচক। বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে না—একথা উভয়েই জানিতেন। তবে গান্ধীজি কূটনীতিজ্ঞ, তাই ডিপ্লোমেসির খাতিরে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে মাঝে মাঝেই অগ্রসর হইতেন; এবং পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন বহুবার। খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দ্বারা তিনি ভাবিয়াছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আকর্ষণ করিতে পারিবেন; তাহা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ তাঁহার জীবিত কালেই ভারত পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হইল এবং আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন হিন্দু-মুসলমান মিলন সমস্যা কোথায়। বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাহাদের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয়। সমস্যা কোথায় জানিতেন বলিয়া তিনি অলীক আদর্শ-বাদের দোহাই দিয়া মিথ্যা স্বর্গরাজ্য গড়িবার জন্য উপদেশ দেন নাই। তাঁহার মতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে অস্তিত্ব স্বীকার মাত্র। এবং তাহারা আমাদের 'জিম্মী' বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেও চলিবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলে, তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মানদান করিলেই, তাহারা ভারত সমাজের সার্বিক কল্যাণের সমান অধিকারী হইবে। Uniformity বা বাহ্যিক লক্ষণাদি ধারণের দ্বারা ঐক্য বা unity সম্ভবে না। হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার মূল অভিপ্রায় ছিল বৃটিশ সরকারকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাভূত করা। মানবীয়তা বা মানবধর্মের অপরিহার্য অঙ্গরূপে এই মিলনের প্রয়োজন—এই মহাবাক্য উহ্য রহিয়া গেল—কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না করিয়া ভাবিয়াছিলাম বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করিব—আপাতত প্রয়োজন—ভারতে বৃটিশ শক্তির অবসান-আনয়ন। কিন্তু সে গোঁজামিলের প্রচেষ্টা যে দারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা প্রতিদিনের সংবাদপত্র ভূরি প্রমাণ দ্বারা সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

নিরস্ত্র, দুর্বল, দরিদ্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য অসহযোগ সত্যাগ্রহ আইন-অমান্য প্রভৃতি যেমন রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার নির্দেশ দেন গান্ধীজি, তেমনি অনশন ছিল তাঁহার আর এক ব্রহ্মাস্ত্র—সেই অনশন-অস্ত্র আজ (অশিক্ষিত জনতার পক্ষে সহজে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ন্যায়) হাস্যকরভাবে সুলভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতির ঘোর বিরোধী, তাঁহার মতে দৈহিক নির্যাতন হইতে অনশনের নৈতিক জুলুম কিছু কম বিরক্তিকর নয়। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে একাসনে বসানো বিপজ্জনক।...মহাত্মাজি যদি মাঝে মাঝে চিত্ত শোধনের জন্য এই কৃচ্ছ্রসাধনা করতেন তা হলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত। মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশন ব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে— বরঞ্চ ফলটা উলটো হবারই কথা।..... লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে আপন বলে স্বীকার করে নি।...গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষি আমার দেশে ছড়িয়ে গেছে।" আজ যাহারা গান্ধীবাদকে কোনো মতবাদ বলিয়াই স্বীকার করে না, তাহারা তাঁহার 'অনশন' ধর্মঘট প্রত্যেকটি দাবি-দাওয়ার অপূরণেই আরম্ভ করিয়া গবর্মেণ্টকে অযথারূপে বিব্রত করিয়া তোলে।

এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে মতভেদ যতই থাক, রবীন্দ্রনাথের কাছে গান্ধী ছিলেন 'মহাত্মাজি' (এ নাম নাকি তাঁহারই প্রদত্ত) ; গান্ধীর নিকট রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'গুরুদেব'। তাই পুনা-প্যাক্টের পূর্বে যেরবাদা জেলে অনশন আরম্ভ করিয়া গুরুদেবের কাছে তারবার্তায় আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর অর্থসন্ধানে ছাত্রছাত্রীদের লইয়া উত্তর ভারত সফর করিতেছেন, তখন গান্ধীজি দিল্লীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন কত টাকার ঘাটতির জন্য কবি এই বৃদ্ধ বয়সে নগরে নগরে ঘুরিয়া ফিরিতেছেন। গান্ধীজি সেই অর্থঘাটতি পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কবির শরীর জীর্ণ, মৃত্যুপথযাত্রী। গান্ধীজি ও কস্তুরীবাঈ কবিকে শেষবারের মতো দেখিতে আসিলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালে—পঁচিশ বৎসর পূর্বে ১৯১৫ সালে এই তারিখের কাছাকাছি ইঁহারা সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন—তাঁহাদের পুত্র, আত্মীয় ও ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেখিবার জন্য। সেবার মধ্যরাত্রে ক্ষীণদীপালোকে মাধবীকুঞ্জে গান্ধীজিকে অভিনন্দিত করেন আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ। এবার আম্রকুঞ্জে বিপুলভাবে সংবর্ধনা হইল— কবি রুগ্ন শরীরেও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দুই দিন গান্ধীজি আশ্রমে বাস করিবার পর ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪০) প্রত্যাবর্তনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে খামে মোড়া এক পত্র দেন। গান্ধীজি বোলপুর স্টেশনে পত্রটি পাঠ করেন—কবি লিখিয়াছিলেন, "Accept this

institution under your protection giving it an assurance of permanence if you consider it to be a national asset, Visvabharati is like a vessel which is Carrying the Cargo of my life's best treasure...."

গান্ধীজি ট্রেনে বসিয়া উত্তরে লিখিলেন "...Visvabharati is a national institution. It is undoubtedly also international. You can depend upon my doing all I can in the common endeavour to assure its permanence."

দশ বৎসর পরে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর নূতন সংবিধান রচনান্তে ভারত রিপাবলিক গঠিত হইল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) ও আবুল কালাম আজাদ প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হইয়া বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্রয় দান করিলেন—তখন রবীন্দ্রনাথও নাই, গান্ধীজিও নাই। রবীন্দ্রনাথের life's best treasure-কে গান্ধীজির অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়িত্ব permanence-দানের জন্য অগ্রসর হইলেন।

দরশনে ভেল অনুরাগ

ক্ষিতীশ রায়

গান্ধীজীর সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯১৫ সনে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে দু-জনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া উচিত ছিল। দেখা সম্ভবত হয়েও থাকবে কিন্তু পরিচয় হয়নি। আমার এই কথাটা নিতান্ত অলস অনুমান যে নয় তার নজির আছে গান্ধীজীর আত্মকথায়, গুরুদেবের য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরিতে এবং অন্য কিছু প্রসঙ্গে।

১৮৯০ সনে দু-জনে হয়তো একই সময়ে কিংবা অল্পদিনের ব্যবধানে প্যারিস একজিবিশনে উপস্থিত হয়ে ঈফেল টাওয়ারে আরোহণ করেন। সে ঘটনাটা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে।

ওই বছরেই ২রা অক্টোবর তারিখের দিনলিপিতে দেখি গুরুদেবের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হয়েছে নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে। গান্ধীজীর আত্মকথা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে থাকবে, একটি পুরো অধ্যায়ে তিনি নারায়ণ হেমচন্দ্রের কথা বলেছেন। এই নিরীহ শীর্ণ খর্ব মানুষটিকে গুরুদেব ভারতবর্ষে থাকতে জানতেন। ইনি বাঙলা শিক্ষা করে অনেক ভালো ভালো বাঙলা বই গুজরাতীতে তর্জমা করেছিলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপক্রমে বলেছিলেন যে, বাংলা মুলুকে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ও গুজরাতী ভাষীদের কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছেন। গান্ধীজী ও গুরুদেব উভয়েই নারায়ণ হেমচন্দ্রের কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। গুরুদেব তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, "বেচারীর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে আমি তাঁকে আমার এক স্যুট গরম কাপড় দিলুম।" ত্রিশ বছর বয়সের শাজোয়ান গুরুদেবের দেহের মাপে তৈরি এই কাপড়-চোপড়—নারায়ণ হেমচন্দ্রের মতো রোগা ও বেঁটে লোকের গায়ে কি রকম মানিয়েছিল, সে এখন কেবল কল্পনার বিষয়।

আর জল্পনার বিষয় এই যে, নারায়ণ হেমচন্দ্র হয়তো গান্ধীজী ও গুরুদেবের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের সেতু হলেও হতে পারতেন। কিন্তু নিয়তির বিধানে এই সেতুবন্ধনের গৌরব তোলা ছিল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ-এর ভাগ্যে।

আরও একবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটতে পারত ১৯০১ সালে। সে-বছর

গুরুদেব ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পত্তন করে, ১১ই মাঘে কলকাতা এসেছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়ির মাঘোৎসবে আচার্যের কাজ করতে। গান্ধীজী সেবার কলকাতার কংগ্রেসে উপস্থিত। সেই অধিবেশনের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও জানকীনাথ ঘোষাল, অর্থাৎ গুরুদেবের ন-দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী। গান্ধীজীর আত্মকথা থেকে জানা যায় কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর, মাসখানেকেরও বেশী কাল গোখ্‌লের অতিথি হয়ে তিনি কলকাতায় থেকে যান। সে সময় তিনি জোড়াসাঁকো বাড়িতে মহর্ষির সন্দর্শনে গিয়েছিলেন। অসুস্থতানিবন্ধন দেখা হয়নি, কিন্তু সম্ভবত জানকীনাথের মধ্যস্থতায় তিনি মাঘোৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। আত্মকথায় তিনি লিখেছেন: "সেই উপলক্ষে কয়েকটি সুন্দর বাঙলা গান শোনবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তখন থেকে বাঙলা গানের আমি অনুরাগী।"

নোয়াখালি পরিক্রমায় যিনি একলা চলার পথে পথিক হয়েছিলেন, ১৯০২ সনে তিনি সম্ভবত জানতেও পারেননি জোড়াসাঁকোর মাঘোৎসবে সে সময় প্রধানত গুরুদেবের গানই গাওয়া হত এবং তাঁরই নেতৃত্বে। জোড়াসাঁকো বাড়ির মাঘোৎসবে সেই তাঁর প্রথম ভাষণ—বিষয় ছিল, কী উপায়ে ভারতের বহু বিচিত্রতা একটি বৃহৎ আদর্শে সংহত করা যায়। গুরুদেব বলেছিলেন—সে কেবলমাত্র উপনিষদের আনন্দরূপমমৃতম্ ও একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবপর। এ যাত্রায়ও দূর থেকে দুজনের দেখা হয়ে থাকবে, কিন্তু খুব কাছে এসেও আলাপ পরিচয় হয়নি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই গুরুদেবের কি রকম নিকট যোগ ছিল, সে আমরা অনেকেই জানি। এই দুটি পত্রিকার পুরাতন ফাইল ঘাঁটলে দেখা যায় যে, ১৯০৮ সনেই রামানন্দবাবু দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা ও গান্ধীজীর আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছিলেন। সেই বছরেই Modern Review পত্রিকায় গান্ধীজী ও ট্রান্সভালে তাঁর সত্যাগ্রহের বিষয়ে সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করে, রামানন্দবাবু বলেছিলেন, পরবর্তী বছরে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী গান্ধীকেই সভাপতির পদে বরণ করা উচিত। সুতরাং অনুমান করা যায়, এই দুই পত্রিকা মারফত গুরুদেব গান্ধীজীর বিষয়ে অনেক কথা পূর্ব থেকেই জেনে থাকবেন। আবার অনেকে এমনও অনুমান করেন যে, "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় চরিত্রটি গান্ধীজীর ছাঁচে ঢালা না হলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহীর দ্বারা পরোক্ষ ভাবে

অনুপ্রাণিত। তবে সেটা কেবল মাত্র অনুমানই—গুরুদেবের কাছ থেকে এই অনুমানের সমর্থনে কেউ সত্যাসত্য যাচাই করে নেননি। এমন কি, গুরুদেবের অশীতিবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে প্রকাশিত বিশ্বভারতী ইংরেজী ত্রৈমাসিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-রচিত যে প্রবন্ধ আছে, তাতে ধনঞ্জয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও নো-ট্যাক্স আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে তার তাৎপর্য বিষয়ে বিশদ বর্ণনা থাকলেও, গান্ধীজীর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের কোনো তুলনামূলক আলোচনা নেই।

তবে একথা ঠিক, গুরুদেব যখন "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক রচনা করেন তখন কিংবা তার কিছু আগের থেকেই তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তায় একটা আলোড়ন এসেছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তিনি "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান" গান গেয়ে, গড়পার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে এক বিরাট শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেছিলেন। অথচ তার বছর দুই পরে দেখি "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে তিনি পুনরায় তাঁর সেই স্বদেশী সমাজের সংগঠনী পরিকল্পনা তুলে ধরে, দেশের যুবশক্তিকে সত্যকার স্বায়ত্ত শাসনের কাজে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের সুড়ঙ্গপথে দেশের তরুণেরা যখন হিংসার হাতিয়ারে শান দিতে লেগেছে, মজঃফরপুরে যখন বোমা ফাটল, মানিকতলার ষড়যন্ত্রীরা যখন ধরা পড়ল, গুরুদেব তাঁর "পথ ও পাথেয়" বক্তৃতায় পুলিসী জুলুমের যেমন নিন্দা করলেন তেমনি আদর্শ-নিষ্ঠ তরুণ বাংলার আত্মোৎসর্গপরায়ণ বীরহৃদয়কে অভিনন্দিতও করলেন। সেই সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন—সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতের মুক্তির পথ নয়, বুঝেছিলেন হিংসাকে প্রতিরোধ করতে হবে অহিংসার দ্বারা। একদিকে তিনি যেমন তদানীন্তন কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের আমলাতন্ত্রী মনোভাব সমর্থন করতে পারেননি, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপেও সায় দিতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন—ত্যাগ ও আত্মশক্তির সাধনায় গ্রামীণ ভারত যেন স্বাধিকারের ভিত্তিতে আত্মিক শক্তি লাভ করে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক যিনি হবেন তাঁকে হতে হবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি অকুতোভয়ে বলতে পারবেন—রাজ্যটা কেবল রাজার নয় প্রজাসাধারণের মঙ্গলেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁর সেই আদর্শ দেশনেতার প্রতীক হলেন "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী। যে-উপন্যাসের আখ্যানভাগের উপর এই নাটকের ভিত্তি, সেই "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসে এই বৈরাগীর চরিত্র নেই। ট্রান্সভাল সত্যাগ্রহের অহিংস প্রতিরোধীকে যদি তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীতে রূপান্তর করে

থাকেন—তাহলে তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই।

১৯১৩ সনে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য দিল্লী ছেড়ে চলে আসেন। দিল্লীতে থাকতেই গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলন বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এণ্ড্রুজকে বহু কথা বলেন এবং অনুরোধ করেন যে, শান্তিনিকেতনের কাজে পুরোপুরি যোগ দেবার আগে পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ যেন একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর কাজ দেখে আসেন। তদনুসারে এঁরা দুজনে যখন গুরুদেবের কাছে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, গুরুদেব সানন্দে তাঁদের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এণ্ড্রুজ যখন গুরুদেবের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহন করে নেবার জন্য একটি বাণী প্রার্থনা করেন, গুরুদেব বলেন, আশ্রমের অন্তরস্থিত শান্তং শিবমদ্বৈতমই হলো দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি তাঁর বাণী।

মনে হয় শান্তং শিবমদ্বৈতম মন্ত্র ছাড়া এণ্ড্রুজ পিয়ার্সনের হাতে দিয়ে গুরুদেব একটি বাণীও পাঠিয়ে থাকবেন। গান্ধীজী সম্পাদিত Indian Opinion পত্রিকার Golden Number প্রকাশিত হয় গান্ধীজী শেষ বারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে যাবার অল্পদিন আগে—১৯১৪ সনে। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ দেখা যায়:

In a letter to Mr. Gandhi Babu Rabindranath Tagore refers to the struggle in South Africa as the "steep ascent of manhood not through the bloody path of violence but that of dignified patience and heroic self-renuciation."

The power our fellow countrymen have shown in standing firm for their cause under severest trials, fighting unarmed against fearful odds, has given us." "The power" he says, "a firmer faith in the strength of the god that can defy sufferings and defeats at the hands of physical supremacy, that can make gains of its losses."

রামানন্দবাবুর এলাহাবাদের সহকর্মী ও বন্ধু নেপালচন্দ্র রায় তখন শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছেলেরা নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে একটি রাস্তা তৈরি করে। সে রাস্তা এখনো নেপাল রোড

নামে খ্যাত। এই রাস্তা বানাবার কাজের জন্য ছেলেদের দৈনিক মজুরী দেওয়া হত। তাছাড়া ছেলেরা তাঁদের জলখাবার থেকে কিছু কিছু আহার্য বর্জন করে তার মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল। সেই সঞ্চিত তহবিল শান্তিনিকেতনের ছেলেদের দান হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ফণ্ড-এ এণ্ড্রুজ মারফত পাঠানো হয়। ১৯১৩ সনের ৩০শে নভেম্বর তারিখে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান, ছেলেরা তাঁদের হাতে এই তহবিল ও ফিনিক্স-আশ্রমের ছেলেদের প্রতি তাদের প্রীতিসূচক একটি বাণী পাঠান।

ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সনে এণ্ড্রুজকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিলেত চলে যেতে হয়—তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। বিলেতে থাকতে এণ্ড্রুজ গুরুদেবের যে চিঠিটি পেয়েছিলেন তাতে প্রসঙ্গক্রমে বলা ছিল : You know our best love was with you while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi.

পিয়ার্সন সোজা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। ৩১শে মার্চ ১৯১৪ সনে দেখা যায় গুরুদেব আশ্রমের শিক্ষক ও ছাত্রদের সমভিব্যাহারে বোলপুর স্টেশনে পিয়ার্সনকে আনতে গেলেন। ৭ই এপ্রিল তারিখে পিয়ার্সন আশ্রমের একটি সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষে আফ্রিকা থেকে আনা কিছু কিছু কৌতূহলজনক দ্রব্যসামগ্রীর একটি প্রদর্শনী হয়। দিনেন্দ্রনাথ জুলুদের পিয়ানো যন্ত্রে গৎ বাজিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন।

১৭ই এপ্রিল তারিখেও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমস্ত আশ্রম ভেঙে পড়ে বোলপুর স্টেশনে। এণ্ড্রুজ সেদিন ফিরলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসা হল। শান্তিনিকেতনে একটি সংবর্ধনা সভায় মাল্যচন্দনে বিভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ সেদিন সন্ধ্যা বেলা সদ্যোরচিত একটি প্রশস্তি পাঠ করলেন।

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরস ধার
হে বন্ধু এনেছো তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।

তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু চরণে তাঁর, করি নমস্কার।

যে মাসে ছেলেদের হাতে লেখা ইংরেজী পত্রিকা The Asram-এ বেরুলো গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বালক সত্যাগ্রহীদের ফটো। ফিনিক্স-এর ছেলেদের হাতে লেখা ২৩শে জুলাই তারিখের একটি চিঠি এল পিয়ার্সন-এর কাছে। সে চিঠিতে সই ছিল প্রভুদাস, রামদাস, কুপ্পুস্বামী ও দেবদাসের। চিঠির বক্তব্য Convey our love to the boys of Santiniketan and Gurukula.

ফিনিক্স আশ্রমের ছেলেদের লেখা এণ্ড্রুজের নামে একটি চিঠি সেই হাতে-লেখা ইংরেজী কাগজ The Asram-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কপি হয়ে বেরুল :

"We are most anxiously and impatiently looking forward for that blessed day on which we will have pleasure of reading a meassage from those noble and beloved brethen who, although so far away from us, had encouraged us through their brave and noble work in that dark and stormy time of our struggle". এই রকম সময়েই লণ্ডন থেকে গান্ধীজী এণ্ড্রুজ-এর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যেন ফিনিক্স আশ্রমের ছেলেদের জন্য কোনো আশ্রম বিদ্যালয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

অক্টোবর মাসে ফিনিক্সের ছেলেরা ভারতে পৌছুলে পর কিছুদিনের জন্য তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হয় লালা মুন্সীরামের (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) হরিদ্বারস্থিত গুরুকুল আশ্রমে। ইতিমধ্যে গুরুদেব স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে তাদের জন্য নিজের বাসাবাড়ি দেহলির লাগাও নতুন বাড়িতে ফিনিক্স দলের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে রাখেন। অক্টোবরের শেষ দিকে মগনলাল গান্ধীর নেতৃত্বে ফিনিক্স-এর কুড়িজন ছেলে এসে নতুন বাড়িতে আশ্রয় নেন। গুরুদেব স্বয়ং তাদের দেখাশুনো তত্ত্বতদারক করতে থাকেন। সেই মাসের The Asram পত্রিকায় রামদাস গান্ধীর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "My Goal Experiences in South Africa."

এই সময় গুরুদেবকে কিছুদিনের জন্য কলকাতা হয়ে এলাহাবাদ যেতে হয়। কলকাতা থেকে ১৫ই নভেম্বর তারিখে তিনি এণ্ড্রুজকে একটি চিঠি লেখেন, "What little I have seen of the Phoenix boys, they are very nice. But it is a pity to be so completely nice..."

ফিনিক্স ছেলেদের পঠন-পাঠন শিক্ষা-শাসন আহার-বিহার ধরন-ধারন সবই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছেলেদের থেকে আলাদা ছিল। কাজে এবং বিশেষ করে রান্না-বান্না ও সাফাইয়ের কাজে, তাঁদের ছিল বিশেষ উৎসাহ। সেই তুলনায় হাসিখেলায় তাদের অনুরাগ ছিল একটু যেন কম। তাদের শিক্ষক মগনলাল ছিলেন নিয়ম নিষ্ঠার একজন কঠোর ভক্ত।

প্রথম প্রথম এই নিয়ম শাসনের কঠোরতা গুরুদেবের হয়তো ততটা ভালো লাগেনি। কিন্তু এণ্ড্রুজকে চিঠি লেখবার পরই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা একপেশে হয়ে থাকবে। তাই তিন দিন পর ১৮ই নভেম্বর তারিখের চিঠিতে এণ্ড্রুজকে আবার তিনি লিখলেন: "I had been somewhat unfair to the Phoenix boys in my last letter to you.... I have been able to come closer to them and I think they are very loveable, though I cannot get rid of my misgivings about their system of training."

ডিসেম্বর মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শান্তিনিকেতন আশ্রম সংবাদে দেখা যায়—"শ্রীযুক্ত গান্ধী এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। তাঁহার না আসা পর্যন্ত এই ১৫ জন ছাত্র আমাদের আশ্রমে থাকিবেন। ইঁহারা মিষ্ট কিংবা মসল্লাযুক্ত আহার্য বর্জন করেন। কেহ কেহ দুধ ও ঘৃতও সেবন করেন না। আশ্রমের যাবতীয় কাজ-কর্মে তাঁহারা সোৎসাহে যোগদান করিতেছেন।"

গান্ধীজী বিলেত থেকে বোম্বাই এসে পৌঁছান সম্ভবত ১৯১৫ সনের গোড়ার দিকে, এবং সম্ভবত সেই প্রথম গুরুদেব তাঁকে চিঠি লেখেন। চিঠির কথা ছিল এই রকম: "That you could think of my school as the right and likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India, has given me real pleasure and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Santiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the Sadhana of both of our lives."

১৯১৫ জানুয়ারির মাঝামাঝি গুরুদেব গেলেন কলকাতায় এবং সেখান থেকে শিলাইদহ। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এণ্ড্রুজ গান্ধীজীর তার পেলেন যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী বোলপুর পৌঁছুবেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি। সে সময় সভাসমিতির কাজে গুরুদেব কলকাতায় আটকা পড়েছেন। কিন্তু তা হলে কি হয়, সর্বদা তিনি খোঁজ নিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা। ওদিকে শান্তি-নিকেতনে গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ, ক্ষিতিমোহন সেন, অসিত হালদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গান্ধীজীর অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর উদ্‌যোগ আয়োজন প্রস্তুত।

যাঁর জন্য অত আয়োজন তাঁর গুজরাতী দিনলিপিতে তারিখে তারিখে দিনের সংক্ষিপ্ত সমাচার লিখিত হচ্ছে :

Monday 15 Feb. 1915—নগিনদাস সাথে আইবা বোলপুর তরফ রওয়ানা

16 Feb. 1915—রাস্তামাঁ

17th Feb. 1915—বর্ধমানমা Andrewsনে সন্তোষবাবু আইবা। Christনে খের গেয়া বোলপুর রাতে পহুচা। আসল ন অতিথি সংকার অলভইবো—।

গান্ধীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অল্প কথায় যে, অতিথি সংকারের কথা লিখেছেন, আত্মকথায় সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন "The reception was a beautiful combination of simplicity, art and love." শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র প্রফুল্ল চৌধুরী The Asram পত্রিকার জুন-জুলাই সংখ্যায় যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রত্যাশিত হলেও গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আসাটা উৎসবের রূপ নিয়েছিল। প্রফুল্ল চৌধুরীর কথাতেই সবটুকু শোনা যাক্ : "Then all the boys were engaged in cleaning the Asram...Some of us began to repair the main road and they did the work of about five days in a single day....During 15th, 16th and 17th we did nothing but cleaning the Asram, and making arches and dais to welcome Mr. and Mrs. Gandhi....On 17th when the time for going to the station came the bell was rung....We and the train reached the station at the same time....They had come outside the station by another path. They had put on very simple dress and there

were no shoes on Mr. Gandhi's feet. They refused to come to our Asram in the carriage sent by our Dwipendranath Tagore. So they began to walk with us...At first they went to see Mr. Dwijendranath Tagore, and after meeting him they came to the first gate....Then they came to the second arch...Then they came to the third gate and that was the finest and largest of the three....When they had taken their seats Khitimohan Babu, Mr. Rajangam and Mr. Dattatreya.. read some hymns at this gate. After the hymns were read, Mr. Dinendranath Tagore sang a song with a music party. Then Mr. Ashit Haldar presented a very fine picture...After the welcome...there was a feast that day...Mr. Gandhi requested the teachers to give us a holiday and we got a holiday next day."

গান্ধীজী এই সংবর্ধনা সভায় যা বলেছিলেন তা সেই বছরের চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গান্ধীজীর কথাতেই উদ্ধৃত হয়েছে: "The delight I feel today I have never experienced before. Though Rabindranath, the Gurudeva, is not present here yet we feel his presence in our hearts. I am particularly happy to find that you have arranged for the reception in the Indian manner..."

ওদিকে অভ্যর্থনার পরের দিনই (১৮ ফেব্রুয়ারি) কলকাতা থেকে আশ্রমগুরু এণ্ড্রুজকে লিখছেন, "I hope Mr. and Mrs. Gandhi have arrived... and Santiniketan has accorded them welcome as befits her and them. I shall convey my love to them personally when we meet. ...Monday will see me at Bolpur...."

কিন্তু ২০ তারিখের দিনলিপিতে গান্ধীজী লিখছেন, "রাজ্যগুরুনা স্বর্গবাস নো তার মেলেঁা। বোলপুর থি রওয়ানা। J. B. তার কইরেঁা। বর্ধমান স্থধী Andrews আইবা, খুব বাত হই। শিক্ষকো নি সাথে স্থধারানি বাত। ট্রেন মা সংকট। মগনলালনে নগিনদাস তথা বা সাথে আইবা।"

রাষ্ট্রগুরু গোখলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গান্ধীজী একটি শোকসভায় সভাপতিত্ব

করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেদিন বিকেলবেলা পুণা রওনা হয়ে গেলেন।

গুরুদেব ২২শে ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। গান্ধীজী তখন পুণায়। কলকাতায় থাকতেই গুরুদেব বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়!...তাই আমরা যৌবনকে আহ্বান করছি...। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এদেশে জন্মেছি যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব।...অরুণ লেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে ভয় নেই। আমাদের ভয় নেই।" শান্তিনিকেতনে যখন ফিরলেন তখনও যৌবনের এই জয়গানের রেশ গুরুদেবের মনে গুন গুন করছে। এবার তিনি শান্তিনিকেতনে না থেকে চলে গেলেন সুরুলের নতুন বাড়ীতে। কলকাতা থেকে তাগিদ এল গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলা সফরে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন বারাকপুরে তাঁর সাক্ষাৎকারে আসেন। গুরুদেব আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ তিনি তখন "ফাল্গুনী" নাটকে নবযৌবনের অভিযানকে আহ্বান করে নিতে ব্যস্ত। রচনা শেষ হল ৪ঠা মার্চ। পরদিনই তিনি তা পড়ে শোনালেন আশ্রমবাসীদের কাছে।

৬ই মার্চ তারিখে গান্ধীজীর দিনলিপিতে লেখা, "শান্তিনিকেতন পহুঁচা, গুরুদেব নি ভেট।" এই কয়েকটি কথার মধ্যে দুজন যুগন্ধর পুরুষের সাক্ষাৎকারের একটি মহা-ইতিহাস সূচিত হয়েছে। আশা করি সেই প্রসঙ্গ নিয়ে জওহরলাল যে আলোচনার সূত্রপাত করে গেছেন, তার জের টেনে ভবিষ্যতেও বিদগ্ধ জনেরা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সেই সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপুরুষদের জানা একপ্রকার মহাজাতি ও মহাদেশকেই জানা।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকানাই সামন্ত

খৃষ্টীয় ১৮৯৩ সাল ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই বৎসরের ৩১মে তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশে বোম্বাই শহর থেকে রওনা হন। অন্তর্যামী ছাড়া কে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল সে হয়তো স্বামীজিও সেদিন জানতেন না। আজ আমরা জানি শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে ভারতভাগ্যবিধাতাই তাঁকে পাঠিয়েছিল ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসমুদ্র-পারে দূরতম প্রতীচ্যে, পৃথিবীর অপর এক গোলার্ধে, ইতিপূর্বে ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ের অ্যাপোলো বন্দরে বিলাত-প্রত্যাগত অরবিন্দ ঘোষ পৌঁছুলেন পরপদানত স্বদেশের দাসত্ব-মোচনের নিগূঢ় ও জ্বালাময় সংকল্প অন্তরে পোষণ ক'রে, তিনিও জানতেন না আপনার ভাগ্য আর ভারতের ভবিষ্যৎ কোন্‌দিকে—কেবল পুণ্য ভারতভূমির স্পর্শমাত্রে যে দিব্য আবেশের পরিমণ্ডলে আবৃত হন তিনি, তাতেই অপ্রত্যাশিত অলৌকিকের ইঙ্গিত ছিল। আর, ১৮৯৩ সনে পোরবন্দরের দেওয়ান করমচাঁদ গান্ধীর পুত্র মোহনদাস গান্ধীকেই বা কজন জানে, এপ্রিলে তিনিও রওনা হলেন বোম্বাই থেকে আপনার ভাগ্য অন্বেষণে—লক্ষ্য দক্ষিণ আফ্রিকা। ভাগ্য যে তাঁর নিজের নয় কিংবা অনভিজ্ঞ অকৃতী যুবকের ব্যারিস্টারি পেশায় সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ নয়, সে অবশ্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জানতেন না অথচ আজ এদেশে শুধু নয়, ভারতবহির্ভূত দেশে দেশান্তরেও সকলে জানেন।

যে তিনজনের উল্লেখ করা গেল ভারতক্ষেত্রে প্রত্যেকেই এঁরা যুগপ্রবর্তক বা যুগপুরুষ বলা যেতে পারে, ভারতের বাইরেও এঁদের প্রভাব, এঁদের জীবনাদর্শের সাফল্য ও সার্থকতা ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে, হতে থাকবে। এক এক দিকে অরবিন্দ ও গান্ধী স্বামীজির উত্তরসাধকও বটে, সেটি সবিস্তারে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

নিজের নিজের জীবনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে ভারতের তিনজন নরোত্তমকে লক্ষ্য করলাম, আর একজনকেও স্মরণ করতে চাই, তিনি এঁদের অগ্রজ, তিনিও এই নূতন যুগের ধারক বাহক, দ্রষ্টা আর স্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

১ উল্লিখিত ঘটনাকালে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও অরবিন্দের বয়স যথাক্রমে ৩৩, ৩১, ২৪ ও ২১ বৎসর।

ভারতভাগ্যের রঙ্গমঞ্চে ঠিক এই সময়ে এমন কোনো গূঢ়ার্থ ভূমিকায় দেখছি না বটে, তবু ১৮৯৩ সনের অগস্টে (?) কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে, 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' বলে যে প্রবন্ধ[২] তিনি পাঠ করেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন,—'রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না[৩]…ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব…প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।'[৪]

পুনশ্চ শেষ দুটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে [প্রবাসে ?] অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে; পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া **পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে**। তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন **আমাদের চিরপরিচিত ভাষায়** আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, তখন আর কিছু না হউক, সহসা চৈতন্য হইবে…তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট [সুলভ খ্যাতি ?] চাহিতেছেন না…তিনি নিভৃতে শিক্ষা

২। 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিকের 'সাধনা'য় মুদ্রিত। দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ১০। প্রথম খণ্ড রবীন্দ্র-জীবনীতে বলা হয়েছে (১৩৬৭, পৃ. ৩৭৫)—'এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে লেখক বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমস্যাসমূহের সমাধানের যে দুইটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপত আত্মশক্তি ও অসহযোগ।' রাজনীতিক্ষেত্রে অসহযোগের বিশিষ্ট প্রয়োগ ও নির্দিষ্ট রূপায়ণ তখনও ভবিতব্যে লুক্কায়িত এ কথা সত্য।

৩ 'রচনাবলী-১০, পৃ. ৪০২।

৪ তদেব, পৃ. ৪০৩। অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরগুলির প্রয়োগ আমাদের।

করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন ; **আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া** তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন।…যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায় উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন **অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।**

কবির এই বাণীতে ভাবী ভারতের নেতা, পরাধীন দেশে নব জীবনতন্ত্রের গুরু, গান্ধীজিরই আবাহন এমন মনে করলে বিশেষ ভুল হবে না। স্বদেশ-আত্মার যা অভীপ্সা, জাতিজীবনের যা নিগূঢ় অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা তা এই-ভাবেই ত্রিকালদর্শী কবির বাক্যে মন্দ্রিত হয়েছে। একদিন অতীত ভারতের রামদাস-শিবাজী[৫] বা গুরুগোবিন্দের পুণ্যচরিত যিনি উপলব্ধি করে থাকবেন নিবিষ্ট মননে, ধ্যানে, সমগ্রভারতের ও ভাবী কালের অনাগত 'গুরু'কে অন্তরে প্রত্যক্ষ করলেন আজ আরও সত্য, আরও মহান্, আরও বিরাটরূপে। অন্তত আমাদের তাই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সেদিন উপস্থিত দেশ কাল উপলক্ষ্যকে বহুগুণে অতিক্রম করেছিল, উজিয়ে গিয়েছিল।

সেবা ত্যাগ আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তি অর্জন কবির লক্ষ্য ছিল, স্বভাবতঃ প্রেম মঙ্গল ও সামঞ্জস্যের তিনি দূত বা প্রবক্তা ছিলেন, সকল ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ছন্দপতন তাঁর কাছে একান্ত পীড়াদায়ক ছিল—এ-সবই আজ অবিসংবাদিত বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর স্বভাবে ও সাধনায়, মননে ও অভীপ্সায় এইখানেই সুগভীর মিল, আত্মিক সংযোগ। বাস্তব সংসারে পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয় হবার আগেই আত্মায় প্রতিষ্ঠিত এই আত্মীয়তা। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বহু মতানৈক্য[৬] হয় পরবর্তীকালে, সেটাই বড়ো কথা নয়, কেন না আসল

৫ অবশ্য 'কথা' বা 'কথা ও কাহিনী'র 'প্রতিনিধি' কবিতা এ সময়ে বা এর পূর্বে লেখা হয় নি। এই কবিতায় এমন কি এর শিরোনামে, উত্তরকালে গান্ধীজি যে ন্যাসীবাদ (Theory of Trusteeship) প্রচার করেন তাই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গানুকূলে 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটকেও কবি এই তত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬ এরূপ 'অনৈক্যে'র পঞ্জীকরণ কঠিন হবে না। এ প্রসঙ্গে 'কালান্তর' গ্রন্থে 'সত্যের আহ্বান' ও 'চরকা' যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি বাংলায় ইংরেজিতে আরও অনেক লেখাই রয়েছে। একটি কথা মনে পড়ে, কবিগুরুর দেহত্যাগের পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে কোনো এক প্রশ্নের উত্তরে বাপু বলেন : I have found no real conflict between us. I started with a disposition to detect a conflict between Gurudev aud myself but ended with the glorious discovery that there was none. (V. B. News, February 1946)

কথা নয়। জেনে না-জেনে এই মহাত্মার রূপও রচনা করেছেন এই মহাকবি আপনার যুগধৃত আর যুগোত্তর সৃষ্টিতে, সাহিত্যে,—সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয়। অথবা বিস্তারিত আলোচনার শক্তি বা সুযোগ না থাকলেও, বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গান্ধীজির মহনীয় মৃত্যুবরণের পরে 'মহাত্মা গান্ধী' পুস্তিকায়। রবীন্দ্রনাথের যে-ক'টি রচনা সংকলন করা হয়, উপস্থিত সে আমাদের আলোচ্য নয়। অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে কথিত বা লিখিত, উপলক্ষ্যের দ্বারাই অনেকটা সীমিত। সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম হল 'শিশুতীর্থ' কবিতার যে অংশ গ্রন্থের প্রবেশক-রূপে স্থান পেয়েছে; এই কাব্যখণ্ডে যুগপৎ অতীত আর ভবিষ্যৎ থেকে যাঁর প্রতিবিম্ব-পাত হয়েছে তাঁকে কেউ বলবে দিশারি মানুষ, কেউ খৃষ্ট, আর আমরা আজ বাপু বা গান্ধীও বলতে পারি।

বিশেষ কাল ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'পরিশেষ' কাব্যের 'জলপাত্র' আর 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি', 'রঙরেজিনি', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন' এবং 'প্রথম পূজা'। রচনাকাল শ্রাবণ-ফাল্গুন ১৩৩৯ বা আগস্ট ১৯৩২—ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। অবশ্য সেই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় 'চণ্ডালিকা' নাটক (১৩৪০ ভাদ্র) আর তারই নৃত্যনাট্যে পরিণতি (১৩৪৪ ফাল্গুন)।°হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতাপাপ-মোচনের সংকল্পে গান্ধীজি দেশব্যাপী যে আন্দোলন ও মনোভাবের সৃষ্টি করেছিলেন, সে বিষয়ে এইভাবেই কবি আপন সমর্থন জানান নব নব রসরূপের ভাবে ভঙ্গীতে সঙ্গীতে।° বলা বাহুল্য যে, অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে ঘৃণা, জাতির এই বহু যুগের মূঢ়তা ও কলঙ্ক ক্ষালনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ তেমনি রবীন্দ্রনাথেও প্রথম থেকেই ছিল। মহাত্মাজির আবেদনে ও আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আপনারই কবি মানস প্রতিবিম্বিত দেখেছেন। যৌবনে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের এই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনি মেয়ে।

করুণায় সমব্যথায় বলেছিলেন—

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি, জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস
তবে মিছে সহকারশাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস। (১২৯২)

পরিণত বয়সে আর একদিন গভীরতর ভক্তিতে সম্ভ্রমে দীনতায় বলেছিলেন—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে।
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

(১৯শে আষাঢ় ১৩১৭)

অধঃপতিত মোহগ্রস্ত দেশকে সম্বোধন করে পরক্ষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।...
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

(২০শে আষাঢ় ১৩১৭)

মনে রাখতে হবে ঋষির ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি আর কবির স্বপ্ন আর সাধকের অনিঃশেষ তপস্যা (না, আজও শেষ হয় নি রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ গান্ধীর জন্মের শতবর্ষ পরে) এক হয়ে মিলেছে 'ভারততীর্থে'র এই গানে—

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

(১৮ই আষাঢ় ১৩১৭)

তমসাচ্ছন্ন নিশাবসানে নবযুগপ্রভাতে বিধাতার একই ইঙ্গিতে একই প্রেরণায় ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে কবি ও কর্মীর অভ্যুদয়—একজন ভাবরাজ্যের অধিপতি কল্পভুবনের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, আর একজন সমস্ত দেশের সমগ্র জাতির সত্তা আপনাতে আকর্ষণ ক'রেই 'মহাত্মা'—তর্কাতীতভাবে এটুকু আমাদের ধ্যান ধারণায় পরিস্ফুট। প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ আহরণের প্রয়োজন নেই, নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনাবশ্যক।

২

গান্ধীজির চরিত্র, তাঁর 'রাজনীতি' লোকনীতি, তাঁর জীবন দর্শন, এসবের কল্পরূপ (বাস্তব রূপায়ণ নয়) বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও যদি প্রোজ্জ্বল প্রস্ফুট বর্ণে আঁকা হয়ে থাকে সে হল ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। ধনঞ্জয় প্রথম আমাদের দেখা দেন প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। এটি প্রায় তাঁর প্রথম উপন্যাস (১২৮৮-৮৯ ভারতী) বউ ঠাকুরাণীর হাটের নাট্যরূপ বলা যেতে পারে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রচিত, প্রকাশিত ১৩১৬ বৈশাখে। ইতিপূর্বে ওই উপন্যাসের আর একটি নাট্যরূপ রচিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল (সম্ভবতঃ ১২৯৩ আষাঢ়—১৩০৭ চৈত্র) অভিনীত হয়েছিল 'রাজা বসন্তরায়' নামে, কবি স্বয়ং সেটি রচনা করেন নি। ঐ নাটক মুদ্রিত বা অমুদ্রিত পাওয়া যায় না ; মনে হয় বসন্তরায় চরিত্রই এ স্থলে প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। কবি-কৃত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও ন্যূনতা ঘটে নি, কিন্তু ধনঞ্জয় চরিত্রে তার সার্থক একটি জুড়ি মিলেছে। রাজকুলে জন্মলাভ সত্ত্বেও দ্বেষহিংসাশূন্য স্নেহপ্রেমপ্রবণ বসন্তরায়ের যে স্বাভাবিক পরিণতি,[৭] যেমন স্বভাব থেকে তেমনি

৭ বউ ঠাকুরাণীর হাট থেকেই এ বিষয়ে ধারণা করা যাবে। প্রায়শ্চিত্তে (১৩১৫), পরে পরিত্রাণে (১৩৩৪), এ চরিত্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নি।

একমুখী ও সচেতন সাধনায় ধনঞ্জয় তার আশ্চর্য বিকাশ। ধনঞ্জয়ই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে কবির অভিনব সৃষ্টি।

'রাজা বসন্তরায়'এর সাফল্য বা লোকপ্রিয়তা অল্প হয় নি, নানা সূত্রে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন তার নির্লিপ্ত দর্শক; যদিও তাঁর সৃষ্টি, কল্পনা, অন্যে যেভাবে যেরূপে দৃশ্য ক'রে তোলা সম্ভবপর সে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বাঙ্গসুন্দর বা সন্তোষজনক হয়েছিল এ তো মনে করা যায় না। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পরে স্বয়ং তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এতদিন পরে বিশেষ কী উপলক্ষ্য ঘটেছিল কোথাও তার কোনো ঘোষণা নেই; অথচ সেইটেই আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' গল্পের অতিরিক্ত নূতন যে উপাদান আছে এ স্থলে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর দলবল নিয়ে তাতে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না—ঠিক এই সময়ে দেশ-ব্যেপে যে আবেগ-উত্তেজনার আবহাওয়া ছিল, দেশপ্রেম গুপ্তহত্যাকেও উপায় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি, বরং গৌরবই বোধ করেছিল, তারই প্রতিবাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছিল কবির মনে—প্রয়োজন ছিল। এই সময়েই দূর সিন্ধুপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের নূতন কর্মকৌশল প্রয়োগ করেন গান্ধীজি, যথার্থই 'সত্যের পরীক্ষা' তারও বার্তা বৈরাগীর বাণীতে বিঘোষিত, সমর্থিত। রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের বিরাগভাজন হয়েও নানা সময়ে নানা প্রবন্ধে যে কথা বলতে চেয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়, নাটকে তাই জীবৎসত্তা ও সচল বিগ্রহরূপে উপস্থিত হয়েছে।

এ দেশে ও বিদেশে একই সময়ে 'কবির বামে ও দক্ষিণে জাতীয় মুক্তি পিপাসার ও জনজাগরণের দুই রূপ—হিংসা আর অহিংসা, গুপ্তহত্যা আর সত্যাগ্রহ, রক্তাক্ত বিপ্লব আর অসহযোগ। একটিকে তিনি বেছে নিলেন, একটিকে তিরস্কৃত ক'রে আর একটিকে তিনি উজ্জ্বল বর্ণে এঁকে দেখালেন।

বঙ্গভঙ্গের আঘাত ও অপমানের জ্বালা কবি রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করেন নি তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগেও এসে পড়েছিলেন।[৮] অথচ শীঘ্রই অনুভব করলেন, অন্ধ আবেগে যে পথে চলেছে দেশ অথবা দেশের যুব সমাজ সে পথ তাঁর নয়। মুক্তি পিপাসায় সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ ভালো, মৃত্যুবরণ বরং ভালো। জাতিবৈরবশে নির্বিচার দুঃখ বা মৃত্যুঘাত দেওয়া

---

৮ ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে / বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,/ দুই নয়নে স্নেহের হাসি, / ললাট নেত্র আগুন বরণ। / একদিন এ গানে (১৩১২) দেশজননীর কালী করালী মূর্তিরও আভাস পাওয়া যায় নি কি? 'সুপ্রভাত' কবিতাতে (৮ই বৈশাখ ১৩১৪) দ্রষ্টব্য সঞ্চয়িতা) রুদ্রের বন্দনা অকুণ্ঠ বলা যায়। 'অরবিন্দ'

অশুভ এবং পাপ—তার প্রশস্তি বা তারই সমর্থন তাঁর কণ্ঠে নেই, অন্তরেও থাকতে পারে না। যদি সাময়িক মোহই বলা যায়, সেই মোহভঙ্গে কবি আপন স্বভাবে ও স্বধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই স্বভাবে ও স্বধর্মে কবি রবীন্দ্রনাথে ও পরম বৈষ্ণব গান্ধীতে আসলে কোনো ভিন্নতা নেই।

৩

এখন, বাংলায় ভারতে ও ভারতের বাইরে কোন্ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়শ্চিত্তের রচনা, ধনঞ্জয় বৈরাগীর কল্পনা, একটু বিশদভাবে আলোচনা ক'রে দেখা যাক্। এ আলোচনা প্রধানতঃ তথ্যমূলক হবে, বিবিধ তথ্যেরই সমাহার, কেন না উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবুকতা কল্পনা ও অনুমান অপেক্ষা তথ্যের মূল্য অনেক বেশি।[৯]

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট' কিংস্‌ফোর্ড্ সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হয় ১৩১৫ বৈশাখে। ভ্রমক্রমে 'ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা বোমার আঘাতে নিহত' হন। 'হত্যাকারী দুইজন যুবক—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী'। (ইতিপূর্বে ১৮৯৭ জুনে পুনায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির দিনে 'প্লেগ-কমিশনার Mr. W. C. Rand এবং তাঁহার সহকারী Lt. Ayerst কে হত্যা করেন 'দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই চিৎপাবন ভ্রাতা'।) কিংস্‌ফোর্ড-হত্যার ব্যর্থপ্রয়াসের 'অল্পকাল পরেই কলিকাতার মানিকতলায় বোমার কারখানা ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে।[১০]

রবীন্দ্রের লহো নমস্কার' কবিতায় (৭ই ভাদ্র ১৩১৪) 'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে / সেই রুদ্রদূতে'র মধ্যে বীরত্বের, মনুষ্যত্বের মৃত্যুঞ্জয় রূপ দেখে, বন্ধনহীন আত্মার স্বরূপ দেখে, চরণে প্রণাম করেছেন কবি সেই ঈশ্বরকে 'যিনি ক্রীড়াচ্ছলে / গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে' / 'যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাস' / 'দুঃখ কিছু নয়—/ ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয় / কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার! / কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার! / ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির। / আমি আছি, সত্য আছে স্থির।' / —এও যদি রুদ্রের বন্দনা হয়, রুদ্র তাঁর দক্ষিণ মুখ ফিরিয়ে ভক্তকে দেখা দিয়েছেন; একই কালে সত্য ও মঙ্গলকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন; কোনো হীনতা দীনতা ক্ষুদ্রতা—আত্মঘাতী অন্ধ আবেগ ও রাগদ্বেষ—লক্ষ্য করেন নি।

৯ শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়খণ্ড (১৩৬৮) রবীন্দ্রজীবনী থেকে এ বিষয়ের কিছু ইঙ্গিত ও কতকগুলি তথ্য লাভে আমরা উপকৃত। ঐ গ্রন্থের পৃ ১৯১-৯২ দ্রষ্টব্য।

১০ দ্বিতীয়খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের অগ্নিযুগ (১৯৪৮ ?), এবং টেণ্ডুল্‌করের Mahatma গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৯৬০) থেকে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সমাহৃত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে-সব তথ্য পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সংকলিত তারও বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা শেষোক্ত গ্রন্থে। ১৯০৮ ফেব্রুয়ারির মডার্ন রিভিয়ু আমরা দেখেছি আর সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী কাগজের উদ্‌ধৃতি

এই হল এক দিকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পূর্বসংকেত ও প্রস্তুতিতে নানা মর্মান্তিক ঘটনা। অন্য দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরও ক্রান্তিকাল এসেছিল এই সময়েই; সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমাদের জানা দরকার।

১। ঘটনাচক্রে খৃষ্টীয় ১৮৯৬ সনেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও অপমানের প্রতিবিধানে নবীন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষে এসে বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতায় বহু প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্তা বলেন, সংবাদপত্রে প্রচার করেন, সভাতেও বক্তৃতা দেন—টিলক, গোখলে, ভাণ্ডারকর, ফিরোজশা মেটা প্রভৃতির সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই দেশে বিদেশে এই আন্দোলনের প্রতি সমাজ সচেতন অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ নয়, অন্য দেশপ্রেমী মানবপ্রেমী মনীষীরাও কতটা অবহিত হয়েছিলেন তারই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের একখানি চিঠিতে। এ চিঠি লেখা হয় জয়পুর থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে—

Mr. Setlur of Girgaon, Bombay,...writes to me to send somebody to Africa to look after the religious needs of the Indian emigrants...The work will not be very congenial at present, I am afraid, but it is really the work for a perfect man. You know the emigrants are not liked at all by the white people there. To look after the Indians, and at the same time maintain cool headedness so as not to create more strife—is the work there. No immediate result can be expected, but in the long run *it will prove a more beneficial work for India than any yet attempted.* I wish you to try your luck in this.···And godspeed to you!···

Yours in the Lord
Vivekananda.[১১]

পেয়েছি শ্রীমনোরঞ্জন গুহের সৌজন্যে—১৮৯৬ থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী বহু বৎসরের ষ্টেটস্‌ম্যান ইংলিশ্‌ম্যান বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে গান্ধীজির সম্পর্কে বহু তথ্য ও সংবাদ তিনি সংকলন করেছেন।

১১ দ্রষ্টব্য: Complete Works of Swami Vivekananda (1963), vol. VIII, pp 440-41. হেলানো হরপ ব্যবহার করেছি আমরা। স্বামীজির মতো মানুষ দিব্যদৃষ্টিতে সেদিন কী দেখেছিলেন আমরা জানিনে। অথচ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল।

২। কলিকাতায় ১৯০১ ডিসেম্বরে ভারতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৫ ও ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের বোম্বাই, বারাণসী ও কলিকাতায় অধিবেশনে উক্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।

৩। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বহু সংবাদ, পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। ভারতের রাজধানী কলিকাতায় The Englishman, The Statesman, The Amrita Bazar Patrika, The Bengalee এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী হন। তন্মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকা থেকে একটি এবং The Modern Review থেকে অন্য একটি উদ্‌ধৃতি দিলেই সমকালীন প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ঐ সংখ্যায় গান্ধীজির ছবিও ছাপা হয়।

The Bengalee, January, 1908

Passive Resistance in the Transvaal.

The following telegram will be read with interest in this country :—

Gandhi, the Indian leader in the Transvaal, besides five other Indians and three Chinese residents, have been sentenced at Johannesburg to quit within fortyeight hours for refusing to register their names. There are about **70,000** Indians at present in the Transvaal and they have declined to conform to the Act. Gandhi says he awaits arrest.

So the government of the Transvaal must now be face to face with a serious situation. 70,000 Indians declining to conform to the Registration Act is a spectacle which is as humiliating to the authorities as it redounds to the glory of the Indians themselves.

The Modern Review, February 1908, p. 192

Mr. M. K. Gandhi and Other Passive Resisters.

Mr. M. K. Gandhi, the well-known Indian leader of the Transvaal, with many others of his way of thinking have been sent to jail for not registering themselves according to the notorious anti-Asiatic regulations of that colony. All

honours to these sturdy patriots. May we be able to follow their example in thousands when the occasion comes !

(না ব'লে পারা যায় না সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি অতুলনীয়।)

৪। ফলতঃ ট্রান্সভালে ১৯০৮ থেকেই সত্যাগ্রহীরা দলে দলে অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সাহস শৃঙ্খলা ও বীর্যের সঙ্গে, প্রভূত দুঃখক্লেশ ও কারাবাস বরণ করতে থাকেন আর গান্ধীজিকেও কয়েদ করা হয়। ১৫ অক্টোবর তারিখে দ্বিতীয়বার তাঁর কারাদণ্ডের পরে ১৬ তারিখেই লণ্ডনে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লাজপৎরায়, সাভারকর, খাপার্দে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আনন্দকুমার স্বামী যোগ দেন।

৫। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিওটলষ্টয় 'A letter to a Hindu' পত্র-প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন : পশুশক্তির দ্বারা পশুশক্তিকে ঠেকাতে পারে নি ব'লে ভারত পরাধীন ; শতগুণে মহত্তর আত্মিক বলের দ্বারাই অত্যাচার-অবিচার-পরায়ণ এবং যূথবদ্ধ বাহুবল অস্ত্রবল ও কূটরাজনীতির পরাজয় সুনিশ্চিত। এই বহুপ্রচারিত প্রবন্ধের নিহিতার্থ গান্ধীজি স্পষ্টই অনুধাবন করেন এবং ১ অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে যখন টলষ্টয়কে প্রথম চিঠি লেখেন, প্রবন্ধটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস প্রতিরোধের বিবরণ জেনে টলষ্টয় অত্যন্ত খুশী হন আর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লেখেন : Therefore, your activity in Transvaal.........is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but all the world, will unavoidably take part.[১২]

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এ পর্যন্ত স্পষ্ট হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই সূচনা (১৯০৮ জানুয়ারিতে সহকর্মিগণসহ গান্ধীজির

১২ টেণ্ডুলকরের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি চিঠির অংশ বিশেষ সংকলন করা হলেও দুঃখের বিষয়, কোন্ তারিখে কী উপলক্ষ্যে লেখা জানা যায় না ; তা হলেও এখানে তুলে দেওয়া যাক্ :

Tagore referred to the struggle in South Africa as the "steep ascent of manhood, not through the bloody path of violence but that of dignified patience and heroic self-renunciation—" Mahatma, vol. I (1960), p. 145 দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সমকালে ঐ চিঠি লেখা হয়, তার যথেষ্ট সম্ভাবনা নেই কি ?

এবং আরও বহুশত সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড) তার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব, ঐ সময়েই বা অব্যবহিত পরে দেশ-বিদেশের মনীষী ও মানবপ্রেমিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি, তার গভীর গম্ভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও কেউ কেউ বুঝেছিলেন। এ দিকে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই 'প্রসঙ্গকথা'য় (ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫) বলেন, 'ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই' আর প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রায় সমকালীন এক প্রবন্ধে ('সমস্যা', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫) পুনশ্চ লিখলেন : 'য়ুরোপের যে কোনো জাতি হোক্ না কেন, সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসী মাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহার সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।'

পথ ও পাথেয়, সমস্যা, সদুপায়, দেশহিত—সব-ক'টি প্রবন্ধ[১৩] মোটের উপর একই সুরে বাঁধা, একই বক্তব্য-খ্যাপনে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ও আশ্বিনের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ; শেষোক্ত প্রবন্ধের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে [নিত্যধর্মকে] অবলম্বন না করিলে কোনো মতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই। অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।'

একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করছেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে, বিশেষতঃ ধনঞ্জয় চরিত্রে, তাই সাকার করে তুলছেন আর সমুদ্রপারে গান্ধীজির অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তা বহুজনের জীবনে জীবন্ত এবং বহু ঘটনায় বাস্তব হয়ে উঠছিল—ভেবে দেখতে গেলে এতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই।

---

১৩ দশমখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী দ্রষ্টব্য ; এ স্থলে প্রাসঙ্গিক সমুদয় তথ্য ও উদ্‌ধৃতি বিশ্বভারতী প্রকাশিত ঐ গ্রন্থ থেকে আহৃত।

প্রায়শ্চিত্ত নাটক ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮-১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) ঠিক কোন্ সময়ে লেখা আমাদের জানা নেই। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র গান্ধীচরিত্রের মুকুরিত প্রতিবিম্ব না হলেও রূপান্তর বলা চলে ; স্বরূপের পার্থক্য ঘটে নি—উভয়ের জীবনদর্শন মূলতঃ এক। এই আন্তরিক ঐক্যের এটিও বিশেষ কারণ যে, কবির ধ্যান-ধারণায় স্বভাবে অসত্য ও অন্যায় সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, পৌরুষ, বীর্য, এই গুণগুলি যেমন ছিল, সবার উর্ধ্বে ছিল প্রেম মৈত্রী ও করুণার স্থান—হিংসা বিদ্বেষ বৈরভাব ও একান্ত জাত্যভিমান ছিল অধর্ম বা পরধর্ম, স্বদেশ স্বজাতির উর্ধ্বে ছিল বিশ্বমানব। অর্থাৎ, উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথে ও গান্ধীতে স্বভাবের আশা ও আদর্শের, সম্পূর্ণ মিল ছিল ; তবে একজন ছিলেন কবি ও মনীষী, আর একজন কর্মযোগী ও তপস্বী—জাতীয় জীবনের গুরু, মহাত্মা।

৪

বিশেষ কারণে ও বিশেষ ঘটনাবলীর পটভূমিকায় বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের রূপান্তর হল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। রূপান্তর শুধু প্রকরণগত নয় আমরা জানি, ধনঞ্জয় বৈরাগীর আবির্ভাবে নূতন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে কবির এই নূতন সৃষ্টিতে। অর্থাৎ, স্থূল পরিবর্তন নয় ; গুণগত বিবর্তন, স্বরূপের পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তারও সূচনা দেখা দিয়েছে। কী সেই নূতন মাত্রা dimension বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ?

উপন্যাসের একদিকে ছিল বলদর্পী বিষয়লোলুপ প্রতাপাদিত্য, আপনার ক্ষমতাবিস্তারে রাজ্যবিস্তারে স্নেহপ্রেম হিতাহিত ন্যায়ধর্ম-লঙ্ঘনে সদাই প্রস্তুত ; আর একদিকে সাধুপ্রকৃতি স্নেহপ্রবণ বসন্তরায়, তেমনি স্বভাব উদার, সংবেদনশীল উদয়াদিত্য, স্নেহপ্রেমসহিষ্ণুতার প্রতিমা সুরমা, উদয়ের উপযুক্ত ভগিনী বিভা। এদেরই ঘাত-প্রতিঘাতে অবশেষে এই কাহিনীর মর্মান্তিক করুণ পরিণতি। একদিকে অশুভশক্তির প্রবলতা ও সক্রিয়তা, আর একদিকে সাধুত্বের নিষ্ফল আত্মবলিদান। বসন্তরায়ের উপাদান-বিচারে দেখা যাবে যেমন কবির আপন সত্তা ও আদর্শ ভাবনা[১৪] তেমনি রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহের চমৎকারজনক বাস্তব চরিত্র মিলিত মিশ্রিত হয়ে যেন এই আকার পেয়েছে। বসন্তরায়ের সাধুত্ব নির্দোষ বা ষোলো আনা হলেও বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে এসে সেটি সক্রিয় তেমন

১৪ একটির সজ্ঞান সচেতন উপলব্ধি আর অন্যটির সুষ্ঠু পরিণতি বা পরিপূর্ণতা তখনও দূরবর্তী। বউ ঠাকুরাণীর হাট 'কাঁচা' লেখা সন্দেহ নাই, লেখকের বয়স কুড়ি একুশ।

নয় ; বজ্র ও বিদ্যুৎ-গর্ভ নয় ; আর্ত, ব্যথাহত। এ জন্যই ট্র্যাজিক ঘটনাপরম্পরার মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতো শক্তি তার মধ্যে নেই ; আসুরিক শক্তির, অশুভশক্তির যূপকাষ্ঠে বলি হওয়াই তার নিয়তি। এ লোকের উপযোগী নয় এই প্রেম, করুণা, সাধুত্ব ; যেন লোকান্তরেই তার স্বাচ্ছন্দ্য ও উপযোগিতা। এ বিষয়ে বসন্তরায়ের থেকে উদয়াদিত্যের পার্থক্য প্রবল এবং প্রচুর নয় ; পরিণামে তাই একই প্রকার নিষ্ফলতা।

কোনো মনীষী বলেছেন, একজন সাধুপুরুষের উপস্থিতিতে ট্র্যাজেডির কোনো অবকাশ থাকে না। তেমন বিদ্যুৎ-গর্ভ সক্রিয় সাধুত্ব উদয়াদিত্যে বা বসন্তরায়ে দেখা দেয় নি। দেখা দিয়েছে (একই কালে বাস্তবে গান্ধীচরিত্রে আর) প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীতে। বিশেষভাবেই সংক্রামক সক্রিয় এঁর চরিত্র—dynamic। লক্ষ্যে যে চলেছে এই শুধু নয়, চলার বেগ ও শক্তি নিজের ভিতরে নিজে উৎপাদন ক'রে অন্যে সঞ্চারিত করছে ব'লেই তাকে বলতে পারি ডাইনামিক। এখানে এই হল নূতন মাত্রা। এর প্রয়োজন ছিল। নিষ্ফল নিষ্ক্রিয় সাধুত্বের বদলে সংগ্রামশীল সংক্রামক সাধুত্ব, কল্যাণকর্মের জনক এবং অকল্যাণের নিবর্তক, যা মার খায় বলেই মরে না, সংশয় এনে দেয় অত্যাচারীর মনে, মার ফিরিয়ে দেয় তার অন্তরে, পরিণামে শুভবুদ্ধি ও সত্যের উপলব্ধি এনে দেয় রিপুর বশবর্তী অন্ধ অজ্ঞানের কাছে, তাই সত্যাগ্রহীর ধর্ম, তাই হল সত্যাগ্রহ, আর তারই প্রথম রেখাপাত—অভ্রান্ত রেখাপাত—ধনঞ্জয়ে। যে কারণে প্রতাপকেও বলতে হয়েছে—'বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।' উত্তরে ধনঞ্জয় বলেছে—'মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। এটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক—আমরা কোথায় লাগি।'

কিন্তু ঐ কথার পুরোপুরি তাৎপর্য উপলব্ধির স্থান কাল উপলক্ষ্য ঘটে নি এ নাটকে। সে হয়েছে আরও পরে মুক্তধারায়।[১৫] এখানে কাহিনীর বিবর্তন যেমন সম্পূর্ণ, অহিংস নির্বৈর প্রতিরোধের সাফল্য ও সার্থকতা তেমনি প্রকটিত—তার

[১৫] প্রবাসী মাসিক পত্রে 'মুক্তধারা'র প্রকাশ ১৩২৯ বৈশাখে (এপ্রিল ১৯২২), বাংলায় শুধু নয়, ভারতব্যাপী জাতীয় জীবনের আর এক বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে। সেই বিপ্লবের অপর নাম, অবশ্য, নন্‌কো-অপারেশন মুভ্‌মেণ্ট্‌ বা অসহযোগ আন্দোলন ; গান্ধীজি তার অবিসংবাদিত নেতা। একদিন সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যের যে প্রয়োগ বা পরীক্ষা শুরু হয়, অনেকগুলি স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এখন তার নূতন রূপ, ব্যাপকতর বিশালতর সিদ্ধি ও সম্ভাবনা।

মূর্তি হল অভিজিৎ আর ধনঞ্জয়ের গানে গানে তার অন্তরমন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। এখানে পরাভবের কোনো কারণ নেই, কেননা অন্যায় অসত্য যেমন প্রবল, সত্য-মঙ্গলের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত—বীরশ্রেষ্ঠ নরোত্তমের আত্মদানে তার প্রতিষ্ঠা। মোহ পাপ অজ্ঞানের নিরসন।

প্রায়শ্চিত্তে যার সূচনা, এভাবে মুক্তধারাতেই তা পূর্ণতা পেয়েছে। এ কথা বললে অসঙ্গত হবে না—ধনঞ্জয় ও অভিজিৎ সার্থকভাবেই পরস্পরের পরিপূরক, এজন্য এই দুজনকে নিয়েই গান্ধী-চরিত্রের প্রতিফলন সম্পূর্ণ। গান্ধী একাধারে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, ধনঞ্জয় এবং অভিজিৎ।

অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহের তত্ত্বটি প্রায়শ্চিত্তে কতকটা প্রক্ষিপ্ত ছিল যদি বা বলা যায়, মুক্তধারায় তা নয়। অবান্তর বিষয়বস্তুর ভার ফেলে দিয়ে কবির বক্তব্য এখানে ঋজুভাবে প্রকটিত। সমুদয় নাট্য ব্যাপার যেন এক ভূমি থেকে আর ভূমিতে উন্নীত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘাত-প্রতিঘাত অপ্রধান ; জাতি-বিজাতি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, এদের সংঘাত-সংঘর্ষেই এ নাটকের অগ্রগতি। (নাটকের ভাব ভঙ্গী, প্রকরণ ও প্রকৃতি, তদুপযোগী—যুগোপযোগী।) কবির বক্তব্য এখানে গান্ধীজির জীবন তথা জীবনদর্শন থেকে অভিন্ন। এখানে সত্যের পরাজয় নেই ; অহিংসার শক্তি বা প্রেমের শক্তি দুর্বল নয়, দুর্বার—অপ্রতিরোধ্য। অভিজিতে দেখি উভয়েরই মোহমুক্ত অপাবৃত স্বরূপ, হতাশা বা নিষ্ক্রিয়তা যখন একটুও নেই, পরিপূর্ণ সংবিৎ, জাগ্রত—মৃত্যুঞ্জয় শিবেরই ডিমি ডিমি ডমরুধ্বনি ও বিজয়ের ঘোষণা তার মৃত্যুতে। এ হল কবির কল্পনা, সত্যকল্পনা। বাস্তবে দেখেছি আমরা গান্ধীজির মৃত্যু যেমন মহনীয় তেমনি সকল পরাভবের উর্ধ্বে অস্তিমজয়েরই সূচনা, পথের সংকেত, দিগ্‌দেশের নির্দেশ—যে দিকে সত্য মঙ্গল এবং প্রেম, শান্তি ও সামঞ্জস্য।

মুক্তধারা প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত'-নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।' এ কথার অর্থ এই যে, এ নাটকের বক্তব্য আজই উদ্ভাবিত হয়েছে রবীন্দ্র-মানসে এমন নয়। এমন-কি প্রায়শ্চিত্তের পূর্বেও এর ভাববীজ ছিল অন্তত্র; অভ্রান্তভাবে ছিল কবির স্বভাবে ও স্বধর্মে। তবু গান্ধীজির জীবন ও চরিত্র কবিকে তাঁর আপনার কথা আপনার মতো ক'রে বলবার প্রেরণা দিয়েছে, আপন নিগূঢ় গভীর উপলব্ধি ও জীবনদর্শন বাহিরে সাকার

সচল জীবন্ত বিগ্রহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছে বার বার এ কথা মিথ্যা নয়।

প্রায়শ্চিত্তের জন্মান্তর যেমন মুক্তধারায়, সুসংস্কৃত রূপান্তর পরিত্রাণে, ১৩৩৪ সনের শারদীয়া বসুমতীতে। পরিত্রাণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক হলেও বলা উচিত—এ নাটকে উদয়াদিত্য আরও সগোত্র সজাতীয় অভিজিতের; অর্থাৎ পৌরুষ ও দৃঢ়তাপূর্ণ, প্রবুদ্ধ; একেবারে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ফল নয়। বসন্তরায়ের বলিদান রূপ অশুভ ট্র্যাজিক ঘটনা তাই বর্জিত, তার প্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না এ ক্ষেত্রে, এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস

প্রমথনাথ বিশী

বাল্মীকির রামায়ণের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র। রামায়ণে অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নরনারী-চরিত্র আছে সত্য, কিন্তু রাম-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বাল্মীকির কল্পনায় তিনি আদর্শ মানব। আবার মহাভারতেও অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নর-নারী আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের কল্পনায় কৃষ্ণই আদর্শ মানব। ভারতবর্ষীয় কবি কল্পনা রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রে তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে; আজ পর্যন্ত এ দুটি চরিত্রেই ভারতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। রামায়ণের রাম-চরিত্র একটি অম্লান শুভ্র রাজচ্ছত্রের ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার উপরে বিস্তৃত থাকিয়া কত শোকতাপ নিবারণ করিতেছে! আবার কৃষ্ণ-চরিত্র সমগ্র ভারতখণ্ডের আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো চিরবিরাজমান থাকিয়া যুগে যুগে কত না রস বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে!

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানি তাঁহারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির চেয়ে কম সত্য নহেন, বাস্তব সত্য এখানে কল্পনার সত্যের কাছে পরাজিত।

বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের পরে কালিদাস ও তুলসীদাস আর দুইজন ভারতীয় মহাকবি। নানা কারণে পৌরাণিক যুগের কবিদের সহিত ঐতিহাসিক কালের কবিদের তুলনা করা সঙ্গত নয়। আর চরিত্রসৃষ্টিতেই যে কবিত্বের একমাত্র বিকাশ তাহাও নয়। এসব কথা মনে রাখিয়াও বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা কেহই পৌরাণিক কবিযুগলের কাছে ঘেঁষিতে পারেন নাই। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র উমা ও শকুন্তলা। তাহারা দুইজনেই অতিশয় কোমল ও স্পর্শকাতর, সূক্ষ্মশিরা তন্তুতে তাহাদের দেহ গঠিত; সীতা ও দ্রৌপদীর সুমহৎ বীর্যের অধিকারিণী তাহারা নয়। কালিদাসের কালে নূতনতর সীতা বা দ্রৌপদী গড়া সম্ভব ছিল না, মানুষের মন অনেক সূক্ষ্মরসগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছিল। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের রামের কল্পনা বাল্মীকির কল্পনাশ্রিত, তাহাতে তুলসীদাসের মৌলিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস ও তুলসীদাসের পরে এদেশে মহাকবির সন্ধান করিতে গেলে একে-বারে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পড়িতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বিশ্বস্পর্শী—

অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রাচীন কবিগণের সহিত সার্থকভাবে প্রতিস্পর্ধা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় যে, তিনি রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো নিখিলমানবরসসম্পন্ন-চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব তাঁহার কালে তাহার সমর্থন ছিল না, খুব সম্ভব তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি অন্যরূপ। আর আগেই তো বলিয়াছি যে, কবিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে মহৎ চরিত্র কল্পনার পথেই হইবে এমন কথা নাই।

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সর্বব্যাপী ও সর্বরসের আধার, এবং এই দুটি গুণের ফলেই হাজার বছর ধরিয়া তাঁহারা এই মহাদেশোপম ভূখণ্ডের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন, আদর্শের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর জানি না; গান্ধীজী বলিবেন—রামচন্দ্র; বঙ্কিমচন্দ্র বলিবেন—শ্রীকৃষ্ণ। সে গূঢ় তর্কে প্রবেশ না করিয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, মানুষের মনে পূর্ণমানবের যে আদর্শ বিরাজিত এ দুটি চরিত্র প্রায় তাহার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, পূর্ণমানবপরিকল্পনার মানুষ বোধ করি সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষে কত-না মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বুদ্ধ আছেন, অশোক আছেন, আরও কতজন আছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মহাকবির লেখনীযোগে অমরত্ব লাভ করেন নাই, বাস্তব সত্যের বলেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতিতেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে চালাইয়া দেওয়া কত কঠিন। অন্তত কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু এখানেই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, তৎসত্ত্বেও সত্য, কারণ সত্য ইতিহাস-নিরপেক্ষ। 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণ-রচনা' প্রবাদে ইহারই সমর্থন। অর্থাৎ বাল্মীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে বাস্তব সত্যের অনুসরণ করেন নাই, সুমহৎ কবিকল্পনার ইঙ্গিতের শরণ লইয়াছিলেন। কল্পনার সত্যকে তাঁহারা এমন ভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহা বাস্তব সত্যের চেয়েও এমন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন লোকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কবিকল্পনা যাহাকে সত্য মনে করে তাহাই সত্য, বাস্তব সত্য তাহার তুলনায় গৌণ। আরও একটি কথা, বাল্মীকি ও ব্যাস স্ব-স্ব কালে ঐরূপ এক-একটি পূর্ণমূর্তি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব

করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা আর সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহাদের কালের তথ্যপরিবেশ এখন চিরকালের জন্য অবলুপ্ত; কেবল সত্য হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের কালের বেদনা-সঞ্জাত ঐ মহামানবের চরিত্র দুটি।

এবারে বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়ের প্রত্যক্ষ আসরে আসা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাস বা বাল্মীকির মতো সর্বব্যাপী ও সর্বরসাধারা চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেগুলিকে একটি পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে একটি সুমহৎ চরিত্রের আভাস যেন পাওয়া যায়। কোন একটা ইঙ্গিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সবগুলিকে পর পর বিন্যস্ত করিলে একটি অখণ্ড ধারণার সৃষ্টি করে, একটি ইঙ্গিত ও অপরটির মধ্যে অনেক সময়ে দীর্ঘ কালের ব্যবধান, কিন্তু তাহাতেই কি বুঝিতে পারা যায় না যে, চরিত্রের আদর্শটি একেবারে কবিকল্পনার উৎস-মূলে—আশ্রিত? আবার কোন ইঙ্গিতটিকেই সচেতন চরিত্রসৃষ্টি-প্রয়াস বলা যায় না। কিন্তু মহৎ কবিকল্পনা যে সচেতন প্রয়াস নয়, ইহা তো অত্যন্ত সুবিদিত।

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কালের বেদনা তাঁহাকে একটি মহৎ আদর্শমানবের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকির সৃষ্টি-প্রয়াস সম্বন্ধে যাহা এখন আর জানিতে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে তাহা জানিতে পাইতেছি; আমরা রবীন্দ্রনাথকেও জানি, আবার রবীন্দ্রনাথের কালকেও জানি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাস্তব সত্য অনেক সময়েই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবিকল্পনার দর্পণে নিজেকে আভাসিত করিয়া তোলে—সেই জন্যই 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণ রচনা' একেবারে অসম্ভব নয়।

এখন, এ দুটি কারণ স্মরণে রাখিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পূর্বোক্ত ইঙ্গিতগুলিকে যদি পর পর কালানুক্রমে বিন্যাস করিয়া লই, তবে একটি মহামানবের আভাস চোখে পড়িবে। এক, সেই মহামানবের কাল্পনিক আভাসের সঙ্গে এ যুগের একজন মহামানবের বাস্তব-রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সেই বাস্তব-মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, রামজন্মের পূর্বে আর একবার রামায়ণ লিখিত হইয়াছে, এবং এই দাবির বলে নবীন ভারতের মহর্ষি-কবি প্রাচীন ভারতের কবি-মহর্ষিদ্বয়ের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

এবারে রবীন্দ্রসাহিত্যের গদ্য-পদ্য হইতে কতক উদ্ধার করিব। গান্ধীচরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই ঐসব অংশের সহিত গান্ধীচরিত্রের ঐক্য দেখিতে পাইবেন—সে ঐক্য এমনি প্রকট যে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এখানে বলিয়া রাখি, এখানে কেবল সেই দৃষ্টান্তগুলিই উদ্ধৃত হইবে যাহা লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর নামটি পর্যন্ত জানিতেন না; কেবল একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইবে, তখন তিনি নামটি জানিয়াছেন, কিন্তু তখনও মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখেন নাই। আর একটি কথা। গান্ধীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার পরে এই শ্রেণীর আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়া যায় না, কেন যায় না বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-মানুষ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়াছে। আরও একটি কথা, এই সব ইঙ্গিত যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস, একথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলেও খুব সম্ভব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না; কবিত্বের ব্যাখ্যায় কবিকে অস্বীকার করা অন্যায় নয়, বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে বেচারা বরই সবচেয়ে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এসব ইঙ্গিত কবির সচেতন অভিপ্রায় নয় বলিয়াই এগুলির মূল্য সমধিক, একথা কিছুতেই ভোলা উচিত হইবে না।

প্রথম উদাহরণ:

মানসী কাব্যের অন্তর্গত গুরু গোবিন্দ কবিতাটি প্রথম উদাহরণ। রচনাকাল ১৮৮৫; গান্ধীজীর নাম তখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত?

গুরু গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিজের সাধনোত্তর সার্থকতার কথা বলিতেছেন—

'আয়, আয়, আয়, ডাকিতেছে সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক
ভ'রে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হ'য়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায়ে সকল জগৎ
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই, নাই আর কিছু।

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দেবে ব'লে
আসে লোক কত শত।'

গুরু গোবিন্দ সিংহ মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই বলিবেন যে, এক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তব সত্যকে অনেকদূর অতিক্রম

করিয়া গিয়াছে। আবার গান্ধীচরিত্রজ্ঞাতা পাঠককে বলিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে বাস্তব সত্য কল্পনাকে পিছনে ফেলিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কবির বর্ণিত চিত্র গান্ধীচরিত্র ও গান্ধীকীর্তি সম্বন্ধে যেমন সত্য, এমন গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে নয়। বস্তুত কবির কাছে গুরু গোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন মহামানবের চিত্র আঁকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কন প্রয়াসের মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ'

ইহা গুরু গোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে ইহা বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর কোন মহামানব নিজের জীবনকালে এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে বাস্তব-সত্য কল্পনাকে ডিঙাইয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬ সংখ্যক চতুর্দশপদীগুলি। নৈবেদ্য-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯০১ সাল।

গুরু গোবিন্দ কবিতায় যাহা চিত্রাকারে ব্যক্ত এখানে তাহা আইডিয়া বা ভাবাকারে প্রকাশিত। চিত্র বা চরিত্রের যে মূল্য দিতেছি, আইডিয়ার মূল্য এক্ষেত্রে তত নয়, কারণ আইডিয়া স্বভাবতই অনেকটা নির্গুণ; চিত্র যেমন রঙে রসে ভাবকে প্রকাশ করিতে সক্ষম, অপেক্ষাকৃত নির্গুণ আইডিয়া তেমন পারে না। তৎসত্ত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে এই কবিতাগুলিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে একটা বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কালে দৃষ্ট গান্ধী-চরিত্রের মহিমার একদিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

নূতন ভারতের জীবনাদর্শ, পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শের সঙ্গে কোথায় তাহার প্রভেদ, এবং লোভদ্বন্দ্বঈর্ষাসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীতে নূতন ভারত কর্তৃক আশার বাণী দান—ইহাই কবিতাগুলির মর্ম। এখন গান্ধীজীর কীর্তি ও বাণী নূতন ভারতকে যে প্রতিষ্ঠানভূমি দিয়াছে এবং পৃথিবীর চোখে ভারতকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া যদি কবিতাগুলি পড়ি, তবে মনে না হইয়া পারে না যে, বাস্তব সত্যরূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবির কল্পনা যেন গান্ধী-বাণীকে

প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের প্রতি আমাদের যে সূক্ষ্ম মোহ ছিল, গান্ধী যাহার প্রতি শেষ আঘাত হানিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলিতে যেন তাহার পূর্বাঘাত ধ্বনিত হইতেছে।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ

"মনে হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন, যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোন কারণ নাই। যিনি ঘোষণা করিবেন ভারতের কাম্য মুক্তি।" (১৯০২ সাল)

চতুর্থ উদাহরণ ঃ

এবার তিনটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, প্রথম দুটি 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থ হইতে, আর শেষেরটি 'স্বদেশ'-গ্রন্থ ভুক্ত। দু'খানি গ্রন্থেরই প্রকাশকাল দেখিতেছি ১৯০৮ সাল ; রচনাকালও খুব বেশী আগে নয়।

"শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানাজাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধকারে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে, তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হোক সহসা চৈতন্য হইবে, একদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা। আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই ; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজী কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা

হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোন একটা বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে, আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে, মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিতেছেন।"

এখন এই অংশটিকে যদি নিতান্ত আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করি, তবে ইহা নিঃসংশয়ে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাসবর্ণনা-রূপে প্রতিভাত হইবে। কারণ তিনিই প্রথম সুদীর্ঘ আত্মপ্রস্তুতির পরে ভারতীয় সমাজকে 'চিরপরিচিত ভাষায়' আহ্বান করিলেন, আর তিনিই প্রথম আইন সংশোধন ও আইন সভার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া দেশের দুর্গতির মূলে অনুপ্রবেশ করিলেন, ব্যাপকভাবে বুঝাইয়া দিলেন প্রকৃত দুর্গতি মনুষ্যত্বের অভাবে।

এবারে আর একটি উদাহরণ:

"ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধন করিব যাহাতে শত্রুমিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব।"

এই ভাবটিই গান্ধীজী ভাষান্তরে বলিতে পারিতেন, কতবার বলিয়াছেন। মহাকবি যে মহাযোগীর মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া আগেভাগে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এবারে তৃতীয় উদাহরণটি উদ্ধৃত হইতেছে। এটি আগের দুটির চেয়ে অধিকতর অর্থসম্পন্ন। আগের দুটি বাণী, এটি চিত্র; আগের দুটি ভাব, এটি দেহী। এখানে কবি আশ্চর্য কৌশলে ভারতবর্ষ ও ভারতপুরুষকে সমরেখায় আঁকিয়াছেন, দেহ ও আত্মাকে সমবন্ধনে বাঁধিয়া মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

"আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ। তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায়

না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্র রৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতচারী; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি, তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে ঐ অবিচলিত শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে, যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। সঙ্গহীন নিভৃতবাণী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস-সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।"

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই সন্ন্যাসী কে? ভারতবর্ষ না গান্ধী? একাধারে দুই-ই। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই চিত্র কি ভারতের দেহের না আত্মার? একাধারে দুয়েরই। ভারতবর্ষের আর কোন মহাপুরুষ এমনভাবে সমগ্র দেশের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হইয়া যাইতে পারিয়াছেন কি? ত্রিশ বৎসরকাল গান্ধীই ছিল ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই ছিল গান্ধী! কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই মানুষটিকে চর্মচক্ষে দেখিবার অনেক আগে মনশ্চক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াছিলেন। ১৯০১ সালেও যেমন, ১৯০৮ সালেও তেমনি গান্ধীজী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, তখন ছিলেন তিনি আত্মপ্রস্তুতির পথে এবং ভারতক্ষেত্রে প্রবেশের ভূমিকায়। পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর চিত্র পড়িয়া যাহার গান্ধীজীর কথা মনে না হইবে তাহাকে বৃথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চম উদাহরণ : প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী :

এই সময়কার অনেক প্রবন্ধাদিতে আমাদের মতের সমর্থক অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে সমস্তের উল্লেখ বাহুল্য, কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর মন্ত্র অহিংসা ও অভয়। রাজার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিলে প্রকারান্তরে হিংসারই জয় হইয়া থাকে; ভয় না করিয়া আঘাতকে প্রেমের সহিত বহন করিলে—আঘাতকারীর মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে, এই শিক্ষাই ধনঞ্জয় বৈরাগী তাহার অনুচরদের শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা স্পষ্টত গান্ধীজীর বাণীর পূর্বাভাস। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তখন এবং তাহার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী এই বাণীর প্রচার শুরু করিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় তিনি এই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুক্তধারা নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগীর দেখা পাই। দুটি নাটকেই এই চরিত্র। তবু কিছু প্রভেদ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা অহিংসার প্রতি; মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা যন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে প্রাণের দ্বারা শোধনের প্রতি; মুক্তধারাতে অহিংসার বাণী আছে, তবে ঝোঁকটা স্থান কাল পাত্রের তাগিদে অন্যত্র পড়িয়াছে; ইহা স্পষ্টত গান্ধীজীর প্রভাবধর্মী। কিংবা বলা যাইতে পারে, এই চরিত্রটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ নিজেকে এবং গান্ধীজীকে রূপ দিয়াছেন; প্রায়শ্চিত্ত নাটক লিখিবার কালে গান্ধীজীকে জানিবার আগেই দিয়াছেন ইহা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রতিভা সব সময়েই বিস্ময়ের আকর।

ষষ্ঠ উদাহরণ :

বলাকা কাব্যের 'পাড়ি' নামক কবিতা।

রবীন্দ্রনাথকৃত বলাকা কাব্যের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি যে ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া নেয়ে বা নাবিক আসিতেছে। তাহার 'নাইকো মাণিক, নাই রতনের হার' শুধু 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার'। ধনী বা মানীর গৃহকে লক্ষ্য করিয়া নেয়ে আসিতেছে না। দীন, হীন, সর্বপরিত্যক্তের গৃহের উদ্দেশে নাবিক যাত্রা করিয়াছে। যখন নাবিক তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে—

'বাজবে নাকো তুরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরম পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে নেয়ে বা নাবিক যিনিই হোন, বর্তমান প্রসঙ্গের সূত্রে গ্রথিত হইয়া ইহার নূতন অর্থ মনে উদিত হয়, বিশেষ যখন জানিতে পারি যে ঠিক এই সময়েই গান্ধীজী শেষবারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবিতাটির রচনাকালে তিনি নেয়ের মতো হয় সমুদ্রে রহিয়াছেন, নয় কেবল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আমাদের জন্য ধনমানের বোঝা আনিতেছিলেন না; তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তাহা অহিংসায় শুভ্র, প্রেমে অম্লান এবং নিশীথান্ধকারের মধ্যে শ্বেতচন্দ্রের অভয় তিলক।

এই কবিতাটি লিখিবার কালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে দেখেন নাই; কিন্তু উভয়ের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কবি এণ্ডরুজ ও পিয়ারসন নামক দুইজন বন্ধুকে পাঠাইয়া ছিলেন। মুখ্যত এণ্ডরুজের মাধ্যমেই দুজনে পরস্পরকে জানিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কতগুলি অংশের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কেবল এই কবিতাটি লিখিবার আগেই তিনি গান্ধীবাণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই বর্তমানসূত্রে কবিতাটির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তৎসত্ত্বেও আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, এটি লিখিবারকালে কবির মনে নিশ্চয় কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কবি ভাবিয়া বা কিছু না ভাবিয়াই লিখুন প্রসঙ্গসূত্রে তাহাতে নূতন অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়ে। মহৎ শিল্পের এটি একটি মূলগত ধর্ম।

ইহার কয়েকমাস পরে ১৯১৫ সালের বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহার পর হইতে উভয়ের বন্ধুত্বের ও মিলনের ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এই যে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবার পরে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল; যাহা আছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সচেতন চিন্তার ফল,

এবং সেইজন্যই তাহার শিল্পগত মূল্য অল্প।

এমন কেন হইল? কল্পনার বস্তু বাস্তবরূপলাভ করিয়াছে বলিয়াই কি কবি আর তাহাকে পুনরঙ্কিত করিতে চাহেন নাই? কিংবা বাস্তব কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি কবি তাহার ব্যর্থ অনুসরণ করিতে চাহেন না? কিংবা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাইয়া কবি বিড়ম্বিত বোধ করিয়াছেন? কারণ যাহাই হোক তাহা গবেষণাযোগ্য।

এখানেই বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি। নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনায় নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর পূর্বাভাস সাহিত্যিকের, ঐতিহাসিকের ও মনস্তত্ত্ব-বিদের অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মতো ভারতপুরুষ সর্বরসাধার মহামানব সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু আমার বর্তমান প্রচেষ্টা যদি সার্থক হইয়া থাকে তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি আর একজন ভারত পুরুষের অলৌকিক চরিত্র পূর্বাহ্নে পূর্বাভাসে অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্র

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের দুই বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রণাঙ্গনে গান্ধীজীর সক্রিয় ভূমিকা শুরু হয় ১৯১৯ সালে। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি তার নেতৃত্ব করে আসেন। গান্ধীজীর যখন আবির্ভাব ঘটে এই রণক্ষেত্রে তখন নরম গরম নানান পন্থীর নেতার অভাব ছিল না দেশে। তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা এবং ত্যাগ সর্ব কালের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে এই সব শ্রদ্ধেয় নেতার নেতৃ-সত্তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়, গান্ধীজী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র নেতার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গান্ধীজীর এই নেতৃত্বের মূর্তিমান বিদ্রোহ হলেন সুভাষচন্দ্র।

ইতিহাসের বহিরঙ্গ গান্ধী-সুভাষের এই পরিচয়টুকুই চিত্রিত করেছে। কিন্তু বিদ্রোহের উত্তেজনা থেকে মনকে একটু দূরে সরিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যদি একবার এই দুই বিরাট পুরুষের সমগ্র জীবনের দিকে তাকান যায় তবে দেখা যাবে যে, কেবল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই নয়, উপরন্তু প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে যেন এক মিলনের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে।

উনিশ শো একুশ সালের ষোলই জুলাই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই দিনই তিনি ইংলণ্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। গান্ধীজী ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। তাঁরই উদ্যোগে কংগ্রেস অসহ-যোগী নীতিরূপে গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উপাধি ত্যাগের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তার অল্প কিছুদিন আগেই সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অসহযোগের আহ্বান তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে নাড়া দেয়। তিনি সেই পদ ত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিবেদিত করার জন্যে। আর তারই পথানুসন্ধানের জন্য তিনি প্রথমেই সাক্ষাৎ করেন নেতা গান্ধীজীর সঙ্গে। পরম হৃদ্যতার সঙ্গে উভয়ের আলোচনা হয়। আগ্রহভরা মন নিয়ে এক জন উত্থাপন করতে থাকেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর এক জন উত্তর দিতে থাকেন গভীর ধৈর্যের সঙ্গে। আলোচনা শেষ হয়। গান্ধীজী যে-আন্দোলনের

আহ্বান জানিয়েছিলেন তার কোন ছক বাঁধা পরিকল্পনা খুঁজে পান না সুভাষচন্দ্র। নিজেকে অত্যন্ত হতোদ্যম ও হতাশ বলে মনে হয় তাঁর। কী করবেন তিনি?[১] অবশেষে গান্ধীজীরই পরামর্শমত তিনি আসেন দেশবন্ধুর কাছে। এবং এখানেই তিনি তাঁর নেতাকে খুঁজে পান।

একথা সত্য যে, নিজের কাছে তখন কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচী না থাকলেও সুভাষচন্দ্র প্রথম সাক্ষাতের দিনে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অবিসংবাদী বলে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। একথাও অনস্বীকার্য যে, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর এ বিদ্রোহ নয়। তাঁর বিদ্রোহ ছিল এইজন্য যে, গান্ধীজীর কর্মসূচীর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সুনিশ্চিত কোন সম্ভবনা তিনি দেখতে পাননি। আর সেইজন্যই উনিশ শো সাতাশ আটাশ সালে বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন উত্তপ্ত এবং গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছেন তখন সুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে অবসর থেকে ফিরে এসে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থনা জানান।[২] কিন্তু গান্ধীজী কোন আলোক তখন দেখতে পাননি এবং কোন আন্দোলনও তিনি তখন শুরু করেননি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার। গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি আস্থা থাকা সত্তেও আন্দোলনের উপযুক্ত সময় এবং কর্মসূচী নিয়ে গান্ধী-সুভাষের মতান্তর ঘটেছে বার বার।

এই চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে যদি একটু গভীরে গিয়ে অনুশীলন করা যায় তবে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, এই মতান্তর ঘটেছে অন্তিম কোন লক্ষ্যের ভিন্নতার জন্য নয়, এমন কি লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ নির্বাচনের মতভেদের জন্যও নয়; বরং যে-ভিন্ন ভূমিকা থেকে তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখেছেন এবং শুধু দেখেছেন নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তার ফলেই এই বিরোধ এবং বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। মত ও পথের যে পার্থক্য বিদ্যমান তা ঐ ভূমিকার ভিন্নতা জনিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীকে 'সত্যের প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন। রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "যে-ব্যক্তি সত্য সন্ধানী, সে কখনও জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। এই জন্য আমার সত্যানুরাগ আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে।"[৩] তিনি একথাও বলেছেন, "আমার ধর্মের কোন ভৌগোলিক সীমা-

রেখা নেই। যদি আমার ধর্মে জীবন্ত বিশ্বাস থাকে, তবে সে বিশ্বাস ভারতের প্রতি আমার যে-অনুরাগ তাকে অতিক্রম করে যাবে। অহিংসার ধর্মের ভিতর দিয়েই আমার জীবন ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃত।"[৪] বস্তুত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গান্ধীজীর কাছে অন্তিম লক্ষ্য ছিল না, এমন কি বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক কর্তব্যও ছিল না। সেজন্য কেবল ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকেই ভারতকে মুক্ত করার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি চাইতেন যে-কোন ধরনের দাসত্ব থেকেই যেন ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করতে পারে। আর সেজন্য স্বরাজের আন্দোলন ছিল তাঁর কাছে আত্মশোধনের আন্দোলন। এই ভূমিকা থেকেই গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন।[৫]

পক্ষান্তরে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন জন্ম-বিদ্রোহী। জীর্ণ ছিন্ন সব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। যেটি সহজলব্ধ, হাতের নাগালের মধ্যেই যা ধরা-ছোঁয়া দেয় তার প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ নেই। অজানার হাতছানিতে সাড়া দিতে তাঁর আগ্রহ সমধিক। কৈশোরে তাঁর সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প পরিচিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ অধ্যাপকের অপমানকর উক্তির প্রতিবাদের যে-প্রচেষ্টা তাও তাঁর ঐ বিদ্রোহের অভিব্যক্তি।[৬] ইংরেজদের প্রতি চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও যে তিনি ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পড়তে গেলেন তাতেও ইংরেজদের চেয়ে ভারতীয়রা যে কোন অংশে কম নয় এটি প্রমাণ করার মনই তো কাজ করেছে। ইংরেজদের প্রতি এই বিতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ১৯১৯ সালে ইংলণ্ড থেকে লেখা এক চিঠিতে. "যা আমাকে সব চেয়ে আনন্দ দেয় তা হল যখন আমি দেখি সাদা চামড়ার লোকেরা আমার সেবা করছে এবং আমার জুতা পরিষ্কার করছে।"[৭] কিন্তু এই বিতৃষ্ণা মানুষ হিসাবে মানুষের বিরুদ্ধে নয়। দর্শনের ছাত্র, উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র কোন মানুষকেই হেয় গণ্য করে প্রকৃত আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। এই চিঠির বক্তব্য ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ শাসকের যে-অমানুষিক অত্যাচার, তার জন্য মনে যে-জ্বালা সুভাষচন্দ্র অনুভব করতেন তারই প্রকাশ। সেজন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও তপস্যা। সেটিকেই তিনি প্রাথমিক ও পরম কাম্য বলে মনে করতেন। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন পথকেই সুভাষচন্দ্র বর্জনীয় বলে মনে করতেন না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ইতিহাসকার ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধী-সুভাষের ভূমিকাকে এই ভাবে বিবৃত

করেছেন, "গান্ধীর জীবনের আদর্শ ছিল সত্যাগ্রহের প্রতিষ্ঠা, আর সব কিছুই ছিল গৌণ, এমন কি এই আদর্শের বিসর্জনের দ্বারা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কোন অর্থ বা মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। অন্যদিকে সুভাষ বোসের কাছে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং কোন পথই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট খারাপ ছিল না।"[৮] গান্ধী-সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিরোধের দিকটিই বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন ডঃ মজুমদার, দুঃখের বিষয় এর তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তা পেরেছিলেন একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে যখন কংগ্রেসের মধ্যে বিক্ষোভের ঝঞ্ঝা বহে চলেছিল, গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা যখন এক দিকে এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে, সেই সময় ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের দেশনায়করূপে যখন রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বরণ করে নিচ্ছিলেন তখনই একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্য দানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজির মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোন বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুন্ন করে, এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এতদিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন, সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হতে দিতে যদি তিনি শঙ্কিত হন• তা হলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্য প্রিয়তার লোভে।"[৯]

স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের গান্ধীজীর যে বিশেষ উদ্দেশ্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার উল্লেখ গান্ধীজী করেছিলেন বার বার: "আমার কাছে দেশপ্রীতি মানবপ্রীতির সমতুল। আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই আমি দেশকেও ভালবাসি। অন্য দেশকে বাদ দিয়ে আমার দেশপ্রীতি নয়, আমি ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ড কিংবা জার্মানীকে আঘাত করতে পারব না।"[১০] গান্ধীজীর এই মনোভাবটিতে সুভাষচন্দ্র তাঁর সমর্থন খুঁজে পাননি। যৌবনের উদ্দীপনা এবং আত্মপ্রত্যয়ের প্রচণ্ডতা তাঁকে অশান্ত, অধৈর্য করে তুলেছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে মহত্তর কোন নীতির সমীকরণ তিনি করতে রাজী হননি। তাই গান্ধীজীকে 'দূরদৃষ্টি সম্পন্ন' ও 'বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ'[১১] বলে মনে করলেও সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, "মহাত্মা গান্ধী এই দেশের অসাধারণ সেবা করেছেন

এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হবে না।"[১২]

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিও তাঁর চরম বিশ্বাস বলে সমর্থিত হতে পারে না। এ হল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার অভিমান। যাকে বড় মনে করি, যাকে ভালবাসি, আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যার মধ্য দিয়ে মূর্ত হোক বলে কামনা করি, সে যখন আমাকে নিরাশ করে তখন ক্ষোভে এবং অভিমানে আমার মন ভরে ওঠে। আমার বাইরের মন তাকে অস্বীকার করে দূরে সরিয়ে দেয়। এই অভিমান এবং ক্ষোভই ছিল সেদিন সুভাষচন্দ্রের মনে। এবং তার কারণও ছিল। আর সে কারণও ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিন্ন ভূমিকা থেকে দেখবার জন্য।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীজী যে পোশাক পরে উপস্থিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রথমে তা সমর্থন করতে না পারলেও পরে তার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন।[১৩] কিন্তু সেই সময় ইংলণ্ডে গান্ধীজী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তা সমর্থন করতে পারেননি। এবং সেখানে গান্ধীজীর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেছিলেন, "ইংলণ্ডে থাকার সময় তাঁকে একই ব্যক্তিতে দুটি ভূমিকায় কাজ করতে হয়েছিল, একজন রাজনৈতিক নেতারূপে এবং একজন বিশ্বের শিক্ষকরূপে।"[১৪] সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, "পক্ষান্তরে মহাত্মা যদি ডিক্‌টেটর ষ্টালিন অথবা দ্বিতীয় ডিউ মুসোলিনী অথবা ফুহের হিটলারের ভাষায় কথা বলতেন তবে জন বুল তা বুঝতে পারত এবং শ্রদ্ধায় তার মাথা নত করত।"[১৫] কিন্তু এই ভাষায় তো গান্ধীজী কথা বলতে পারেন না! তাঁর কথা হল, "মানুষের স্বভাবকে সন্দেহ করতে আমি নারাজ। যে কোন মহৎ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কাজে তা অবশ্যই সাড়া দেবে।"[১৬] সুতরাং গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের অভিমান থাকা স্বাভাবিক।

এটি যদি অভিমান না হয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি চরম অনাস্থা হত তবে পরবর্তীকালে গান্ধীজীর দ্বারা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে এত আগ্রহী হতে দেখা যেত না। উনিশশো উনচল্লিশ সালে সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী নিয়ে গান্ধীপন্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে তখনই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া হোক এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দান না করলে

ভারতব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা করা হোক। বলাবাহুল্য গান্ধীজীই হবেন এই আন্দোলনের পরিচালক। কিন্তু গান্ধীজী তখন সময়কে অনুকূল মনে করতে পারেননি। না পারার কারণ ছিল। সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন এবং একটি চিঠিতে তিনি লিখেও ছিলেন, "আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি যে, ১৬ই জুলাইয়ের (১৯৪০) মধ্যে ইংলণ্ড পরাজয় স্বীকার করে নেবে এবং আত্মসমর্পণ করবে। ভারতবর্ষকে জার্মানদের আসার আগেই স্বাধীন হতে হবে।"[১৭] কিন্তু গান্ধীজী তা মনে করতেন না। বরং বিপদের সময় ইংরেজকে বিব্রত করতে তিনি ছিলেন নারাজ। যে জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে সুভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছিলেন তাতে বাধা পেলেও তিনি থেমে থাকতে চাইলেন না। আপন অনুগামীদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। আট বছর আগে করাচী কংগ্রেসের সময় অনুষ্ঠিত অখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি গান্ধীজীর প্রতি বিক্ষুব্ধ যুবকদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন কংগ্রেস ছেড়ে চলে না যান, বরং কংগ্রেসের গদি দখল করেন।[১৮] কিন্তু আট বছর পরে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ আসন জয় করেও নানান কারণে তাঁকে তা ত্যাগ করতে হল। পদমর্যাদার মোহে তিনি আপন বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করতে পারেননি। কিন্তু এত বিরোধ এবং বিদ্রোহের মধ্যেও তাঁর ভেতরের মনে গান্ধীজীর প্রতি যে পরম আস্থা তা স্তিমিত হয়নি। তাই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেম, "গান্ধীকে প্রভাবান্বিত করার অন্য সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন যে পথ বাকি রইল তা হ'ল ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করে জনমনকে জয় করে নিতে এগিয়ে যাওয়া এবং তার দ্বারা মহাত্মার উপর পরোক্ষ চাপ দেওয়া।"[১৯] বিচিত্র কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েও গান্ধীজীর প্রতি এই আস্থা সুভাষচন্দ্রের মনে চিরদিন অম্লান ছিল। সেজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে তিনি সর্বপ্রথম 'জাতির পিতা' বলে অভিহিত করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন এবং গান্ধীজী বললেন যে, তিনি এই পরাজয়ে আনন্দিত তখন সুভাষচন্দ্র জানালেন, "এটি আমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয় হবে যদি আমি অন্য সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হই, কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হই।"[২০]

মিলনের এই ফল্গুধারাটিই গান্ধী-সুভাষের জীবনের প্রকৃত সত্য। গান্ধীজীর

কথাতেও তা ধ্বনিত হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ যখন চরমে উঠেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গ নিয়ে গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। তার উল্লেখ করে গান্ধীজী দীনবন্ধু এনড্রুজকে একটি চিঠিতে গুরুদেবকে এই আশ্বাস দিতে বললেন যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কারও কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, আর তাঁর কাছে তিনি তো ছেলের মতো।"[২১]

বস্তুত গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক পিতা এবং পরিণত বয়স্ক পুত্রের মতোই। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষ যদি তরবারির নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহলে আর তাঁর হৃদয়ের গর্বের বস্তু থাকবে না।[২২] তবু সুভাষচন্দ্র যখন ইংরেজের শত্রুদের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার কথা বলেন তখন গান্ধীজী বলেছিলেন যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব তবু নেতাজী যদি তাতে সফল হন তবে তিনিই তাঁকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাবেন।[২৩]

কর্মক্ষেত্রে এই বিরোধ এবং বিদ্রোহের ঊর্ধ্বে অন্তর্লোকে যে মিলনের অন্তঃসলীলা প্রবাহমান প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও গান্ধী-সুভাষের জীবনে তা পরিস্ফুট হয়েছে। এবং তা হয়েছে এই জন্যই যে, যে-পদবিক্ষেপ থেকে তাঁরা রস সংগ্রহ করেছেন তা সমগোত্রীয়। আধ্যাত্মিকতায় নিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, উভয়ের জীবনেরই ধ্রুবতারা হয়েছিল এবং দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক সভ্যতায় সংযোজন করার মতো ভারতবর্ষের কিছু দেয় আছে।

গান্ধীজী যে ভাবী সমাজের কল্পনা করেছিলেন তাকে তিনি রামরাজ বলে অভিহিত করতেন। এই রামরাজ যে ইতিহাস বর্ণিত রামচন্দ্রের রাজত্বের অনুরূপ নয় তার উল্লেখ তিনি বহুবার করেছেন। কিন্তু তুলসীদাস নরোত্তম রামচন্দ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন গান্ধীজী তাঁর কল্পিত সমাজে তার রূপায়ণ যে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত গান্ধীজীবনে তুলসী রামায়ণের এমনই ছিল প্রভাব। সুভাষচন্দ্রের মনোভাবও ছিল অনুরূপ। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "ছেলেদের সকলকে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে দিবেন।···মহাভারত ও রামায়ণ সভ্যতার মূল ভিত্তি একথা আমি যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে আরম্ভ করেছি। দুঃখের বিষয় যে, মহাভারত ও রামায়ণ আগাগোড়া ভাল করে কোন দিন পড়লাম না।"[২৪]

বস্তুত আধ্যাত্মিকতার এই ভিত্তিভূমির উপরেই গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্র

তাঁদের আদর্শের সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, ইতিহাসের গতি ক্রমশই অহিংসা বা প্রেমের দিকে ধাবমান এবং মানুষের সমাজ যে-শক্তির দ্বারা বিধৃত তা হল প্রেমের শক্তি।[২৫] সুভাচন্দ্র জীবনে প্রেমের এই গুরুত্ব পুরোপুরি সমর্থন অবশ্যই করতেন না। কিন্তু মানুষের জীবনের সারতত্ত্ব যে প্রেম সে বিশ্বাস তাঁর ছিল: "প্রেমই বিশ্ব লোকের সারমর্ম এবং জীবনের অস্তিত্বের আদর্শ।...যে মৌলিক আদর্শের উপরে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য আমি প্রেমের একান্ত প্রয়োজন বোধ করি।"[২৬]

এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির উপর সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই সাম্যবাদের আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সেজন্য ১৯৩৩ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের অতিরিক্ত কোন মধ্যপন্থা নেই, বিশ্বকে এদের মধ্যে একটিকেই বেছে নিতে হবে; তখন সুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতবর্ষ কোন দিনই সাম্যবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এবং তার সমর্থনে অন্যতম যুক্তিরূপে তিনি বলেছিলেন যে, সাম্যবাদে স্বীকৃত ইতিহাসের জড়বাদী বিশ্লেষণ ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারে না।[২৭] বস্তুত সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান যুগে সমাজবাদই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যাবলির একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু তা প্রচলিত কোন ধাঁচের সমাজবাদ নয়। ভবিষ্যতের এই সমাজবাদ হবে পরিচিত আদর্শগুলির 'সিনথিসিস' এবং ভারতবর্ষই তা সৃষ্টি করবে।

গান্ধীজীর বিচারধারার সঙ্গে এখানে একটি আশ্চর্যজনক মিল আমরা দেখতে পাই। গান্ধীজীও জড়বাদী কোন আদর্শে বিশ্বাস করতেন না এবং সমতার আদর্শকে সমাজের ধ্রুবতারা বলে মনে করলেও ভারতীয় পরম্পরায় তাকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করার কথা বলেছিলেন তিনি। বস্তুত গান্ধীজীর গঠনকর্ম পন্থার মূল লক্ষ্যই হল তাই। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, "আমি সেই ভারতের জন্য কাজ করে যাব যে ভারতে দীনতম ব্যক্তিও মনে করবে যে, দেশ তারই দেশ। এই দেশ গড়ে তুলতে তারও অভিমত কার্যকরী হবে। সেই ভারতে উচ্চ নীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকবে না। সেই ভারতে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে বাস করবে। সেই ভারতে অস্পৃশ্যরূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকবে না, উত্তেজক পানীয় অথবা

অন্য কোন রূপ মাদক গ্রহণেরও কোন প্রশ্রয় থাকবে না। নারী সমাজ পুরুষ সমাজের মত সমান অধিকার ভোগ করবে। এই আমার ধ্যানের ভারত।" সুভাষচন্দ্রের কথাতেও এই সুর ধ্বনিত হয়েছে: "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। এ শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নয়, এ অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিবারণ ও সম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামীর বর্জনকেও সূচিত করে।"

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, এই স্বাধীনতা কষ্টার্জিত জিনিস, আবেদন নিবেদনে তা পাওয়া যায় না। গান্ধীজীও বিশ্বাস করতেন যে, স্বরাজ, যা শুধু পরশাসন মুক্তিকেই সূচিত করে না, তা ভিক্ষার ঝুলিতে পাওয়া যায় না: "স্বরাজ কখনই একটি জাতির আর একটি জাতিকে দেবার বিনামূল্যের দান হতে পারে না। এ হল সেই সম্পদ যা জাতির শ্রেষ্ঠ রক্ত দানের দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়। স্বরাজ হবে অবিরাম শ্রম ও অপরিমিত যন্ত্রণাভোগের ফলশ্রুতি।" এবং এর জন্য যে-প্রচেষ্টা সুভাষচন্দ্র তাকে 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনে বিপ্লবের স্থান সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর বিচারধারাতেও একটি মিলনের সুর প্রত্যক্ষ করা যায়। অপরিণত বুদ্ধি হানাহানি মারামারিকেই বিপ্লবের পরিচয় বলে মনে করে থাকে। বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সে সচেতন নয়। সমাজের প্রচলিত মূল্য (values) পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকেই প্রকৃত অর্থে বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। সেই প্রচেষ্টার গতি পূর্বনির্ধারিত নয়। প্রয়োজনবোধে এবং পরিস্থিতি অনুসারে তার গতিও মন্থর অথবা তীব্র হতে পারে। সমাজ জীবনে এই দুটিরই প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্র তাই বলেছিলেন, " 'বিবর্তন' ও 'বিপ্লবের' মধ্যে কোন স্বভাবসিদ্ধ পার্থক্য নেই। বিবর্তন অল্প সময়ে ঘটলেই তা হয় বিপ্লব আর বিপ্লব যখন বেশি সময় ধরে সংঘটিত হয় তখন তা হয় বিবর্তন। বিপ্লব ও বিবর্তন উভয়ই পরিবর্তন ও প্রগতির সূচনা করে এবং প্রকৃতিতে উভয়েরই স্থান আছে।" গান্ধীজীর কথাতেও অনুরূপ চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে: "সকল জাতিই বিবর্তন ও বিপ্লব, উভয়ের দ্বারা প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। একটি অপরটির মতোই প্রয়োজনীয়।...ইতিহাস তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক প্রগতি (ordered progress) অপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিপ্লবেরই বেশি নিদর্শন।"

এই বিশ্বাসের জন্যই গান্ধীজী নিজেকে বিপ্লবী বলে আখ্যাত করেছিলেন।

শুধু পরশাসন থেকে মুক্তি নয়, জীবনের এবং সমাজের সকল ক্লেদ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং তার প্রচেষ্টাতেই স্বরাজের সিংহ দুয়ার উন্মুক্ত হবে এই ছিল তাঁর সাধনা। সেজন্য নতুন কাঠামোয় তিনি ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। জীবনের এই সর্বস্তর ব্যাপী পরিবর্তন-প্রচেষ্টার গতি স্বভাবতই ছিল শ্লথ। আর সেজন্য সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে বিপ্লবী বলে মনে করতে পারেননি, মূলত একজন সংস্কারক বলেই তিনিই তাঁকে ভেবেছিলেন।[২৮] এই ভাবনার পিছনেও ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন দুটি দৃষ্টিভঙ্গী। মুক্তিকামী ভারতবাসীর আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বের মহান অবদান ও প্রয়োজন অনুভব করলেও সুভাষচন্দ্র যে কর্মধারাকে গান্ধীজী অনুসরণ করেছিলেন তা সমর্থন করতে পারেননি। তাই রোঁমা রোঁলার কাছে গান্ধী নেতৃত্বের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, গান্ধীজীর দুর্বলতা হল এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের কাছে কোন গোপনতা রক্ষা করেন না। বিরোধীদের সামাজিক বয়কট করার নীতির বিরোধিতা করেন এবং আশা করেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হৃদয় পরিবর্তন হবে।[২৯]

বস্তুত সুভাষচন্দ্র যেগুলিকে গান্ধীজীর ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছিলেন গান্ধীজী ভিন্ন ভাষায় সেগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে করতেন। কেননা বিশ্বজনীন মানবতাবোধের দ্বারাই গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্ম পরিচালিত হয়েছে। তাঁর কথা হল, "সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বই হল আমার লক্ষ্য এবং অন্যায়ের চরম বিরোধিতার সঙ্গে আমি পরম প্রেমের সম্মিলন করতে পারি।"[৩০] পক্ষান্তরে, ভারতীয় স্বাধীনতাকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবসাধনার পরম রমণীয় বলে গণ্য করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "এ মর জগতে সব বিনাশ হয়ে যায়, যাবেও। কিন্তু বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার। আদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বিলীন হতে পারে, কিন্তু তার অবলুপ্তির পরে আদর্শ পুনর্মূর্ত হয়ে ওঠে সহস্র আত্মায়। এই আত্মার ধর্ম। ব্যক্তি আত্মাহুতি দেবে জাতিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য। আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব—যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, লাভ করতে পারে গৌরবময় মুক্তি।[৩১] সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনে এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করেছেন। সেই অর্থে মহাত্মা ও নেতাজী সার্থকনামা পুরুষ।

তথ্যপঞ্জী

১। Indian Struggle—Subhas Chandra Bose p. 55

২। Ibid p. 148

৩। My Experiment with Truth– Gandhiji
৪। Young India 11-8-20
৫। Ibid 12-6-24
৬। The Springing Tiger—Hugh Toe p. 19
৭। Ibid p. 19
৮। History of The Freedom Movement, Vol. II,—R. C. Majumdar page xxvii-xxviii
৯। কংগ্রেস, কালান্তর– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ৩৬৮
১০। মহাত্মা গান্ধী—রেঁামা রেঁালা—পৃ. ৭৮
১১। Indian Struggle—p. 159
১২। Ibid—p. 248
১৩। Ibid—p. 218
১৪। Ibid—p. 228
১৫। Ibid—p. 229
১৬। Young India—4-8-20
১৭। The Springing Tiger—p. 55
১৮। Indian Struggle—p. 207-208
১৯। Ibid—p. 335
২০। Mahatma, Vol. V—D. G. Tandulkar p. 33
২১। পরম বান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৩৮-৩৯
২২। Young India—11-8-20
২৩। I.N.A. and Its Netaji—Shanawaj Khan p. 18-19
২৪। সুভাষচন্দ্রের চিঠি, (মেজ বৌদিদিকে)—নবারুণ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৯
২৫। Harijan—11-8-40
২৬। নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা—সমর গুহ, পৃ. ১৬২
২৭। The Indian Struggle—p. 313-315
২৮। Ibid—p. 316
২৯। Ibid—p. 390
৩০। Young India –10-3-20
৩১। নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, পৃ. ৪

বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে

শ্রীহরিদাস মিত্র

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর সঠিক কোন বিবরণই সেদিন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায় নি। আজাদ হিন্দের গুপ্ত বিভাগে সক্রিয় থাকার অপরাধে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রীটের এক সরকারী ভবনে মিলিটারি পরিবেষ্টিত গোপন বিচার-কক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিতে দিয়েই আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয় ১৯৪৫ সালের জুন মাসের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে।

কয়েকদিন পরের ৭ই সেপ্টেম্বর। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ক্ষুদ্র কারা-প্রকোষ্ঠের অন্তরালে ফাঁসির ঘরের মধ্যে পায়চারী করছি। ফাঁসির আসামী আমি। সরকারী লাল রঙের চিঠির লিখনে মৃত্যু পরোয়ানা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জীবনের মেয়াদ আর মাত্র আট দিন। সহসা অনেকগুলো সিপাই-এর সবুট পদধ্বনির কর্কশ শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। স্মিতহাস্যে শান্ত ধীর পদে বর্তমানে পরলোকগতা আমার স্ত্রী শ্রীমতী বেলা জেল সিপাই ও আই বি অফিসার-যূথ পরিবেষ্টিতা, এসে দাঁড়ালেন আমার কারাকক্ষের লৌহ-কপাটের অদূরে, আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে। দু একটি সাধারণ কথার পর প্রণাম করবার জন্য হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে বেলা অতি সঙ্গোপনে বলে,"শেষ চেষ্টা, আজই বাপুজীর কাছে যাচ্ছি পুণাতে"। তার চোখে মুখে স্থির বিশ্বাস ও কঠিন সংকল্পের আভাস লক্ষ্য করি। কিন্তু সংশয়ে আমার মন দুলে ওঠে। আমি মনে মনে ভাবি অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ মহাত্মাজী কেমন করে বিবেচনা করবেন তাদের কথা যারা তাঁর অহিংসার আদর্শকে দেশের মুক্তি-পথ বলে গ্রহণ করে নি, যারা বিরাট সহিংস বৈপ্লবিক সংগ্রামে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল, যারা সশস্ত্রে সসৈন্যে আসাম বর্মার সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল!

তবুও দেখি এর সাত দিনের মধ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর পুণার নেচার কিওর ক্লিনিক থেকে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে চিঠি লিখলেন গান্ধীজী, "প্রিয় বন্ধু! লণ্ডন থেকে ফিরে আসামাত্র এই চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সম্পূর্ণ মানবতার তাগিদেই এই চিঠি লিখছি। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মাত্র ২২ বৎসর বয়স্কা তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বেলার স্বামী, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ. শ্রীহরিদাস মিত্র মনে হয় অযৌক্তিক কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন……সে যাই হোক না কেন জাপানের সহিত যুদ্ধ-শেষে দয়া প্রদর্শনই একান্ত বিধেয়।" (মূল ইংরাজি :—"Dear friend, I am sorry that I have to worry you almost immediately on your return from London. My only excuse is that my mission is purely humanitarion. Shri Haridas Mitra, an M. A. of the Calcutta University and the husband of Shri Subhas Chandra Bose's young niece Bela, aged 22 years, is under sentence of death over what appears to be an untenable ground. ......In any event the case for mercy becomes irresistible in that the war with Japan is over"—Page 46. Gandhiji's Correspondence with the Government. Published by Navajivan Publishing House, Ahmedabad.) লিখলেন তিনি এই বন্দীদের ঘটনা সম্পর্কে বন্দীর স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ; এই মেয়েটিই আমি শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে থাকা কালে সেবা যত্নে এবং ভজন গানে আমাকে তৃপ্ত করেছে। এ পত্রের শেষ পর্যায়ে মহাত্মাজী লিখলেন, "যদি এই মৃত্যুদণ্ড কার্যে পরিণত করা হয়, তাহলে এটা হবে চরমতম রাজনৈতিক ভ্রান্তি" (মূল ইংরাজি :—"It will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect"—Page 47 of the above book).

এর দুদিন পরে যখন মৃত্যুদণ্ড কার্যে পরিণত করবার সামান্যক্ষণ বাকি, ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত, তখন আলিপুর জেলে সংবাদ এলো আমাদের মৃত্যুদণ্ড সাময়িক ভাবে স্থগিত রইলো বড়লাটের আদেশে। এরও পঁচিশ দিন পরে আমাদের সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ যখন গান্ধীজীর কাছে পৌছল না, তখন পুনরায় বড়লাটকে তিনি লিখলেন, "এই মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হবে এই প্রত্যাশায় বন্দীদের সপক্ষে সমস্ত গণবিক্ষোভ আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। বন্দীর তরুণী পত্নী উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলছে, এই ব্যাপারে দেশে ও গ্রেট ব্রিটেনে অচিরে গণ-আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও সে আমার কথা শুনেছে এবং ধৈর্য ধরে প্রতিক্ষা করছে" (মূল ইংরাজি :—"I have prevented all public appeals and demonstrations in favour of the prisoner in the hope that the death sentence will be commuted. His young

wife was anxious that a move should be made publicly here and also in Great Britain. But she listened to me and has waited"—Page 48 of the above book).

এদিকে আমরাও ফাঁসির ঘরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি। প্রতি পঁচিশ দিন অন্তর একবার করে ফাঁসির মঞ্চ সাজান হয়, আমাদের ওজন নিয়ে ফাঁসির রজ্জুকে পরখ করে দেখা হয় এবং শেষ দিনের সংকেত আমাদের জানান হয়। ওদিকে এই চিঠিরও সময় মত উত্তর আসছে না; বাপুজী অস্থির হয়ে উঠছেন। তবুও বেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমি বিশ্বাস করি, তোমাকে শিগ্‌গিরই সুখবর জানাবো, তোমার মুখে হাসি ফোটাবো, আনন্দে তোমার ভজন গান শুনবো. তারপর তোমায় ছুটি দেবো।" এর পরও দশ দিন কেটে যায় কোনও খবর আসে না। তখন গান্ধীজী পুনরায় বড়লাটকে লিখলেন, "যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত সকল বন্দীরা যে কোনও কারণেই হোক, যুদ্ধ শেষ হবার পরও জীবিত আছে। এটা কি অত্যন্ত বেশি হবে যদি এই ধরনের সমস্ত বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করবার জন্য আপনার কাছে পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করি?" এই পত্রের শেষ লাইনে তিনি লিখলেন, "আমার মতে, বিচারকে যদি ন্যায়-বিচারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তার সুসমঞ্জস বিধানের জন্য দয়া প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে।" (মূল ইংরাজি:— "In my opinion, Justice, to be real justice, requires extention of mercy to temper it.—Page 49 of the above book). এই চিঠির বার দিন পরে ১৯৪৫-এর ১লা নভেম্বর আমাদের চার মাস পাঁচ দিন ফাঁসির ঘরে থাকার পর নূতন দিল্লির ভাইসরয় ভবন থেকে মহাত্মাজীকে জানান হোল আমাদের সকলের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল জারি করেছেন।

গান্ধীজী কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হলেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক সম্বন্ধে দয়া প্রদর্শনের নিদর্শন হিসাবে নূতন করে আর মামলা দায়ের করা হবে না, ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মাজী আমাদের কারামুক্তির দাবি করে বড়লাটের কাছে চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই সেই সম্বন্ধে বড় লাটকে শেষ চিঠি লিখলেন, "প্রিয় বন্ধু, চারটি বিনিদ্র রজনীর গভীর চিন্তার পর, এটি আপনাকে জানান আমার কর্তব্য মনে করি যে, শ্রীহরিদাস

মিত্রের মুক্তিদানে কালক্ষয় করে আপনি অন্যায় করছেন, এটি সরকারী ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন"। (মূল ইংরাজি :—"Dear friend, having slept over it for four nights, I feel it to be my duty to say that it seems your Excellency is wrong to delay the release of Shri Haridas Mitra. It is inconsistent with the declared policy of the Government"—Page 55 of the same book).

দিন গড়িয়ে চলে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভাঙ্গাগড়ার কাজ শুরু হয়। পণ্ডিত নেহেরু ও প্যাটেলের নেতৃত্বে হয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা। তখনও আমরা কারান্তরালে যাবজ্জীবন দণ্ডভোগ করছি। গান্ধীজীর ইঙ্গিতে শ্রীমতী বেলা দিল্লিতে আবার ছুটে যান। দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রাক্কালে ভাঙ্গী কলোনিতে বাপুজীর পাশে বসে বেলা আমাদের সকল বন্দীদের মুক্তির দাবি পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের কাছে উপস্থিত করেন। মহাত্মাজী পূর্বেই বেলাকে বলেছিলেন, "অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব নেহেরু-প্যাটেলের উপর এসেছে। তাই এই বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমার ইচ্ছা সরাসরি তাঁদের উপর চাপাতে চাই না; তুমি শুধু আমার পাশে বসে এই বন্দীদের কথা নেতাদের সামনে তুলে ধরবে।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মুক্তির আদেশ দেন; কিন্তু বাংলা দেশে সুরাবর্দি সরকার নানা টালবাহানার পর আরও দুমাস আমাদের জেলে আটকে রেখে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকিতে আমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

এই ছিলেন গান্ধীজী। প্রতিজ্ঞায় কঠোর, স্নেহে কোমল, কর্তব্যে অটল। বিপন্ন মানুষের আবেদনে, মত ও পথের পার্থক্য তাঁকে টলাতে পারে নি। সত্যসন্ধ মহাপুরুষ। বিবেকের ঐশী নির্দেশে যাকে সত্য বলে মনে করেছেন সেখানে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ তো ছার, পৃথিবীর কোনও শক্তিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

মুক্তি পেয়েই সর্বপ্রথম নোয়াখালিতে আর্তসেবারত মহাত্মাজীকে আমাদের মুক্তির খবর জানালাম, শ্রীমতী বেলার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদও এতে ছিল। উত্তরে গান্ধীজী বেলাকে চিঠি লিখলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখা চিঠি কয়টির এটি অন্যতম। তিনি লিখলেন, "পরম স্নেহের বেলা, হরিদাস ফিরে এসেছেন, কত আশা, কত উদ্‌বেগ নিয়ে, তোমার কি এখন শুয়ে থাকলে চলে?

তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র সুস্থ হয়ে স্বামীর কাজে সহায় হও, তারও অন্তরে বল দাও। ইতি। বাপুর আশীর্বাদ।"

এমনি অন্তরের ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিলেন তিনি।

দুই

১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সকালের ট্রেনে এসে নামলাম নোয়াখালি জেলার সোনাইমারি রেল স্টেশনে। এখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশ দাশগুপ্তের কাজিরখিল ক্যাম্পের একজন সেচ্ছাসেবক একটি জীপগাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম, আমাদের আসবার টেলিগ্রাম পেয়ে, আমার সঙ্গী শ্রীমতী বেলার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে, গান্ধীজী নিজে পূর্বদিন শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জীপের ব্যাবস্থা করেছেন। মহাত্মাজী তখন সোনাইমারি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নোয়াখালির সুদূর পল্লী অঞ্চল নন্দীগ্রাম ক্যাম্পে আছেন। এই ত্রিশ মাইল পথ জীপে একটানা যেতে অসুস্থ বেলার অসুবিধা হবে ভেবে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা স্টেশন থেকে দশ এগার মাইল দূরে কাজিরখিল ক্যাম্পে নেমে, স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, পরে যেন নন্দীগ্রামে যাই। বাপুর নির্দেশমত কাজিরখিল ক্যাম্প হয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় নন্দীগ্রাম গান্ধী ক্যাম্পে পৌছালাম। বাপু তখন প্রার্থনা সভায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমাদের দেখামাত্র ত্রস্তপদে উঠে এসে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বেলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বেলা, তুমি এসে গেছ, তোমার জন্য একটু চিন্তিত ছিলাম।" তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টীমারে, রেলে, জীপে আমাদের কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা, কাজিরখিল ক্যাম্পে গিয়ে স্নানাহার করেছিলাম কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন পরম আত্মীয় অভিভাবকের মত একের পর এক করে যেতে লাগলেন। সত্যিকথা বলতে কি, তাঁর এই স্নেহস্পর্শে অসুস্থ বেলার এই দুদিনের পথশ্রম এক নিমেষে যেন লাঘব হয়ে গেল। প্রশ্নাদি শেষ করে তিনি বলেলন, "আর এখানে নয়, চল প্রার্থনা সভায় যাওয়া যাক।" কুটিরের অদূরেই প্রার্থনা সভা। যথারীতি রামধুন সঙ্গীত হয়ে যাবার পর, বাপুজীর ইচ্ছায় বেলা সবাইকে ভজন ও কীর্তন গেয়ে শোনালেন।

জানুয়ারী মাসের শীতের রাত কোথায় কাটান যায়, খাওয়া দাওয়ারই বা কি হবে, এই নিয়ে পরিচিত সাংবাদিক ও অন্য দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেই সময় মহাত্মাজীর সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় নির্মল বসু মশাই এসে বাপুজীর কাছে

আমাদের নিয়ে গেলেন। বাপু বললেন, "তোমরা যে কদিন এখানে থাকবে, আমার এখানেই খাবে"। খাবার পর শ্রদ্ধেয় নির্মলবাবু বললেন, গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি আমাদের শোবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু শুতে যাবার আগেই আবার বাপুজীর ডাক পড়লো। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করে আমাকে বললেন, "বেলা আমার প্রিয় নাতনী, তুমি আমার নাতজামাই, কিন্তু সে আদর তো তোমাকে করতে পারছি না। তবে এখানেই তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করেছি, অন্ততঃ জেলের চাইতে তো খারাপ কিছু হবে না; আর তাছাড়া বেলাও তো থাকবে সঙ্গে।" লজ্জায়, সঙ্কোচে, শ্রদ্ধায় আনত হলাম। দেখলাম তাঁর কুটিরের এক অংশে আমাদের জন্য বিছানা করা আছে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। নোয়াখালির সেই শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে শুধু আতঙ্ক, অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এই মহামানবের সর্বদিকের সকল ব্যবস্থার উপর কি সজাগ দৃষ্টি! কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য আমরা। কিন্তু যে কদিন তাঁর সঙ্গে ছিলাম স্নেহে, করুণায়, মমত্বে তিনি আমাদের নিরন্তর অভিসিঞ্চিত করেছেন। দুঃখ করে বলতেন, "এখানে তোমাদের খাওয়া থাকার কত অসুবিধা হচ্ছে, নানা গোলমালে কিছুই ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।"

শীতের রাত তখনও শেষ হয় নি, আকাশ তারায় ভরা; বাপুজীর কুটিরের মধ্যেই প্রার্থনা সভায় বসলাম। নিয়মিত এক অধ্যায় গীতা পাঠ হোল, কোরাণ আবৃত্তি হোল। বেলা একটা ভজন গান গাইলেন। প্রার্থনা শেষে বাপু বললেন, "এখনও সকাল হতে দেরি আছে, তোমরা শুয়ে পড়ো, সারা দিন বড় শ্রান্ত হয়েছো।" আমরা শুতে গেলাম। যাবার সময় দেখলাম তিনি লণ্ঠন জ্বালিয়ে একলা বসে লিখতে লাগলেন।

ভোর হতে না হতেই মহাত্মাজীর ঐতিহাসিক পদযাত্রার আয়োজন শুরু হোল। সেদিনের সংবাদপত্র এই যাত্রাকে 'স্মরণীয় পরিক্রমা' বলে অভিহিত করেছিল। তাঁর সহযাত্রী হতে পারায় সেদিন নিজেকে কৃতার্থ বোধ করেছিলাম। ঘন সুপুরি নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে তরুবীথিকা সমাচ্ছন্ন সরু পায়ে চলা পথে, রামধুন গাইতে গাইতে দলটি এগিয়ে চলেছে; সবার আগে চলেছেন, বেলা ও মানু গান্ধী। এই দুজনের দুকাঁধে হাত রেখে সেই মহামানব। গ্রামের মেঠো পথে জানুয়ারী মাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, যথেষ্ট গরম পোশাক পরেও যখন আমরা শীত বোধ করছি, অবাক হয়ে দেখলাম কটিবাস পরিহিত সেই তাপস, সামান্য একখানি খদ্দর-চাদর গায়ে জড়িয়ে

শিশির ভেজা পথে প্রায় নগ্নপদে নির্বিকার চিত্তে চলেছেন। ছুপাশের পোড়াবাড়ী থেকে পল্লী মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে আসছিলেন। বাপুজী প্রশান্ত হাস্যে তাদেরই দেওয়া গাঁদা ফুলের মালা তাদেরই গলায় পরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন। সেই রিক্ত লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের দল অশ্রুসিক্ত নয়নে এই মহামানবের পদধূলি নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। দূর দূর থেকে কাউকে ছুটে আসতে দেখলেই, তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। প্রতিটি মানুষের দুঃখ বেদনা নিজের হাতে মুছে দিতে চেয়েছেন।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা প্রসাদপুর গ্রামে এসে পৌছলাম। এখানে একরাত্রি আমরা ছিলাম। হঠাৎ গভীর রাত্রি প্রায় তিনটার সময় একবার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বাপু আলো জালিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করছেন। বুঝলাম, ক্লিষ্ট মানুষের একান্ত সেবায় সারা দিন ব্যাপৃত থেকেও, তাঁর বেদনার্ত অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে। বিনিদ্র রজনী তাই তিনি সকলের অগোচরে নিঃশব্দে যাপন করেন।

পরের দিন বিজয়নগর গ্রামে-খাবার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ত্রিপুরা নোয়াখালির তাঁর এই পরিক্রমায় অপরাধী মানুষের মনে কোনও ছাপ পড়েছে কিনা, তাদের মানসিকতার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে ? ঐ দিন প্রার্থনা সভায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাপুজী বলেছিলেন যে, "এই মুহূর্তে যদিও বড় রকমের পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন না তবু হৃদয় পরিবর্তনের সাধনার পথই তিনি বেছে নিয়েছেন এবং আজীবন এই পথ ধরেই তিনি চলবেন।" পরের দিন শিবির উঠিয়ে গ্রামান্তরে পৌছলাম।

এবার বিদায়ের পালা! বাপুজীর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনারই একান্ত প্রচেষ্টায় ফাঁসির ঘরে গিয়েও যে জীবন ফিরে পেয়েছি, তা যদি আপনার কোনও কাজে লাগে, নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবো।" একটু মৌন থেকে উত্তর দিলেন, "মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জীবনকে তুচ্ছ করে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, তাতে আত্মত্যাগের সঙ্গে উন্মাদনাও ছিল। কিন্তু আমার পথ সম্পূর্ণ পৃথক, কর্মপদ্ধতিও আলাদা ; তাতে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট আদর্শগুলিকে রূপায়িত করতে হবে, সে কাজে চাই ধৈর্য, চাই সহনশীলতা বহুদিনের শিক্ষায় তা আয়ত্ত করা যায় ; তাই এই মুহূর্তে আমার কাজে তো তোমাকে নিতে পারছি না। তবে বেলা সুস্থ হয়ে উঠলে আমার

প্রয়োজনে ওকে আমি ডাকবো।" একটু মৃদু হেসে আবার বললেন, "তখন যেন আটকাতে চেয়ো না।"

বেলার দুচোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাপুজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে আমরা দুজনে ধীরে ধীরে কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম।

নোয়াখালির পথে পথে

কমলা দাশগুপ্ত

১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে দাঙ্গা বেধেছিল। দেশ দুই টুকরো করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এর পশ্চাতে। সামরিক আক্রমণের কায়দায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সেতু, রাস্তা এবং ডাকঘর আগেই নষ্ট করা হয়েছে। স্টিরাপ পাম্প দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়েছে। ব্যাপক লুঠ, নরহত্যা, নারীহরণ, নারীনির্যাতন করেছে এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে। প্রায় চারশ' গ্রামের দুই লক্ষ মতো লোক এই আক্রমণের শিকারে পরিণত।

পাঁচদিন পরে প্রথম সংবাদ পৌঁছায় কলকাতায় এবং দিল্লীতে। গান্ধীজী যতোই সংবাদ পেতে লাগলেন ততোই অস্থির হয়ে উঠতে থাকলেন। একদিন দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় তিনি বলেন, নারীর দুঃখের কাহিনী আমাকে সর্বদাই বিচলিত করে, আমি তাদের চোখের জল মোছাতে, সান্ত্বনা দিতে নোয়াখালি যাব, তারা কোনোই অপরাধ করে নাই। তিনি মনে করতেন পূর্ববঙ্গের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নয়, এটা একটা সমগ্র ভারতের সমস্যা। দেখলেন, বিপদের বৃহত্তর রূপ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। শ্মশানে প্রেমের স্পর্শ দিয়ে নবজীবনের বীজ বপন করতে হবে তাঁর আপন হাতে, প্রেম দিয়ে শত্রুর হৃদয় জয় করতে হবে নিজের জীবন বিসর্জন করেও—এই তাঁর জীবনের সাধনা।

৬ই নভেম্বর গান্ধীজী নোয়াখালি যাত্রা করেন। শরীর তখন তাঁর ভাল নয়। যাবার সময় তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে বাংলার মাটিতেই আমি প্রাণত্যাগ করব, বাংলার মাটিতেই আমি অস্থি পঞ্জর ফেলে যাব।

নোয়াখালি গিয়ে অনুভব করেন যেন জ্বলন্ত আগুন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। নিজের জীবনে সত্য ও অহিংসাকে পরীক্ষা করার জন্য সেক্রেটারি নির্মল বোস এবং একজন স্টেনোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে তিনি শ্রীরামপুর গ্রামের দিকে রওনা হলেন ২০শে নভেম্বর। সেখানে তিনি হিংসার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান করতে লাগলেন।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি তাদের সুখ দুঃখের কথা, নানা সমস্যার কথা শুনতে থাকেন। যারা অসুস্থ রুগ্ন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা

করতে থাকেন। প্রেম দিয়ে হৃদয় জয় করতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

দাঙ্গার পরে গান্ধীজীর কাছে নোয়াখালিতে বহু কর্মীই গেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকারূপে আমিও রওনা হলাম গান্ধীজীর কাছে। হাতে আমার ছিয়াশিখানা চিঠি। বাংলার আবেগপ্রবণ ছেলেরা কাগজে কোনো একটা আবেদন পড়ে সাড়া দিয়ে উঠেছেন। লিখেছেন, নোয়াখালির লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা মেয়েদের তাঁরা বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

বহু অভ্যন্তরে ছোট্ট গ্রাম শ্রীরামপুর। সেখানে তিনি তখন রয়েছেন। চৌমুহনী হয়ে কাজিরখিলে নেমে মধুপুরে আস্তানা করে তারও তিন মাইল দূরে শ্রীরামপুরে যেতে হবে।

কয়েকটা গ্রামের বাড়ীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলি যেন মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধি সম্বন্ধে অবিশ্বাস এনে দেয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল হিন্দুর বাড়ীই পুড়িয়েছে। শুধু বাড়ী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাগানগুলিতেও পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি সব বড় বড় গাছগুলি পুড়ে গিয়ে অঙ্গারের সারি হয়ে দাঁড়িয়ে দুর্যোগের সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর বলছে মানুষ মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে তোমরা চেয়ে দেখ।

গ্রামের ছোট ছোট এক একটি বাড়ী কয়েকটি কুটিরের গুচ্ছ। কুটিরের গুচ্ছগুলি আবার বাগান দিয়ে ঘেরা। শ্রীরামপুরেও এক বাগানঘেরা বাড়ীর একটি কুটিরে আছেন তাঁর সেক্রেটারী নির্মল বোস। নির্মলবাবুর ঘরে আসবাব আছে মাত্র একটি তক্তপোশের উপর একটি ডেস্ক। আমরা যেতে নির্মলবাবু তাঁর তক্তপোশের পাশে একটি পুরোনো বেঞ্চে সমাদর করে বসালেন। বললেন, গান্ধীজী নিজের সঙ্গীদের সবাইকে গ্রামে গ্রামে বসিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজে এখানে রয়েছেন দু'একজন মাত্র সাথী নিয়ে। আমি যে চিঠিগুলি নিয়ে গেছি সেগুলি নির্মলবাবুর হাতে দিয়ে আমার বক্তব্য বললাম। ত্রস্তপদে নির্মলবাবু চিঠিগুলি নিয়ে চলে গেলেন গান্ধীজীর কাছে। এখানে কে যেন বলছে, সবাই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নাও, সময় কোথায়? নির্মলবাবুর নাকি একখানা চিঠির উত্তর লিখতে একটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল কোনো বিশেষ কারণ বশতঃ। গান্ধীজী তাঁকে বলেন—কিন্তু তারা কি মনে করবে? মনে মনে ভাবি গান্ধীজীর কাছে প্রতিদিন শত শত চিঠি আসছে, কত রকমের সমস্যা সমাধান

করতে হচ্ছে, কত রাজনৈতিক জট জড়িয়ে রয়েছে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে, লীগের সঙ্গে, কংগ্রেসের ভিতরে, জনসাধারণের সামনে, সর্বত্র। গান্ধীজীকে তো সমাধান খুঁজতে হয় সব কিছুরই। কেমন করে এই মানুষটি বার্ধক্যের উর্ধ্বে উঠে, কোনো তুচ্ছ মানুষকেও অবহেলা না করে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে চলেছেন! তাই সর্বত্রই তিনি হুঁশিয়ার, সর্বদাই তিনি বলছেন, কাজ ফেলে রাখবার সময় কোথায়?

নির্মলবাবু যেমন দ্রুতপায়ে গিয়েছিলেন অমনি দ্রুতই ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়েছে আমাদের গান্ধীজীর কাছে।

আমরা ঘরে ঢুকবার আগেই দেখি দুই হাত জোড় করে হাসিমুখে নমস্কার করছেন তিনি আমাদের। সেই হাসিটুকু যেন মুহূর্তে আমাদের বলে দিল—তোমরা আমার চির আপন। যেন তাঁর কাছে সহজ হয়ে মন খুলে সব কথা বলা যায়। আমরা প্রণাম করবার আগে, আমাদের পরিচয় না পেয়েও তিনিই আগে কেমন করে আমাদের হাসিমুখে নমস্কার করছেন!

আমরা প্রণাম করে বসলাম। একটা তক্তপোশে শুয়ে আছেন তিনি, কপালে ও পেটে মাটির প্রলেপ দেওয়া। সোমবার, তাই তাঁর মৌন দিবস। তিনি আমার চিঠিগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লিখে দিলেন একটা পুরোনো খামের উল্টো পিঠে:—

"Personally I do not think that the extent of evil is so great. Many such cases have not come under my observation. In any case you may keep in mind the young men who will take in such girls and see what can be done when you come across a bonafide case."

নির্মলবাবু বললেন, সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর কথা হবে। সন্ধ্যার আগে একটা টিনের চালার নীচে বসে প্রার্থনা হল। শতখানেক লোক। পুলিশ, মিলিটারী এবং প্রেস রিপোর্টাররাই অধিকাংশ, গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র। আর কলকাতায় আমরা কী জনস্রোত দেখেছি তাঁর জন্য।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বেড়াতে বার হলেন নোয়াখালির মাঠে। চতুর্দিকে কেবলি ক্ষেত, যতদূর দৃষ্টি যায় সুদূর আকাশ এসে স্পর্শ করে রয়েছে সবুজ প্রান্তরকে। গান্ধীজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছি। গ্রামের একটি মা এসে তাঁকে প্রণাম করে একটি ফুলের মালা দিয়ে নীরবে চলে গেল। ফুলের মালাটি তিনি আমাকে

দিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুমি এটি নাও। যেন আমি তাঁর চিরদিনের স্নেহের কন্যা। জীবনে কাজের প্রয়োজনে বড়র কাছে যদি কখনো গেছি একটা যথেষ্ট দূরত্ব রেখেই তো চলেছি উভয় পক্ষে। সেটাই তো স্বাভাবিক জানি। কিন্তু এখানে এই মানুষটির সঙ্গে দূরত্বটা কী যাদুতে মুছে গেল। আমি আমার অজানিতেই সহজ হয়ে উঠলাম। মনে হয় নি এক মহামানবের সঙ্গে রয়েছি। মনে হয়েছে, যেন মায়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি—সব কথাই বলতে পারি।

হাসিমুখে বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি তখন লিখে দিয়েছি। তুমি দেখতে থাকো যদি এই রকম মেয়ে পাও। আমি বলি—আমি খুঁজে দেখব। এই রকম মেয়ে পাই তবে বিয়ে দেবার শেষ এবং আসল দায়িত্ব আপনার।

—আচ্ছা। এ-রকম বিয়ে করতে প্রস্তুত ছেলে এবং মেয়েকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

তারপর খুব হাসতে হাসতে বললেন, তোমার ছেলে এবং তোমার মেয়ে, তুমি খুশিমতো বিয়ে দেবে। মা কি কখনো নিজের ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে অন্যের উপর নির্ভর করে? সবাই সেদিন খুব হেসেছিল—আমিও হেসেছিলাম। কিন্তু গান্ধীজীর হাসির পিছনে যে আসল কথাটি লুকিয়ে ছিল সেই মূল কথাটি সেদিন আমি বুঝিনি। আজ মনে হয়, তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে চাইলেন, জগতের সকল ছেলেকে এবং সকল মেয়েকে যেন আমি নিজের সন্তান মনে করতে পারি; তেমনি করে ভালবাসতে পারি ঠিক যেমন তিনি আমাকে মুহূর্তে আপন করে নিয়েছিলেন এবং আমার দেওয়া সকল দায়িত্বভার অনায়াসে নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে রাজী হয়েছিলেন। আমাকে বলতে চেয়েছিলেন, সকলকে ভালবেসো। ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে মধুর হেসে মহৎ শিক্ষার পথ তিনি মেলে ধরেছেন অবোধ মানুষের কাছে। আমাদের হাসির মধ্য দিয়ে সেকথা মিলিয়ে গেল নোয়াখালির আকাশে বাতাসে।

পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলি আমাকে তখনও পীড়া দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, —এখানে শান্তি ফিরে আসা কি সম্ভব?

—নিশ্চয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শালা ভগ্নীপতির চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নিয়ে ঝগড়া মিটে যায় নি?

এখানকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেও তিনি সেভাবেই মিটিয়ে দিতে পারবেন, এই তাঁর আত্মবিশ্বাস। এও যেন আত্মীয় বিরোধ।

—কি ভাবে মিটবে?

—মৃত্যু পণ করে এক একজন কর্মী এক একটা গ্রামে বসে যাবে। তাদের দেখে সাহস পাবে গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। ধীরে ধীরে তারা আসবে যাবে। কিন্তু কর্মীরা বসে থাকবে মৃত্যু পণ করে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নিজেই মৃত্যু পণ করে বসে আছেন বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে। আর, দাবি করছেন তাঁর কর্মীদের কাছ থেকে অমনি মৃত্যু পণ।

বেড়ানো এবং আলোচনা হয়ে গেলে তাঁকে ঘরে তুলে দিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

এই আলোচনার পর আমি বিয়ের মেয়ে খুঁজতে চলে গেলাম নানা ক্যাম্পে ও রিলিফ কেন্দ্রে। বহু ক্যাম্প ঘুরে বুঝলাম, অত্যাচারিত মেয়ের সংখ্যা কম। অত্যাচারিত হয়ে থাকলেও মেয়েরা স্বীকার করতে চায় না। যা-ও বা জানা যায় প্রায়ই তারা বিবাহিতা, স্বামীরা তাঁদের ফিরিয়ে নিয়েছে, কুমারী মেয়েরা চৌদ্দ বছরের নীচে। এ-অবস্থায় গান্ধীজীর কাছে কেমন করে নিয়ে যাই? তাছাড়া রিলিফ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষরা বলেন, ঐ ধরনের কয়েকটি ঘটনার মোকদ্দমা তাঁরা নিজেরা চালাচ্ছেন। কাজেই সে সব মেয়েদের নাম ও পরিচয় তাঁরা দেবেন না—গোপন রাখতে হবে মামলা চালাবার প্রয়োজনে। বিয়ে ঘটিয়ে উঠতে পারলাম না আমি।

ফিরে এলাম দত্তপাড়ায়। সেখানে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী। আমার বিয়ে দেবার কঠিন ভার তিনি তুলে নিলেন নিজের হাতে। তিনিও চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেন নি।

সুচেতা দেবী বিজয়নগর গ্রামে কাজের কেন্দ্র স্থাপন করতে চাইলেন। আমি বসে পড়লাম বিজয়নগর গ্রামে কাজের কেন্দ্র করে। আরো পাঁচ ছয়টা গ্রাম নিয়ে আমাদের কেন্দ্র। গ্রামের মুসলমানদের ঘরে ঘরে যাই, তাঁদের আপন করে নিতে চেষ্টা করি এবং হিন্দুদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে অনুরোধ করি। তাঁদের অন্যায়টা বুঝিয়ে দিতে চাই। ওদিকে রিলিফ কেন্দ্রে গিয়ে হিন্দুদের বোঝাতে থাকি, নিজেদের বাড়ীতে সাহস করে ফিরে আসতে বলি। বলি, আমরা আছি, ভয় নেই, চলে আসুন।

গভর্নমেণ্ট ক্ষতিপূরণের জন্য সামান্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করছিল। গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে পুড়ে যাওয়া বাড়ীগুলি দেখি। যত বাড়ী পুড়েছে, ব্যাবসা নষ্ট হয়েছে, জিনিস লুঠ হয়েছে সব নিজেরা দেখি, শুনি এবং তার

তালিকা তৈরি করি। যারা সাহসে বুক বেঁধে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে তাদের জন্ম খয়রাতী খাদ্য-সাহায্য পাবার চেষ্টা করতে থাকি। তাদের বাড়ী, বাগান, জিনিস সর্বস্ব গেছে কিন্তু নিজের পোড়া ভিটের মায়ায় তারা আবার আনাগোনা করছে আর চোখের জলে ভাসছে। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা খুশী হয়, পরম আত্মীয়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, সাহসে বুক বাঁধতে চায়। আমাদের পাওয়া যে তাদের সেদিন কত প্রয়োজন ছিল সেকথা বুঝেছিলেন গান্ধীজী।

এই ভাবেই কাজের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয় খবর পাঠালেন, গান্ধীজী নোয়াখালিতে যে গ্রাম-পরিক্রমা করে চলেছেন তার মধ্যে পড়ে যাবে আমাদের বিজয়নগর কেন্দ্রও। ৯ই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) দু'দিন থাকবেন তিনি আমাদের ক্যাম্পে।

২রা জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর ঐতিহাসিক পদযাত্রা। একদিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কূটনীতি অন্যদিকে দুঃখী গ্রামবাসী। উভয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সামাজিক মমতার বন্ধন গড়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি, তারই মধ্যে ছিল তাঁর রাজনৈতিক সমাধানও। সমস্যাসংকুল কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে আছে শুভ বুদ্ধি। সেই শুভ বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খালি পায়ে হেঁটে চলেছিলেন সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ পিতা। নিজের জীবনের প্রতি খেয়াল ছিল না তাঁর, জীর্ণ দেহের প্রতি করুণা ছিল না। সন্তানদের রক্ষা করতে ছুটে চলেছেন।

বাপুজীর সেই যাত্রাপথে পড়েছে বিজয়নগর কেন্দ্র। জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্য আমার। সতীশবাবু যেমন নির্দেশ পাঠিয়েছেন তেমনি করে তৈরি করছি আমাদের কেন্দ্রকে। বাপুজীর সঙ্গে আসবেন তাঁর কয়েকজন অনুগামী। তাছাড়া আমি আমাদের আশেপাশের ক্যাম্প থেকে কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বাপুজী হয়তো তাঁদের সকলের কেন্দ্রে যেতে পারবেন না। কর্মীরা আমাদের কেন্দ্রে এসে তাঁকে দেখে যান, যা বলার আছে বলে সমাধান নিয়ে যান, এই আমার ইচ্ছা।

অল্পই সময় হাতে। সমস্ত ব্যবস্থা এরই মধ্যে করতে হবে। নন্দীগ্রাম থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত আসবার প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা তাঁর খালি পায়ে হেঁটে চলার মতো তৈরি করে নিতে হবে। সে পথ ছিল এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো। আবার সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় যাবার সওয়া মাইল রাস্তাও তেমনি করে সমতল করতে হবে।

একটি ঘর গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে খড় বিছিয়ে রাখতে হবে অতিথিদের শোবার ও থাকার জন্য। কয়েকটা পায়খানা বানাতে হবে মীরাট কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনার আদর্শে।

বাড়ীটার অতবড় বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার করা, অতিথিদের দু'দিনের খাবার জন্য লক্ষ্মীপুর থেকে চাল, ডাল, তরকারি আনা—কাজের অন্ত নেই। বাপুজী আসছেন অতিথি হয়ে আমাদের কাছে। জীবনে এতবড় দায়িত্ব তো কখনো পালন করিনি। তবু কিন্তু আমার ভয় ছিল না—মনে হয়েছে সেই বাপুজীই তো আসছেন, আমি ঠিক পারব।

আমাদের কেন্দ্রের কর্মীরা অবিশ্রাম খেটে চলেছেন—কল্যাণী দত্ত, অর্চনা প্রামাণিক, মীরা, অনিল সেন, বাড়ীর মালিক যোগেশ মজুমদার, সুচেতা দেবীর সেক্রেটারী ভরত। বাপুজী আসবার আগের দিন অন্যান্য কেন্দ্র থেকে এলেন মায়া ঘোষ, অশোকা গুপ্ত, স্নেহরাণী কাঞ্জিলাল, বেলা চৌধুরী ও অন্যান্য মেয়ে কর্মীরা, আরও কত মেয়ে এবং ছেলের দল। খাটছেন আমাদের গ্রামের ছেলেরাও। অন্য গ্রামের ছেলেরাও এসেছেন। সমস্ত কাজই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। গ্রামের সব কাজের রিপোর্ট লিখে দিতে হবে বাপুজী এলে। তাতে থাকবে যত রকমের পরিসংখ্যান, দাঙ্গার ফলে গ্রামের অবস্থা, গ্রামের সমস্যা, আমাদের কাজের কি কি অসুবিধা এবং আমরা কি কি কাজ করছি সেকথা ইত্যাদি।

৯ই ফেব্রুয়ারী ভোর পৌনে চারটায় সদলবলে রওনা হয়েছি আমরা বাপুজীকে আনতে নন্দীগ্রাম থেকে। শীতের শেষ রাতে কন্‌কনে বাতাসে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছি আমরা গান গেয়ে। আড়াই মাইল রাস্তা যেন বেরোতেই ফুরিয়ে গেল।

নন্দীগ্রামে পৌছে আমরা ঘিরে বসলাম নির্মলবাবুকে। তিনিই সব বলে দেবেন। প্রথমেই নিয়ে গেলেন শাহ্‌ নওয়াজের কাছে। তিনিও আজ হবেন আমাদের অতিথি। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের এই দুর্ধর্ষ সৈনিককে আজ সগৌরবে দেখার সুযোগ হবে আমাদের গ্রামবাসীদের। সাম্প্রদায়িকতার লেশশূন্য এই দেশ-প্রেমিককে দেখে শিখুক নোয়াখালির গ্রামবাসীরা।

তারপর যাই বাপুজীর কাছে। মানু বেন কাছে বসে কি যেন লিখে চলেছেন। আমারা যেতেই বাপুজীর সেই পরিচিত সস্নেহ হাসি। বলেন কতদূরে নিয়ে যাবে ?

—আড়াই মাইল।

—নোয়াখালির আড়াই মাইল তো ?

এবারে আমরা হাসি।

ঠিক সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কাছে যেতেই কাঁধে হাত রেখে রওনা হলেন তিনি।

রাস্তায় চলতে চলতে সবাই মিলে রামধুন গেয়ে চলেছেন :

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম॥
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সব্‌কো সন্মতি দে ভগবান॥
যো হি আল্লা সো হি রাম।
সব্‌কো সুমতি দে ভগবান॥

গাইছেন দলের সবাই, প্রেস রিপোর্টারদের একটি মস্ত দল রয়েছে সঙ্গে—একেবারে একাত্ম হয়ে গাইছেন তাঁরাও। নোয়াখালির আকাশ বাতাস দিগন্তজোড়া ক্ষেত সব যেন গাইছে, রঘুপতি রাঘব রাজারাম—মানব প্রকৃতিও যেন গেয়ে উঠেছে সব্‌কো সুমতি দে ভগবান।

রাস্তার ছ'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামের কিছু কিছু মুসলমান, অতি সামান্য সংখ্যক হিন্দুও। বাপুজী একহাতে সেলাম করছেন মুসলমানদের অন্যহাতে নমস্কার করে চলেছেন হিন্দুদের। মুসলমানরা কিন্তু প্রায়ই তাঁকে সেলাম করছে না। দেখে মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। বলি, উনি আপনাদের সেলাম করছেন, আপনারাও করুন। তবু বেশীর ভাগই তারা সেলাম জানায় নি। বাপুজীর কিন্তু বিরাম নেই, ছুই হাতে অভিবাদন করে চলেছেন। করুণ দৃষ্টিতে কী গভীর অনুরাগভরা আবেদন ফুটে উঠেছে তাঁর। প্রেমে আপ্লুত চোখ ছুটি থেকে করুণার ধারা ঝরে পড়ছে। নোয়াখালির ধূলিকণাও বুঝি তাঁর প্রেমের আবেদনে সেদিন সাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল।

শুধু রামধুন নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে গাইতে আড়াই মাইল রাস্তা পার হয়ে নিয়ে এলাম আমরা তাঁকে বিজয়নগর। বিজয়নগর ক্যাম্পে সেদিন লোক ধরে না। এরা এতদিন ছিল কোথায় ? শত অনুরোধ, শত খোশামোদ, শত ব্যবস্থার চেষ্টায়ও যা আমরা করতে পারিনি, আজ শুধু একজনের আগমনে ক্যাম্প আমাদের পরিপূর্ণ ! আনন্দে সবাই আসছে, হাসছে, খুঁজছে। চঞ্চল আমাদের

গ্রাম, উৎসুক গ্রামবাসীদের দৃষ্টি, আশা তাদের অফুরন্ত। ভীত আর্ত নারীও দলে দলে এসেছেন তাঁকে প্রণাম করতে। বলি, বিকেলে প্রার্থনাসভায় তাঁকে দেখবেন।

বিকেলে প্রার্থনাসভায় যাবার সময় তাঁকে জানাই মেয়েদের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। বরাভয়ের হাসি ফুটে রয়েছে তাঁর মুখে। ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করল গ্রামের রমণীরা।

তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনাসভায় চল।

—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ফিরবার সময় রাস্তায় গুণ্ডাদের ভয়।

—ভয় কি ? আমি আছি, এসো আমার সঙ্গে।

নোয়াখালির কুলবধূরা বাপুজীর পিছনে দল বেঁধে প্রার্থনাসভার সওয়া মাইল রাস্তা গিয়েছিল এবং নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত ইতিহাসের পথ বেয়ে নির্ভয়েই সেই রাতে বাড়ী ফিরেছিল। কোনো অশুভ আঘাত নেমে আসে নি। নোয়াখালির পথ তখন সম্পূর্ণই বিপদশূন্য, কলুষমুক্ত। উপস্থিতি শুধু একটি মানুষের, আবেদন তাঁর মর্মস্পর্শী।

প্রার্থনাসভায় অনেক লোক এসেছিল। গীতা, কোরাণের বাছা বাছা জায়গাগুলি পড়া হয় সেখানে। তাঁর যা কিছু বক্তব্য প্রার্থনাসভায়ই তিনি তা বলেন, লোকদের প্রশ্নের উত্তরও সেখানেই দেন। তারপর ফিরে এলাম আবার আমরা বিজয়নগর।

প্রার্থনাসভায় যাবার পথে আমাকে মিষ্টি হেসে বলছেন, পায়খানার ব্যবস্থা তো ভাল হয় নি। মানু এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। তুমি প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে এসে ওর কাছ থেকে পায়খানাগুলির ব্যবস্থা করতে শিখে নিও, কেমন ? তারপর আমি নিজে দেখব।

—আচ্ছা। আগে আমি শিখে নিই, তারপর আপনি দেখবেন।

প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে মানু বেনকে নিয়ে যাই পায়খানা ঠিক করতে। বাপুজীর ঘরের কাছের যে-পায়খানা আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেটাও লোকেরা ব্যবহার করেছে, তাই গন্ধ আসছিল। সেটাতে আমরা মাটি ব্লিচিং পাউডার ঢেলে দিলাম, তার বেড়া ভেঙ্গে সুপুরি গাছ তুলে ফেলে দিলাম—তবুও কিন্তু লোকেরা সেটা ব্যবহার করেছিল। অন্য পায়খানাগুলির সামনেও আমরা মাটি ও ব্লিচিং পাউডার আগে থেকেই রেখেছিলাম, মীরাট কংগ্রেসে যেমনটি দেখেছি। মানু বেন বললেন, এসব জিনিস ব্যবহার করতে লিখে দাও

বড় বড় অক্ষরে সব পায়খানার সামনে। তাছাড়া ভলান্টিয়ার এবং ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে মাটি ও ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে নিজে সেগুলি ঢালবে।

পরদিন শেষ রাতে বাপুজীর ঘরে প্রার্থনা। ছোট্ট ঘরে অল্প গুটিকয়েক মানুষ আমরা গিয়ে বসলাম। গাম্ভীর্যপূর্ণ নিষ্ঠায় সমাপ্ত হল প্রত্যুষের প্রার্থনা।

এই দু'দিনের জন্য খাদ্য যা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম তা একদিনেই প্রায় ফুরিয়ে গেছে। এক এক বেলায় দেড় শত মানুষ খাবে আন্দাজ করে খাবার সংগ্রহ করেছিলাম। খেয়েছে কিন্তু এত বেশি লোক যে একদিনেই ফুরিয়ে গেছে অনেক জিনিসপত্র। কিন্তু না, ফুরোয় নি। পরদিন কোথা থেকে যে খাবার জিনিস আসতে লাগল, শত শত লোক আবার খেয়ে গেল, তবু ফুরিয়ে গেল না, অপদস্থ হতে হল না। আমাদের কাছে আছেন শুধু ঐ একটি মানুষ। বাপুজীরই মধুসূদনদাদা যেন সেদিন রক্ষা করে চলেছিলেন, অফুরন্ত করে রেখেছিলেন দইয়ের ক্ষুদ্র ভাঁড়টিকে। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন কত লোক খাচ্ছে এবং তারা কারা।

আজ দ্বিতীয় দিন সোমবার, তাঁর মৌনদিবস। মুসলমানদের অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি খুবই ইচ্ছুক—তাই গোপীনাথপুরের মুসলমানদের একান্ত অনুনয় রক্ষা করতে চলেছেন তিনি তাঁদের গ্রামের দিকে। তাঁরা বলেছেন দেড় মাইল রাস্তা মাত্র। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরও যখন দেখা গেল আরও কিছুদূর যেতে হবে তখন তিনি পিছন ফিরলেন। লিখে দিলেন, "Don't make me collapse, let us go back." যাতায়াতের তিন মাইল রাস্তা চলতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলেন। লোকে তাঁর জীর্ণ শরীরের অবস্থা কতটুকুই বা বোঝে।

সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর মৌনভঙ্গ হল। সওয়া মাইল রাস্তা বেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। পরের দিন ১১ই ভোর সাড়ে সাতটায় চলে যাবেন তিনি আমাদের গ্রাম ছেড়ে। চলে যাবার আগে ঘর থেকে বেরিয়েই আবার হাসিমুখে কোমরে ঝোলানো ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন, দেখ্, তোর জন্য দু'মিনিট সময় রেখে দিয়েছি, তোর তৈরি পায়খানা এবার দেখে যাব। আমার শিক্ষা কেমন হয়েছিল সেকথা আজও জানি না, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন।

আবার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন তিনি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামান্তরে। ভালবাসার জগৎ গড়ে তুলবেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে চুক্তিবদ্ধ

এক তামিল শ্রমিক বালসুন্দরম্‌কে তার ইংরেজ প্রভু প্রচণ্ড প্রহার করে দাঁত দুটো ভেঙে দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরিয়েছিল, বস্ত্র ছিন্নবিছিন্ন করে দিয়েছিল—কাঁদতে কাঁদতে সে এসে দাঁড়িয়েছিল গান্ধীজীর সামনে। করুণায় বিচলিত গান্ধীজী তার প্রতিকার করতে সেদিনও ছুটেছিলেন সেই প্রথম-জীবনে। পীড়িত মানবের কান্না জীবনকে তাঁর ব্যথাতুর করে রেখেছিল। জগতের সকল দুঃখীর দুঃখ ঘোচাতে, কান্না মোছাতে তিনি সেই যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন জীবনসন্ধ্যায় আজ নোয়াখালির গ্রাম-পরিক্রমায়ও চলেছে তারই অবিরাম পদধ্বনি। তিনি জেনেছিলেন পীড়িত মানব শুধু একটি মাত্র বালসুন্দরম্‌ নয়, কোটি কোটি মানুষ প্রবলের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। কোথাও ব্যক্তি, কোথাও সমগ্র জাতিই অপমানিত, লাঞ্ছিত। রক্তক্ষরিত একটি মানুষকে রক্ষা করে তাই তাঁর তৃপ্তি আসে নি, সমাধান মনে হয় নি।

তিনি জেনেছিলেন সকলের মঙ্গল হলে, সকলের উন্নতি হলে তবেই আসবে প্রতিটি আলাদা মানুষের মঙ্গল ও শুভ। রাস্কিনের লেখা Unto this Last বইখানি তাঁকে শিখিয়েছিল—The good of the individual is contained in the good of all.

অন্যের উপর উৎপীড়ন বা নির্যাতন করে কখনো কোনো মানুষ বা জাতি বেশীদিন নিজেদেরও শুভ আনতে পারে না। "পশ্চাতে টানিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" সকলের ভাল করতে পারলে তবেই হবে নিজের মঙ্গল। তার মধ্যেই আছে সকল সমস্যার সমাধান। তাই তাঁর সর্বোদয়।

তিনি মনে করতেন, মানুষের মনে হিংসা ও প্রেম দুটি প্রবৃত্তিই আছে। জিঘাংসা বৃত্তি অবলম্বন করে জগতে বহু জাতিই যুগে যুগে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন অন্যের মনে জাগিয়ে তুলেছিল অধিকতর হিংস্র প্রবৃত্তিকে। হিংসা পায় হিংস্রতর প্রত্যাঘাত। অত্যাচারীর তাই পতন হয়। হিংসা এবং তার প্রতিশোধ—এর শেষ কোথায়? কিন্তু মানবমনে অন্য-দিকে আছে প্রেমও। তিনি মনে করতেন প্রেম দিয়েও হৃদয় জয় করা যায়, হৃদয়ের পরিবর্তন করা যায়—তাতে হবে সুবুদ্ধির উদয়, আসবে জগতে কল্যাণ ও শান্তি।

তাই যখন নোয়াখালিতে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই নিঃসঙ্গ একক মানুষটি হাত দুটি তাঁর অকাতরে প্রেম বিলিয়ে চলেছিল, চোখ দুটি তাঁর প্রেমের আবেদনই করে চলেছিল। জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি মানুষের

বড় বড় অক্ষরে সব পায়খানার সামনে। তাছাড়া ভলান্টিয়ার এবং ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে মাটি ও ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে নিজে সেগুলি ঢালবে।

পরদিন শেষ রাতে বাপুজীর ঘরে প্রার্থনা। ছোট্ট ঘরে অল্প গুটিকয়েক মানুষ আমরা গিয়ে বসলাম। গাম্ভীর্যপূর্ণ নিষ্ঠায় সমাপ্ত হল প্রত্যুষের প্রার্থনা।

এই দু'দিনের জন্য খাদ্য যা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম তা একদিনেই প্রায় ফুরিয়ে গেছে। এক এক বেলায় দেড় শত মানুষ খাবে আন্দাজ করে খাবার সংগ্রহ করেছিলাম। খেয়েছে কিন্তু এত বেশি লোক যে একদিনেই ফুরিয়ে গেছে অনেক জিনিসপত্র। কিন্তু না, ফুরোয় নি। পরদিন কোথা থেকে যে খাবার জিনিস আসতে লাগল, শত শত লোক আবার খেয়ে গেল, তবু ফুরিয়ে গেল না, অপদস্থ হতে হল না। আমাদের কাছে আছেন শুধু ঐ একটি মানুষ। বাপুজীরই মধুসূদনদাদা যেন সেদিন রক্ষা করে চলেছিলেন, অফুরন্ত করে রেখেছিলেন দইয়ের ক্ষুদ্র ভাঁড়টিকে। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন কত লোক খাচ্ছে এবং তারা কারা।

আজ দ্বিতীয় দিন সোমবার, তাঁর মৌনদিবস। মুসলমানদের অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি খুবই ইচ্ছুক—তাই গোপীনাথপুরের মুসলমানদের একান্ত অনুনয় রক্ষা করতে চলেছেন তিনি তাঁদের গ্রামের দিকে। তাঁরা বলেছেন দেড় মাইল রাস্তা মাত্র। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরও যখন দেখা গেল আরও কিছুদূর যেতে হবে তখন তিনি পিছন ফিরলেন। লিখে দিলেন, "Don't make me collapse, let us go back." যাতায়াতের তিন মাইল রাস্তা চলতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলেন। লোকে তাঁর জীর্ণ শরীরের অবস্থা কতটুকুই বা বোঝে।

সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর মৌনভঙ্গ হল। সওয়া মাইল রাস্তা বেয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। পরের দিন ১১ই ভোর সাড়ে সাতটায় চলে যাবেন তিনি আমাদের গ্রাম ছেড়ে। চলে যাবার আগে ঘর থেকে বেরিয়েই আবার হাসিমুখে কোমরে ঝোলানো ঘড়িটি দেখিয়ে বললেন, দেখ্, তোর জন্য দু'মিনিট সময় রেখে দিয়েছি, তোর তৈরি পায়খানা এবার দেখে যাব। আমার শিক্ষা কেমন হয়েছিল সেকথা আজও জানি না, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন।

আবার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন তিনি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামান্তরে। ভালবাসার জগৎ গড়ে তুলবেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে চুক্তিবদ্ধ

এক তামিল শ্রমিক বালসুন্দরম্‌কে তার ইংরেজ প্রভু প্রচণ্ড প্রহার করে দাঁত দুটো ভেঙে দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরিয়েছিল, বস্ত্র ছিন্নবিছিন্ন করে দিয়েছিল—কাঁদতে কাঁদতে সে এসে দাঁড়িয়েছিল গান্ধীজীর সামনে। করুণায় বিচলিত গান্ধীজী তার প্রতিকার করতে সেদিনও ছুটেছিলেন সেই প্রথম-জীবনে। পীড়িত মানবের কান্না জীবনকে তাঁর ব্যথাতুর করে রেখেছিল। জগতের সকল দুঃখীর দুঃখ ঘোচাতে, কান্না মোছাতে তিনি সেই যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন জীবনসন্ধ্যায় আজ নোয়াখালির গ্রাম-পরিক্রমায়ও চলেছে তারই অবিরাম পদধ্বনি। তিনি জেনেছিলেন পীড়িত মানব শুধু একটি মাত্র বালসুন্দরম্ নয়, কোটি কোটি মানুষ প্রবলের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। কোথাও ব্যক্তি, কোথাও সমগ্র জাতিই অপমানিত, লাঞ্ছিত। রক্তক্ষরিত একটি মানুষকে রক্ষা করে তাই তাঁর তৃপ্তি আসে নি, সমাধান মনে হয় নি।

তিনি জেনেছিলেন সকলের মঙ্গল হলে, সকলের উন্নতি হলে তবেই আসবে প্রতিটি আলাদা মানুষের মঙ্গল ও শুভ। রাস্কিনের লেখা Unto this Last বইখানি তাঁকে শিখিয়েছিল—The good of the individual is contained in the good of all.

অন্যের উপর উৎপীড়ন বা নির্যাতন করে কখনো কোনো মানুষ বা জাতি বেশীদিন নিজেদেরও শুভ আনতে পারে না। "পশ্চাতে টানিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" সকলের ভাল করতে পারলে তবেই হবে নিজের মঙ্গল। তার মধ্যেই আছে সকল সমস্যার সমাধান। তাই তাঁর সর্বোদয়।

তিনি মনে করতেন, মানুষের মনে হিংসা ও প্রেম দুটি প্রবৃত্তিই আছে। জিঘাংসা বৃত্তি অবলম্বন করে জগতে বহু জাতিই যুগে যুগে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন অন্যের মনে জাগিয়ে তুলেছিল অধিকতর হিংস্র প্রবৃত্তিকে। হিংসা পায় হিংস্রতর প্রত্যাঘাত। অত্যাচারীর তাই পতন হয়। হিংসা এবং তার প্রতিশোধ—এর শেষ কোথায়? কিন্তু মানবমনে অন্যদিকে আছে প্রেমও। তিনি মনে করতেন প্রেম দিয়েও হৃদয় জয় করা যায়, হৃদয়ের পরিবর্তন করা যায়—তাতে হবে সুবুদ্ধির উদয়, আসবে জগতে কল্যাণ ও শান্তি।

তাই যখন নোয়াখালিতে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই নিঃসঙ্গ একক মানুষটি হাত দুটি তাঁর অকাতরে প্রেম বিলিয়ে চলেছিল, চোখ দুটি তাঁর প্রেমের আবেদনই করে চলেছিল। জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি মানুষের

প্রতি মানুষের প্রেম। পথের ধারে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কিন্তু সবাই সেলাম ফিরিয়ে দিচ্ছিল না। আবার আমি তাদের অনুরোধ করি, আপনারাও সেলাম করুন। করুণ চোখে বাপুজী বললেন, ওরা নাইবা করল, আমার কর্তব্য আমি করে যাব, একলাই তো চলতে হবে—একলা চল, একলা চল রে। তাঁর চোখে মুখে নেমে এসেছে একলা চলার আকুল অনুভূতি। গানটা গাইতে বললেন। সকলে মিলে গান গেয়ে নিয়ে চলেছিল তাঁকে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।"

বাংলা সাহিত্যে গান্ধীজী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে প্রথম পরিচিত করাবার গৌরব কলকাতার প্রাপ্য। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেদিন গান্ধীজী এসেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে ; ভারতের নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন আরও প্রায় দুই দশক পরে। সুতরাং বাংলা দেশে তাঁর প্রথম উপস্থিতি স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্যে কোনো চিহ্ন রাখতে পারে নি।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বাঙালী লেখকরা উদাসীন ছিলেন না। স্বাধিকার অর্জনের জন্য যে অভিনব পন্থায় সংগ্রাম চলছিল, দূর থেকে তার বিবরণ পাঠ করে তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ইজ্জতের জন্য" কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রামে সহায়তা করবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন :

> ক্ষুব্ধ সাগর আনল খবর হাল আইনের আফ্রিকাতে
> রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে !
> ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
> নাই অধিকার কিছুতে তার—কেনা-বেচার লাভে···মূলে।
> মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
> জিজিয়া কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে !

এই অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন গান্ধীজী :

> সুরু হল নতুন নাট্য সূত্রধারের নূতন নাট,
> সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী-পাঠ।
> ইজ্জতেরি দায় আজিকে, ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্রবীণা
> উঠছে কেঁপে, সহায় হও গো যুঝছে তারা অস্ত্র বিনা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পর পর কতকগুলি হিংসাত্মক রাজনৈতিক ঘটনা দেখে কবি বিচলিত হয়ে পড়েন। এই মানসিক

পটভূমিকায় গান্ধীজীর অহিংস পদ্ধতি তাঁকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে। আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলনের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই ভারতের ভবিষ্যৎ নেতা হিসাবে বিভিন্ন লেখায় আভাস দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সব কল্পনা যে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০৯) নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী স্পষ্টই গান্ধীজীকে মনে করিয়ে দেয়। ধনঞ্জয়ের খাজনা বন্ধের অহিংস আন্দোলন, বাংলা সাহিত্যে গান্ধীজীর মূলনীতির প্রথম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের দ্বারা যে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ নাটকের প্রধান চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রতি তাঁর মমত্ব-বোধ। "মুক্তধারা" এবং "পরিত্রাণে" কাহিনীর অদল-বদল ঘটেছে, নতুন চরিত্র এসেছে, কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর মৌলিক রূপটির পরিবর্তন হয় নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর জন্ম ১৯০৯ সালে; গান্ধীজীর ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নতুন করে পেলাম "মুক্তধারায়"; আবার লবণ সত্যাগ্রহের ঠিক পূর্বে তাকে দেখা গেল "পরিত্রাণ" নাটকে। সর্বত্যাগী অহিংস সত্যাগ্রহী ধনঞ্জয় যে গান্ধীজীর আদর্শে পরিকল্পিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করেন। স্থির হয় তিনি ইংলণ্ড ঘুরে ভারতে আসবেন। ইতিমধ্যে ফিনিক্স স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে ওঠেন হরিদ্বার গুরুকুলে। কিছুদিন পরে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের উৎসাহে তাঁরা চলে এলেন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। শান্তি-নিকেতনে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ৬ই মার্চ, ১৯১৫। গান্ধীজীর জীবনের নতুন পর্বও শুরু হয় বাংলা দেশ থেকেই। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে গান্ধীজীর স্বল্পকালীন অবস্থিতি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধীজী এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আত্মজীবনীতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজী স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এ বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ফলে আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব গান্ধীজীর উপরই এসে যায়। অবশ্য এর পূর্বে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন চম্পারণে। সেখানে অভিনব পদ্ধতির সাফল্য

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছে দেশবাসী। আফ্রিকার ঘটনাবলী গান্ধীজীকে ঘিরে একটা বিস্ময়ের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। এবার তাঁর সংগ্রাম দেশের মাটিতে, দেশবাসীর চোখের সামনে। এই আন্দোলনের যিনি নায়ক তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নেই। সুতরাং সেদিনের তাগিদ মেটাবার জন্ত ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের পরিচিতি হিসাবে বহু বই প্রকাশিত হতে থাকে। এই ক'বছরের মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ; সুতরাং এ ধরনের পরিচিতিমূলক বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

যতদূর জানা যায়, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত "মহাত্মা গান্ধী—জীবনী ও অভিমত সংগ্রহ" বাংলায় গান্ধীজীর পরিচিতিমূলক প্রথম বই। এই সচিত্র ১১১ পৃষ্ঠার বইটি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল হাওড়া জেলার পানিত্রাস থেকে। অল্প দিনের মধ্যে বইটির কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল।

গান্ধীজী সম্পর্কে সব রকম বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছ'শর উপর। প্রকাশের তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এসব বই কয়েকটি পর্বে বেশী করে বেরিয়েছে। প্রথম পর্ব ১৯১৮-২৫ ; দ্বিতীয় পর্ব লবণ সত্যাগ্রহের সময় ; তৃতীয় পর্ব ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ; শেষ পর্বের মূল প্রেরণা মহাত্মার আকস্মিক মৃত্যু।

প্রথম পর্বের বইগুলি আকারে ছোট। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অধিকাংশ রচনাতেই ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর অভিনব সংগ্রাম-কৌশল সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। এদের অনেকগুলি বেরিয়েছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। লেখকরা তাঁদের বক্তব্যের বাহন হিসাবে গদ্য এবং পদ্য দুইয়েরই ব্যবহার করেছেন। লোকের মুখে মুখে পদ্য রচনাগুলি হয়তো বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। সতীশচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন "মহাত্মা গান্ধীর অষ্টোত্তরশত নাম"। নমুনা হিসাবে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হল :

গোঁড়ারা মিলিয়া নাম রাখিল বিধর্মী।
ভাবুকের দল নাম রাখিলেক কর্মী ॥
সি, আর, দাশ নাম রাখে আশার আলোক।
বেশান্ট রাখিল নাম আদর্শ-ভূলোক ॥

কলিকাতা নাম রাখে অটল প্রতিজ্ঞ।
ঢাকায় রাখিল নাম কর্মী মহা বিজ্ঞ॥

মদনমোহন নাম রাখে চরখাভূষণ।
অরবিন্দ নাম রাখে সত্যের তোষণ॥
দাদাভাই নাম রাখে স্থির অনাহারী।
রবীন্দ্র রাখিল নাম স্বরাজ ভিখারী॥

উকিল মহাদেব সিংহ অসহযোগের পরিণাম বর্ণনা করেছেন:

মক্কেল কাছারীতে না আসিবে আর,
মুখেতে দেখিবে তুমি ভস্মের বাহার!
যদি হে সম্মান চাও,
গান্ধীর পথেতে ধাও,
সহযোগে থেকে দেশ করো না উজাড়,
ছি ছি রে উকিল তোরে ধিক শতবার!

অনেকে গান্ধীজীকে অবতার হিসাবে দেখেছেন। নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করেছেন:

ধর্মরূপী গান্ধি সহায় যখন,
তবে ভয়ে ভীত হও কি কারণ?
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে পাণ্ডব যেমন,
করে যাও কাজ সেই মত জ্ঞানে।

নবীনচন্দ্র সাহা তাঁর বই "মহাত্মা গান্ধি অবতার ও যুগলক্ষণ"-এ পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে কল্কিতে গান্ধীজীই অবতার।

"গান্ধি-কীর্তন" (১৩২৯) বাংলা ভাষায় গান্ধীজী-সম্পর্কিত প্রথম সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলনে আছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেন্দ্র দেবের কবিতা এবং শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ।

প্রথম পর্বের অধিকাংশ রচনার সাহিত্যমূল্য না থাকলেও সেদিন এই পুস্তিকাগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথা জনসাধারণের মধ্যে এদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে।

১৯২০-২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছয়টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আকারে ছোট হলেও গান্ধী-সাহিত্যে এরা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পরে সত্যেন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু এই কটি পুস্তিকায় তিনি গান্ধীজীকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন। এর জন্য তিনি শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রকে তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীর সকল নীতি ও কর্মকে রবীন্দ্রনাথ যে নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি এটা সহজভাবে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তিনি ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ "গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ দাঁড়াইয়া বিরোধের সূত্রপাত করিতেছেন।"

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে: "মহাত্মা গান্ধি শুধু নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-মন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ পুরোহিত নহেন, তিনি এই মন্ত্রের সাধক··· হিংসা দ্বেষশূন্য নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ ব্যাপারে বাক্য অনুযায়ী কার্য করিবার অক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের যত অধিক বোধ হয় জীবিত কোন নেতার মধ্যেই তা এত অধিক নহে।"

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পার্থক্য নির্দেশ করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন: "১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধি-আন্দোলন এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলন তত্ত্বের দিক হইতে অনেকটা এক হইলেও, বস্তুর দিক হইতে দুই আন্দোলন প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালার আন্দোলনে তত্ত্ব আছে, সাধনা নাই, কথা আছে কাজ নাই, আদর্শ আছে চরিত্র নাই। ১৯০৬-এর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্দোলনে তত্ত্ব ও সাধনা, কথা ও কাজ, আদর্শ ও চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গান্ধি-আনুগত্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছে: "তিনি মহাত্মার সহিত দেশবন্ধুরূপে সুর মিলাইয়া অন্ততঃ বাঙ্গালার ইজ্জত বাঙালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে দেখেছেন নবযুগের সূচনা হিসাবে: "এ যুদ্ধ কেবল ভারতের রাজার ও প্রজার যুদ্ধ নহে। এ যুদ্ধ ভারতের রাজার হিংসার বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রজার অহিংসার যুদ্ধ নহে, এ যুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের সহিত খ্রীষ্টানের যুদ্ধও নহে, ইহা এমন এক যুদ্ধ, যাহা মনুষ্যের সভ্যতাকে আর একবার ভাঙ্গিয়া গড়িবে।"

সত্যেন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গান্ধীজীর জীবন, কর্মধারা এবং বাঙালী নেতাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর ছয়টি পুস্তিকার মধ্যে

আলোচনার ধারাবাহিকতা ও গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবং শ্রদ্ধা তিনি প্রকাশ করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উদ্দীপনাময়ী ভাষায়।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর কর্মপন্থার সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগের পার্থক্য বিচার করেছেন "আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ" গ্রন্থে। বিপিনচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে শাসন-যন্ত্রের উপর অধিকার বিস্তার করা আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য—তাঁর মতে—একে অকর্মণ্য করে দেওয়া। তাই তিনি বলেছেন : "এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারি নাই। এ পথের পরিণাম স্বরাজ নহে, কিন্তু অরাজকতা।....এক কথায় বলিতে গেলে প্যাসিভ রেসিস্‌ট্যান্স সরকারের পুলিস-পাহারা সৈন্য-সামন্ত কিংবা ফৌজদারী আইন-আদালত নষ্ট করিতে চাহে না। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-প্রস্তাবে ইহা করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই তাহার সমর্থন করিতে পারি নাই।"

গান্ধীজী প্রথমবার যখন কলকাতায় আসেন তখন থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় এবং খদ্দর প্রীতির মধ্যে গান্ধীজীর গভীর প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেছেন : "প্রতি গান্ধী পুণ্যাহে আমরা যুগাবতার মহাত্মার নাম স্মরণ করি। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়।"

এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ না পাওয়ায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যখন সমালোচনার ঝড় উঠল তখন সমালোচকদের জবাব দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র : "অনেক কর্মী বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ হয় নাই বলিয়া আজ হতাশ হইয়াছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি,—আমরা কি মহাত্মার নির্দেশ মত খদ্দর বয়ন ও পরিধান করিতে পারিয়াছি ?"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে গান্ধীজীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন : "মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত নিতান্ত করুণারসটি প্রেমের অবতার যীশুর বিচার-ব্যাপারের সঙ্গেই তুলনীয়। প্রভেদ এই যে, যীশু অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নি, গান্ধীজী অভিযোগ শুধু সম্পূর্ণ স্বীকার করেছিলেন, এমন নয় ; তিনি বলেছিলেন, আইনের চোখে তিনি যে অপরাধ করেছেন, অভিযোগে তার চেয়ে তাঁকে লঘু অপরাধীই বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, পরমেশ্বরের আইন মান্য করার জন্যই

তিনি শাসন-পদ্ধতির আইন অমান্য করেছেন।"

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন দেশবন্ধু। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ প্রেমের আন্দোলন: "...মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা করিবে না, হিংসা করিবে না; কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য।

"আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, এই যে আন্দোলন, ইংরেজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন, এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-নিবেদন।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস "পথের দাবী" লেখা হয়েছে বিপ্লবপন্থী নরনারীর জীবন নিয়ে। কিন্তু প্রথম জীবনে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মপন্থার উপর তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। যে কারণে এই শ্রদ্ধা, শরৎচন্দ্র তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন: "অকস্মাৎ একদিন চৌরিচোরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন একথা সমস্ত জগতের কাছে অকপটে ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারম্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত হইতে সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে্ পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—'আই হ্যাভ লস্ট অল ফীয়ার অব মেন'—জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এদেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন। তাহার দণ্ডভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল, অনুরক্ত ও ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—একথা লোকে একপ্রকার ভুলিয়াই

ছিল—যাবার পূর্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া যাইতে হইল যে, সম্ভ্রম, মর্যাদা, যশঃ, এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পায়া যায় না।"

গান্ধীজী সত্যের যে আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য: "সত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই; সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ।...দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়।...অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন। পণ করিয়াছিলেন—মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।"

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসবার পরেই। তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে পত্র-বিনিময় হয়েছে, একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় প্রত্যক্ষরূপে গান্ধীজীকে ১৯৩০-এর পূর্বে দেখতে পাওয়া যায় না। তার পূর্বে গান্ধীজী সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ কবি রচনা করেন নি। এর কারণ আর যা-ই হোক্, শ্রদ্ধার অভাব নয়। ১৯২০-২১ সালে বিদেশে সাংবাদিকদের নিকট রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

গান্ধীজী সম্বন্ধে কবির যে কটি রচনা "মহাত্মা গান্ধী" নামক পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে তার সবগুলিই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত। কবি এই কটি রচনার মধ্যে গান্ধীজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কর্মপন্থার অনন্যতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইনি আসার পূর্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অবিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।" এই ভয় থেকে গান্ধীজী আমাদের মুক্ত করেছেন। নির্ভীক হতে বলেছেন কিন্তু বলেন নি হিংসাত্মক দম্ভকে প্রশ্রয় দিতে। গান্ধীজীর অনুশাসন, "মরব তবু মারব না, এবং এই করেই

জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্ম যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে ; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত।"

রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা বড় অভিশাপ রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বদা ব্যগ্র থাকেন। গান্ধীজী সেই স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, সাময়িক সুবিধার জন্য এক সত্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন নি। সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর : "তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার।' তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা।" এই সমান দৃষ্টির জন্যই আমরা যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে রেখেছি তিনি তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন। যে সামাজিক পাপ বহু শতাব্দী যাবৎ জাতিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করেছে তার বিরুদ্ধে গান্ধীজীই প্রথম এমন সর্বাত্মক সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পর অনেকেই গান্ধীজীর জীবন ও সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফল স্বরূপ যে-সব বই লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে নাম করতে হয় কৃষ্ণ দাসের 'গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস'। নির্মলকুমার বসুর 'গান্ধীচরিত', ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'মহাত্মা গান্ধী', প্রভৃতি। সুবোধ ঘোষের 'অমৃতপথ যাত্রী' একটি সুলিখিত জীবনী। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক সংকলিত পুস্তিকাগুলি এক সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনাথগোপাল সেন ও রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ নিয়ে বই লিখেছেন। নির্মলকুমার বসু গান্ধীবাদ বিশ্লেষণ করেছেন 'গান্ধীজী কি চান' ও 'স্বরাজ ও গান্ধীবাদ' বই দুটিতে। সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, সর্বোদয়, পল্লী গঠন, চরকা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজীর মতামত নিয়ে কয়েকটি বই লেখা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলার চিন্তানায়কদের সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনামূলক আলোচনার যে সূত্রপাত করেছিলেন সেই ধারাটি শেষ হয়ে যায় নি। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ', ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' এই শ্রেণীতে পড়ে। এছাড়া "মহাত্মা গান্ধী ও

স্বামী বিবেকানন্দ," "গান্ধীজী নেতাজী", 'নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত" ইত্যাদি পুস্তকেও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সস্তায় সুপরিকল্পিত ভাবে গান্ধী-সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম মূল গুজরাটী থেকে গান্ধীজীর আত্মকথার প্রাঞ্জল অনুবাদ করেন। আরও কতকগুলি বইয়ের অনুবাদ ছাড়া তিনি নিজে 'কার্পাস শিল্প', 'চরকার ব্যবহার', 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেছেন।

সমকালীন কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায় গান্ধীজীর উপর বিভিন্ন দিক থেকে যত আলোচনা করেছেন এমন আর কেউ করেন নি। তাঁর "প্রবন্ধ" এবং "খোলা মন খোলা দরজা" গ্রন্থ দুটিতে গান্ধীজী সম্পর্কে অনেকগুলি রচনা আছে। স্বাধীনতাপরবর্তী নানা সমস্যা গান্ধীবাদের পটভূমিকায় আলোচনা করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। অন্নদাশংকরের মতে "গান্ধীজী আমাদের সকলের ঘনীভূত বিবেক।" সাময়িক হতাশা সত্ত্বেও তাঁর ধারণা গান্ধীজীর নীতি একদিন সার্থক হবে। কেননা, "গান্ধীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়তো আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মক হোক না কেন, কোনো অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারত তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায়চিন্তা। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই।"

উপরে আলোচিত গদ্যরচনাবলীর এক ক্ষুদ্র অংশ সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভের দাবি করতে পারে। এদের অধিকাংশই রচিত হয়েছিল উচ্ছ্বাসের প্রেরণায়, প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে। গান্ধীজীর প্রভাব স্থায়ী হয়ে থাকবে বাংলা কাব্যে, নাটকে ও উপন্যাসে। অবশ্য সাহিত্যের এই সব বিভাগেও যে সাহিত্যমূল্যহীন গ্রন্থ রচিত হয় নি, তা নয়। বিশেষ করে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মসাধনা কেন্দ্র করে পদ্যে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে যাদের কথা আজ আর কেউ মনে রাখে নি। কিন্তু আবার এই বাংলা কাব্যেই গান্ধীজীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। বাংলা দেশের প্রায় সব কবিই গান্ধীজী সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম খ্যাতিমান কবি যিনি কাব্যে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

নিবেদন করেন। গান্ধীজী পরিচালিত দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সমর্থনে তিনি "ইজ্জতের জন্য" লিখেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩২৮) সত্যেন্দ্রনাথের 'গান্ধীজী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি রচনার সময় গান্ধীজী কলকাতায় ছিলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দেশবাসীকে তাঁর পথ অনুসরণ করবার জন্যে উদাত্ত আহ্বান একটি কবিতার মধ্যে সুন্দর মিলিত হয়েছে :

> দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
> নগরের পথে রোল ওঠে শোন "গান্ধিজী!" "গান্ধিজী!"
> বাতায়নে ত্থাখ কিশোর কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
> জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন চন্দ্রের অনুরাগে!
> জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী,
> পথ চায় কার কাতারে কাতারে উৎসুক নরনারী!
> কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ তনু, কৃশাণু পুণ্য ছবি—
> জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!

গান্ধীজীর আসন "বুদ্ধের কোলে, টলস্টয়ের পাশে," এবং

> আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
> কর্মে যে মহাকাব্য মূর্ত. চরিতে যে অনুপম ;

ছন্দের লালিত্যে, ভাব-সম্পদের ঐশ্বর্যে ও উপমা প্রয়োগে এই দীর্ঘ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার আরতি,' 'শূদ্র', 'মেথর' এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রচিত 'ফরিয়াদ' কবিতায় গান্ধীজীর প্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। স্ব-রচিত 'চরকার গান' গেয়ে নজরুল তাঁকে মুগ্ধ করেন। নজরুল চরকাকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

> তোর ঘোরার শব্দে ভাই,
> সদাই শুনতে যেন পাই
> ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
> ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুঃখের রাত্রি ঘোর॥

এর পূর্বে, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, 'বাংলায় মহাত্মা' নামে একটি গান রচনা করে-ছিলেন নজরুল :

আজ না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

ভারতের জেরুজালেম বাংলা। মুক্তি-পাগল গান্ধী সেখানে এসেছেন প্রেমের বাণী নিয়ে। সেই বাণীর প্রভাবে—

আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি
এক হ'ল ভাই বামুন মুচি
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে।
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস,' 'সত্যমন্ত্র' প্রভৃতি কবিতা ও গানে গান্ধীজীর প্রভাব অনুভব করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধী মহারাজ' ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথের আবেগ এখানে অনুপস্থিত। তাঁর শিষ্যরা গরীব মেরে পেট ভরায় না, তারা ভয় করে না কাউকে, কারাবরণ করতেও পিছু-পা নয় তারা :

ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'

মহৎ কবিরা অবশ্য ইঙ্গিত ও রূপকের সাহায্যে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। গান্ধীজীর নাম উল্লিখিত না হলেও হয়তো তাঁরই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো কবিতা লিখেছেন বলে সমালোচকদের ধারণা। 'শিশুতীর্থ' এমনি একটি দীর্ঘ কবিতা যা বুদ্ধদেব, যীশু ও মহাত্মা গান্ধী—এই তিন মহাপুরুষকে অবলম্বন করেই রচিত হতে পারে। রচনার কাল বিচার করলে এ কবিতা পাঠ করে সর্বাগ্রে গান্ধীজীর নামই মনে পড়বে।

গোল টেবিল বৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবার পর গান্ধীজী গ্রেফতার হন। প্রায় সেই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অগ্রদূত' কবিতাটি :

নবজীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি' দিবে—
জীবনের ব্রত তব।

কেউ কেউ মনে করেন এই কবিতাটি এবং "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের 'শান্ত' ও 'প্রণাম' কবিতা দু'টি গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে লিখিত।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর 'গান্ধী মহারাজ' একদা জনপ্রিয় হয়েছিল। নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকল প্রবীণ কবিরাই গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যও তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। চারদিকে মৃত্যুর রাজ্য,—যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ; এই মৃত্যুর রাজ্যে জীবনের প্রতীক মহাত্মা :

মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়বো প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ।

গান্ধীজীর জীবন যে-সব কবিদের আকৃষ্ট করতে পারে নি, তাঁর অভাবনীয় মৃত্যু তাঁদের উদ্‌বেল করেছে, প্রেরণা দিয়েছে শ্রদ্ধার্ঘ রচনায়। অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রভৃতি বহু কবি তাঁদের বেদনা মূর্ত করে তুলেছেন অনেকগুলি সুন্দর আবেগময় কবিতায়। অজিত দত্ত মহাত্মা গান্ধীকে তুলনা করেছেন সূর্যর সঙ্গে ; আমাদের চোখের ছোট মাপ দিয়ে যদি সূর্যকে বিচার করতে চাই তাহলে তো ভুল করবই। অচিন্ত্যকুমার 'মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু'

কবিতায় ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেছেন। যীশুকে হত্যা করবার অভিশাপে ইহুদি জাতি যেমন আশ্রয়হারা দিশেহারা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতবাসীর অবস্থাও বুঝি তেমনি হবে। অন্যত্র তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন, দধীচির অস্থি দিয়ে যেমন বজ্র তৈরি হয়েছিল তেমনি সকল অন্যায় ও অশুভ দূর করবার জন্য গান্ধীজীর অস্থি দিয়ে তৈরি হবে এক নতুন অস্ত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'তিনটি গুলি'-তে বলছেন, তিনটি গুলির শব্দ একদিন অমৃত-মন্ত্রে পরিণত হবে :

দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে চেয়ে দেখি—
পিস্তলের শব্দ আর নয়।
অগণন মানুষের বুকে বেজে বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে ;
হয়ে যায় পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেছেন, গান্ধী-হীন এই ভারতে তাঁর স্মৃতি আনে সূর্যের আভাস :

ফিরে গেলো আবার সে-আভা
বিন্দু-বিন্দু সূর্য হয়ে তুষারের গায়ে ;
হিমালয় আবার স্থবির,
দেবতার মতো দূর—সুদূরের ছায়ায় গভীর।

*

ফিরে গেলো—তাই তারে চিনি
তাই তারে ফিরে বুঝি পাই অন্ধকারে,
আমাদের অন্ধকারে-দীর্ঘযামা যখন যামিনী।
পাই যেন মনের আকাশে।
সে আকাশও আর্ত, অন্ধকার,
তবু তার আভা আছে সূর্যের আভাসে॥

মানুষের মন থেকে যা সত্য ও মহৎ তার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি টলে গিয়েছিল

অন্যায় অত্যাচার ও অশ্রদ্ধার সংঘাতে। গান্ধীজী আমাদের মনে সেই আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে দেখে আমাদের হতাশা দূর হয়েছে, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জীবনানন্দ দাশ পেয়েছেন নতুন আশা :

মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় বলে ;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;
হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে ;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারা থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে ; সত্য আছে ; আলো আছে ; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।

বুদ্ধদেব বসু একটি শোক-কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮, সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। বেদনায় আচ্ছন্ন। কিন্তু কাল নতুন ভোরে আবার বাঁচার জ্বালা তীব্র হয়ে জেগে উঠবে, আবার আমরা ভুলে যাব মহাত্মাকে। এবং ভুলে গিয়ে আগামী আর কোনো মহাত্মাকে ঠিক এমনি করেই হত্যা করব। কারণ, দু'হাজার বছর আগে যীশুকে হত্যা করেও তো আমাদের শিক্ষা হয় নি।

বিষ্ণু দে তিনটি সুন্দর কবিতায় শোক প্রকাশ করেছেন। '৩১শে জানুয়ারি ১৯৪৮'-তে তিনি বলেছেন।

শকুনের ডানার ঝাপট শিবার ফুৎকার
আর্যাবর্ত চষে যায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ।
তবু তুমি হিমালয়,
হাজার নদীর উৎস,
মানসহ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক,
এ নদীমাতৃক দেশে প্রাজ্ঞ পিতামহ
বিরাট আকাশ,
মৃত্যুঞ্জয়, প্রাণবহ,
পৃথিবীর মানদণ্ড
সমুদ্রে সমুদ্রে ন্যস্ত দুই হাত :

দিনেশ দাস গান্ধী-অনুরক্ত কবি বলে অনেকের নিকট পরিচিত। তিনি পাঁচ ছয়টি কবিতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবি

শুধু আকস্মিক মৃত্যুর জন্য বেদনা প্রকাশ করেন নি, শুনিয়েছেন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও। মহাপুরুষের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু বেদনার সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারে না। কবির কাছে মহাত্মার আত্মোৎসর্গ মহত্তর জগৎ সৃষ্টির ভূমিকা :

ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননীর চেয়ে নরম নতুন অবাক পলির সৃষ্টি করে,
বসুন্ধরার বন্ধ্যা চরে
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে :
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা,
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেঘে।
ভস্ম তোমার বীজের মতোই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলেস্থলে।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ঘটনাবলীতে রয়েছে মহাকাব্যের উপাদান। মহাকাব্যের যুগ আর নেই, সুতরাং একালের শক্তিশালী কবিরা ছোট ছোট কবিতা লিখেছেন। তবু কালীপদ ভট্টাচার্য একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন ষোলোটি সর্গে। "গান্ধীজীবনে" মহাত্মার জীবনের বাহির ও অন্তর দুই-ই কাব্যরূপ পেয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যে যুদ্ধবিলাসী বীরের জীবনগাথা ; এই মহাকাব্যের বীর অহিংস। আবেগ এবং শ্রদ্ধা "গান্ধীজীবনের" প্রধান সম্পদ্।

বাংলা কাব্যে গান্ধীজীর প্রভাব বেশ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। যে-সব কবি মহাত্মাকে নিয়ে লিখেছেন তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করাও এখানে সম্ভব হল না।

বাংলা নাটকে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাব খুবই কম। নাটকে তা হওয়া সম্ভবও ছিল না পরাধীন দেশে, দেশ-নায়কের জীবন কথা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা নিয়ে রচিত নাটক অভিনয় করবার অনুমতি মিলে না। দেশ-প্রেমমূলক নাটক লিখতে হলে তাই রাজস্থান বা মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করাই ছিল প্রধান পথ। তথাপি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই মনোজমোহন বসু "যুগাবতার গান্ধী" নাটকটি রচনা করেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল ময়মন-সিংহ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী মহাত্মা গান্ধীকে মনে করিয়ে দেয় এ-কথা পূর্বেই

বলা হয়েছে। "চণ্ডালিকা" হয়তো লেখা হয়েছিল গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের প্রভাবে। রচনাকাল বিচার করলে মন্মথ রায়ের "কারাগার" অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত, যদিও নাট্যকার একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করেছেন। গান্ধীজীর পরোক্ষ প্রভাব অনেক বাংলা নাটকেই পড়েছে।

উপন্যাসে গান্ধীজীর প্রভাব অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। মন্মথ কুমার রায়ের "নতুন ঢেউ" (১৯২৪) গান্ধীবাদের উপর ভিত্তি করে লেখা প্রথম উপন্যাস। অসহযোগ আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইত্যাদি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। উপন্যাস হিসাবে "নতুন ঢেউ" সার্থক রচনা নয়। পরের বছর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজপথ" প্রকাশিত হয়। নায়ক সুরেশ্বর গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। চরকা ও খদ্দর কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুরেশ্বর আকৃষ্ট করেছে ধনী পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন পরিবারের তরুণী সুমিত্রাকে। সুমিত্রা বিলাতী শাড়ী ত্যাগ করে গ্রহণ করল খদ্দর। এই নিয়ে বিরোধ বাধল মা'র সঙ্গে। সুরেশ্বরের আদর্শ গ্রহণ করেছে তার বোন মাধবী। সুরেশ্বর যখন জেলে তখন মাধবীই তার কাজ দেখাশোনা করেছে। মাধবীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছে বিমান। সে উচ্চ সরকারী পদে ইস্তফা দিয়ে সুরেশ্বরের কাজে যোগ দিল।

মাধবী একদিন সুমিত্রাকে নিয়ে এল সুরেশ্বরের ঘর দেখাতে। সেই ঘরের "দেওয়ালের মধ্যস্থলে 'রাজপথ' লেখা। নিম্নে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দশজন দেশনায়কের চিত্র বিলম্বিত। তাহার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ।' মাধবী কহিল, 'এক-একটি কথা দিয়ে দাদা প্রত্যেকের বিশেষ রূপ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সকলের আগে ইনি হচ্ছেন ধর্ম! এঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসা; এঁর মতে অহিংসা যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধারণ করবে সেদিন থেকে আর মানুষের মধ্যে বিবাদ থাকবে না।"

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের মধ্যেই গান্ধীজীর জীবনাদর্শের প্রভাব অনুভব করা যায়। হয়তো অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই প্রভাব দেখানো সর্বত্র সম্ভব হবে না; কেন না, তারাশংকর মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা বাইরে থেকে তাঁর কাহিনীর উপর চাপিয়ে দেন নি। এই ভাবধারা প্রথমে লেখক নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, তাঁর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তারপরে এসেছে উপন্যাসে। তারাশংকর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন: "১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনা-

প্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবল ভাবে…" অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণও করেছিলেন।

"ধাত্রীদেবতার" নায়ক শিবনাথের মধ্যে তারাশংকরের জীবনের ছায়া পড়েছে। শিবনাথের সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে গান্ধীবাদ গ্রহণের ইতিহাসই "ধাত্রীদেবতার" কাহিনী। ধাত্রীদেবতা ও মাতৃভূমি শিবনাথের চোখে অভিন্ন। দেশ মাতৃকার কল্যাণ কামনায় শিবনাথ জাগতিক সুখের সকল আশা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করেছে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে শিবনাথ বলছে, "এমন যুদ্ধ তোমরা কখনও কর নি, গোঁসাই বাবা। এতে শুধু মরতে হয়, মারতে হয় না! অহিংস যুদ্ধ। নিরস্ত্র হয়ে বীরের মতো বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে হবে।"

কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতি উপন্যাসে গান্ধীবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বনফুলের 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে সাতটি ভিন্ন চরিত্রের ক্রমিক উন্মোচন। এদের মধ্যে মৃগাঙ্ক-শুভ্র গান্ধীবাদের অনুরাগী।…"সরদার ভগৎ সিং, বুটকেশ্বর দত্ত ধরা পড়ল। মহাত্মাজীর আদর্শকে এমনভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। বাংলাদেশে সুভাষ বোসের গান্ধী-বিরোধী বামপন্থী সুরও ভাল লাগছিল না তাঁর।"

সুবোধ ঘোষের "তিলাঞ্জলি" "ত্রিযামা" ও "গঙ্গোত্রী", সঞ্জয় ভট্টাচার্যের "কস্মৈ দেবায়", "মৌচাক" ও "রাত্রি" গজেন্দ্রকুমার মিত্রের "জন্মেছি এই দেশে" নবেন্দু ঘোষের "ডাক দিয়ে যাই", মৈনাকের "বহ্নিবলয়" ও "সুবর্ণরেখার তীরে" প্রভৃতি উপন্যাসে গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক লেখকের গল্প উপন্যাসে গান্ধীবাদের ছায়া পড়েছে। সব লেখকই যে গান্ধী-ভক্ত এমন কথা বলা চলে না। সাম্যবাদ ও গান্ধীবাদের দ্বন্দ্ব কোনো কোনো উপন্যাসের বিষয়বস্তু; গান্ধীবাদের সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে কোথাও কোথাও।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী"তে গান্ধীজীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। গান্ধীজীর আহ্বানে সান্যাল মশাই সরকারী বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আশ্রম করেছেন। পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবেন নি। চরকায় সুতা কাটা, কাপড় বোনা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করা, ইত্যাদি ছিল আশ্রমের

কাজ। সান্যাল মশাই, তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলে নীলু-বিলু দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন গান্ধীজীর অনুশাসন অনুযায়ী। সান্যাল মশাই চরকা কাটতেন, মৌনব্রত পালন করতেন। গান্ধীজী এসেছেন তাঁর আশ্রমে, আশীর্বাদ করে গেছেন। অগাস্ট আন্দোলনে সান্যাল মশাই সপরিবারে বন্দী হয়েছেন। হিংসাত্মক কাজের জন্য বিলুর প্রাণদণ্ড হবে। সান্যাল মশাই ও তাঁর স্ত্রীর কাছে ঈশ্বর আর মহাত্মা প্রায় একার্থক। তাই পুত্রের ফাঁসির হুকুম শুনে সান্যাল প্রার্থনা করছেন: "ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করবার শক্তি দাও!" আর বিলুর মা বলছেন: "গান্ধীজী, তুমি আমার একি করলে?"

উপন্যাস জীবন ও সমাজের দর্পণ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আমাদের জীবনে, চিন্তাধারায় ও সমাজে গান্ধীজীর প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে হয়তো অলক্ষ্যে, কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে। গান্ধীজীর জীবনের ঘটনাবলী অপেক্ষা চিন্তা ও আদর্শের প্রভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই অধিকাংশ রচনায় তাঁর নামের উল্লেখ না থাকলেও উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না কিসের প্রেরণা এদের পশ্চাতে কাজ করছে। মহাত্মার প্রভাব এমনই সর্বব্যাপী যে দৃষ্টান্ত বা উদ্ধৃতি দিয়ে তা যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

বর্ণালী

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা নিঃসংশয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে জাতির জনক বলা হয়। এই পরম গৌরব সর্বতোভাবে তাঁরই তো প্রাপ্য। ভারতবর্ষের জনসাধারণের সুপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল গান্ধীর নেতৃত্বের পরশমণির স্পর্শে। বৃটিশের বেয়নেটের ছায়ায় একটা প্রাচীন মহাজাতি পরাধীনতার কালিমায় কলঙ্কিত জীবন বহন করে চলবে—এমন একটা অসম্মানের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে সর্বনাশ কি শতগুণে শ্রেয় নয়? দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টারি শুরু করার আদিপর্বে গান্ধীর জীবনের সেই অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মুকুরে যাঁকে আমরা প্রতিফলিত দেখি তিনি অহিংস কিন্তু অন্যায়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে কোনমতেই রাজী নন। ফার্স্টক্লাসের টিকেট থাকতেও কালা আদমী বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ গান্ধীকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে জোর করে নামিয়ে দিল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস থেকে একজন ভারতীয় 'কুলি ব্যারিস্টার'কে গায়ের জোরে নামানোর জন্য শেষ পর্যন্ত কী ভয়ানক মূল্যই না দিতে হলো এসিয়ার এবং আফ্রিকার উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ সমাজকে! মানুষের চিরন্তন অধিকারে এই পদাঘাতের অপমানকে বেমালুম হজম করে দাসত্বের অসম্মানের মধ্যে নিরাপদে আরামের জীবন যাপন করবার জন্য গান্ধী পৃথিবীতে আসেন নি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। মরিৎসবার্গ স্টেশনের যাত্রীশালায় লাঞ্ছিত গান্ধী সে রাত্রিতে ঘুমোতে পারেন নি। কী দারুণ শীত! গরম ওভারকোট বিছানা-পত্রের মধ্যে, আর লগেজ তো রেলওয়ে পুলিস প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে কর্তৃপক্ষের জিম্মায় রেখে দিয়েছে। পুনরায় অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় লগেজ্ চাইতে গান্ধী ভরসা পেলেন না। শুধু কী হাড়-কাঁপানো শীত! মনের মধ্যে কত চিন্তার ঢেউ উঠছে। মানবের অধিকারের জন্য গান্ধী সংগ্রামের পথকে বেছে নেবেন, না ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন? গায়ের রঙের সাদা-কালোর পার্থক্যের জন্য সহস্র মানুষ কি আজীবন বঞ্চিত হয়ে থাকবে আপনার পূর্ণ অধিকার থেকে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান?" না, ভারতবর্ষে এখনই ফেরার ইচ্ছায় গান্ধীর মজ্জাগত আত্মসম্মান বোধ সায় দিতে পারল না। একটু আগে যা ঘটেছে সেই লাঞ্ছনা তো রোগের একটা উপসর্গমাত্র। রোগের মূলে

বর্ণ-বৈষম্য ; কালা আদমীরা ঠিক মানুষের পর্যায়ে পড়ে না—শ্বেতাঙ্গদের মনে এই রকমের একটা বদ্ধমূল সংস্কার। এই বর্ণ-বৈষম্যের অতিকায় হিংস্র দানবটাকে গান্ধী মরণ আঘাত হানবেন। রঙের সাদা-কালোয় কিছুই আসে যায় না। অর্ধেক মানুষের মধ্যেই কি আত্মার আলোর শিখা জ্বলছে না ? আর 'স্বাধীনতা, ও গো স্বাধীনতা'—এই মহাসঙ্গীতই কি আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে না ? বাঁধন-ছেঁড়ার একটা দুরন্ত কামনার মধ্যেই কি আমাদের জীবনের গভীরতম আকৃতির প্রকাশ নেই ? আত্মমর্যাদাবোধ কি আমাদের রক্তের মধ্যে আমরা বহন করে আনিনে ? আর সর্বশেষে মানুষের শাশ্বত সর্বগত আত্মা কি অনন্ত শক্তির আধার নয় ? গান্ধী তখনও জানতেন না দক্ষিণ আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা বিরাট নাট্যলীলার সেনাপতির ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করে যেতে হবে সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে। এক বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। মরিৎসবার্গের সেই দারুণ শীতের রাত্রে গান্ধীর মনে তখনই তখনই ভারতে ফিরে যাবার চিন্তা উঁকি মেরেছিল ঠিকই। কিন্তু চুক্তি-ভঙ্গ করে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া গান্ধীর পক্ষে কেমন করে সম্ভব ? এক বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি থাকবেনই এবং বর্ণ-বৈষম্যের অপসারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবেন। সম্ভব হলে ব্যাধির মূলোচ্ছেদের জন্য যে-দুঃখ আসবে তাকে তিনি সানন্দে বরণ করে নেবেন।

চুক্তির মেয়াদ ফুরানোর মুখে! ভারতে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ-পর্ব শুরু হয়েছে। কবে দেশে ফিরে যাবেন গান্ধী সেই দিনের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর এক রকম। ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে আইন তৈরির সংকল্প দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্নমেণ্টের মনে তখন বাসা বেঁধেছে। আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীরা সংখ্যায় দেড় লাখ। কিন্তু হলে হবে কি! তাদের পরিচালিত করবার নেতা কই ? কোথায় সেই রণগুরু যিনি তাদের অস্ত্রে দীক্ষা দেবেন ? শতধাবিচ্ছিন্ন আশাহত তাদের সংঘবদ্ধ করবেন ? দুর্জয় শক্তিতে তাদের শক্তিমান করে তুলবেন ? গান্ধী অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন, অসহায় স্বদেশবাসিগণকে আসন্ন দুর্দিনের অন্ধকারে ফেলে রেখে ভারতে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অন্যায় এবং অশোভন হবে। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ভারতবাসীদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে তাঁর নিজেরও মর্যাদা একই সূত্রে কি গ্রথিত নয় ? গান্ধী নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে।

১৮৯৩ কে ভারতবাসীরা ভুলবে কেমন করে ? ঐ বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মমহাসভায় সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন যার শুরুতেই ধ্বনিত হল : Sisters and Brothers of America. ঐ বৎসরেই যুবক গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম পদার্পণ করেন ব্যারিস্টারের ভূমিকা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখনও চলেছে, ছিন্নপত্রের অজ্ঞাতবাসের যুগ। "কর্মবিহীন বিজন সাধনা"র দিনগুলি কেটে যাচ্ছে পদ্মার নির্জন চরে। কখনো বা শিলাইদহের, কখনো বা সাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর প্রশান্ত পরিবেশে সুন্দর সুন্দর গল্প ও গীতি-কবিতা লেখার ভিতর দিয়ে। বোলপুরের কর্মময় জীবনের রণরঙ্গভূমি তখনো রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বহু দূরে !

গান্ধীর কথায় ফিরে আসি। একদিকে দোর্দণ্ড-প্রতাপ গবর্নমেণ্টের বিপুল পরাক্রম, উদ্ধত পশুবলের নির্লজ্জ আস্ফালন, অন্যদিকে সত্যাগ্রহী ভারতবাসীদের আত্মার অপরাজেয় দিব্য শক্তির মহিমাময় প্রকাশ। জোহান্স্‌বার্গে ব্যারিস্টারিতে পসার তখন ভালোই জমেছিল। গান্ধী তখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। স্বাধীনতার ডাকে ছেড়ে দিলেন ব্যারিস্টারি। সেণ্ট্‌ ফ্রান্সিসের মতো দারিদ্র্যকে করলেন জীবন-বধূ। নির্যাতিত ভারতবাসীদের দুঃখময় জীবন তাঁকেও বহন করতে হবে। সমস্ত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে তালে তালে চলতে না পারলে নেতার ভূমিকায় অবতরণ তো একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে ! ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চলল সংগ্রামের পর সংগ্রাম।

অদ্ভুত এই নেতা ! অদ্ভুত তাঁর নেতৃত্বের জাদু ! দুর্নিবার তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ! সেই ব্যক্তিত্বে শক্তির সঙ্গে সুষমার কী অপূর্ব মিশ্রণ ! আর যে-মানুষের চরিত্রে শক্তির আর সৌন্দর্যের স্ফুরণ যত বেশী হয়েছে তাঁর আবেদন আমাদের আত্মার কাছে কী তত বেশী দুর্বার নয় ? এবং এই সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে কি আমরা এ কথাও বলতে পারিনে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যে পরিমাণে যত বেশী সংখ্যক মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে সেই পরিমাণে তার জীবন সার্থকতা লাভ করে এবং সেই অনুপাতে তার ব্যক্তিত্ব অন্যদের চোখে সুন্দর ও মহৎ হয়ে প্রতিভাত হয় ? কথায় এবং কর্মে এমন অদ্ভুত মিল যে-ব্যক্তিত্বে এমন সত্য হয়ে উঠেছে তার জাদু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। গান্ধীর সংকল্প জনসাধারণের সংকল্পে পরিণত হল; তাঁর জীবন-প্রদীপের শিখার ছোঁয়া সহস্র সহস্র নিষ্প্রভ জীবনে আলো জ্বালিয়ে দিল। প্রথম ক্রিশ্চিয়ানদের বিশ্বাসের বন্যায় যেমন সাম্রাজ্যবাদী

রোমের বিপুল বিক্রম ভেসে গিয়েছিল তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের আত্মিক শক্তির বন্যামুখে জেনারেল স্মাট্‌সের ক্ষমতার সমস্ত আস্ফালন কোথায় ভেসে গেল! কুড়ি বৎসরের আত্মবলি গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে জয়ের মুকুটে মুকুটিত করল। মাথা পিছু তিন পাউণ্ড ট্যাক্স দেবার আইন বাতিল হল। নাটালে স্বাধীন শ্রমিকদের অধিকারে সুরক্ষিত হয়ে বসবাস করবার পথে আইনকানুনের আর কোনো বাধানিষেধ রইল না।

১৯১৪ সাল থেকে শুরু হল গান্ধীর জীবননাট্যে পট-পরিবর্তন। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশে ঘটনাবহুল জীবনের কত বৈচিত্র্যময় বৎসর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। রোমা রলাঁর ভাষায় an epic struggle. ভারতবর্ষে ফিরে এসে গান্ধী দেখলেন, স্বদেশের সমগ্র কিছুকে খুঁটিনাটিভাবে জানবার প্রয়োজন আছে সর্বাগ্রে। একটা নূতনতর বাতাবরণের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের পর সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোয় একটা সত্য নিঃসংশয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন। অহিংসার অস্ত্র অমোঘ। পরাধীন ভারতবর্ষের সব-কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার সংকল্প গ্রহণ করলেন তিনি যাতে অহিংসার অস্ত্রকে ঠিক মত তিনি ব্যবহার করতে পারেন। গুজরাটের কয়রায় এবং বিহারের চম্পারণে ইতিমধ্যে অহিংসার অস্ত্র ব্যবহার করলেন তিনি এবং সফলকামও হলেন।

এই সময়ে বৃটিশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব তিনি পোষণ করতেন না। কিন্তু বৃটিশের ন্যায়-পরায়ণতার উপরে গান্ধীর গভীর বিশ্বাসে নিষ্ঠুর আঘাত লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচুর লোকবল আর অর্থবল দিয়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করল। নিদারুণ বিপদের ঝড় ইংলণ্ডের মাথায় তখন ভেঙে পড়ছে। লয়েড্ জর্জ প্রতিশ্রুতি দিলেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে। বিজয়ী ইংলণ্ড লড়াই থেমে গেলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনই উৎসাহ দেখাল না। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে নিরস্ত্র ভারতবাসীদের এক জনসভার উপরে গুলিবর্ষণ করে জেনারেল ডায়ার প্রমাণিত করে দিল, বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হয় নি। বৃটিশ-সিংহ কেশর-ফোলা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তার রক্তাক্ত থাবা উদ্যত করে আছে। বিদ্রোহের লেশমাত্র চেষ্টা দেখা দিলেই সেই থাবার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

বৃটিশ গবর্নমেণ্টের এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। শুরু হল বিপ্লব। বিপ্লবের পুরোহিত গান্ধী। তিলক

বেঁচে থাকলে গান্ধী গণ-বিপ্লবের পুরোহিতের ভূমিকা নিতেন কিনা সন্দেহ। রোমা রলাঁ যেমন বলেছেন, "স্বাধীনতা আন্দোলনের ধর্মীয় নেতা হয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।" কিন্তু বিধাতার কী নিগূঢ় ইচ্ছায় তিলকের মৃত্যু হল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে! ভারত-ভাগ্য-বিধাতা যেন নেপথ্য থেকে প্রচ্ছন্ন হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন গান্ধীকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগে।

এই প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বতঃই মনে জাগে। গান্ধী সত্যকে সর্বোচ্চ আসন দিতেন, স্বাধীনতার এবং এমন কি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতার কাছে সত্য-মিথ্যার বাদ-বিচার কেন? রাজনীতির ক্ষেত্র সাধুদের জন্য নয়। এই ছিল তিলকের দৃষ্টিভঙ্গিমা এবং অন্তরের বিশ্বাস। গান্ধীর জীবনের লক্ষ্য ছিল সত্যনারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ। সত্যের অপরিমেয় দীপ্তি আভাসে ক্বচিৎ কখনো তিনি দেখেছিলেন এবং যা দেখেছিলেন তাতে সত্যের পূর্ণ প্রকাশ দেখবার জন্য তাঁর মনে ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। গান্ধী বিশ্বাস করতেন জীবমাত্রকেই আত্মবৎ ভালোবাসতে পারলে তবেই সার্বভৌম সর্বব্যাপী সত্যকে সরাসরি দর্শন করা সম্ভবে। আর মানুষকে আত্মবৎ ভালোবেসেছে যে, জীবনের কোন্ ক্ষেত্র থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে? তাই গান্ধী আত্মজীবনীর উপসংহারে লিখেছেন, "সত্যের প্রতি অনুরাগই আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে অথচ নম্রতার সঙ্গে আমি বলতে পারি, যাঁরা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনই সংস্রব নেই তাঁরা ধর্মের তাৎপর্য কিছুই জানেন না।"

তবেই দেখা যাচ্ছে তিলকের সঙ্গে গান্ধীর বিশ্বাসগত আদর্শগত পার্থক্য ছিল মৌলিক, যদিও এঁরা পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ঐতিহাসিক না হলেও ভারতের যুগ-যুগান্তের পটভূমিতে গান্ধীকে দাঁড় করিয়ে তাঁর চিন্তাধারার ও কর্মধারার বিচার করে এই সত্যই বারংবার আমার মনে ঝলক দিয়েছে: গান্ধী ছাড়া আর কোন নেতার ডাকে ভারতবর্ষ এমন করে সাড়া দিতে পারত না। সমস্ত ভারতবর্ষ ধর্মগত, ভাষাগত, শ্রেণীগত, বর্ণগত বিভেদ ভুলে এমন করে ইতিপূর্বে আর কোন রাষ্ট্রনেতার আহ্বানে আগিয়ে আসে নি। এমন যে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারল তার কারণ গান্ধীর আবেদন গিয়ে পৌঁছালো জাতির প্রাণকেন্দ্র যেখানে ঠিক সেইখানে অর্থাৎ জাতির মজ্জাগত অধ্যাত্ম চেতনায়। বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন, "অন্যান্য দেশে মানুষ সর্বাগ্রে রাজনৈতিক হতে পারে। পরে খেয়াল-খুশি মত একটু আধটু ধর্মচর্চা করলেও

করতে পারে। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আগে আধ্যাত্মিক হওয়া। পরে অবসর থাকলে অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করা যেতে পারে। এই কথাটি মনে রাখলে আমরা সহজে বুঝতে পারব, কেন জাতির কল্যাণের জন্য আমরা এখন সর্বাগ্রে জাতির আধ্যাত্মিক সমস্ত শক্তিকে খুঁজে বার করব। অতীতেও এইটি আমরা করেছি এবং অনাগত সর্ব কালেও এইটিই আমাদের করতে হবে।"

বিবেকানন্দের এই বাণীর প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের ধর্মপদং প্রবন্ধে যার মধ্যে আছে: "ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেছেন, "আমাদের দেশে মোগল-শাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।"

ইংরেজ শাসনকালেও দেখা গেল, গান্ধীর নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান আসমুদ্র-হিমাচল তোলপাড় করে দিল তার মধ্যে সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহীর আত্মিক' শক্তির প্রকাশই আমরা দেখেছি। গান্ধীর জীবনদর্শন ধর্মভিত্তিক। তাঁর সমস্ত সামজিক অভিযান এবং রাষ্ট্রচেষ্টার মূলে তো অহিংসা অর্থাৎ প্রেমের জীবন্ত অনুভূতি। ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আত্মবৎ ভালোবেসেই তো কর্ম-সাগরে ঝাঁপ দিলেন! রাজনীতির ক্ষেত্রে আসা—সেও তো জনসাধারণের প্রতি বিপুল সহানুভূতি থেকেই। রাজনীতি অজগর সাপের মতোই জাতিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল। তাকে দূরে রেখে তো সর্বোদয়ের স্বপ্নকে ফলবান করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। আর অহিংসা তো দুর্জনের অত্যাচারের সামনে নিষ্ক্রিয় থাকা নয়। রোমা রলাঁ যে-কথা গান্ধীর জীবনীতে বলেছেন: "বিশ্বাস হচ্ছে একটা সংগ্রাম। এবং আমাদের অহিংসার মত এমন সাংঘাতিক সংগ্রাম কি আছে?" আর গান্ধীর জীবনদর্শনে লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ। এই ঈশ্বর গান্ধীর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সত্যরূপে অর্থাৎ যাঁর আদি নেই, অবসানও নেই, যিনি সর্বকালে এসেছেন এবং যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বকিছুই যিনি। অহিংসার সাধনা কেন? কারণ সারাজীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় গান্ধী

উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হতে গেলে একমাত্র অহিংসার পথেই তা সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজীকে আশ্রয় করে যেমন মোগল-শাসনকালে একদা রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলেছিল ইংরেজ রাজত্বেও তেমনি ধর্মীয় ভাবে অনুপ্রাণিত গান্ধীকে আশ্রয় করে রাষ্ট্রচেষ্টা আর একবার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্যে আকার নিল। গান্ধীর পূর্বেও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রনেতা কেউ কেউ এসেছেন যাঁরা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারায় পশ্চিমের ছাপই যেন বেশী। গান্ধীর চিন্তাধারার উপরেও পশ্চিমের প্রভাব কম নয়। রাস্কিন, থোরো, টলস্টয় এঁদের কাছে অকুণ্ঠ ভাষায় তিনি তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মনের বাতায়নগুলি সকল দিকেই খোলা রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু একথা আমরা কিছুতেই ভুলে যাব না, "He incarnates the spirit of the people"। একটা জাতির গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ আমরা দেখেছি গান্ধীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বে। দু'হাজার বৎসরেরও বেশী ছাড়া কম নয়, ভারতবর্ষের মর্মমূলে রসসিঞ্চন করেছে অহিংসার আদর্শ। কত মহাবীর, কত বুদ্ধ, কত চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ তাঁদের জীবন ও বাণী দিয়ে অহিংসাকে লক্ষ লক্ষ আত্মার মহাসম্পদে পরিণত করে গেছেন। গান্ধী এসে অহিংসার মধ্যে শুধু ক্ষাত্রতেজের হোমশিখা জ্বালিয়ে দিলেন। মারাত্মক নিষ্ক্রিয়তায় যে-অহিংসা ভীরুতার এবং তামসিকতার নামান্তর ছিল তা যে বীরের হাতের অস্ত্র হয়ে একটা শৃঙ্খলিত জাতির পরাধীনতার বন্ধনপাশ ছেদনের অপরাজেয় শক্তি রাখে—এই সত্য প্রমাণিত করবার জন্য গান্ধীর নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

বিবেকানন্দ রাজনীতির ক্ষেত্রে আসেন নি। গান্ধী যদি বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুধু ধর্মীয় নেতার ভূমিকা নিতেন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবার কাজে ডুবে থাকতেন তবে কি এমন করে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে তাঁর পিছনে টানতে পারতেন? রোমা রলাঁ বলেছেন, "কোন দেশের জনগণের অধিনায়ক হওয়া যার তার কাজ নয়। তাঁকে তিনটি শর্ত পূর্ণ করতে হবে। তাঁর বাণীতে থাকবে জাতির গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। তিনি বর্তমানের দাবি তৃপ্ত করবেন। জগতের তৃষ্ণা মেটানোরও ক্ষমতা থাকা চাই তাঁর।"

নব্য ভারতবর্ষের বর্তমানের দাবি ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান।

গান্ধী জানতেন, কারও হাড় ভেঙে গেলে সেই ব্যক্তির সমস্ত মন যেমন ভাঙা জায়গায় পড়ে থাকে তেমনি একটা শৃঙ্খলিত জাতির সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রকে অধিকার করে থাকে একমাত্র চিন্তা,—কেমন করে পরাধীনতার বন্ধনপাশ ছেদন করা যায়। স্বাধীনতার আন্দোলনের শুরুতেই গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা চূড়ান্ত মোকাবিলা হয়ে গেল। গান্ধী প্রথম থেকেই জানতেন ভারত-বর্ষের কাছ থেকে কতখানি দাবি করতে পারেন তিনি। জাতির লক্ষ্য অহিংসা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজ,—এ নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের লেশমাত্র মত-ভেদ ছিল না। অহিংসায় ভারতের বিশ্বাস মজ্জাগত। কিন্তু বিবেকানন্দের ভাষায় স্বাধীনতা কি আমাদের মর্মের মহা-সঙ্গীত নয়? হিংসা এবং ভীরুতা—এ দুয়ের মধ্যে যদি একটাকে বেছে নিতে হয় তবে কি হিংসাকেই আমরা বেছে নেব না? আবার রোমা রলাঁর ভাষায় বলি, "We do not fight violence so much as weakness." স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে যারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তারা আর যাই হোক আত্মমর্যাদাবোধে মহিমাময় তো বটে, অত্যাচারী বিজেতার পদপ্রান্তে দাসত্বের অসম্মানের মধ্যে আরাম চায় না তারা। তাই গান্ধী বললেন, "I would rather see India freed by violence than enchained like a slave to her foreign oppressors." "ভারতবর্ষ হিংসার পথে স্বাধীন হোক—এ বরং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে বিদেশী অত্যাচারীদের কাছে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে এ আমি কিছুতেই চাইনে।" অহিংসার আদর্শের পূজারী গান্ধীর মুখে এসব কথা অদ্ভুত শোনায় বটে। কিন্তু একথা আমরা কখনই ভুলব না যে গান্ধী বিবেকানন্দের মতই বিশ্বাস করতেন, "Know that all sins and all evils can be summed up in that one word, weakness." সকল পাপের, সকল অকল্যাণের গোড়ার কথা ভীরুতা। গান্ধী ভারতবর্ষকে অহিংস দেখতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আরও বেশী করে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে নির্ভীক এবং স্বাধীন দেখতে।

কিন্তু হিংসার রাস্তায় স্বাধীনতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইংরেজ জাতিকে নিরস্ত্র করে রেখেছিলো। ভিক্ষার রাস্তায় তো স্বাধীনতা কোন কালেই পাওয়ার নয়। তবে কোন্ রাস্তায় স্বাধীনতা আসবে? গান্ধী বললেন, "একটা গোটা জাতি স্বাধীনতার জন্য চরম দুঃখকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যদি তার বাঁধন-ছেঁড়ার অভিযান শুরু করে তবে পৃথিবীতে এমন সামরিক বাহিনী নেই যে তার সংকল্পকে নোয়াতে পারে।" অত্যাচারীর কাছে বশ্যতা স্বীকার

না করলে অত্যাচার টিকে থাকতে পারে না কখনই। আর অত্যাচারের কাছে বশ্যতা-স্বীকৃতির মূলে তো ভয়—ফাঁসি কাঠে ঝোলার, নয় তো বন্দুকের গুলিতে মরার ভয়। কিন্তু মৃত্যুভয়কে যদি জয় করা যায়! পুলিসের লাঠিতে মাথার খুলি চৌচির হয়ে যাচ্ছে তবু লাগছে না বলা যে শক্ত! ঠিক এই প্রশ্নই করেছে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাইয়ের বিদ্রোহী প্রজারা রাজশ্যালক চণ্ডপালের মারের মুখে। আর রুদ্র সন্ন্যাসী ধনঞ্জয় কেমন করে মারকে জিততে হয় সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন: "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।" রক্তমাংসের বাহিরের মানুষটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আসল মানুষটি, "The man within the man." এই আসল মানুষটির কাছে ছিল বিবেকানন্দের আবেদন উপনিষদের আত্মার বাণী শুনিয়ে নির্বীর্য ভারতকে অপরাজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। গান্ধীও অনন্ত শক্তির আধার আত্মার কাছে আবেদন করলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভাষায় বিদ্রোহী ভারতকে শোনালেন, "মাথা তুলে যেমন বল্‌তে পারবি লাগচে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।" ভারতবর্ষ গান্ধীর কথা শুনল, 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' অভয় মনে মারের সাগর পাড়ি দিল 'বিষম ঝড়ের বায়ে।' বৃটিশের ছিল দুঃখ দেবার আসুরিক ক্ষমতা। আমাদের দুঃখ সইবার দিব্যশক্তি। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করলেন গান্ধী। অবশেষে দুঃখের বহ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে, শুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষ পরাধীনতার তিমিররাত্রের গর্ভ থেকে স্বাধীনতার আলোয় নবজন্ম লাভ করল। এইবার প্রবন্ধ শেষ করি সেই বরেণ্য নেতার পায়ে প্রনাম নিবেদন করে যাঁর অসামান্য নেতৃত্বে একটা নিরস্ত্র শৃঙ্খলিত জাতি সংগ্রামের পর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে অবশেষে জয়ের গৌরবে মুকুটিত হয়েছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী মৈত্রীভাবনায় অনুপ্রাণিত হবার জন্য কি ভারতবর্ষের বাণীর অপেক্ষা করছে না? এবং গান্ধীর নেতৃত্বেই কি ভারতবর্ষ এই বাণী দেবার যোগ্যতা অর্জন করল না?

আমেরিকায় গান্ধীবাদ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ঠিক এক যুগ আগের কথা মনে পড়ছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বাস শহরে আমি অতিথি। নিজের হোটেলে (ওয়েভারলি হোটেল) বসেই নিজের একটি বেতার-ভাষণ শুনছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত সে ভাষণ।

অগাস্টের শেষভাগে রাজধানী ওয়াশিংটনে উপস্থিত হবার ক'দিন বাদেই হোটেল প্রেসিডেন্সিয়েলে আমার কাছে এক ডাক এলো ভয়েস অব আমেরিকা থেকে। গান্ধীজীর জন্মদিন আসন্ন, সে উপলক্ষে আমার একটি ভাষণ রেকর্ড করিয়ে রাখার ইচ্ছা জানালেন তাঁরা। আমি খুশী।

আমেরিকা যাত্রার আগে থেকেই সে দেশে ভারতীয় প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করেছে তা জানবার জন্যে আমার একটা আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে সে দেশের নিগ্রোদের যে স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির ভিত্তিতে, তারই বা গভীরতা ও সত্যতা কতটুকু সে সব যাচাই করে আসবার কথাও আমি বিশেষভাবেই ভাবছিলাম। সে সময়ে আমেরিকার বেতারে গান্ধী সম্বন্ধে বলার এমন একটি সুযোগ পেয়ে স্বভাবতঃই আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

সে ভাষণে আমি বলেছিলাম—"আজ সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করতে গিয়ে এ কথাই প্রথমে মনে হচ্ছে, মহাত্মাজীর নির্দেশিত পথ শুধু ভারত বা ভারতবাসীর জন্যে নয়, সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর জন্যে। একমাত্র তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ইতিহাসের অরুণোদয় থেকে আজ অবধি ভারত-মনীষীদের কণ্ঠে বার বার যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হয়ে আসছে সে বাণী পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে উঠতে পারেনি, বহুদেশ সে বাণীর গভীরতাই উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে বার বার হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী, রক্ত-কলঙ্কিত হয়েছে পৃথিবীর পবিত্র মাটি, কলঙ্কিত হয়েছে সমগ্র মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা।

"হিংসার পথ অন্যায়ের পথ। এক অন্যায়ের সাহায্যে আরেক অন্যায়ের

প্রতিকার যথার্থভাবে সাধিত হতে পারে না, হিংসার পথে কোনো প্রশ্নেরই স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব নয়, মহাত্মা গান্ধী একথা বারবার বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন—কত-বার সতর্ক করে দিয়েছেন হিংসাত্মক পথের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে! যারা সেই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছে, তাদের পরিণাম আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরিপূরণ না হতেই পৃথিবীর দিকে দিকে যেভাবে নতুন করে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে তাতে আজ মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর সত্য, শান্তি আর প্রেমের আদর্শকে বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন।

"একই সঙ্গে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা এবং যুদ্ধায়োজন করে যাওয়া মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। পৃথিবীর কোনো কোনো রাষ্ট্র সেভাবেই এগিয়ে চলেছে। সুখের কথা পৃথিবীর অগণিত মানুষ শান্তিকামী এবং বহু রাষ্ট্রনায়কও গান্ধীজীর শান্তিনীতিতে যথার্থ আস্থাশীল।

"পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত। দুই শিবিরের নায়করাও শান্তিপূর্ণ পথেই যাবতীয় বিশ্বসমস্যা মীমাংসার শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যখন পরমাণু ও উদ্‌জান যুদ্ধের মহড়া চলে তখন ভারতের মানুষ সেই শুভ ইচ্ছায় স্বাভাবিক ভাবেই সন্দিহান না হয়ে পারে না। গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসার আদর্শকে সারা পৃথিবী যেদিন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে সেদিন কোনো রাষ্ট্রই আর যুদ্ধায়োজনের কথা চিন্তা করবে না, অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির আর কোনো প্রয়োজনই বোধ করবে না, কারণ তখন পারস্পরিক অবিশ্বাসকে দূর করে দেবে।

"অহিংসার শক্তি যে অপরিসীম মহাত্মা গান্ধী তা তাঁর নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন। আমার জীবনই আমার বাণী—এ তাঁরই কথা। জার্মানীর মতো দুর্ধর্ষ রণনিপুণ জাতিকে বিগত দুই মহাযুদ্ধে বিপর্যস্ত করার গৌরবের অংশীদার হয়েও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজকে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত ভারত-সৈনিকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা।" গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে কলাম্বাসে দু'টি টেলিভিসনেও আমাকে প্রশ্নোত্তরে কিছু বলতে হয়েছিল।

* * *

ফিলাডেলফিয়া থেকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল সফরে বেরিয়ে-ছিলাম ২৬শে সেপ্টেম্বর। মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর আপত্তি জানিয়ে-

ছিলেন আমায় সে সময়ে দক্ষিণাংশে যেতে দিতে। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের বিরোধে সে অঞ্চলে তখনো বেশ উত্তেজনা। এমন কি আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারী-লাল মেহেতাও কয়েকদিন আগে দক্ষিণে গিয়ে শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ সব কারণ দেখিয়ে এবং আমাকেও কোনো গোলমালের মুখো-মুখি যদি হতে হয় সেই আশঙ্কায় আমার সাধে বাদ সাধতে চেয়েছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তর। কিন্তু একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করা আমার যে কর্তব্য ও ধর্ম, জোরের সঙ্গে সে কথা বুঝিয়ে বলার পর সরকারপক্ষ থেকেই আমার জন্যে দক্ষিণ সফরের এক পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচী তৈরি করে দেওয়া হলো। সেই ব্যবস্থা মতোই আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে যাত্রা করে টেনেসি রাজ্যের নক্সভিল, আটলাণ্টা হয়ে জর্জিয়ার কলাম্বাস শহরে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে সময়ে সারা আমেরিকা জুড়ে সাংবাদিক সপ্তাহ পালিত হচ্ছিল। প্রতি বছর এই সপ্তাহে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ সাংবাদিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকে সাংবাদিক সমাজকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৃত্তিগত সংস্থার সভা-সম্মেলন আহ্বান করা হয় এ উপলক্ষে। কলম্বাস শহরে এমনি দু'টি সভায় লায়নস ও রোটারিয়ানদের কাছে এবং ডসন নামক উপকণ্ঠবর্তী এক পল্লীতে আয়োজিত সাংবাদিক নৈশভোজে সাংবাদিকতা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাংবাদিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল আমাকে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই আমি এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক গান্ধীকে উপস্থাপন করেছি। রাষ্ট্রীয় মুক্তি আন্দোলনের অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জনশ্রেণীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন এবং যাতে তিনি অনেকখানি সাফল্যও অর্জন করেছেন, মার্কিন শ্রোতৃবর্গ গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই সব বিবরণ শুনেছেন এবং শুনে আনন্দিতও হয়েছেন।

কলাম্বাসে চার-পাঁচ দিন কাটিয়ে আমি দক্ষিণের নিউঅরলিন্স (লৌজিয়ানা) টেক্সাসের অস্টিন, হাউস্টন, আসফর্ক, সান এ্যান্টোনিও, এবং আরিজোনার ফিনিক্স প্রভৃতি শহরে নিগ্রোদের হতমান অবস্থা দেখে ভারি মন নিয়েই প্রকৃতি-নিকেতন গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান হয়ে ১৩ই অক্টোবর তারিখে চলে আসি

প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের লস এঞ্জেলস শহরে। পূব থেকে দক্ষিণ হয়ে এলাম পশ্চিমে। উত্তেজনার আবহাওয়া কাটিয়ে এসে পড়লাম অনেকটা শান্ত পরিবেশে। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান থেকে সাণ্টাফে'র দোতলা ট্রেনে দীর্ঘপথ আসতে আসতে কেবলি ভেবেছি, মহামতি লিঙ্কন ও জেফারসনের দেশে এবং মানবতার কবি হুইটম্যানের আমেরিকায় আজও কী করে মানুষে-মানুষে এমন বৈষম্য, সাদা-কালোয় এমন পার্থক্য বজায় থাকতে পারছে। পরাধীনতার যুগে আমাদের দেশেও 'শুধুমাত্র ইয়োরোপীয়ানদের জন্যে' হোটেল দেখেছি, দেখে অপমানে জর্জরিত হয়েছি--আজ সে-সব ইতিহাসের কথা। স্বাধীন ভারতে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু স্বাধীন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের নাগরিকতা আজও কি করে অব্যাহত আছে, রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার পর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দাসমুক্তি ঘোষণা করে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলনে যে তীব্র অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তারপরে শতাধিক বছর কেটে গেলেও এবং নানা বিধি-বিধানের বাঁধন সত্ত্বেও সেই বৈষম্য-বিরোধের আজও কেন কোনো সুমীমাংসা হলো না সে সম্বন্ধে আমেরিকার দক্ষিণাংশে সফরের সময় আমি যেখানে যত লোককে প্রশ্ন করেছি কারও কাছ থেকেই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। 'জন্মসূত্রে পৃথিবীর সব মানুষই সমান এবং সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকেই কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দান করেছেন; এই অধিকারগুলির মধ্যে আছে জীবন ধারণের, স্বাধীনতা ভোগের এবং সুখানুসরণের অধিকার আর এই সব অধিকার আয়ত্ত করার জন্যেই মানুষের সমাজে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়ে থাকে এবং সেই শাসন ব্যবস্থার পরিচালকদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতাবলী আহৃত হয়ে থাকে শাসিত জনগণের সম্মতি থেকে।'—মার্কিন সংবিধানের এই ঘোষণার সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রো সমাজের বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি কতটুকু—এ-প্রশ্ন করলে মার্কিন শ্বেতাঙ্গ মহল থেকে অনুরূপ ভাবে ভারতীয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের 'অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য'দের প্রশ্ন টেনে আনা হয়, কিন্তু তাতে দেশের সাদা-কালার রেষারেষি কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তার কোনো সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। বরং বর্ণবৈষম্যের সপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সমর্থন যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল সেটাই তাঁদের মূল বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেটা ইতিহাসের কথা, কাজেই অনেকেরই জানা।

গৃহযুদ্ধের তৃতীয় বছরে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করলে (১৮৬৩) মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে 'ফ্রীড ম্যানস্ ব্যুরো' নামে এক সংস্থা গড়ে উঠলো। মুক্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে পতিত, পরিত্যক্ত ও বাজেয়াপ্ত জমি বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা হলো ঐ সংস্থার উদ্যোগে এবং তাদের চেষ্টাতেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাবও পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কতটুকু সুবিধা নিগ্রোরা পেয়েছে এই সংশোধনী প্রস্তাবের ফলে? তেমন কিছুই নয়। সুপ্রিম কোর্ট বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করে এসেছেন যে, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাব কেবল মাত্র ফেডারেল গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত নাগরিকাধিকার বিষয়েই প্রযোজ্য, কোনো স্টেটের ওপর তার কোনো এক্তিয়ার নেই। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বর্ণ বৈষম্য রক্ষার প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধিসম্মত এবং সে জন্যেই বিদ্যায়তন, আমোদ প্রমোদের স্থান, ট্রেন এবং ট্রামে-বাসে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের পৃথক করে রাখার অধিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের এক ঘোষণায় পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাব শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গে সমানাধিকার স্বীকার করে নিলেও বর্ণ বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সেই বিধানের কিছুই করণীয় নেই এবং তাতে রাষ্ট্রনৈতিক সমতা স্বীকৃত হলেও, সামাজিক সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। 'স্বতন্ত্র হলেও সমান' এই নীতি অনুসারেই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নিগ্রোদের পক্ষে বাস্তবিকই অপমানসূচক। শিক্ষার প্রসারের ফলে নিগ্রোদের মধ্যে দ্রুত আত্মসচেতনতার উদ্ভব হয়ে চলেছে। তাই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও তাদের মধ্যে ক্রমশ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

এব্রাহাম লিঙ্কনের অনেক পরে রিপাব্লিকান পার্টি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নিগ্রো জাতির মধ্যে তখন এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়, নতুন আশায় উদবেলিত হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু রুজভেল্টের আমলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবী জুড়ে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। মহাযুদ্ধের দারুণ উত্তেজনার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কিছুটা ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিলেন, তাঁর পিছিয়ে-পড়া নিপীড়িত দেশবাসীর প্রতি। নিগ্রোরা যাতে অর্থোপার্জনের সমান সুযোগ পায়—চাকরির

ব্যাপারে যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদে কোনো তারতম্য করা না হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সে-রকম এক নীতি ঘোষণা করলেন এবং এ নীতিকে যথার্থ ভাবে কার্যকর করার জন্যে তিনি 'ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট প্রাক্‌টিসেস্' কমিটি নামে একটি কমিটিও করে দেন। এতে অনেক রাজ্য সরকারও যথেষ্ট সাড়া দেন। সে-সব রাজ্যে আইন করে চাকরি বণ্টনে জাতি-ধর্ম বা বর্ণের বিচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ, হোটেল, গ্রীষ্মাবাস এবং প্রমোদভবন প্রভৃতিতে প্রবেশের আবেদন জাতি-বর্ণভেদের অজুহাতে প্রত্যাখ্যানের অধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তাহলেও আমি দেখেছি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশেও কিভাবে গুরুতর অপমান সহ্য করে নিগ্রো যাত্রীরা নিউঅর্লিন্সের মতো বিরাট শহরে বাসের শেষদিকের নির্দিষ্ট আসনগুলিতে বসতে বাধ্য হয়, এয়ারপোর্টে 'Lavatory for whites only' সাইনবোর্ড দেখে বিস্মিত হয়েছি, দক্ষিণের প্রায় সর্বত্রই সাদা মানুষ ও কালো মানুষদের জন্য পৃথক পৃথক হোটেল দেখে বেদনাবোধ করেছি। লিঙ্কন থেকে শুরু করে রুজভেল্টের আমল পর্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে অনেক চেষ্টা হয়েছে আমেরিকার মাটি থেকে বর্ণবৈষম্যের পাপ দূরীকরণের জন্যে। সব চেষ্টা সর্বতোভাবে সব সময় সফল হয়নি, তাহলেও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিগ্রোদের সঙ্ঘবদ্ধতা বৃদ্ধির ফলে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও অনেক বন্ধু দেখা দিয়েছে তাদের, ব্যাপক সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চতুর্দিকে যাতে একের পর এক জয়ের পথ তাদের প্রশস্ত হয়ে উঠেছে।

সেটা তৃতীয় রিপাব্লিকান প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের প্রথমবারের শাসন কাল। দ্বিতীয়বার নির্বাচনী প্রস্তুতি চলেছে তাঁর তখন। আমি লক্ষ্য করেছি হাওয়া তাঁরই পক্ষে। রিপাবলিকান পার্টিকে নিগ্রোরা তাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল বলে মনে করে এবং বাস্তবিক পক্ষেও লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং আইজেনহাওয়ারের রাষ্ট্রপতিত্বে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকেরা তাদের সমানাধিকারের সংগ্রামে যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে অন্য সময়ে ততটা সম্ভব হয়নি। আইজেনহাওয়ারের আমলে দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে নিগ্রো ভোটারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চললেও তাঁর প্রথমবারের রাষ্ট্রপতিত্বের মধ্যভাগে নিগ্রো-মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে সুপ্রিম কোর্টের এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলা হয়, 'আমরা আজ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাবের

সমতা সংরক্ষণ শর্তের জোরে কোনো রাজ্যে জাতি বৈষম্য মেনে নিয়ে পৃথকভাবে কোনো সাধারণ বিত্যালয় পরিচালনা করা চলবে না।' এ ঘোষণা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। পাঁচ অঞ্চলের স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের পক্ষ থেকে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, এ তারই ফল। সে মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আরো পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন, "শিক্ষা ক্ষেত্রে 'স্বতন্ত্র কিন্তু সমান' নীতি চলতে পারে না। এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আসলে বৈষম্যেরই পরিচয়ক।" তাই কোর্ট থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে পৃথকীকরণ ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণা ও নির্দেশ অনেক জায়গায় কার্যকর হলেও আবার বহু স্থানে তা লঙ্ঘিতও হয়েছে। যেখানে লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানেই বেধেছে গোলমাল এবং সেইসব গোলমালের কথাই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে নিগ্রো-মুক্তির আন্দোলন যে ক্রমশ সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে তার ততটা প্রচার হয়নি। এ হলো সরকারী মুখপত্র ও মুখপাত্রদের কথা। তাদের মূল বক্তব্য, জনগণের সম্মতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধনই মার্কিন নীতি, যাতে জন সমর্থন নেই তেমন কিছু সাধারণত আমেরিকায় করা হয় না। আর জোর-জবরদস্তি করে সমানাধিকার দিতে গিয়ে নিগ্রোদের যে অধিকতর শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ ও ঘৃণার সম্মুখীন হতে হয় অতীত অভিজ্ঞতায় সে প্রমাণও রয়ে গেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বার বার সৈন্য আমদানী করে দক্ষিণাঞ্চলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই সরকার শান্তির পথে এ ব্যাপারে ধীর-নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

এই সরকারী ভাষ্য হয়তো ঠিক। কিন্তু নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ অপমানে উত্তেজিত হয়েও উন্মত্ততার পথ পরিহার করে লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্যে যখন অহিংসার বলে বলীয়ান হয়ে শান্তিপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের পথকে বেছে নেয় তখন একটা অতি উচ্চ আদর্শের ছবি আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে নিগ্রো-মুক্তি যুদ্ধের তেমনি একখানি চিত্রই আমার চিত্তকে অধিকার করে বসেছিল।

কিন্তু ভারতের তো অনেক কিছু করণীয় আছে এদেশে। বিশেষ করে নিপীড়িত নিগ্রো জাতির কথা বিশেষভাবে ভাববে না নিপীড়িত ভারতের মানুষ, এ হতেই পারে না। এ প্রসঙ্গ নিয়েই একদিন আমার দীর্ঘ আলোচনা হচ্ছিলো

লস এঞ্জেলেসের বেদান্ত সেণ্টারে স্বামী প্রভবানন্দজীর সঙ্গে। আমেরিকার উত্তরাংশে রামকৃষ্ণ মিশনের এগারো-বারোটি কেন্দ্র কাজ করছে, কিন্তু দক্ষিণাংশে একটি শাখাও নেই অথচ নিগ্রো অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলেই ভারত-ধর্মের কথা প্রচারের বেশি প্রয়োজন। আমার এ যুক্তি স্বামীজী স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন, দক্ষিণে আমরা যে নতুন সেণ্টার খুলবো, সন্ন্যাসী কোথায় যারা ভারত-কথা প্রচার করবে? স্বাধীন ভারতের তরুণদের কি আর সেই মিশনারী স্পিরিট আছে? তবে একটা সুখের কথা আমেরিকার নিগ্রো জাতি মূলত ভারতের অহিংস নীতিকেই অর্থাৎ গান্ধী-আদর্শকেই তাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে।

বাস্তবিকই তাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী-নীতির সাফল্যে আমেরিকার নিগ্রো জাতি এমন ভাবে প্রভাবিত হয় যে ক্রমশই তারা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের নেতৃত্বে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরুপদ্রব নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার আমেরিকার গান্ধী বলে পরিচিত হয়ে উঠেন। শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর নয়, অনেক শ্বেতাঙ্গের ওপরেও মিঃ কিং-এর যে অসামান্য প্রভাব তা' প্রত্যক্ষ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

* * *

আরো কয়েকটি রাজ্য পরিভ্রমণের পর আমি ইলিনয় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শহর শিকাগোয় এসে পৌঁছুই ২৯শে অক্টোবর বিকেলে। 'সিটি অব গ্যাঙ্গস্টার্স' নামাঙ্কিত হলেও এ শহরের প্রতি যে কোনো ভারতীয়ের বিশেষ করে বাঙালীর একটা বিশেষ আকর্ষণবোধ স্বাভাবিক। কারণ এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভারত-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। তাই শিকাগো শহর ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থস্বরূপ। আর এ শহরেই আমি নিগ্রোদের ওপর গান্ধী-প্রভাবের সব চেয়ে বেশি পরিচয় পাই। সেজন্যেই শিকাগো আমার স্মৃতিপটে সবিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে।

সে এক মনোরম বিকেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিকাগো শহরের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে আমি ফিরে চলেছি আমার হোটেলের দিকে। মিসিসিপি নদীর ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড ব্রীজ। শহরের বুক চিরে নদী বেরিয়ে গেছে আর দু'খণ্ড শহরকে যুক্ত করেছে এই ব্রীজ। সে ব্রীজ পেরুতে গিয়েই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো পেছন থেকে হঠাৎ এক ডাক শুনে।

মুখ ফিরিয়েই দেখি এক নিগ্রো মহিলা। প্রথমেই তিনি আত্মপরিচয় দিলেন, আমি মিসেস রাথ ওয়েস্ট, মার্টিন লুথার কিং-এর শিষ্যা। তারপরেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি গান্ধীর দেশ ভারত থেকে এসেছেন?

আমার উত্তরে খুশী হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকলেন মিসেস ওয়েস্ট। কথায় কথায় বললেন, জানেন তো আমরাও আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গান্ধী-নীতিকেই মূলত গ্রহণ করেছি। আমাদের নেতা রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার পুরোপুরি গান্ধীবাদী।

হ্যাঁ, জানি বৈকি। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে মণ্টগোমারী, আলাবামায় যে অভিনব সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয় পৃথিবীর মানুষকে উল্লসিত করেছে সে তো প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদেরই জয়।

আমার এ উত্তরে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিসেস ওয়েস্ট। তারপরে যখন বললাম, মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও আমি আলাবামার সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলেই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে মণ্টগোমারীর পঞ্চাশ হাজার নিগ্রোর আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবময় সংগ্রাম কাহিনী শুনছিলাম, আনন্দ ও গর্বে তিনি তখন যেন একেবারে ফেটেই পড়ছিলেন। তার আরো বেশি আনন্দ এই জন্য যে, তাঁরই মতো মার্টিন লুথার কিং-এর আরেকজন শিষ্যই মণ্টগোমারীতে অন্যায় আইন অমান্য করতে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন।

জর্জিয়া-আলাবামা তো পাশাপাশি রাজ্য। ওসব এলাকা যখন ঘুরে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই মিসেস পার্কস সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনার কানে এসে থাকবে। দু'চার জন নিগ্রো নেতা বা কর্মীর সঙ্গেও আপনার কথাবার্তা হয়েছে, না সর্বক্ষণ সাদা চামড়ার মানুষগুলোই আপনাকে ঘিরে রেখেছে? —মিসেস ওয়েস্টের এ প্রশ্নে বিক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, নিগ্রো বন্ধুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উদ্দেশ্য নিয়েই আমি দক্ষিণাঞ্চলে গিয়েছিলাম। যেখানে সুযোগ পেয়েছি সেখানেই আমি তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। এও আমি দেখেছি, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও নিগ্রো-বন্ধুর অভাব নেই।

তা' ঠিক, একশ'বার তা' স্বীকার করবো। 'কোনো জাতি আধা স্বাধীন ও আধা ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না', মহান লিঙ্কনের একথা কি আমরা ভুলতে পারি? কিন্তু এমন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের সংখ্যা আজও, এই বিংশ

শতাব্দীর শেষার্ধেও খুব বেশি নয়—সেটাই ভারি দুঃখের। বলতে বলতে ওয়েস্টের কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেল।

পরক্ষণেই মিসেস ওয়েস্ট আবার বলতে শুরু করলেন, জানি অনেক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর সহানুভূতি রয়েছে আমাদের ওপর। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও অনেকটা তৎপর হয়েছেন সাদা-কালোর পার্থক্য ঘোচাতে। কিন্তু শুধু অন্যের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করলে চলবে না, অন্যায়ের প্রতিবাদে আমাদেরই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—আমাদের নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর এই শিক্ষা, এই নির্দেশ। মহাত্মা গান্ধীও তো আপনাদের তেমনি শিক্ষাই দিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আপনারা সংগ্রাম করেছেন, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। আমরাও সেই পথেই অগ্রসর হয়েছি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্যে।

আপনাদের জয়ও সুনিশ্চিত। আমি আশ্বাস দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা হোটেলের সামনে এসে উপস্থিত। নর্থ মিশিগান এ্যাভিন্যুর ওপর হোটেল এলার্টনের বিরাট বাড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বিদায় নিতে চাইলাম। কিন্তু মিসেস রাথ ওয়েস্ট দেখি নাছোড়বান্দা। বললেন, বেশ তো চলুন না, আপনার হোটেলে গিয়েই একটু বসা যাক।

মনে মনে প্রমাদ গুনলেও অসম্মতি জ্ঞাপনের অভদ্রতা করা সম্ভব ছিল না। মিসেস্ ওয়েস্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এলেন হোটেল লাউঞ্জে। ভদ্রতার খাতিরে একটা ড্রিঙ্কও 'অফার' করতে হলো। কিন্তু আমার কথা জেনে আমাদের দু'জনের জন্যেই তিনি কফির অর্ডার দিতে বললেন।

সেই কফি খেতে খেতেই আরো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা চলেছিল সেদিন। বিষয় সেই একই—নিগ্রোদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গান্ধীনীতি।

চামড়ার রঙ যাই হোক মানুষ তো আলাদা আলাদাভাবে জন্মায় না, ঈশ্বরও আলাদা আলাদা করে মানুষকে সৃষ্টি করেন নি। তবে কেন সাদা চামড়ার মানুষগুলো বাসের সামনের দিকেই বসবে, আর তারা, যাদের গায়ের রঙ কালো তারা চিরকালই বাসের পিছনের সীটে বসতে বাধ্য থাকবে? এই অন্যায় আইন আর কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না, এই সিদ্ধান্ত করে মণ্টগোমারীর মিসেস্ পার্কস যেদিন বাসে উঠে শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত একটি আসনে গিয়ে বসলেন সেদিন সমস্ত নিগ্রো জগতে যে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ

করা অসম্ভব। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মিসেস্ পার্কস সেদিন যা করেছিলেন শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক আইনে তা মস্তবড়ো অপরাধ। আর সে অপরাধে মিসেস পার্কসের হলো অর্থদণ্ড। আগুনের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো সে খবর। আকাশ বাতাস থমথম উত্তেজনায়। আইন অমান্যের পর আহ্বান এলো বয়কটের—'আমরা আর ওদের বাসে চড়বো না।' প্রত্যেক নিগ্রোর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো এই সংকল্প।

আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলনের সময় আমাদের দেশেও এমনি আবহাওয়াই সৃষ্টি হতো। মিসেস্ ওয়েস্টের দম নেওয়ার অবসরে ওঁকে আমি জানালাম এ-কথা।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, গত বছর ৫ই ডিসেম্বর শুরু হয়ে গেল আমাদের সেই ঐতিহাসিক বয়কট। সমগ্র জগৎ জানতে পেলো, নিগ্রোরা আর মুখ বুজে যত রকমের অত্যাচার আর অবমাননা সহ্য করবে না, সমবেতভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে তারাও সক্ষম।

মিসেস্ ওয়েস্ট বলে চললেন, বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিষ্পেষণের রথচক্র। বিনা কারণে ধর্মঘটের অভিযোগে চলেছে ধরপাকড়, চলেছে জেল-জরিমানা। শেষ পর্যন্ত 'বে-আইনী' বয়কট আন্দোলন পরিচালনার জন্যে রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিংকেও দণ্ডিত হতে হলো। পাঁচশত ডলার জরিমানা ও আরো পাঁচশত ডলার আদালতের খরচ হিসেবে দাবির বিরুদ্ধে রেভারেণ্ড কিং আপীল করবেন শুনেই তাঁর উপর পূর্ব দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করে ৩৮৬ দিনের কারাবাসের হুকুম জারী করা হলো। পরে অবশ্য সরকার সে আদেশ বাতিল করে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবু ভালো, সুবুদ্ধি ওদের ফিরে এসেছিল। আমার এই ছোট্ট মন্তব্য শুনেই বাকি কফিটুকু এক চুমুকে শেষ করে, 'না, মোটেই ওদের সুবুদ্ধি ফিরে আসে নি' বলেই নড়ে চড়ে বসলেন মিসেস্ ওয়েস্ট।

তারপর বললেন, শুনুন তাহলে। স্বার্থবাদী শ্বেতাঙ্গরা যখন দেখলো যে শুধু শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে নিগ্রোদের এই আন্দোলনকে দমন করা যাবে না, তখন তারা কুক্লুক্স ক্লাইনের দস্যুদলকে লেলিয়ে দিলে আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে। তাদের বোমায় কয়েকটি নিগ্রো চার্চ ধ্বংস হয়ে গেল, কয়েকজন ধর্মযাজকের বাড়িতেও তারা বোমা ফেললে। পাল্টা জবাব দেয় নি নিগ্রোরা। তাদের নেতার নিষেধ। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স্ক নেতা মার্টিন লুথার কিং গান্ধীর

অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বার বার বলেছেন, হিংসার জবাব হিংসায় দেওয়া যায় না। তাঁর সেই কথার ওপর আস্থা রেখেই নিগ্রোরা শুধু সহ্য করে চলেছে। মণ্টগোমারীর কালো আদমীরা আর বাসের দিকে যায় না। হেঁটে হেঁটে পা তাদের প্রায় অচল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু পথ চলার তাদের বিরাম নেই। তারা যে মুক্তিপথের অভিযাত্রী, থামলে তো চলবে না তাদের!

ঠিক কথা, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহী কখনো বিরাম বা বিশ্রামের কথা ভাবতে পারে না। আমার এ-কথার পিঠেই তাঁদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা তুললেন মিসেস্ ওয়েস্ট।

তিনি বললেন, কিন্তু জানেন, অবস্থা যখন খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে, পরিবেশ যখন রীতিমত বিপজ্জনক ঠিক সেই সময় আন্দোলন আরম্ভের এক বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেন, আমেরিকায় আর বর্ণ-বৈষম্য প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলেন মার্কিন দেশের চামড়া গর্বীরা, বিশেষভাবে মণ্টগোমারীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা। তাঁরাও জোরের সঙ্গে জানালেন শতাব্দী পর শতাব্দী তাঁরা মামলা চালিয়ে যাবেন, তবু কিছুতেই তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মেনে নেবেন না, বাসে চিরকাল তাঁরা সামনেই বসবেন আর কালা আদমীরা বসবে পিছনের আসনে। কোনো দিন এর নড়চড় হবে না! ওঁরা গৃহযুদ্ধ এবং রক্তপাতের হুমকি দিলেন। হুমকি দেওয়াই নয়, সেদিনই রাত্রিতে মণ্টগোমারীর নিগ্রোদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বোমা-পিস্তলে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা হলো এবং তা আগে থেকেই রেডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলো।

আমি চমকে উঠলাম শুনে।

এর চেয়েও যা বিস্ময়ের তা এখনও আমি বলিনি। গান্ধীবাদী লুথার কিং অভয় দিলেন মণ্টগোমারীর নিগ্রো নরনারীদের—নির্ভয়ে আমরা আক্রমণ-কারীদের সম্মুখীন হবো, তাদের অভ্যর্থনা জানাবো।

একটু থেমে মিসেস্ ওয়েস্ট আবার বললেন, নেতার সেই অদ্ভুত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মণ্টগোমারীর অর্ধলক্ষ নরনারী সেদিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পৃথিবীর মানুষের সামনে ইতিহাসে তার বোধ হয় কোনো তুলনা নেই।

কী রকম?

সে কথাই বলছি। রাতের অন্ধকারে সেদিন যখন প্রায় খান চল্লিশেক

গাড়ি বোঝাই হয়ে কু-ক্লুক্স ক্ল্যানের সশস্ত্র দস্যুরা এসে নিগ্রো পল্লীতে উপস্থিত হলো নরনারী নির্বিশেষে সকলকে নিগ্রহ করবার জন্যে, তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্যে, তারা দেখতে পেল নিগ্রোদের ঘরে ঘরে তখনও আলো জ্বলছে—সব জেনে শুনেও পল্লীর নিঃশঙ্কচিত্ত নরনারীরা তাদের আমন্ত্রণ করছে, আহ্বান জানাচ্ছে! বিস্ময়ে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন গুলিয়ে গেল সব। রাত্রের অন্ধকারেই দস্যুদল আবার গা ঢাকা দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল কে জানে। বলেই থেমে গেলেন মিসেস্ ওয়েস্ট।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখের সামনে ভেসে উঠলো দশ বছর আগেকার আরেকটি ছবি। হিন্দু-মুসলমানের আত্মনাশা সংঘর্ষে বিধ্বস্ত কলকাতার বেলেঘাটায় গান্ধীজীর সামনে অনুতপ্ত দাঙ্গাকারীদের অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য। মিসেস্ ওয়েস্টকে আমি বললাম সে কথা। তিনিও কম আশ্চর্য হলেন না সে কথা শুনে।

তারপরেই তিনি বললেন, সত্যি সত্যি এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ধর্মযাজক ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বয়সে তরুণ হলেও অপরিসীম তাঁর মনোবল, অতুলনীয় তাঁর নেতৃত্ব। সমগ্র নিগ্রো জাতির মধ্যে তিনি নতুন শক্তি, নতুন প্রাণের সঞ্চার করে দিয়েছেন। তাঁর কথা, আমরা যদি কথায় ও কাজে অহিংসাকে অবলম্বন করে চলতে পারি তা হলে এমন এক সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যেখানে জাতিগত বর্ণগত প্রভেদ বলে কিছু থাকবে না এবং সকলেই ভোগ করবে সমান স্বাধীনতা।

এ তো একেবারে মহাত্মা গান্ধীরই মর্মবাণী, আমি বললাম।

হ্যাঁ, তাতো হবেই। এদেশে আমাদের নিগ্রোজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনাদের মহাত্মা গান্ধীই তো আমাদের প্রেরণা, তাঁর অহিংসার আদর্শই আমাদের অবলম্বন এবং সেই আদর্শে সমগ্র নিগ্রো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে ডঃ মার্টিন লুথার কিং আমাদের পূর্ণ মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

বলতে বলতে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন মিসেস্ রাথ ওয়েস্ট। তাঁর নেতার কথা বলতে গিয়ে বার বার তাঁর চোখ দু'টি যেন জলে জলে উঠছিল। তিনি যখন বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেলেন তখনো আমি ভারতপ্রেমিক ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর কথাই কিছুক্ষণ ধরে ভাবছিলাম।

শিকাগো থেকে ২রা নভেম্বর আমি বিদায় নিয়ে যাই বাফেলোয় নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখার জন্যে। সেখান থেকে আবার নিউইয়র্কে ৫ই নভেম্বর। আমার আমেরিকা পরিক্রমা এবার শেষ পর্বে। রাজধানী ওয়াশিংটনে কয়েক-দিনের জন্য যেতে হবে একবার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্তাদের সঙ্গে শেষ মোলা-কাতের জন্যে। তারপর আবার নিউইয়র্কে ফিরে এসে সেখান থেকেই স্বদেশ যাত্রা। কিন্তু বার বার নিউইয়র্কে এসেও হার্লেম দেখে যাবো না, সে কি হয়? হতেই পারে না। তাই নিউইয়র্কেরই সংলগ্ন অংশ হার্লেমে একদিন বেড়াতে চলে গেলাম পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে। সম্পূর্ণতই নিগ্রোদের বাস এ অঞ্চলে। তুলনামূলক বিচারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনেক বেশি নিগ্রোদের। তাদের এলাকা তাই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। দোকানপাটের ঔজ্জ্বল্যও অনেক কম। তা হলেও হার্লেম এলাকায় নিগ্রোদের জন্যে স্কুল-কলেজ রয়েছে, গীর্জা রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সংবাদপত্রও রয়েছে। ব্রুকলিন-কুইন্স-নিউইয়র্কের নিগ্রো অধিবাসীদের মুখপত্র 'আমস্টারডাম নিউজ' কার্যালয় দেখে একথাই আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, সুযোগ-সুবিধা পেলে নিগ্রো ভাইবোনদের দ্বারা কী না করা সম্ভব! শত অসুবিধা সত্ত্বেও সঙ্গীতে, ক্রীড়াকুশলতায় ও আরো নানা ক্ষেত্রে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় তারা দিয়ে আসছে সত্যি তার কি কোনো তুলনা আছে? সকল বিষয়ে সমানাধিকারের স্বীকৃতি পেলে নিগ্রোদের চেষ্টা ও উদ্যমে আমেরিকা আরো দ্রুত এগিয়ে যাবে, তেমন কথাই শুনছিলাম হার্লেমের এক দম্পতির মুখে। এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ এক নিগ্রো তরুণীকে বিয়ে করেছে নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অবিচারের প্রতিবাদে এবং সেই প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাকে যে তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে, এমন কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে, সে জন্যেও তার তেমন দুঃখবোধ নেই দেখে একটু আশ্চর্য বোধ হলেও মনে মনে খুশী হলাম। কারণ এ নিছক আদর্শ-নিষ্ঠার ব্যাপার।

হার্লেমের বাজার এলাকায় নতুন অভিজ্ঞতা হলো। দোকান-পাট দেখতে দেখতে পথ চলছি আর কানে আসছে সব মন্তব্য—ইণ্ডিয়া, গান্ধী, টেগোর, নেহরু ইত্যাদি টুকরো টুকরো কথা। সবই আমাকে লক্ষ্য করে নিগ্রো ভাইরা উচ্চারণ করছেন, তাঁদের কথায় ভারত-প্রীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু সহসা এক মস্ত নিগ্রোর উত্তেজনা দেখে সেই মুহূর্তে বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম আমি। মুষ্টি উঁচিয়ে এমন ভঙ্গিমায় লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতি

উচ্চকণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় জঘন্য সব গালমন্দ করছিল যাতে যে কোনো লোকেরই ভয় পাবার কথা। কিন্তু কয়েকজন বন্ধু এসে আমায় বললে, আমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, আমার শ্বেতাঙ্গ গাইডই ঐ উত্তেজনা ও গালাগালের লক্ষ্য। আমরা তাড়াতাড়ি হার্লেম থেকে চলে এলাম—শ্বেতাঙ্গদের প্রতি নিগ্রোদের বিদ্বেষ কতো তীব্র ও গভীর হতে পারে তাও প্রত্যক্ষভাবে জেনে এলাম।

এর পর কয়েকদিন রাজধানী ওয়াশিংটনে কাটিয়ে দেশে ফেরার পথে আবার আমায় আসতে হয় নিউইয়র্কে। আমেরিকায় এই শেষ তিনটি দিন খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটলেও নেহাতই আকস্মিকভাবে একটি ইহুদী পরিবারের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায় সে সময়। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শনে গেলে সেখানে আমায় গাইড দেওয়া হয় মিসেস উরশুলা শার্মেনকে। ভদ্রমহিলা ঐ লাইব্রেরীরই একজন কর্মী। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তিনি আমায় লাইব্রেরীর নানা বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান এবং ইণ্ডিয়ান সেকশনে আমার কয়েকখানা বই দেখে খুশী হন। আমার পরিচয় তিনি আগেই পেয়েছিলেন লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে। বিদায় দেবার সময় তাঁর একটি ইচ্ছা তিনি আমার কাছে প্রকাশ করলেন। বললেন, তাঁর স্বামী খুব সাহিত্য-রসিক, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলে খুব খুশী হবেন। সে জন্যেই তাঁর জিজ্ঞাসা, সন্ধ্যায় আমি হোটেলে থাকবো কিনা। আমার সম্মতি পেয়ে স্বামীকে নিয়ে মিসেস উরশুলা এসেছিলেন আমার হোটেলে—হোটেল উডস্টকে। সে সন্ধ্যায় আমার অনেক গল্প হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে, জাতি ও বর্ণবৈষম্য সমস্যা নিয়ে এবং আরো নানা বিষয় নিয়ে। এবং তারই জের চলছিল তার পরের রাত্রিতে তাঁদের বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। খাবার টেবিলেই জানতে পেলাম শার্মেন দম্পতি ইহুদী। মিঃ উরশুলা শার্মেন কথায় কথায় বলছিলেন, আমেরিকায় তাদের অবস্থাও এক সময়ে নিগ্রোদের চেয়ে খুব ভালো ছিল না। আরব এবং ইহুদী প্রভৃতি সেমেটিক জাতির প্রতি মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের বিরূপতা এমনি প্রবল ছিল যে, তাদের কোনো ভোজনশালায়, প্রমোদ সংস্থায় বা সাধারণ ক্লাব ইত্যাদিতে ঢুকতেই দেওয়া হতো না, কোনো কোনো কলেজ বা মেডিক্যাল স্কুলে ইহুদীদের জন্যে কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সে সুযোগটুকুও পাওয়া যেতো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সে অবস্থার অনেকটাই অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে। ইহুদী প্রভৃতি জাতিগুলি মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আজ একরূপ সমানাধিকারই ভোগ করছে। এমনি ভাবে

নিগ্রোদের সম্পর্কেও যদি সমস্ত কুসংস্কারের অবসান ঘটতো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় সমানাধিকারের বন্ধনে সমগ্র দেশ যদি আবদ্ধ হয়ে যেতো তাহলে আমেরিকা স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতো।

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন মিঃ শার্মেন। তারপরেই একটু নীচু গলায় বললেন, এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন সব ব্যবধান সব বৈষম্য ঘুচে যাবে। নিগ্রোদের মধ্যে এখন অদ্ভুত সঙ্ঘবদ্ধতা এসেছে। আপনাদের গান্ধীর অহিংস নীতির শক্তি যে অপরিসীম তা ওরা বুঝতে পেরেছে। হিংসায় বিশ্বাসী একটি নিগ্রো দল থাকলেও রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের আহ্বানে সমগ্র নিগ্রো জনসাধারণের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।

মিঃ শার্মেনের মুখে এসব কথা শুনতে খুবই ভালো লাগছিল আমার এবং নিগ্রো আন্দোলনের প্রতি ইহুদীদের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতিও শার্মেন দম্পতির কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খেয়েদেয়ে উঠে কফির টেবিলে তাঁদের সেই আন্তরিকতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম। নিগ্রো কবি ইভ মেরিয়ামের সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই 'মণ্টগোমারী, আলাবামা, মণি, মিসিসিপি এ্যাণ্ড আদার প্লেসেস' (এ প্যাম্পলেট ইন পোয়েট্রি) আমায় উপহার দিলেন মিঃ শার্মেন। কবি সম্বন্ধে তিনি জানালেন, চল্লিশ বছর বয়স্কা এই মহিলা কবি তাঁর দক্ষিণী নিগ্রো ভাইবোনদের বিরামহীন অহিংস সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়ে গত মার্চ মাসে ষোলো দিনে এই সংকলনের চব্বিশটি কবিতা রচনা করেছেন। এটি ইভ মেরিয়ামের তৃতীয় কাব্য-সংকলন—সমকালীন নিগ্রো আন্দোলনের একটি চমৎকার প্রতিচ্ছবি। বইখানির পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখ পড়লো একটি কবিতার ওপর। কবিতাটি আমেরিকার অসামান্য প্রভাবের অধিকারী গান্ধীবাদী মহান নায়ক রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার এবং তাঁর দুই প্রধান সহযোগী রেভারেণ্ড এ্যাবারনাথি ও রেভারেণ্ড রবার্ট গায়েৎসকে নিয়ে। অস্ত্রের সাহায্যে নয়, প্রেমের আহ্বান জানিয়ে মানুষকে মানুষের ন্যায্য অধিকার দেবার জন্যে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের মিলিত অভিযানের এ একটি সুন্দর চিত্র। কবিতাটির নাম : মার্টিন লুথার এ্যাণ্ড আদার পিপ্‌ল।

সেই কবিতায় ইভ মেরিয়াম লিখছেন—

Three men of God with faith in God
and with men holding faith.

They would die for their belief.
Oh keep their faith alive.

The Reverend Martin Luther King,
Named for a king among men,
Namesake of that great other—
Martin Luther reborn again.
Brave as his older brother,
Brave with the faith of truth,
And braving the same abuse...

Watch out, King, we're gunning for you.
Words of hate, and more than hate :
We're gunning for you today.

"Let us pray for them, too,"
Says the Reverend King,
"As we walk in God's own way.
Carry no weapon but love."

And the Reverend Ralph Abernathy,
Alabama born-and-bred,
A big and powerful man,
Broad of shoulder, strongly armed

Speaks the Reverend Abernathy :
"Our hands must be free as we walk our way,
Our hands kept free for love.
Carry no weapon but love."

And the white Reverend Robert Gaetz,
With faith the same, (with warnings the same…)
Keeps faith the same,
Speaks the same in the name of one God :
"Carry no weapon but love."

Oh, the door of His house is open wide
To anyone who knocks.

Enter His house that has only one door
Without any bars or locks.

Till they treat us as well as our fares they accept
Together mixed in the box—

We'll hold with the Lord, we shall not ride,
We'll hold with the Lord, and abide.

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার ভারতীয়দের কাছে একটি পরিচিত নাম। তিনি ভারতেও এসেছিলেন, রাজঘাটে গান্ধী-বেদীমূলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা, গান্ধী শতবার্ষিকীর মাত্র কয়েক মাস আগে এক অঘটন ঘটে গেল। গত ৫ই এপ্রিল ১৯৬৮ আমেরিকার গান্ধী, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৬৪) শান্তিবাদী নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংকেও গান্ধীর পথেই চিরবিদায় নিতে হলো নিতান্ত অপরিণত বয়সে মাত্র উনচল্লিশ বছরে। বিশ্ব-সংসার আরেকবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল! আমেরিকায় নিগ্রো আন্দোলন পরিচালনায় কিং-এরই প্রধান সহযোগী রেভারেণ্ড এ্যাবারনাথি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তবে শুধু আমেরিকাতেই নয় সারা পৃথিবী জুড়েই আজ নিপীড়িত মানুষের বিজয় অভিযান চলেছে। তাই কবি ইভ মেরিয়াম তাঁর কাব্য সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন—

Hear the sound
The sound of footsteps rising
The silent melody of handclasp
The tune comes clear across the Himalayas
The music is here everywhere
the song heard round the world.

শান্তিপূর্ণ পথে বিশ্বব্যাপী এই বিজয় অভিযানের পূর্ণ সাফল্যেই গান্ধীবাদের সার্থকতা।

গান্ধীজী ও শান্তিবাদ

আর. আর. দিবাকর

সমগ্র বিশ্বের শান্তিবাদীরা গান্ধীজীকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। শান্তিবাদীদের ইচ্ছা ছিল যে তাঁদের ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতবর্ষে হবে যাতে তাঁদের কাছে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত উপদেশ পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর সম্ভবপর হয় নি। তবুও তাঁর প্রতি শান্তিবাদীদের শ্রদ্ধা এত প্রবল ছিল যে, তাঁরা তাঁদের সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করেন নি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক দিনে তাঁর পরলোকগমনের পরও তাঁরা ভারতবর্ষের সেবাগ্রামে মিলিত হয়েছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

গান্ধীজীর এই বিশ্বজনীন স্বীকৃতির মূলে হয়ত এই কারণ বিদ্যমান যে, প্রায়শঃ তাঁকে সবার কাছে সব কিছু মনে হলেও সর্বদাই এই একাত্মতার মধ্যেও প্রচণ্ড পার্থক্য থাকত। নিজেকে তিনি সনাতনী হিন্দু বলে প্রচার করলেও ঘোষণা করেছিলেন যে, যুক্তি বা নৈতিকতাবিরোধী কোন কিছু মানতে তিনি রাজী নন। অস্পৃশ্যতার প্রথাকে তিনি কলঙ্কজনক ও অমানুষিক আখ্যা দিয়ে বাতিল করে-ছিলেন এবং জাতিভেদ প্রথার রূপও এক রকম পাল্‌টিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কমিউনিস্ট কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদের হিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু বিবর্জিত। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের শ্রদ্ধা করতেন এবং অনুরূপ ভাবে ইসলাম ও অপরাপর ধর্মমতকেও ভালবাসতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সব ধর্মের অনুগামীদের ধর্মান্তরিতকরণের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁদের সতর্কও করতেন। শান্তিবাদ ও শান্তিবাদীদের ক্ষেত্রেও তিনি আপোসবিহীন ভাবে যাবতীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উক্তি ও আচরণের দিক থেকে তিনি যুদ্ধবিরোধী মতবাদ থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সামগ্রিক অহিংসার সমর্থক হয়েছিলেন।

আজকের শান্তিবাদ নূতন অথবা এক রকমের কোন কিছু নয়। প্রাচীনতম শান্তিবাদী সম্ভবতঃ সেই খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী যিনি রোমক সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ মারতে হতে পারে বলে তিনি সৈন্যদলে যোগ দেবেন না। খ্রীষ্টধর্মের সেই অনুগামীটিকে যদি 'ঐতিহাসিক' শান্তিবাদীর নমুনা বলে ধরে নিয়ে এবার আধুনিক শান্তিবাদীর সংজ্ঞা শোনা যেতে পারে। লণ্ডনের 'পিস প্লিজ ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'শান্তিবাদী'র

মতে, "শান্তিবাদী তিনিই যিনি সব রকমের যুদ্ধ বর্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ ও কদাপি কোন যুদ্ধের সমর্থন করবেন না।" এই জাতীয় সঙ্কল্পের তাৎপর্য ও বাস্তব রূপায়ণের ফলে মানুষের সামনে ব্যক্তিগত বীরত্বের অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং গোষ্ঠীগত ভাবে এমন সব অহিংস কর্মসূচি রূপায়িত করার সম্ভাবনা দেখা দেয় যার পরিণামে শেষ অবধি এমন এক সমাজব্যবস্থা রচনা করা সম্ভবপর হয় যুদ্ধ যেখানে অকেজো বলে বাতিল এবং যেখানে মানুষ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্জনাত্মক ভাবে এবং শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করতে শিখেছে। কয়েক প্রকারের শান্তিবাদ আছে এবং জেনে শার্প এদের নয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে এক দিকে আছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'অপ্রতিরোধ' এবং অপর দিকে রয়েছে যাবতীয় যুদ্ধ ও হিংসার বিরুদ্ধে 'অহিংস বিপ্লব'। শান্তিবাদীদের মধ্যে উপযোগিতাবাদী (utilitarian) থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদী, উদারনীতিক ও কোয়েকার এবং অন্যান্য আরও অনেক মত ও পথের লোকেরা আছেন। তবে এঁদের মধ্যে সর্বসামান্য সূত্রটি হল যুদ্ধবিরোধ, যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচার, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং নিজ বিশ্বাসের জন্য যে কোন রকমের নিগ্রহ বরণের প্রস্তুতি। তবে শান্তিবাদীদের মধ্যে এমন সব গোষ্ঠীও আছেন যাঁরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অসামরিক কার্যকলাপের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত এবং নিজ নিজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করতে রাজী নন। শান্তিবাদীদের ভিতর বর্তমানে এমন সব চরমপন্থীও আছেন যাঁরা সক্রিয় ভাবে যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরোধিতা করেন এবং এর জন্য পিকেটিং ও আইন অমান্য করতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

শান্তিবাদ ও যুদ্ধবিরোধিতার ঐতিহ্যের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখব যে, প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার না করার শান্তি ও অপ্রতিরোধের খ্রীষ্টীয় উপদেশ যথাযথ ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে রাজধর্ম করার পর তিনি শান্তি অথবা যুদ্ধের কাজ যা-ই হক না কেন, সর্বাবস্থাতেই রাষ্ট্রের প্রতি খ্রীষ্টানদের আনুগত্য লাভে সমর্থ হলেন। একমাত্র অ্যালবিজেনসেস (Albigenses) ওয়ালডেনীস (Waldenses) অ্যানাব্যাপটিস্টস (Anabaptists) ও মেননাইটসের (Mennonites) মত কোন কোন প্রচলিত ধর্মের বিরোধী সম্প্রদায়ই যথার্থ খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং 'শত্রুকেও ভালবাসার' নীতির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আধুনিক যুগের যুদ্ধবিরোধিতা ও শান্তিবাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, পাশ্চাত্য জগতে

কোয়েকার, রিকন্‌সিলিয়েশান গোষ্ঠী, টলস্টয় ও দুখোবারেরা শান্তিবাদের নীতি অনুসরণ করছেন। প্রেম, হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ না করা ও এইসব আদর্শের জন্য নিগ্রহ বরণ করা ইত্যাদি ছিল পূর্বোক্ত গোষ্ঠীসমূহের সর্বসামান্য নীতি। সেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেও আমরা দেখতে পাই যে, আদিম বলউ (Adim Ballou) ও উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসনের মত ব্যক্তিরা আমেরিকাতে সর্ব-প্রকারের যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রচার করছেন এবং শিক্ষা ও প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে স্বমতে আনার প্রয়াস করছেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মেননাইটরা তো সৈন্যদলে যোগদান করতে অস্বীকার করে শাস্তি বরণ করেন।

সর্বপ্রকার হিংসা ও যুদ্ধবিরোধীদের যখন এই অবস্থা তখন এমনও অনেক মনীষী ও রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা ঘোষণা করেছেন যে মানবীয় ব্যাপারে সংঘর্ষ, যুদ্ধ, জীবন ও সম্পত্তির বিনষ্টি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। হেরাক্লেটাস, পলিবিয়াস, হান-ফি-ৎসু, কৌটিল্য, ইবন খেলদেম, ম্যাকিয়াভেলি ও ক্লাউসউইৎস্ ইত্যাদি অবিশ্রাম বলে গেছেন যে সংঘর্ষই জীবনের বিধান। অনুরূপ আপোসবিহীনতা সহকারে বুদ্ধ, যীশু, রাস্কিন, এমার্সন; থোরো, টলস্টয় ও ক্রপটকিন প্রভৃতি ঘোষণা করেছেন যে, প্রেম ও শান্তিই মানবজাতির অস্তিত্বের বিধান। গান্ধীজী হলেন শান্তি ও প্রেমের সর্বাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, স্বার্থ সংঘাত থাকতে পারে এবং আছেও; কিন্তু এর সমাধান করতে হবে সত্যে উপনীত হয়ে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ সম্বন্ধে আনুপূর্বিক অনুসন্ধান করতে হবে এবং তারপর সম্বন্ধিত ব্যক্তির প্রতি তিলমাত্র বিদ্বেষ পোষণ না করে যাবতীয় অহিংস প্রক্রিয়ার সহায়তায় অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে হবে। সত্য সম্বন্ধে প্রচার দ্বারা জনমত তৈরি করা, আত্মশুদ্ধি, গণ সমাবেশ ও গণবিক্ষোভ, সাময়িক অসহযোগ, পিকেটিং, বয়কট, করবন্ধ, অহিংস আইন অমান্য, ব্যাপক ভাবে স্থানান্তরে গমন ও উপবাস ইত্যাদি হল গান্ধীজীর অস্ত্রশালার আয়ুধ।

আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী রূপে গান্ধীজী যদিও বিশ্বাস করতেন যে, এমন একটা দিনের আবির্ভাব হবে যখন সংঘর্ষ বা হিংসার অস্তিত্ব থাকবে না, জগতের বাস্তববাদী হিসাবে তিনি স্বীকার করতেন যে, সংঘর্ষের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাসও করতেন যে, মানুষের বিকাশ হচ্ছে এবং তাই তার কর্তব্য হল যাতে প্রেম ও সৃষ্টির শক্তি বিদ্বেষ ও ধ্বংসের স্থান নেয় তা দেখা।

এইজন্য তিনি কেবল যুদ্ধ হিংসা ও ধ্বংস পরিহারের সীমাবদ্ধ লক্ষ্যেরও উর্ধ্বে ওঠেন না, যাবতীয় অন্যায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিধায়ক অহিংস প্রতিরোধের শরণ নেবার কথাও তিনি বলেন। অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই তিনি শান্তিবাদীদের কাছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ করে নিজ নিজ দেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়াস করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান সম্ভবপর? গান্ধীজীর লক্ষ্য নিছক যুদ্ধ পরিহার করা নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হল স্বার্থপরতা লোভ ও অপরের উপর নিষ্ঠুর শোষণবৃত্তিরূপী মানুষের হৃদয়স্থিত যুদ্ধের মূল ও বীজ নষ্ট করা। গান্ধীজীর অহিংসা বা প্রেম হল একটি বিধায়ক সক্রিয় শক্তি এবং যেখানেই অন্যায় বা অবিচার দেখা যাবে সেখানেই এর প্রয়োগ করা যেতে পারে। গান্ধীজীর অদ্বিতীয় অবদান হল অহিংসাকে এক সংগঠিত শক্তিরূপে গড়ে তোলা এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে হিংসারই মত শক্তিশালী অথচ ক্ষতিকারক নয়—উভয় পক্ষের কাছেই অপেক্ষাকৃত মর্যাদাজনক ও মহৎ এক যুদ্ধকৌশল ও পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের নীতি ও কর্মপদ্ধতি কেবল মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির মাধ্যম নয়। যাবতীয় অন্যায় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এর সহায়তায় এমন ব্যাপক ভাবে গণ-প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়, ইতিহাসে কেউ যার নজির পাবেন না।

মানুষের জীবন, স্বয়ং মানুষ ও তার সমাজ একটি প্রাণবন্ত অখণ্ড সত্তা—এক সুসংবদ্ধ জটিল বিকাশক্রম এবং নিত্যবিকাশশীল ও গতিমান এ। গান্ধীজীর প্রয়াস ছিল জীবনের সত্যের অনুসন্ধান—প্রেম শান্তি ও সম্প্রীতির উচ্চতর মূল্যবোধে অভিব্যক্তির সঠিক বিধানের আবিষ্কার। তাঁর এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হল এই যে, কেবল যুদ্ধ বন্ধ করলেই চূড়ান্ত প্রতিকার হবে না, যুদ্ধের কারণ—মানুষের হৃদয়স্থিত পাপের দূরীকরণ প্রয়োজন। অতএব উপদেশ ও আচরণের মাধ্যমে তিনি প্রেম ও অহিংস পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলে গেছেন যাতে ভবিষ্যতের মানবসমাজের প্রগতির পথ চিরতরে পরিষ্কার হয়। মানব জাতির বিকাশের পথে শান্তিবাদ থেকে পৃথক এই প্রেম অর্থাৎ অহিংসার মাধ্যমে তাঁর সত্যানুশীলনের নীতির তাই এক শাশ্বত ও অদ্বিতীয় মূল্য আছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদের যতটুকু অবদান তার জন্য গান্ধীজী এর গুণগ্রাহী হলেও তিনি বলবেন এইটুকুই যথেষ্ট নয়। প্রত্যুত এটা একটা বিচিত্র ব্যাপার যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শান্তিবাদীরা তাঁদের 'ফ্রেণ্ড' নামক পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বের সমর্থন ও

গান্ধীজীর বিরূপ সমালোচনা করতেন। অ্যামবুলেন্স-কর্মীরূপে গান্ধীজী যখন জুলু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তখনও তাঁরা তাঁর মধ্যে দোষ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্ম গান্ধীজী তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কেবল সম্পূর্ণ অসহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তিনি ভারতের ইংরেজ শাসনের পূর্ণ পাপ-প্রকৃতির কথা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সুতরাং অনুগত নাগরিক অথচ অস্ত্রচালনায় অনিচ্ছুক ব্যক্তিরূপে পূর্বেকার যুদ্ধগুলিতে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। গান্ধীজীর কৈফিয়তে কেউ সন্তুষ্ট হোন বা না হোন, ঐসব ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আচরণের সপক্ষে বিবেকসম্মত কারণ ছিল।

আজ অবশ্য এ-কথা খুবই স্পষ্ট যে, শান্তিবাদকে কোন ক্রমেই একটি দর্শন বা জীবন-পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া যায় না। গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহের জনক তা অবশ্য একটি জীবন-পদ্ধতি এবং এতে বিভিন্ন যুগের অনুভূত অর্থে সত্যের প্রতি অসীম গুরুত্ব দেওয়া হয় ও প্রেম বা অহিংসাকে জীবনের সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সাধন বিবেচনা করা হয়। গান্ধীজীর দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী বিষয় হল এই যে, উপায়ের শুদ্ধতার প্রতি আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ। গান্ধীজীর অহিংসা এমন একটি নীতি যা সমগ্র জীবন ও তাবৎ সমস্যার প্রতি প্রয়োগ করা যায়। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, যুদ্ধকে গান্ধীজী কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা বলে মনে করতেন না। সমগ্র জীবনের সমস্যার এটি একটি অঙ্গ এবং তাই এই হিসাবেই এর সমাধান করা উচিত এবং সম্ভবও। এক্ষেত্রে গান্ধীজী এক প্রগতিশীল মানবসমাজের কল্পনা করেছিলেন এবং সত্বর এই আদর্শে উপনীত হবার জন্য তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের পদ্ধতিকে নিখুঁত করে গড়ে তুলেছিলেন।

গান্ধীজী ও মানবের মুক্তি

উ. ন. ঢেবর

দোসরা অক্টোবরকে আত্মোৎসর্গের দিন মনে করার মতই সর্বসাধারণের আনন্দ-উৎসবের দিন রূপে বিবেচনা করার অধিকারও মানব-পরিবারের আছে। গান্ধীজীর মৃত্যু যেমন এই সত্যের দ্যোতক যে মানব-সমাজকে তার দ্রষ্টা পুরুষদের বোধির বিষয়মুখীতার এখনও আত্তীকরণ করতে হবে, তেমনি তাঁর জন্মলাভ করাও মানব-পরিবারের শিরা ও রক্তে এখনও যে মানবতা ও প্রাণবত্তা সঞ্চারমান তার নিদর্শন।

গান্ধীজী সাবালক হয়ে ওঠেন সেই সময় যখন ভারতবর্ষ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ প্রাপ্ত আঘাত জনিত ক্ষত অবলেহন করছিল। দেশের চতুর্দিকে শান্তি বিরাজিত ছিল—তবে সে শান্তি শ্মশানের। প্রয়োজন হলেই ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে রাজানুগত গোষ্ঠীদের ইংরেজ শাসকদের অঙ্গুলি হেলনে ভারতীয় চিন্তা-জগতের নেতা বলে লোক সমক্ষে হাজির করা হত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক হিসাবে একটি শক্তিতে পরিগণিত হতে কংগ্রেসের আরও বহু বছর সময় লেগেছে।

সে সময় মনে হত ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে ব্রিটেনের উপর এবং ভিক্টোরীয়ান উদারনীতির পরিবেশে প্রভাবিত তদানীন্তন ব্রিটেন তখন খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে। কার্ল মার্কস ইতিমধ্যেই তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন যাতে বিশ্বের সর্বহারাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ের সাধন বলপ্রয়োগে দখল করতে আহ্বান জানান হয়েছে। অবশ্য তখনও এ মতবাদ কোথাও কার্যকরী হয় নি। একান্তে থাকার নীতি গ্রহণ করে আমেরিকা তখন "যন্ত্রশিল্পের এক ম্যামথ" গড়ে তুলছে পরবর্তী কালে যা তাকে বিশ্বের জাতিসমূহের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত করেছে। ইউরোপ শিল্পায়নের প্রয়াস করলেও ব্রিটেনের উচ্চাঙ্গের কূটনৈতিক তৎপরতার জন্য সে দেশের সঙ্গে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হচ্ছে। যে রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে শ্বেতকায় জাতিদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ধূলিসাৎ হয় এবং চিরকালের জন্য রাশিয়ার রোমানভদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, তা আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা।

দেশ ও বিদেশের এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারীর ডিগ্রী পাবার পর জনৈক তরুণ গুজরাতী বেনিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা একজন ভারতীয় মক্কেলের একটি মামলা হাতে পেলেন। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল ব্রিটীশ উপনিবেশ। জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণ করবেন বলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর রেলকামরা থেকে জবরদস্তি করে বহিষ্কৃত করা হল, জনৈক শ্বেতাঙ্গ বসবেন বলে তাঁকে প্রহার করে ঘোড়ার গাড়ীর আসন থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল এবং জনৈক কালা আদমি ফুটপাথ দিয়ে তাঁর আগে আগে চলেছেন—এ দৃশ্য কোন এক শ্বেতাঙ্গের পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় ফুটপাথ থেকে তাঁকে পদাঘাতে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে তরুণ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আঘাত পেলেন এবং এই আঘাতের ফলে মূলতঃ ভীরু ও বিচলিত প্রকৃতির একজনের বহু সুপ্ত গুণাবলী জেগে উঠল। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে প্রতিবাদ, পরে একটি আন্দোলন ও সর্বশেষে প্রতিরোধ সংগঠিত করার প্রয়াস তিনি করেন।

গান্ধীজী দেখতে পেলেন যে অন্য ব্যাপারে স্বাভাবিক হলেও শ্বেতাঙ্গরা স্বীয় জাতি-গরিমার কারণ গর্ব ও অহংকারে ডগমগ, তাঁদের প্রবল বিশ্বাস এই যে গায়ের চামড়ার রঙ ও দেহের আকৃতি-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠতর জাতি ও সংস্কৃতির প্রতীক হবার চূড়ান্ত প্রমাণ। অত্যন্ত অস্বস্তি সহকারে তিনি লক্ষ্য করলেন যে জীবন এখানে যেভাবে অভিব্যক্ত তাতে শ্বেতাঙ্গদের স্থান সবই উচ্চে এবং কালাদের বিধিলিপি হীনাবস্থা স্বীকার করে নেওয়া।

আর এই সব শ্বেতাঙ্গদের পিছনে ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেয়নেট যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণ যার দ্বারা বিজিত দেশের কাছ থেকে আথিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ বিন্দুটুকু সুবিধা নিংড়ে আদায় করা যায়। ভারতবর্ষ ছিল এই ব্যবস্থার শোচনীয়তম শিকার। এক প্রাচীন সভ্যতাকে এমন ভাবে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল যে সেদেশের জনসাধারণ নিজ গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণা হারিয়ে ফেলেছিল। ইংরেজ জনসাধারণের ভিতর সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও অসহায় আত্মসমর্পণের ভাব সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এই সব দিক সম্বন্ধে অবহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী শেলি রাস্কিন থোরো ও টলস্টয়ের রচনাবলীর পরিচয়লাভ করলেন। এঁদের রচনা থেকে তিনি এমন কিছু পেলেন যা তাঁর ধর্ম সংস্কৃতি ও পিতামাতার শিক্ষারই প্রতিফলন।

নিজ চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ রূপে গ্রথিত করে দেশবাসীর সম্মুখে আপন মতবাদের এক রূপরেখা উপস্থিত করার তাঁর প্রথম প্রয়াস হল "হিন্দ স্বরাজ"। তাঁর মনের দিগন্ত প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন তাঁর অভিজ্ঞতাও পরিপুষ্টি লাভ করতে লাগল তেমনি তেমনি তিনি এই রূপরেখার অদল বদল করতে লাগলেন। এই ভাবে এই রূপরেখার যথেষ্ট পরিবর্তন হল। তবে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর বুনিয়াদ ও মূলতত্ত্ব ছিল অপরিবর্তিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের পর ভারতে তাঁর সংগ্রাম শুরু হল এবং এর পরিণামে বিশ্ব অন্যায় অবিচার ও পাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে রুখে দাঁড়াবার এমন এক অভিনব পদ্ধতির সন্ধান পেল যা ছিল মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত। অন্যান্য বহু বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মানুষের মতভেদ ঘটতে পারে ; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে অহিংস উপায়ে নিজ অভিযোগের প্রতিবিধানার্থ নিরস্ত্র জনসাধারণকে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর অবদানের তুলনা ইতিহাসে নেই।

গান্ধীজীর চিন্তাধারার মূল সম্বন্ধে এবার বিবেচনা করা যাক। গোঁড়া সনাতনী পরিবেশে গান্ধীজীর জন্ম হওয়ায় অবশ্যই তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে সে প্রভাব পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত নয়। পাশ্চাত্য পরিবেশে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ভিক্টোরিয়ান উদারনীতির আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠায় তিনি এর সর্বসামান্য মানবীয় নীতিসমূহ স্বীকার করে নেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি, যেমন করেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ফেবিয়ান মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন। উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জৈন সাধুপুরুষ রাজচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অবশ্যই তিনি তাঁর উপদেশাবলী থেকে অনুপ্রাণিত হন—কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন। বাইবেলের উপর তাঁর অনুরাগ জন্মাল এবং তার থেকেও বেশী অনুরাগ সৃষ্টি হল গীতার উপর। সক্রিয় অহিংসার এক সক্রিয় দর্শনের উদ্ভাবন তিনি করলেন এবং এ অহিংসা হিংসাত্মক যুদ্ধ ও প্রচলিত শান্তিবাদের থেকে পৃথক। সেকালে প্রচলিত বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত ; কিন্তু এর ভিত্তিভূমি তাঁর স্বকীয়।

প্রতিভা বা সর্জনাত্মক আবেগ কিংবা বিচার-বুদ্ধি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি রক্ত বা গাত্রচর্মের কোন সীমাবন্ধন স্বীকার করে না। অবশ্য বর্ণবৈষম্যের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া নিছক সাংবিধানিক সমানাধিকার প্রাপ্তির

লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এক ভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার জন্য গান্ধীজী সংগ্রাম করেছিলেন। মানুষ মাংস অস্থি রক্ত বা ত্বকেরও অধিক। "মানুষের" "মানবীয় দিকটির" উপর জোর দেওয়া ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য এবং তার বহিরাবরণের থেকে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ কর্তব্য সাধনের পর ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধীজী প্রায় এক দুঃসাধ্য পরিস্থিতির মুখোমুখী হলেন। এখানে তিনি দেখতে পেলেন জড়তার কবলিত অগণিত জনসাধারণ—সংখ্যায় যারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় —হাত পা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই বদ্ধ জলাশয়ের মত। এর চেয়েও বড় কথা এই যে গান্ধীজী যখন ভারতের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে পথ করার চেষ্টা করছিলেন তখন লক্ষ্য করলেন যে এই সব জঘন্য ব্যাপারের কতকগুলির পিছনে রাষ্ট্রের, কতকগুলির পিছনে সমাজ ও অপর কতকগুলির পিছনে আবার ধর্মের সমর্থন রয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল ভারতীয় নারীদের সমস্যা যারা প্রায় অস্থাবর সম্পত্তির পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী। এ ছাড়া ছিল অস্পৃশ্যতার সমস্যা। এ ব্যাপারে হিন্দুধর্ম ছিল নিজের ও মানব-সমাজের প্রতি জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ছিল পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই ধর্মান্ধ সম্প্রদায় ধর্মকে স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বেদীমূলে পদানত করার ব্যাপারে সমভাবে দায়ী ছিল। সরকার আবার এই ভেদভাবকে উস্কানী দিত। আর্থিক দিকে ছিল গভীর মূল দারিদ্র্য ও সর্বব্যাপক শোষণের সমস্যা। এর মূলে ছিল অচিন্তনীয় সামন্ততন্ত্র ও অসাধু ব্যবসায়ীবর্গ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী আধিপত্যের সমস্যা তো ছিলই। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল এক সর্বব্যাপক সংগ্রাম। তাই এর প্রতিকারের পন্থারও সর্বাত্মক হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

গান্ধীজীর মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম ছিল মানুষ হিসাবে তার চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সংগ্রামেরই একটা অংশ। তিনি চেয়েছিলেন যে বর্ণবৈষম্য ও উপনিবেশবাদের শিকার মানুষেরা এমন এক বিধায়ক জীবন-দর্শনের ছত্রছায়ায় এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যার পরিণামে মানব-চরিত্রের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে গান্ধীজীর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে তাঁর সংগ্রাম-

পরিকল্পনা হিংসার ভিত্তিতে রচিত বা পরিচালিত হতে পারে না। এই সত্যও গান্ধীজীর দৃষ্টি এড়ায় নি যে ইউরোপ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিবেকশীল মানুষেরাও নিজেদের সমাজের গতি-প্রকৃতিতে সুখী বোধ করছিলেন না। তাঁদের নেতৃত্বে যে প্রথা গড়ে উঠেছিল তার আওতায় পঁচিশ বছর অন্তর এক এক বার নিজ দেশের ফুলের মত যুবক-সমাজকে ডালি দিতে হচ্ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে ঘটছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতি।

অন্তরের অন্তস্থলে তিনি তাই নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন জগত-জোড়া মানুষের আশা-আকাজ্ক্ষা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে কি ভাবে মানুষ তার চিরকাম্য মানবতা এবং সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার বিশেষ মানবীয় গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃতি-মাতার স্বাভাবিক সৃষ্টি মানুষ এক কৃত্রিম বস্তুতে পরিণত হচ্ছে এবং এই ভাবে তিলে তিলে তার নিজের সত্যকার রাজত্ব হারাচ্ছে।

বহু দিক থেকে মানুষ আপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সমতুল্য হলেও তার ভিতর এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা বিশ্ব-বিধানের ভিতর মানুষ হিসাবে তার বিশেষ ভূমিকার দ্যোতক। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। এর কারণ মানুষ বিশ্ব-বিধানে চৈতন্যশীল অংশীদারের মত ভাগ নিতে পারে। যে সমস্ত বস্তু বা প্রাণীর সংস্পর্শে সে আসে তাদের সম্বন্ধে মানুষ নিজ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে। এবং এই বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা যে কোন পরিস্থিতি ও স্বয়ং নিজের উপরও মানুষ কর্তৃত্ব করতে পারে। চৈতন্যশীল জীব হিসাবে ক্রমাগত সে নূতন ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার খোঁজ করে বেড়ায় এবং এসব তাকে আবার নিত্য নব নব ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। সময় সময় এই সব অন্বেষণ-প্রেরণা সমান্তরাল ভাবে চলে কখনও বা চলে পরস্পর বিরোধী দিশায়—কিন্তু তারা চির চলমান। নূতন ভাবধারা এসে হয় অপর ভাবধারার পরিপূরক অথবা প্রচলিত ভাবধারার সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ ঘটায়। নূতন অভিজ্ঞতা অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে। নিত্য নূতন জিনিস সৃষ্টির ফলে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই হতে পারে। তবে এসবেরই মাঝে প্রকৃতি-মাতার প্রধান মাধ্যম মানুষ—যে চৈতন্যশক্তির অধিকারী এবং বিচার-বিবেচনা করা ও সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করার ক্ষমতা যুক্ত—বেঁচে থাকে, তার অভিব্যক্তি (evolution) ও বিকাশ ঘটে।

মানুষ না থাকলেও প্রকৃতি ক্রিয়াশীল থাকবে। তবে তখনও প্রকৃতির এই ক্রিয়াশীলতা থেকে অনুপ্রাণিত হবার মত অথবা একদিকে সৃষ্টির ব্যাপকতা ও অন্যদিকে তার খুঁটিনাটিরও বিস্ময়কর নির্ভুলতা দেখে প্রভাবিত হবার মত কেউ থাকবে কিনা সেটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। গোলাপ তখনও ফুটবে; তবে তার সুগন্ধে ও বর্ণবৈভবে মাতোয়ারা হবার মত কেউ থাকবে না। পাথর লোহা বা কাঠ তখনও থাকবে, তবে এমন কেউ থাকবে না যে এক টুকরো লোহা থেকে আগুন জালাবার চক্‌মকি তৈরি করতে পারে, কাঠের টুকুরো থেকে হাতল বানাতে পারে অথবা এক-টুকরো পাথর কুঁদে এমন এক অনুপম শিল্পকৃতি সৃষ্টি করে যা সকলেরই প্রশংসাধন্য হয়। অন্যান্য জীব তখনও থাকবে। তবে তাদের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করে কেউ আর তাদের বাড়ীতে পুষবে না। আজও মানুষ প্রকৃতির কাঁচা মালকে পাকা মালে রূপান্তরিত করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম।

"প্রকৃতির সব কিছুই প্রধান, একমাত্র মানুষই অপ্রধান"—এটা মানুষের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন নয়। কারণ এই অপ্রধানতা বা হীনতা মানুষের গঠনের কোন মৌলিক ত্রুটির কারণ নয়। মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে থেকে এর উদ্ভব। জীব-জন্তুদের মত কেবল আহার তৃষ্ণা নিবারণ ও যৌন-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নি। এমন এক ধরনের কাজে মানুষ বিশেষজ্ঞ যা একমাত্র সে-ই পারে। কাজটি হল প্রকৃতির অনুশীলন, এবং এর পরিবর্তন, রূপান্তর ও রূপদান—প্রকৃতির আস্বাদন, প্রশংসা ও উপভোগ এবং পরিশেষে এমন সব জিনিস রেখে যাওয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যার ব্যবহার রসাস্বাদন ও উপভোগ করতে পারবে। গান্ধীজী মনে করতেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে প্রথার প্রবর্তন করছে মানুষকে তা প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ তার কার্যকলাপের সচেতন অংশভাগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। কারণ পশ্চিমের প্রথার ফলে মানুষের সর্জনাত্মক প্রয়োগ বহুধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে মানুষ আর বিচারক ও স্রষ্টা হিসাবে তার দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

মানুষের অপর একটি শক্তি বিদ্যমান। ক্রমাগত তাকে বিশ্বের অন্যান্য মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে লেনদেন করতে হচ্ছে এবং এইসব লেনদেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এই লেনদেনের সময় মানুষ এর সঙ্গে আবেগের একটা উপাদান যোগ করে। দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনের সময় মানুষ "পরিবার" নামে আখ্যাত একটি বুনিয়াদী সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। মানুষ কোন বস্তুকে

ভালবাসতে পারে আবার অপর এক বস্তুকে ঘৃণাও করতে পারে। এই সম্পর্কের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। একদা যে সব বস্তুর প্রতি সে উদাসীন ছিল পরবর্তীকালে তাদের পছন্দ করতে পারে বা ভালবাসতে পারে। আজকের বন্ধু কাল বিরোধী এমনকি শত্রুতেও পর্যবসিত হতে পারে। শত্রুরা গভীর সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে—এ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। লেনদেনের প্রতিটি পর্যায়ে শারীরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে একটা আবেগের উপাদান যুক্ত হয় যার পরিণামে কার্যটি গুণগত বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জল হয়ে ওঠে এবং এর পরিণামে মানুষে মানুষে ও মানুষে বস্তুতে বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভূমিকা রচিত হয়। এইসব সম্বন্ধ-বন্ধন শারীরিক সম্বন্ধের উর্ধ্বে ওঠে ও এই ভাবে একটা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়।

অতএব মানুষ নিছক ভৌতিক সত্তার উর্ধ্বে। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ পৃথক। প্রকৃতি তাকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। সে সর্জনশীল। নিজ স্থূল বা ভৌতিক কার্যকলাপের ভিতর সে আবেগের একটা উপাদান যোগ করতে পারে। ভালবাসার ক্ষমতা তার আছে। এই সব শক্তি মানুষ নির্বিচারে কাজে লাগাচ্ছে। তবে অধিকাংশ মানুষ এইসব ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষার পারিপূর্তির উদ্দেশ্যে অথবা দ্রুত ফললাভের আগ্রহে এর কথা বিস্মৃত হয়। এর পরিণামে তারা হিংসার শরণ নেয়। হিংসা কেবল ততক্ষণই কার্যকরী থাকে যতক্ষণ না উচ্চতর হিংসা এসে তাকে পরাভূত করছে। হিংসা অপরিহার্য ভাবে এমন সব জটিলতার সৃষ্টি করে, নূতন সমস্যা রূপে যাদের সমাধানে ব্রতী হতে হয়। লক্ষ্যে উপনীত হবার পর কেবল হিংসার দ্বারাই তার সংরক্ষণ করতে হয়। গান্ধীজী এমন একটা অস্ত্রের সন্ধানে ছিলেন যার দ্বারা এইসব জটিলতা পরিহার করে লক্ষ্য-সাধন সম্ভবপর। গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল তাই মানব-জাতির আত্মতুষ্টিপরায়ণতার বিরুদ্ধে এক আহ্বান স্বরূপ। এই আত্মতুষ্টি-বৃত্তি-সঞ্জাত শৈথিল্যের কারণ মানুষ আপোষ করে এসেছে। সুতরাং গান্ধীজীর সংগ্রাম মানবজাতির অস্তিত্বের আধার মূল্যবোধের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপরে যেসব কথার উল্লেখ করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে তা মানব-পরিবারের ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তাধারার অঙ্গ স্বরূপ। অবশ্য এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাঁর বিধায়ক (positive) দর্শনকে কেবল তিনি একটা মর্যাদাই দিলেন না, এর একটা বিধিবদ্ধ প্রণালীও আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা

এক সক্রিয় প্রাণবন্ত দর্শন রূপে ক্রিয়াশীল হওয়া এর পক্ষে সম্ভবপর হল। "সত্য ও অহিংসা" শব্দ দুটি পৃথিবীর পর্বতদের মতই প্রাচীন। এর সম্বন্ধে অগণিত স্ফীত-কলেবর গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। নিজের দর্শনের ব্যাখ্যা করার জন্য গান্ধীজী এই সব গ্রন্থকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি যা আবিষ্কার করেন তা রূপ নেয় তাঁর অন্তর্জ্ঞানের রাজ্যে। শাস্ত্রগ্রন্থ ও আপ্তবাক্য তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেছিল। তবে এসব কেবল তাঁর শব্দার্থ-প্রকাশিকার কাজই করে। তাঁর অন্তর্লোকে যে দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল তাকে বাঙ্ময় করার জন্য তিনি বাস্তবতার বিশ্বকে কাজে লাগান, বাস্তববাদী প্রক্রিয়ার এই দর্শন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং এ নিয়ে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে একে উত্তরোত্তর নিখুঁত করে গড়ে তোলেন।

গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বেও ভারতবর্ষের বহু মনীষী সম্যক চিন্তা ও আচরণের চূড়ান্ত পরিচয় স্বরূপ সত্যের মূল্যের কথা বলেছিলেন। তাঁর পূর্বে ভারতের অগণিত নর-নারী এই সত্যের প্রতিপাদন করার জন্য সত্যে দৃঢ় সংলগ্ন থেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। হরিশচন্দ্র প্রহ্লাদ প্রভৃতি এই জাতীয় মহাপুরুষদের নিদর্শন গান্ধীজী নিজ আদর্শ পুরুষ স্বরূপ পেশ করেন। অন্তরের অন্তস্তলে অবশ্য গান্ধীজী সত্যের প্রতিফলনকে একটা শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করেন এবং এইভাবে সত্যকে একটি শক্তি হিসাবে উপলব্ধি করার পর তিনি এই "সত্যের শক্তি" বা আত্মার শক্তিকে "পশু শক্তির" সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য তৈরি করলেন এবং ব্যাপক ভাবে এর প্রয়োগ করলেন। সত্য রক্ষার্থ এই ভাবে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করার নীতি মানব-জাতির ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। বিচারবুদ্ধির শক্তি সম্বন্ধে সচেতন মানুষ এযাবৎ কাল তার এই চেতনা ও শক্তিকে নিজের ভিতরকার পশুকে ক্রমাগত আহার জুগিয়ে শক্তিশালী করার কাজে লাগিয়েছে। এর পরিণামে মানুষের ভিতরের পশু তার সত্যস্বরূপকে পরাভূত করে অধিকতর বিকশিত হয়েছে। আবেগ ও সর্জনাত্মক প্রক্রিয়া নিচয়ের শক্তি এবং এদের অন্তরালে যে মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিহিত তার সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে গান্ধীজী পশুশক্তিকে পরাভূত করার জন্য এক প্রাণবন্ত অথচ করুণা ও পৌরুষমণ্ডিত সত্যের শক্তিকে সক্রিয় করে তুললেন।

সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সদাচার এসম্বন্ধে মনে মনে দৃঢ় প্রতীতি জাগার পর তিনি নিজের জীবনকে সত্য-নির্ভর করার জন্য আগুয়ান হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সত্য যে পরিমাণে অন্যায় আচরণের প্রতিরোধ করবে সেই পরিমাণেই তা

সদাচারের সাক্ষী হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে পারবে। এই ছিল তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বুনিয়াদ। অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি তাঁর মতে অবশ্যই দোষী কিন্তু এর কাছে নতি স্বীকারকারীও সমভাবে অপরাধী। দ্বিতীয়োক্তের কর্তব্য হল প্রতিরোধ করা।

তাছাড়া সত্যের শক্তিকে ব্যক্তও করতে হবে সত্য পন্থায়। যে কোন অবস্থায় সত্যকে তিনি যেভাবে দেখছেন বা অনুভব করছেন তাকে ব্যক্ত করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য সত্যের পূজারী কোন ছুতোনাতা খুঁজবেন না। অহিংসায় যদি তাঁর বিশ্বাসের অপ্রতুলতা অথবা এ ব্যাপারে যদি তাঁর শক্তির ন্যূনতা থাকে তাহলে অন্যভাবে নিজেকে ব্যক্ত করা তাঁর কর্তব্য। সত্যের পথে নিজ কর্তব্য করতে বিরত থাকা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। গান্ধীজীর কাছে কর্তব্যে ত্রুটি ছিল অভিসম্পাত স্বরূপ।

মানুষের বিশেষ ভূমিকারূপী একই উৎস থেকে প্রবাহিত এইসব মূল্যবোধের বিচার বিবেচনা করার পর তিনি অহিংসার প্রয়োজনীয়তারূপী অপর এক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গেলেন। মানুষ এবং তার ভিতর যে দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে তার মধ্যে গান্ধীজী পার্থক্য করলেন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের এই সব দুষ্ট প্রবৃত্তি বাইরে থেকে আরোপিত একটা ব্যাপার এবং হিংসার তুলনায় বরং অহিংসার প্রয়োগে একে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে সামলানো যায়। কারণ হিংসাশ্রিত প্রক্রিয়ার প্রয়োগে বহুবিধ নূতন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন এক বাস্তব আদর্শবাদী এবং দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে তিনি যেন হিংসার যবনিকার অন্তরালে কি আছে দেখতে পেতেন। হিংসার পরিণামে কিভাবে অসত্য ও হিংসার এক দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয় ও যে সমস্যার সমাধানে হিংসার প্রয়োগ এর ফলে তা কেমন আরও জটিল হয়ে উঠে এবং অবশেষে মানুষের অধোগতি ঘটে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

অসত্য ও হিংসাকে প্রতিরোধের জন্য যেখানে প্রয়োজন "সত্যের শক্তির" যথার্থ অভিব্যক্তি বা সত্যাগ্রহ এবং হিংসার তাৎপর্য পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি—এই হল মুদ্রার এক পিঠ। এর অপর দিক হল সংগ্রাম চলার সময়ও ন্যায়বিচারের পক্ষকে পুষ্ট করা। গঠনমূলক কর্মের এই হল ভিত্তি। এই ত্রিবিধ মূল নীতির উপর তিনি তাঁর জীবন-দর্শনকে গড়ে তুলেছিলেন। হিংসা কোন সমস্যার সমাধান করে না বলেই অহিংসা। অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে বলে সত্যাগ্রহ। ভাল ও ন্যায়সঙ্গত সব কিছুকে সাহায্য করতে হবে বলে গঠনমূলক কার্যক্রম।

সেই সত্য বা আত্মার শক্তির অভিপ্রকাশ তিনি নিজ জীবনে ভাস্বর করে তুলেছিলেন। এর প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে জনসাধারণের মনে তিনি এক অভিনব জাগৃতির সৃষ্টি করেছিলেন—ভারতবাসীদের ভিতর মানুষ হিসাবে নিজেদের মর্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে একটা নূতন চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের প্রধান পরিচালন-বল্গা একবার তাঁর করায়ত্ত হবার পর এবং ব্যক্তিগত উদাহরণ ও আত্মত্যাগের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার মূল্য সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবর্গকে সচেতন করার পর তাঁদের তিনি প্রভাবিত করতে সমর্থ হলেন। তাঁর মতে বর্ণবৈষম্য ও উপনিবেশ-বাদের বিপত্তি এবং সামাজিক ও আর্থিক শোষণ ছিল আধ্যাত্মিকতা রহিত সামাজিক কাঠামোর উপসর্গ। পশ্চিম এর যে জোড়াতালি দেওয়া সমাধান দেয় অথবা সাম্যবাদীরা যে নেতিবাচক সমাধান উপস্থাপিত করেন তা এর প্রতিকারের পথ নয়। এর প্রতিকারের পন্থা হল মনুষ্য হিসাবে মানুষের অপরিহার্য ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা জীবনযাত্রা পদ্ধতি আবিষ্কার করা। নিজের বিবেক ও ঈশ্বরের কাছে মানুষের যে অঙ্গীকার তার দায়িত্ব নিতে মানুষ অস্বীকার করছে বলেই মানবীয় বিভূতির এই ক্রমাগত অবক্ষয়।

ভারতবর্ষের জনসাধারণকে তিনি পূর্ণ এক পুরুষকাল ধরে সেই সত্য বা আত্মার শক্তি ভিত্তিক গণ-আন্দোলনের মূল নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর ফলে পশু-শক্তির প্রতীক ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিশাল সৌধই শুধু ধূলিসাৎ হয় নি, ভারতীয় সমাজের হৃদয়-মনকেও তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত করে-ছিলেন। চার্চিলের মত আর কেউ বোধহয় তাঁকে এত সম্মান জানান নি। ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকারের কার্যকলাপকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন যে তাঁদের জন্য গান্ধীজীর মত একজন অর্ধনগ্ন ফকির মহামান্য সম্রাটের সরকারের প্রতি-নিধিদের সঙ্গে সমান মর্যাদা সহকারে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন! দুটি শক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দণ্ডায়মান। এর একটি হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা সেই অর্ধনগ্ন ফকিরের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করছিল এবং অপরটি হল সাম্রাজ্যের আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তি যার পৃষ্ঠপোষকতা করছে ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্ত সামরিক শক্তি।

বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে তিনি মিথ্যাচারের সঙ্গেও যুদ্ধরত ছিলেন। এরই প্রক্রিয়ায় তিনি ভারতবর্ষের বিপুল নারী-সমাজকে পর্দা প্রথার অবরোধমুক্ত করলেন যাতে তাঁরা সমাজের ভিতরে বাইরে অসত্যের

বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলেছে, পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে তার দায়িত্ব বহন করতে পারেন। পাঁচ কোটি তথাকথিত অস্পৃশ্যকে তাঁদের মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে হিন্দুরা যে অন্যায় করছেন তার সম্বন্ধে তাঁদের তিনি সচেতন করে তুললেন। ভারতের কৃষক সমাজের ভিতর তিনি একটা নূতন আত্মবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করলেন। খদ্দর ও কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সপক্ষে প্রচার করে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে তিনি কারিগর শ্রেণীর আশার সঞ্চার করলেন। খাদি ও কুটিরশিল্পের উদ্দেশ্য ভারতের সেই সব কোটি কোটি অধিবাসীর হাতে কেবল এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহের জন্য কয়েকটি মুদ্রা দেওয়া নয়, দেশের সম্পদের উপর যাদের কোন অধিকারই নেই। এর আসল উদ্দেশ্য হল সর্বসাধারণের ভিতর শরীর শ্রমের প্রতি মর্যাদার ভাব সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কারিগর শ্রেণীকেও মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলা। খাদিকে তিনি করে তুলতে চেয়েছিলেন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

এই প্রয়াসের প্রভাবও বিপুল ভাবে অনুভূত হয়। ভারতের সংবিধান পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ জ্ঞান করা হয়। ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য এবং লক্ষ লক্ষ জমিদারী জায়গীরদারীর মাধ্যমে একই সামন্ততন্ত্রের সুবিশাল সৌধ বলতে গেলে কয়েক মাসের মধ্যেই ধূলিসাৎ হয় ও এর পরিণামে ছয় কোটি কৃষক পরিবার সামন্তবাদের কবল থেকে মুক্তি পায়।

মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সে সময় বুঝতে পারতেন যে দৈত্যকায় যন্ত্রের দ্বারা ভূরি প্রমাণ উৎপাদনের ফলে মানুষ তার সর্জনাত্মক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিষ্ক্রিয় উপভোক্তায় রূপান্তরিত হবে। মানুষের সৃষ্টি যন্ত্র মানুষকেই আবার যন্ত্রে পর্যবসিত করছিল। অভিধানে একটি নূতন শব্দ যুক্ত হল—"প্রয়োগ-বিস্তার অগ্রগতি" (technological development)। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত কুশলতার আর্থিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং এর দ্বারা অভাবনীয় সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা বিদ্যমান। শুধু এই জন্য শরীর ও মনের উৎপাদন-প্রয়াসকে দ্রুত বেগে হ্রদয়। শরীর ও মনের সম্মিলিত সর্জনাত্মক প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে মানুষকে যদি তার অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সর্জনাত্মক আনন্দের সন্তুষ্টির স্বাদও দিতে হয় তাহলে তার ও তার কাজের সঙ্গে যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন, তার প্রতি মহাত্মা গান্ধী নূতন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আর্থিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে সমাধান-সূত্র পেশ করেছিলেন শিক্ষিত সমাজের কাছে তা মনঃপূত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তাঁর নিদান অবিলম্বে আচরণীয় মনে হতে পারে আবার এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী থাকাও সম্ভবপর। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তিনি সেই সব সমাজ-বিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ যাঁরা সর্জনশীল শক্তি দিয়ে প্রকৃতি যেখানে মানুষকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে জীবনের সেই সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি থেকে যন্ত্র কর্তৃক মানুষকে উৎখাত করার বিপদ সম্বন্ধে অগ্রিম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বাস্তববাদী হিসাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রয়োগবিদ্যার বিকাশকে আটকে রাখা যাবে না। তবে তিনি চেয়েছিলেন যে প্রয়োগবিদ্যার এই বিকাশকে যেন মানুষের সর্জনাত্মক বৃত্তির পরিপূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে তিনি এক বিকেন্দ্রীত উৎপাদন পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য অন্যতম উচ্চ ও সুমহান মানবীয় বৃত্তির স্বীকৃতি দেওয়া হোক—এই ছিল তাঁর কাম্য।

এই অর্থে দোসরা অক্টোবর কেবল গান্ধীজীর জন্মদিন নয়। এই দিনটি নবীন প্রয়োগকৌশলে সমৃদ্ধ মানবজাতির সচেতন মনে একটি নূতন ভাবধারারও আবির্ভাব-দিবস। মানব-পরিবারকে বর্তমানে যে বিনষ্টির পথে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার সম্ভাব্য পন্থা হিসাবে ক্রমশঃ অধিকাধিক সংখ্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এই দিকে দৃষ্টিপাত করছেন।

মহাত্মা গান্ধী

হুমায়ুন কবির

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শত-বার্ষিকের উৎসবে আজ সমস্ত পৃথিবী যোগ দিয়েছে। শুধু বর্তমান যুগ বলে নয়, বোধ হয় কোন যুগেই পরাধীন দেশের একটি মানুষ নিজের জীবদ্দশায় এভাবে সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন নি। তাঁর আহ্বানে পৃথিবীর মন কেন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গান্ধীর প্রধান অবদান তাঁর অভয়বাণী। জড়তা ও তামসে যেদিন এদেশের জনমানস নির্জীব ও ক্লীব, সেদিন গান্ধীর কণ্ঠে অভয়বাণী উদাত্ত সুরে বেজে উঠেছিল। স্তরে স্তরে তিনি সাধারণ মানুষের ভয় ভেঙেছেন। কারাগার ও রাজরোষের ভয় ১৯২০ সালের পরেই কমে এসেছিল, ১৯৩০ সালের পরে তিনি ধনমানবিত্ত নাশের ভয় দূর করতে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। ১৯৪২ সালে এল চরম আহ্বান—জীবনের মায়া এবং মৃত্যুভয় বর্জন করে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিল। একবার যখন জাতির মোহ ভেঙে গেল, ভয়কে জাতি পরিহার করতে শিখল, তখন যে দেশ স্বাধীন হবে, তাতে বিচিত্র কি?

ভারতবর্ষের জন্য গান্ধীজির সব চেয়ে বড় দান অভয়বাণী। বিশ্বমানবের কাছে গান্ধীর ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য মৈত্রী ও সহযোগিতার আহ্বান। দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হিংসা জর্জরিত মানুষকে তিনি বললেন যে, হিংসার পথে মুক্তি নাই, তরবারি যারা গ্রহণ করবে তরবারির আঘাতেই তারা বিনষ্ট হবে। বিশেষ করে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক যুগে যে সব মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ব্যবহার হলে আর বিজেতা বিজিতের পার্থক্য থাকবে না, রাবণের চেয়েও অনির্বাণ চিতায় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই সহমরণে শেষ হয়ে যাবে।

কেবলমাত্র সাবধান বাণী উচ্চারণ করেই, গান্ধীজি সন্তুষ্ট থাকেন নি, তাঁর প্রধান কৃতিত্ব যে যুদ্ধের পরিবর্তে দ্বন্দ্বসমাধানের অন্য পথের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। বুদ্ধির পথে, যুক্তির পথে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব নিরসনের যে অস্ত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠল, তার জন্য যতদিন মানুষ বাঁচবে, গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

গান্ধীজির জীবনেও ব্যর্থতা ছিল—মানুষ কোনোদিন অকলঙ্ক হতে পারে না এবং সেই দুর্বলতার গ্লানি বিজয়ের মুহূর্তেও আমাদের আনন্দকে নিষ্প্রভ করে দেয়। গান্ধী পৃথিবীর মানুষকে বুদ্ধির পথে যুক্তির পথে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে আহ্বান করলেন, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে বহুবার বুদ্ধির পথ ছেড়ে আবেগ ও বিশ্বাসকে বড় করে তুলেছেন। হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান যে তিনি করতে পারেন নি, বরং সে সমস্যাকে আরো জটিল করে অবশেষে দেশ-বিভাগের দায়িত্বও অন্তত আংশিকভাবে নিলেন। গান্ধীর জীবনে এই বোধ হয় সব চেয়ে বড় পরাজয়।

এ পরাজয়ের বীজ কিন্তু গান্ধীর নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল। গান্ধীজির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনীতির ধারা প্রধানত বুদ্ধিজীবীর হাতে, তাঁরা যুক্তিতর্ক বিচারের পথে ধীরে অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারই মধ্যে অকস্মাৎ গান্ধীর আগমনে স্রোত উদ্‌বেল হয়ে উঠল, মরা নদীতে বান ডাকল। কিন্তু সে বন্যাস্রোতে অনেক গ্লানি, অনেক আবর্জনার সঙ্গে যুক্তি-প্রধান রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীও ভেসে গেল। ১৯২০ সালের পূর্বের জিন্নাসাহেবের আর যত অপরাধই থাক, তাঁর মতন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেকালে এদেশে খুবই কম ছিলেন। গান্ধী যখন খেলাফৎ আন্দোলনের জোড়াতালি দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের দিকে টানলেন, তখন জিন্না সাবধান করেছিলেন যে একবার যদি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠে, তবে পরে আর তাকে রোধ করা যাবে না। গান্ধী সে কথা শুনলেন না। খেলাফতের ভিত্তিতে মুসলমানকে টানলেন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের চিরকালের সংস্কারকে পুনরুজ্জীবিত করে হিন্দুজনতার বিরাট অংশকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলেন।

রাজনৈতিক স্রোত যতদিন তীব্র ও গতিশীল, ততদিন এ যুগ্ম ধর্মচেতনার উদ্‌বোধনে যে বিপদ তা কারু চোখে ধরা পড়ে নি। চৌরিচৌরার পরে গান্ধীজি যে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন, এটাও যেমন তাঁর স্বধর্ম, সে প্রত্যাহারের ফলে যে দেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, তাও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে সমান স্বাভাবিক। জিন্না কংগ্রেস থেকে বিচ্যুত হলেন কিন্তু তখনও তাঁর মতন জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষে বিরল। যতদিন জিন্না যুক্তি ও বুদ্ধির পথে চলেছেন, গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেস তাঁর কথায় কান দেয় নি। যেদিন জিন্না স্বধর্মচ্যুত হয়ে আবেগ আন্দোলনের পথে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, সেদিন কংগ্রেস তাঁর কাছে প্রায় আত্ম-

সমর্পণ করে বসেছিল। লগ্ন কিন্তু তখন পার হয়ে গিয়েছে, ভাঙা হাট আর বসল না, জিন্নাসাহেবও পাকিস্তান সৃষ্টি করে জীবনে চরম পরাজয় মানলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি গান্ধীজির জীবনেও চরম পরাজয়। তিনি বার বার বলেছিলেন যে পাকিস্তান স্থাপনা শুধু রাজনৈতিক ভুল নয়, নৈতিক পাপ। আরও বলেছিলেন যে যদি একজনও তাঁকে সমর্থন না করে, তিনি একা ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে লড়বেন—একমাত্র তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে। কার্যকালে কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। ১৯৩২ সালে জীবনপণ করে হিন্দুসমাজের বিভাগ তিনি রোধ করেছিলেন—এবার ভারত বিভাগের যুগসন্ধিক্ষণে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর কাছে বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে মনের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য স্বাধীনতা দিবসে তিনি কলকাতায় বসে রইলেন।

পরাজয়ের পরমুহূর্তেই কিন্তু গান্ধীজির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব আরো দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। নিভন্ত বাতি যেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে, অস্তায়মান সূর্যের কিরণে পৃথিবী যেমন ভাস্বর মায়াময় হয়ে উঠে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে গান্ধীজির জীবনও অপরূপ মহিমায় দ্যুতিমান হয়ে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যেদিন গান্ধী ভারতবর্ষে আসেন, তার পরে বার বার নানা সংগ্রামে তাঁর জয় হয়েছে, কিন্তু ভারতবিভাগের পরে আত্মিক যে সংগ্রামে তিনি নিজেকে ঢেলে দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার বেশী তুলনা মিলবে না। সেদিন হিংসায় উন্মত্ত ভারতবর্ষ, মানুষ তার মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে পশুর অধম কার্যকলাপে বিভ্রান্ত, সে নিরন্ধ্র অন্ধকারে কোথাও যেন বিন্দুমাত্র আশার আলোক নাই। মানবতার সেই দুর্দিনে গান্ধীর কণ্ঠে প্রেমের বাণী, অহিংসার বাণী, সহযোগের বাণী মন্দ্রিত হয়ে উঠল। অন্ধকারের যারা দাস তারা সে আলোক সহ্য করতে পারল না। নিষ্ঠুর আঘাতে গান্ধীর মরজীবন শেষ করে দিল। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তেও গান্ধীর কণ্ঠে অমৃতের বাণী, মানবতার আশ্বাস। হিংসাকে জয় করে সেদিন গান্ধীর যে অমরযাত্রা, ক্ষণিক পরাজয়ের কালিমাকে দূর করে চির-বিজয়ের যে ভাস্বর দীপ্তি, তারই স্মৃতিকে পাথেয় করে যদি পাকিস্তান ও ভারতের মানুষ চলেন, তবেই তাঁদের কল্যাণ।

গান্ধীজী ও ভারত বিভাগ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

কংগ্রেস বরাবরই ভারতের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিল। কংগ্রেসের সৃষ্টির আগে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় জাতীয়তা প্রচার করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কংগ্রেসের জন্ম হতেই কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তার পোষক ও ধারক রূপে কাজ আরম্ভ করে। পরবর্তী যুগে কংগ্রেস যতই উদ্যোগী ও অগ্রসী (energetic and aggressive) হয় ততই ভারতীয় জাতির ঐক্যে তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। গান্ধীজীও ভারতের ঐক্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও কংগ্রেস ও গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ মেনে নিলেন। কেন? কোন্ অবস্থার চাপে পড়ে, এমন একটা মৌলিক বিষয়ে গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের মত পরিবর্তন করতে হল—তা-ই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা হবে। বিষয়টি জটিল ও বিস্তৃত; একটা ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব নয়।

ভারত বিভাগের কয়েক বছর পূর্বেও কেউ ভাবেনি যে স্বাধীনতা লাভের মূল্য স্বরূপ ভারতকে বিভক্ত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরা কতকটা প্রথম হতে বলা দরকার। মুসলমানদের পৃথক সত্তা ও স্বার্থ প্রথমে স্বীকার করা হয়—১৯০৮ অব্দের মিণ্টো-মরলি-শাসন সংস্কারে (Minto-Morley Reforms)। এর বীজ বপন করা হয়েছিল আলিগড় কলেজে। পর পর তিনটি ইংরাজ অধ্যক্ষ ওখানে বসে এ তত্ত্বই প্রচার করেছেন যে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের কোন দিক দিয়েই মিল হতে পারে না। অপর দিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের (Renaissance) সব আন্দোলনেই ছিল হিন্দু সংস্কার ও ঐতিহ্য ঘেঁষা। এর মধ্যে রামমোহন ছিলেন সবচেয়ে সমন্বয় মনোভাবের। তবুও তাঁর সমাজসংস্কার বা ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার পিছনে মূল কথা ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মকে বাইরের আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখা এবং আধুনিক ভাবাপন্ন করা। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—সবারই লক্ষ্য হল হিন্দু সমাজ। জাতীয় আন্দোলনের সময়, রাণা প্রতাপ, শিবাজী বা বাংলার প্রতাপাদিত্যকে যখন আমরা জাতীয়তার প্রতীক বলে দাঁড় করিয়েছিলাম, তখন ভেবে দেখিনি—মুসলমানদের মনে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। তার পর ইংরাজ সরকার মুসলমানদের মনে একটা পৃথক সত্তার

বোধ ক্রমেই জাগিয়ে তুলেছিল। যতই জাতীয় আন্দোলন জোরদার হতে লাগল, যতই শাসনভার ভারতীদের হাতে আসতে লাগল—ততই মুসলমানদের মনে আশঙ্কা জাগানো হল—পুতুল-উপাসক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধীনতায় তারা আসছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে আচরণিক পার্থক্য ছিল, তা ঘুচাবার কোন চেষ্টাও হয়নি।

এই অবস্থায় ১৯৩৩ অব্দে বিলাতের কেমব্রিজ হতে চৌধুরী রহমত আলি নামে এক ভারতীয় যুবক কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। অনেকে মনে করে তৎকালীন ভারত-সচিবের (Secretary of State for India) উৎসাহ ও উসকানী এর পিছনে ছিল। ঐ সব পুস্তিকায় তিনি পাকিস্তান দাবি করেন; —ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে পৃথক ও স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং তারই নাম হবে পাকিস্তান। বাংলার উপর কোন দাবি এতে করা হয়নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তখন ঐ-সব পুস্তিকা বিশেষ মর্যাদা পায়নি; বাস্তবতার দিক থেকে কোন মূল্যই প্রায় কেউ এতে দেয়নি। ১৯৩৮ অব্দে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল দাবি করেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হোক। এতে তিনি পাকিস্তান শব্দ প্রয়োগ করেননি। যে কবি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত—"সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা"—সেই কবি হিন্দুস্থান বিভাগের কথা বললেন! কেন? কিছুদিন পর বিলাতে তাঁর এক বন্ধুকে (Edward Thompson) তিনি লিখেছিলেন - লীগের সভাপতি হিসাবে লীগের দাবি তাঁকে বলতে হয়েছে; কিন্তু তিনি জানেন যে, ভারত বিভাগ সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে—ব্রিটিশ সরকার, ভারতবর্ষ এবং এমনকি মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। (disastrous to the British Government, disastrous to India & disastrous to the Muslim Community).

১৯৩৭ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ কোনও সুবিধা করতে পারেনি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ খান সাহেব—কংগ্রেসের; সিন্ধুতে এলেন স্যার গোলাম হোসেন হিদায়ৎউল্লা—লীগ-বিরোধী; পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির (Unionist Party) নেতা সেকেন্দার হায়াৎ খান হলেন মুখ্যমন্ত্রী; এবং বাংলাদেশে কৃষক-প্রজা পার্টি জয়ী হল ও মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফজলুল হক।

এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল; কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করল। সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ ক্রমেই প্রকট হতে লাগল। লীগ এর সুযোগ নিতে কসুর করল না। বাংলার হকসাহেব ইতিমধ্যে লীগে যোগ দিয়েছেন। এর জন্য বাংলার নেতৃবর্গের ভুল-ত্রুটি কতটা দায়ী, ইতিহাস একদিন তার বিচার করবে। বাংলার নেতৃস্থানীয়—একজন তখন বলেছিলেন—মীরজাফরের পর বাংলার এত বড় শত্রুতা আর কেউ করেনি, যা আজ করে এলাম হকসাহেব ও নাজিমুদ্দিনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে।

১৯৪০ অব্দে লাহোরে লীগের অধিবেশন। জিন্নাসাহেব সভাপতি, এবং হকসাহেব সকলের চেয়ে বড় আসন অধিকার করলেন। জিন্নাসাহেব তাঁর ভাষণে তীব্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন—হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে কোন মিল নেই;—কোন ভাবগত ঐক্য নেই—দু'টা আলাদা জাতি; এক সম্প্রদায়ের কাছে যিনি বরেণ্য বীর, অপর সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ঘৃণ্য শত্রু (very often the hero of one is the foe of the other)। হিন্দুর কাছে শিবাজী বরেণ্য বীর; মুসলমানদের কাছে তিনি শত্রু; তেমনি ঔরঙ্গজীব মুসলমানদের নিকট সম্মানিত সম্রাট; হিন্দুর মনে তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা। হকসাহেব ঐ সম্মেলনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাতে বলা হয় ভারতের পূর্বপ্রান্তের ও উত্তর প্রান্তের মুসলমান প্রধান প্রদেশ সমূহকে নিয়ে স্বাধীন দু'টি রাষ্ট্র করা হোক। এই প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি এবং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল দু'টিকে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি ছিল। ইংরাজীতে শব্দ ছিল independent states—বহুবচন;—পূর্ব ও পশ্চিল অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র হবে সে দাবি ছিল না।

এটা ইতিহাসের বিদ্রূপ বা ভাগ্যের গঞ্জনা—যে-দু'জন নেতা এ দাবির পিছনে ছিলেন, সমস্ত জীবন তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছেন এবং জাতীয়তার সাধনা করেছেন। জিন্নাসাহেব চিরকাল ছিলেন ধর্মের বিষয়ে উদাসীন; মুসলমান ধর্মের কোন বিধি-নিষেধ তিনি জীবনে বা আচরণে মানেননি। হকসাহেবের উদারতার কথা আজও বাঙ্গালী ভোলেনি। তাঁরাই হলেন পাকিস্তান দাবির বা মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার দাবির মুখপাত্র। এ পর্যন্ত গেল পটভূমিকা।

এর কিছুদিন পর হতে কংগ্রেসের মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্য

গান্ধীজী দেশকে তৈরি করতে লাগলেন। ১৯৪১ অব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল ; সব কংগ্রেস নেতারা জেলে অবরুদ্ধ হলেন। যুদ্ধের উগ্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগল—যখন হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করলেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর হতে আবার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিলাভ শুরু হয়। জাপান দ্রুত গতিতে একটার পর একটা দেশ জয় করে ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এই সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও চীনের রাষ্ট্রপতি চাঙ্-কাই-সেক ব্রিটেনের উপর চাপ দিচ্ছিলেন—যুদ্ধে ভারতের অর্থাৎ কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়া দরকার। ১৯৪২ অব্দের মার্চ মাসে ক্রিপস্ (Sir Stafford Cripps) ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। সরকারী তরফ হতে ভারত বিভাগের প্রথম উল্লেখ আসে ক্রিপ্স আলোচনায়। তাঁর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল—এই যুদ্ধে ভারত ও কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি স্বাধীন ভারতের সংবিধান গঠন করবে, কিন্তু যদি কোন প্রদেশ বা অঞ্চল সে সংবিধান গ্রহণ করতে না চায়, তবে তাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার আলাদাভাবে কথা বলে চেষ্টা করবেন যাতে ঐ সব অঞ্চল—স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যদি তারা রাজী না হয়—তাহলে ঐ সব অন-অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ সমূহ (such non-acceding provinces) আলাদা সংবিধান তৈরি করে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে।

২৯শে মার্চ হতে ১১ই এপ্রিল—অর্থাৎ ১৪ দিন ধরে আলোচনা চলে ; কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি দিনের পর দিন আলোচনা করছিল। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যুদ্ধে সহযোগিতা করার মৌলিক আপত্তি ত তাঁর ছিলই ; তা ছাড়া প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত কিছু ছিল না। সর্বোপরি ঐ প্রস্তাবে কোন কোন প্রদেশকে ভারত অন্তর্ভুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবার যে খোলা-দরজা দেওয়া হল—তাতেও তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। গান্ধীজীর কথা ছিল যে সংখ্যাধিক্যের জোরে কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বা কোন জন সমষ্টিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হবে না ; এটা কংগ্রেসের ভাবনারও অতীত। কিন্তু এর বিচার ও ব্যবস্থা স্বাধীন ভারত করবে—বিদেশী সরকার চলে যাবার পর। কার্যকরী সমিতির দীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্যে এ প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে বলা হল—"কোন কোন প্রদেশকে অন-অন্তর্ভুক্তির (non-accession) অধিকার দেওয়ার উদ্ভট নীতিকে (novel

principle) প্রথম হতেই মেনে নেওয়া ভারতের ঐক্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যে বিশ্বাসী। বর্তমান জগতে মানুষ যখন বৃহত্তর যুক্ত রাষ্ট্রের (federation) কথা ভাবছে, তখন ভারতের ঐক্যের উপর কোন আঘাত প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট লোকের পক্ষেই ক্ষতিকর ও বেদনাদায়ক। কিন্তু এই কমিটি (Working Committee) কোন অবস্থায়ই কোন অঞ্চলের লোকদের তাদের মতের বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের (Indian Union) মধ্যে জোর করে রাখার কথা কল্পনা করে না।"

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে আরো বলা হল—"প্রত্যেক আঞ্চলিক উনতকে (territorial unit) পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিয়ে ভারতের মধ্যে রাখার চেষ্টা আমরা করব। কিন্তু বর্তমান (অর্থাৎ ক্রিপস্) প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শুরুতেই প্রত্যেক অঞ্চলকে পৃথক হবার দিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। যখন মৈত্রী ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন, এখন এই প্রস্তাব সৃষ্টি করবে সংঘর্ষ। এই প্রস্তাব করাই হয়েছে একটা সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণ করার জন্য (To meet a communal demand)। এই প্রস্তাবের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাচীনতা অনুরাগী (reactionary and obscurantist) মনোভাব-বিশিষ্ট লোকদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে।"—এর সবটাই গান্ধীজীর মত অনুসারে লেখা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, এ বিষয়ে লেনিনের মতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের মৌলিক মিল ছিল। লেনিন বলেছিলেন—সংখ্যা-গরিষ্ঠদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া (right to secede); তেমনি আবার সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও কর্তব্য, ঐ অধিকার পেয়ে সংযুক্ত থাকার দিকেই (to accede) সিদ্ধান্ত নেওয়া। গান্ধীজীরও কথা তা-ই। স্বাধীনতা আসুক—স্বাধীন সরকার প্রত্যেক অঞ্চলকে অধিকার দিবে—(to secede) বেরিয়ে যাবার, কিন্তু তিনি আশা রাখতেন এই অধিকার পেয়েও কেউ বেরিয়ে না গিয়ে সংযুক্ত থাকার (to accede) সিদ্ধান্তই নিবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বেই কোন কোন অঞ্চলকে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর হাত দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার দিতে তিনি রাজী নন। ক্রিপস্ প্রস্তাব ও গান্ধীজীর মতের মধ্যে পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনে হবে; কিন্তু এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে পরে আসতে হবে।

ক্রিপ্স সাহেব ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। তার ৪ মাসের মধ্যেই ১৯৪২

অব্দের ৯ই আগস্ট—"ভারত ছাড়" (Quit Iudia) প্রস্তাব পাস হল। ব্যাপক আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ শুরু হবে ইংরাজ শাসনযন্ত্রকে বিকল করার জন্য। এ প্রস্তাব পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃবর্গ সব ধরা পড়লেন। রাজাজী কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী নীতি সমর্থন করেননি; তাই তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বড়লাটের কার্য নির্বাহক সমিতির (Executive Council) সভ্য হলেন। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের ঠিক এক বছর পর তিনি তৎকালীন খ্যাত রাজাজী প্রস্তাব প্রচার করলেন। এর পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁর সমর্থন নিয়ে নেন। ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি জিন্নাসাহেবের কাছে তাঁর প্রস্তাব পাঠান এবং ১০ই জুলাই সাধারণের নিকট তা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের মূল কথা হল—"যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক যোগে ভারতের তৎকালীন সরকার (provisional government) চালাবে, এবং যুদ্ধের পর ঐ সরকার একটি সীমানির্দেশক কমিশন বসিয়ে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ সমূহে গণভোট (plebiscite) নেওয়ার ব্যবস্থা করবে; তখন কোন অঞ্চল বেরিয়ে যাবার (to secede) পক্ষে মত দিলে, সে অঞ্চলকে সে অধিকার দেওয়া হবে। এতে ভারত বিভাগ হলে পর, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা পারস্পরিক চুক্তি হবে—প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যোগাযোগ (defence, commerce, communication) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহযোগিতা রাখার জন্য। রাজাজীর প্রস্তাবে কথাটা ব্যবহার করা হয়েছিল—seceding, সংযুক্তির পর বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক; কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে যেখানে ছিল—non-acceding অর্থাৎ সংযুক্তির পূর্বেই ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে আগ্রহী।.

এই দুটি প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ; নিজেদের কর্মকুশলতা ও ভারতীয় জনতার উপর আস্থা না থাকলে এই পার্থক্যকে কোন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। ১৯৩৭ অব্দের নির্বাচনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই বিশ্বাস গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের ছিল যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর মুসলিম জনতার আস্থা লাভ করা কঠিন হবে না। তা-ছাড়া ভারত বিভাগ দ্বারা ভারতীয় মুসলিম জনতার সমস্যা মিটবে না, এবং উভয় দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা আরও জটিল হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, রাজাজী তাঁর প্রস্তাব জিন্নাসাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন; তিনি তা বিবেচনার যোগ্যও মনে

করেননি। তাঁর মতে এটা হল একটা ছায়া বা তুষ, পঙ্গু, বিকৃত ও পোকায়-খাওয়া পাকিস্তান (a shadow and husk ; a maimed mutilated and moth-eaten Pakistan)।

১৯৪৫ অব্দের জুন মাস হতে কংগ্রেস নেতাদের জেল হতে মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। এসময় ইউরোপের যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়েছে ;—আমেরিকান ও মিত্রবাহিনী ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে ; জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে মে মাসে ; হিটলার ও মুসোলিনী দুইই নিহত হয়েছেন। আমেরিকার ও চীনের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও চাঙ্গ-কাই-সেক তখনও ব্রিটেনের উপর চাপ দিচ্ছিলেন যাতে ভারতের বা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোস হয়। এঁদের বার বার অনুরোধে চার্চিল কিছুটা নরম হন এবং ১৪ই জুন ভারত সচিব এমেরি (L. S. Amery) পার্লিয়ামেণ্টে এক ঘোষণা করেন। এর মোট কথা হল যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হবে। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell) সিমলাতে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন মৌলানা আজাদ। জেল হতে খালাসের পর দিনই তিনি বড়লাটের আমন্ত্রণ পত্র ,পান—২৫শে জুন সিমলা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। ২২শে জুন বোম্বাইতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন ডাকা হল। ২৫ শে জুন হতে সিমলা সম্মেলন শুরু হল। দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যর্থতার মধ্যে সম্মেলনের অবসান হল।

এই আলোচনায় লীগের দাবির সঙ্গে ওয়াভেলও তাল রাখতে পারেননি। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস বা আর কেউ কোন মুসলমান সদস্য দিতে পারবে না—এই হল তাদের দাবি। সরকার গঠনের যে সূত্র নিয়ে আলোচনা চলছিল তাতে কংগ্রেস ৫ জন, লীগ ৫ জন ও বড়লাট ৪ জন সদস্য মনোনীত করবেন। কংগ্রেসের তালিকায় ২ জন হিন্দু, ১ জন মুসলমান, ১ জন পার্সী ও ১ জন খ্রীষ্টান রাখা হয়েছিল। বড়লাটের ৪ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান (লীগ বিরোধী পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান) ১ জন শিখ এবং ২ জন তপসীল বর্ণের হিন্দু (Scheduled Caste)। লীগ থেকে ৫ জনই মুসলমান দিতে পারে। তাতে ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন হতো মুসলমান এবং ২ জন হতো বর্ণ-হিন্দু (Caste Hindus)। কিন্তু লীগ এতে রাজী হল না। তার দাবি একমাত্র লীগেই মুসলমান প্রতিনিধি দিবে আর কেউ নয়। তাদের মতে কংগ্রেস হল বর্ণ-হিন্দু প্রতিষ্ঠান।

গান্ধীজী বা কংগ্রেস এই দাবি মানতে রাজী নন;—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তখনও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলানা সাহেব। গান্ধীজীর কথা হল—কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তার আছে। কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি গান্ধীজী বা কংগ্রেস মেনে নিতে পারেন না। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভারতের কোন প্রদেশেই তখন লীগ মন্ত্রীসভা ছিল না। পাঞ্জাবে ছিল লীগ বিরোধী ইউনিয়নিস্ট (Unionist) মন্ত্রীসভা মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান; সিন্ধুতে লীগ বিরোধী স্যার গোলাম হুসেন হিদায়েৎ উল্লা (Sir Gholum Hussain Hidayatulla); উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এবং বাংলায় তখন কোন মন্ত্রীসভা ছিল না; গভর্নরের শাসন প্রচলিত চিল। তবুও লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাসাহেব দাবি করলেন একমাত্র লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি।

এখানে গান্ধীজী ও জিন্নাসাহেবের মতের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। গান্ধীজী এ-ও বলেছিলেন যে যদি লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবে তিনি ভারতের সমস্ত শাসন-ভার লীগের হাতে ছেড়ে দিতেও রাজী আছেন এবং তখন যদি লীগ কংগ্রেসের কোন সদস্য মন্ত্রীসভায় নিতে চায় তাতেও তিনি কংগ্রেসকে পরামর্শ দেবেন—লীগের গঠিত মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে। কিন্তু জিন্নাসাহেব এতে রাজী হলেন না। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আপোসেই তিনি যেতে রাজী নন। তিনি জানতেন, তিনি যতই একরোখা ও অযৌক্তিক হবেন—ব্রিটিশ সরকার ততই তাঁকে তোষণ করার চেষ্টা করবে। সিমলা সম্মেলনে তাঁর দাবি সম্বন্ধে বড়লাট ওয়াভেল সাহেব মুখে বলেছিলেন—লীগের দাবি সমর্থন যোগ্য নয়; কিন্তু কার্যত তা তিনি মেনে নিলেন। যদি ও মেনে না নিতেন—তবে লীগকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের হাতেই শাসনভার দিতেন। তা করলেন না। জিন্নাসাহেব এত বড় জেদ দেখালেন যে লীগের তরফ হতে কোন লিস্ট পর্যন্ত দেওয়া হল না। এখান হতেই ভারত বিভাগ ব্রিটিশ সরকার কার্যত স্বীকার করে নিল।

এর পূর্বের একটা ঘটনা এখানে বলা দরকার। ১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বোম্বাইতে জিন্নাসাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন; ১৮ দিন পর্যন্ত এই আলোচনা চলে। সর্বপ্রকারে তাঁর তুষ্টি সাধনের চেষ্টা গান্ধীজী করেন; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। এই সময় রাজাজীর প্রস্তাব

সম্বন্ধেও আলোচনা হয়, গান্ধীজী বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে কোন অঞ্চলেরই সব মুসলমান পাকিস্তান চায়নি। এর জবাবে জিন্নাসাহেবের এক কথা—লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি—আর কেউ তাদের হয়ে কোন কথা বলতে পারে না। গান্ধীজী বললেন—"ঐ সব অঞ্চলের অ-মুসলমানদের বিষয়ও ভাবতে হবে; তারা কি পাকিস্তান দাবি মানছে?" জিন্নাসাহেবের জবাব হল—"তাদের মতের ত' দরকার নেই।" "কিন্তু তা-হলে যে গ্রামে-গ্রামে মহল্লার মহল্লায় সব অ-মুসলমান আছে—তাদের কি হবে?" জিন্নাসাহেব ভাবী পাকিস্তানের এক সুন্দর ছবি গান্ধীজীর সামনে ধরলেন,—পূর্ণ গণতন্ত্র ও অ-মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা সেখানে থাকবে। মোটের উপর ১৮ দিন আলোচনার পরও জিন্নাসাহেবের কাছ থেকে আর কিছুই পেলেন না;—এক মাত্র কথা এখনই স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন হিন্দুস্থান করতে হবে। রাজাজীর প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রধান কারণ ঐ প্রস্তাবে রাজী হলে লীগকে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা-দাবি মেনে নিতে হয়; তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দীর্ঘ আলোচনার পর যখন রাজাজী গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি নিয়ে এলেন?"—বিষাদের সুরে গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন—"ফুলের তোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আর নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে এলাম।"

অনেকে গান্ধীজীকে তখন প্রশ্ন করেছে—রাজাজীর প্রস্তাবে পাকিস্তান সম্বন্ধে স্বীকৃতি আছে;—ভারত বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কি করে রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন? গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন—রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকেই (Self-determination principle) স্বীকার করেছেন। এবং কংগ্রেস বহুপূর্বেই এই নীতিকে স্বীকার করেছে। ১৯৪২ অব্দের ২রা এপ্রিল, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে, তা স্বীকার করা হয়েছিল (The Committee can not think in terms of compelling the people of any territorial unite remain in the Indian Union against their declared and established will)। এর পর ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, যাতে জাতির বিভিন্ন উনত (different units) একযোগে সহযোগিতা মূলক এক জাতীয় সত্তায় বাস করতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করা হবে। স্বাধীনতা লাভের পর জনমতকে গঠন করার সুযোগ না দিয়ে, স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী শাসকদের হাত দিয়ে দেশকে খণ্ডিত করার তিনি ঘোর বিরোধী

ছিলেন। গান্ধীজী জিন্নাসাহেবকেও এই কথাই বলেছিলেন—ব্রিটিশ সরকারকে আমি এ অনুরোধ করতে পারব না যে, তোমরা ভারতের উপর ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিয়ে যাও (I cannot ask the Britisher to impose partition on India)।

ক্রমে যুদ্ধ শেষ হল—শেষ শত্রু জাপানকে পরাজিত করা হল—আণবিক বোমা দিয়ে। তা না হলে হয়ত যুদ্ধ আরো কিছুকাল চলত। ব্রিটেনে নূতন নির্বাচন হল; শ্রমিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শাসন ক্ষমতা দখল করল। শ্রমিক দলের নেতা এটলী প্রধান মন্ত্রী হলেন। চার্চিলের রক্ষণশীল সরকার থেকে একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করলেন। ১৯৪৬ অব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তিন জন মন্ত্রী ভারতে যাচ্ছেন। পরে ১৫ই মার্চ পার্লিয়ামেণ্টে তিনি যা বললেন—তার অর্থ দাঁড়ায়, লীগের দাবি অনুসারে তাঁরা ভারত বিভাগে সম্মত হবেন না। তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন—"আমাদের মনে রাখা দরকার যে ব্রিটিশরা ভারতে একটি মহৎ কাজ সাধন করেছে—আমরা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছি, তার মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়েছি, যা তার পূর্বে ছিল না।" একটু পরে তিনি বলছেন, "সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে আমরা খুব সজাগ; যাতে তারা ভয় হতে মুক্ত হয়ে বাস করতে পারে তা-ও আমরা দেখব। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অগ্রগতি রোধ করার অধিকার তাদের দিতে পারি না (We cannot allow the minority to place a veto on the advance of the majority)।" আরো একটু পরে আবার বলছেন—আপনাদের সকলের মতো আমিও ভারতের সংখ্যালঘু-সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত। ...আমি বিশ্বাস করি সংবিধানে এ বিষয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে (I believe that due provision will be made in the constitution)।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণামতো ১৯৪৬ অব্দের ২৩শে মার্চ কেবিনেট মিশন ভারতে এলেন; এর মধ্যে ছিলেন। (১) ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স (Lord Pethwick Lawrence), (২) স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপ্স (Sir Stafford Cripps), এবং (৩) এ, ভি, এলেকজাণ্ডার (A. V. Alexander)। প্রায় দুই মাস আলোচনার পর ভারত সচিব লর্ড লরেন্স তাঁদের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণায় পাকিস্তান প্রস্তাব স্পষ্টভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হয়।

তিনি বলেন—"পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হবে বলে আমরা মনে করি না।" (We do not accept the setting up of a separate Muslim sovereign state as a solution of the communal problem)। একটু পরে আবার বলছেন—"তাছাড়া ভারতের অন্যান্য অংশ হতে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ আলাদা করলে, সমস্ত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করা হবে। এর ফলে সৈন্য বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে হবে এবং বর্তমান নীতির পক্ষে বিশেষ দরকারী—গভীরে প্রতিরক্ষা এতে ব্যাহত হবে। তাই আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী নই।" (Moreover, complete separation of Pakistan from the rest of India would in our view, gravely endanger the defence of the whole country by splitting the army into two and by preventing defence in depth which is essential in modern war. We, thorefore, do not suggest the adoption of this course)।

মিশনের প্রস্তাব ছিল ভারত বিভক্ত হবে না—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খুব সীমিত (limited) হবে ; কেবল বৈদেশিক ব্যাপার, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এবং এই তিনটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা (Foreign Affairs; Defence, Communications and power necessary to raise finances required for the above subjects) ; অন্য সব বিষয়ই থাকবে প্রদেশের হাতে। সংবিধান রচনার জন্য প্রদেশগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হল :—(ক) হিন্দুপ্রধান প্রদেশসমূহ, (খ) উত্তর পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম-প্রধান প্রদেশসমূহ এবং (গ) পূর্ব প্রান্তের বাংলা ও আসাম। (খ) ও (গ) এ দুটিকেও মুসলিম প্রধান বলে ধরা হল,—যদিও আসাম মুসলিম প্রধান ছিল না।—

এই ঘোষণায় খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগে তাঁরা সম্মত হতে পারেন না। কারণ, তা ওখানকার বহু লোকের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরোধী হবে (contrary to the wishes and interest of a very large proportion of the population of those provinces)। আরো বলা হল—বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রত্যেকেরই ভাষা, দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য আছে। এর পর প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা করে—পরিশেষে

তারা বললেন—"অতএব ব্রিটিশ সরকারকে আমরা এ পরামর্শ দিতে পারি না যে আজ তাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তা-দুটি সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হোক। (We are therefore unable to advise the British Govt., that the power which, at present, resides in the British hand should be handed over to two entirely separate sovereign states.)

ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ সময়কার সব ঘটনা আলোচনা সম্ভব নয় এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অনেক কথার কোন প্রত্যক্ষ যোগও নেই। মোটের উপর কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল। কিন্তু লীগ তা প্রত্যাখ্যান করল ; তাদের একই দাবি—ভারতের দুই প্রান্তে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আপোস প্রস্তাবেই তারা রাজী নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমে মে মাসে লীগ কেবিনেট প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল ; কিন্তু পরে ২৯শে জুলাই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব (Direct Action) পাস করে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা তখন বড়লাট ওয়াভেলকে তাগিদ দিল—কংগ্রেসের হাতেই শাসনভার ছেড়ে দিতে। অনেকটা অনিচ্ছায় ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে বড়লাটের নূতন কর্মনির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠন করা হল। এর মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, তপসিলী হিন্দু ও বর্ণহিন্দু—সবই ছিল। ১৬ই আগস্ট হতে লীগের গুণ্ডামী শুরু হয়। সফৎ আহাম্মদ খান এই সরকারে যোগ দিতে রাজী হন! তাঁকে সিমলার রাস্তার ধারে ভীষণ ভাবে আহত করা হয়। ছোরার ঘা দিয়ে মৃত মনে করে রাস্তার পাশে তাঁকে ফেলে রেখে আততায়ীরা চলে যায়। রফি সাহেবের ভাই সফি আহাম্মদ কিদোয়াইকে মুসৌরিতে হত্যা করা হয়। ১৬ই আগস্ট হতে কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিকট রূপ ফুটে ওঠে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে লীগ নেতারা তাঁদের মনোভাব গোপন করেননি। তাঁরা খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন যে, শান্তিপূর্ণ বা বৈধ পন্থায় তাঁদের কোন আস্থা নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামই বোঝেন ;—এর মধ্যে কোন দ্ব্যর্থতা নেই, তা-ও তাঁরা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। আব্দুর রব নিস্তার, যিনি পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন, বলেছিলেন—রক্তপাত চাই এবং অমুসলমানদের রক্তপাতই দরকার (Blood of the non-Muslims must be shed)। বলা দরকার যে ইতিমধ্যে গভর্নরদের ষড়যন্ত্রে ও লীগ

পন্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে কিছুদিনের মধ্যে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রী-সভার পতন ঘটিয়ে লীগ মন্ত্রী সভা স্থাপন করা হয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে তাদের তেমন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হল কলিকাতা। পাকিস্তান পাবে সে বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত ছিল; কিন্তু সমস্ত বাংলা পাবে না তা-ও তারা জানত। কলিকাতা বাদ দিয়ে বাংলার মূল্য যে খুব বেশী নেই তা-ও তারা জানত। পাঞ্জাবের সঙ্গে লাহোর তারা পাবে; সিন্ধুর সঙ্গে করাচী পাবে. পেশোয়ারও তারা পাবে। কিন্তু কলিকাতা? অথচ কলিকাতার প্রান্ত সীমা পর্যন্ত মুসলমান প্রধান অঞ্চল। তারা এ ঘোষণাও করেছিল যে কলিকাতাকে হিন্দুস্থানে যেতে দেওয়ার চেয়ে বরং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে (reduce to ruins rather than allow it to go to Hindusthan)। তাই লীগের উদ্দেশ্য হল—দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা কমিয়ে এবং কলিকাতার তপসিলী হিন্দুদের হাত করে, তারা গণভোট (Plebiscite) দাবি করবে। তাদের আশা ছিল তপসিলী হিন্দুদের মনে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, টাকা দিয়ে ও অন্যান্য সুবিধার ভরসা দিয়ে তাদের হাত করা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি আট-ঘাট বেঁধে কাজে নামলেন। কলিকাতার ২৪টি থানার মধ্যে ২২টি থানায় তিনি মুসলমান থানা অধিকর্তা (O. C) বসালেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ধার্য হল—১৬ই আগস্ট; সকলের আপত্তি উপেক্ষা করে ঐদিনকে তিনি সরকারী ছুটি বলে ঘোষণা করলেন। ১৬ই সকাল থেকে সশস্ত্র লীগ ভলান্টিয়াররা রাস্তায় রাস্তায় যথেচ্ছ ধ্বনি দিয়ে টহল দিতে লাগল। পুলিস তাদের কোন বাধা দিল না। সুরাবর্দি নিজে লালবাজারের পরিচালনা কক্ষে (control room) বসে পুলিসকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন। ১৬ই বিকাল থেকে তাণ্ডব শুরু হয়। ১৭ই ও ১৮ই কলিকাতার বুকের উপর নরকের দরজা খুলে দেওয়া হল। কিন্তু ১৭ই বিকাল হতে কলিকাতার হিন্দু যুবকরা সংঘবদ্ধ হতে লাগল। বিভিন্ন স্কোয়ারের রেলিংগুলি খুলে নিয়ে মাথাটা ছুঁচালো করে, তারা প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি হল। লীগ-গুণ্ডার দল ১৮ই হতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হল। কলাবাগান বস্তি ছিল সুরাবর্দির গুণ্ডাদলের প্রধান আড্ডা। হিন্দু যুবকগণ ঠিক করলো ঐ বস্তি আক্রমণ করবে। তিনদিন পর্যন্ত শত শত নিরীহ লোক নিহত হয়েছে; শত শত শিশু ও নারীর উপর আক্রমণ হয়েছে। পুলিস

একটি গুলি ছোঁড়ে নি বা একটি মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেনি। হিন্দুদের উপরই পুলিসের যত দৃষ্টি ছিল। তখন কিন্তু সুরাবর্দির মনে শাসকের কর্তব্য বুদ্ধি জাগেনি। কিন্তু যখন কলাবাগান বস্তির উপর হামলা হবার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন সুরাবর্দি সৈন্য বাহিনী তলব করার প্রয়োজন বোধ করলেন। দুই চার দিন থেমে থেমে পুরো একবছর পর্যন্ত কলিকাতার উপর নরকের খেলা চলে। এটা হল কলিকাতা জয়ের যুদ্ধ।

কলিকাতা ভারতে থাকবে, কি পাকিস্তানে যাবে তা নির্ধারিত হল কলিকাতার রাস্তার ও গলিতে নিরীহ লোকের উপর আক্রমণের মাধ্যমে। এ লেখক তখন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে কয়েকটি সহকর্মী ও চার পাঁচটি তরুণ যুবক নিয়ে বাস করছে। সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, কিরণ মুখার্জী (কিরণ দা) সুধীর রায় প্রভৃতি। বহু বন্ধু-বান্ধব টেলিফোন করেছে ঐ বাড়ী ছেড়ে যেতে। রোজ রাত্রে মুসলমান বস্তি বা মসজিদ হতে আওয়াজ শুনতাম—"পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, লড়াইয়ে তক্‌দির" প্রভৃতি ধ্বনি। তিন চার দিন বাড়ীর দরজায় এসে হামলাও হয়েছে। দুই এক বার পাড়ার মুসলমানরা এসে বাইরের গুণ্ডাদের সরিয়ে দিয়েছে। খ্যাতি ছিল এরা বিপ্লবী; বোমা পিস্তল সঙ্গে থাকা খুবই সম্ভব। হয়ত সেজন্যই পাড়ার মুসলমানরা বাইরের হামলাকারীদের সরিয়ে দিয়েছে। অথবা আমাদের প্রতি পাড়ার মুসলমানদের কোন বৈরীভাব ছিল না;—সে জন্যও হয়ত বাইরের লোকদের ওরা সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঠিক বাড়ীর দুপাশে একটি হোটেল ও একটি চা'র দোকান ছিল লীগ গুণ্ডাদের আশ্রয়স্থল। ঐ আশ্রয়স্থল হতে বেরিয়ে অতর্কিত ভাবে কোন হিন্দু পথিককে আক্রমণ করে আবার আশ্রয়-স্থলে চলে যেত।

সব চেয়ে করুণ দৃশ্য একদিন হল যে দিন আমাদের সহ কর্মী ননী সেন (ভূদেব সেন) আমাদেরই বাসার সামনে আহত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে আনলাম আমাদের বাসার ভিতরে, ননী তখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চেষ্টা করছিল। ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ ননী প্রাঙ্গণে শুয়ে রইল—রক্তক্ষরণ হচ্ছে। একবার বলল—"অরুণদা, আমি ত' চললাম"। অতি কষ্টে তাকে মিঠ-ফোর্ড হাসপাতালে (বর্তমান নীলরতন সরকার হাসপাতাল) পাঠানো হল; এম্বুলেন্স গাড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত লীগের এম্বুলেন্স গাড়িতে পাঠানো হল। রাত ১১ টার পর খবর পেলাম—ননীর জীবন শেষ হয়েছে।

চোখের সামনে দেখলাম—নিরুপায় দর্শকের মতো একটি অমূল্য জীবন গুণ্ডার ছোরার আঘাতে অকালে ঝরে পড়ল।

ঐ সময়ের কাহিনী কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটু বিস্তারিত ভাবে লিখলাম। কলিকাতার যুদ্ধের এই এক বছরের ইতিহাস নিয়ে আজও কোন আলোচনা হয়নি। কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক এই একবছরের ঘটনার উপর কোন গুরুত্ব আজও দেননি। এটা আমাদের পক্ষে একটা গুরুতর ত্রুটি। অনেক ঘটনা লোকে ভুলে যাচ্ছে; তৎকালীন লোক—প্রত্যক্ষদর্শীরা ক্রমে ইহজগৎ ত্যাগ করছে। তাই সমকালীন তথ্য পাওয়া কঠিন হচ্ছে। যে তদন্ত কমিশন বসিয়ে থামিয়ে দেওয়া হল,—তার কাগজ-পত্রে ও পুলিস দপ্তরের কাগজ-পত্রে হয়ত এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যেতে পারে। লীগ থেকে কলিকাতার জন্য plebiscite বা গণভোট দাবি করা হয়েছিল; কিন্তু কংগ্রেসের আপত্তিতে বড়লাট তাতে রাজী হননি। কলিকাতার যুদ্ধ চলল ১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। এর মধ্যে গান্ধীজী বহুবার কলিকাতায় এসেছেন; বহু দিন কলিকাতায় বাস করেছেন। অনেক সময় মুসলমানদের মনে ভরসা জাগাবার জন্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলে তিনি বাস করেন। ঐ সময় সুরাবর্দি গান্ধীজীর সঙ্গে নানা প্রকার আলোচনা করেন। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবও তিনি দেন; গান্ধীজীকে তিনি বার বার অনুরোধ করেন—ভ্রাতৃ-বিরোধ রোধ করতে। তখন আক্রমণ বেশী হচ্ছিল মুসলমানদের উপর। গান্ধীজীর সামনে জনতা থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হল—"কলিকাতার ঐ বিরাট নরহত্যার (Great killing) জন্য আপনি দায়ী কি-না।" সুরাবর্দি জবাব দিলেন—"হাঁ, এটা আমারই দায়িত্ব" (Yes, it is my responsibility)। তাঁর স্বাধীন অখণ্ড বাংলার প্রস্তাবে গান্ধীজী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন—"কি করে সুরাবর্দি আশা করেন—যে হিন্দুরা তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করবে!"

কলিকাতার মুসলমানরা পরে যে মার খেয়েছিল তার প্রতিশোধ নিল নোয়াখালীর দাঙ্গার মাধ্যমে। গান্ধীজী কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার এভাবে ছুটতে লাগলেন। এদিকে বড়লাটের কর্মনির্বাহক সমিতিতে জওহরলাল, বল্লভভাই প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা প্রতিপদে শাসন কার্যে বাধা পেতে লাগলেন। ইংরেজ সেক্রেটারীরা তখনও সব দপ্তরের মাথায় বসে। তাঁদের আন্তরিক অনুরাগ হল মুসলিম লীগের দিকে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেলেরও তা-ই। সবাই

তলে তলে চেষ্টা করতে লাগলো কি করে লীগকে সরকারের মধ্যে আনা যায়। ১৫-ই অক্টোবর (১৯৪৬) ওয়াভেলের চেষ্টায় জিন্না রাজী হলেন—সরকার গঠনে লীগ সহযোগিতা করবে। ২৫শে অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের পাঁচ জন প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করা হল। যেহেতু কংগ্রেস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককেও সরকারে নিয়েছে, তাই লীগের তরফ হতে জিন্নাসাহেব একজন তপসিলী হিন্দুর নাম দিলেন—বাংলার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কিন্তু বাংলার কোন মুসলমান নেতার নাম তিনি দিলেন না। তাতে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সরকারে বসে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে আরও জোরদার ও ব্যাপক করার সিদ্ধান্ত নিল। এর পর শুরু হল পাঞ্জাবের দাঙ্গা। কলিকাতা, নোয়াখালী বা বিহারকে হার মানিয়ে পাঞ্জাবের দাঙ্গা, কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঁপিয়ে তুলল। আশ্রয়হীন, সর্বহারা মানুষ, ধর্ষিত নারী, পিতৃ-মাতৃহারা শিশু দলে দলে দিল্লীতে আসছে—দাঙ্গা থামাও। শক্ত মানুষ সর্দার প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্র-সচিব (Home Member); কিন্তু তাঁর নির্দেশের কোন মূল্য পাঞ্জাব সরকার দিচ্ছে না। জেলাশাসক পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ অমান্য কর্‌ছিল। গান্ধীজী, বল্লভভাই, জওহরলাল—সবাই তখন নিজেদের অসহায় বোধ করছিলেন। তাঁদের মনের জোর ভেঙ্গে পড়ল; তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন মানুষের এই নির্যাতনের কোন প্রতিকার যখন সরকারে থেকেও তাঁরা করতে পারছেন না, তখন? তবে কি ভারত বিভাগই মানতে হবে? পাঞ্জাবে যে কত লোক মরল, তার হিসাব দেওয়া কঠিন। ১৯৪১ ও ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দের আদম শুমারির হিসাব থেকে অনুমান করা হয় যে কম হলেও তিন চার লক্ষ অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্থানে নিহত হয়েছে। পাঞ্জাবের এক ইংরাজ কর্মচারী (P. Moon) তাঁর পুস্তকে লিখেছেন—অন্তত দুই লক্ষ লোক নিহত হয়েছে; কত নারী অপহৃত ও ধর্ষিত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। গান্ধীজী তখন বলেছিলেন—"আমি অসহায় বোধ করছি (I feel helpless)।" গান্ধীজী আবার চলে যান বিহার।

১৯৪৭ অব্দের মার্চ মাস; গান্ধীজী তখন দাঙ্গা-দগ্ধ বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এই সময় লর্ড-ওয়াভেল বড়লাটের পদ ত্যাগ করে দেশে ফিরে যান এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে আসেন। এসেই, তিনি ঘোষণা করেন যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কাজকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশ

নিয়ে তিনি ভারতে এসেছেন। এর পর বিহারে বসে হঠাৎ একদিন কাগজে গান্ধীজী দেখলেন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঞ্জাব বিভাগের দাবি করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কাগজে এ সংবাদ পড়ে গান্ধীজী দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। তিনি বিহার থেকে জওহরলালকে লিখলেন —এ প্রস্তাবের পিছনে কি যুক্তি আছে জানি না (I think I do not know the reason behind the Working Committee's resolution)। ঐ চিঠিতে তিনি পরে বললেন—দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ও সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ ভাগের বিরুদ্ধে যুক্তি আমার আছে; তা আমি বলতে পারি। বাধ্যতামূলক ভাবে সবই হতে পারে; কিন্তু স্বেচ্ছায় সম্মতি দিতে হলে যুক্তি ও অন্তরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই (Anything was possible by compulsion. But willing consent required an appeal to reason and heart)। বল্লভভাইকে তিনি লিখলেন—"যদি সম্ভব হয় পাঞ্জাব সম্বন্ধে প্রস্তাবটা আমায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিও; আমি ওটা ঠিক বুঝতে পারছি না।" উভয়েই জবাবে একই কথা, একই সুর—হতাশা ও নিজেদের অক্ষমতা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কংগ্রেস থেকে পাস করানো হল গান্ধীজীকে না জানিয়ে ও তাঁর অনুপস্থিতিতে। পাঞ্জাবের দাঙ্গা তাঁদের মনের বল নষ্ট করেছে; নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্মক্ষমতার উপর আস্থা তাঁরা হারিয়েছেন। প্রধান যুক্তি এঁরা দিলেন—এ ভিন্ন লীগের দাবির কোনো উত্তর হয় না;—পাঞ্জাবের হিন্দুরাও ঐ প্রস্তাবে খুশী হয়েছে। গান্ধী বুঝলেন—কংগ্রেস নেতাদের ও তাঁর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আজ একা;—পূর্বের সে জোর মনের মধ্যে পাচ্ছেন না। কংগ্রেস-নেতারা আজ যুদ্ধক্লান্ত—পূর্বের সেই সংগ্রামের উৎসাহ তাঁদের নেই। জওহরলাল এই সময় গান্ধীজীকে লিখেছিলেন—আমরা যেন দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি; ঠিক দিকে যাচ্ছি কি-না তাও বলতে পারি না (We are drifting everywhere and some time I doubt, if we are drifting in the right direction.)

লর্ড মাউন্টবেটন চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এসেছেন মুসলিম লীগের দাবিকে সমর্থন করে ভারতকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে;—এ বিষয়ে তিনি চার্চিলের মন্ত্র-শিষ্য। কংগ্রেসের মনোভাবে যে একটা পরিবর্তন আসছে তিনি জানলেন ও খেয়াল করলেন। তাঁর ভারতে আসার কয়েকদিন পূর্বে

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি হতে পাঞ্জাব বিভাগের দাবি করা হয়। ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে জওহরলাল ও বল্লভভাইর মনে উদীয়মান সংশয়ের সুযোগ নিতে তিনি ক্রটি করলেন না। এদিকে দিল্লীতে সরকারী দপ্তরের কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ। লীগ নেতা লিয়াকত আলি খানের হাতে ছিল অর্থ দপ্তর। সব দপ্তরের প্রায় সব প্রস্তাবই অর্থ-দপ্তরে যেতে হবে। লিয়াকত আলি সেখানে প্যাঁচ কষতে লাগলেন; কোন কাজেই অর্থ মঞ্জুর সময় মত হয় না। ইংরাজ সেক্রেটারী প্রায় সবই লীগ অনুরাগী; তারাও কাজে বাধা দিচ্ছিল। জওহরলাল ও বল্লভভাই প্রায় সর্ব বিষয়েই ব্যাহত হচ্ছিলেন। তাঁরা বুঝছিলেন—দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাও রক্ষা করা যাবে না;—উন্নয়নমূলক কাজ ত' হবেই না। দ্বিতীয়ত—এ-ও তাঁরা বুঝছিলেন যে অবিভক্ত ভারতের শাসন কার্যে লীগের সহযোগিতা অপরিহার্য; কিন্তু সে সহযোগিতা শাসন কাজে সাহায্য না করে বাধাই সৃষ্টি করবে। এই অবস্থায় কংগ্রেস-নেতা জওহরলাল ও বল্লভভাইর কাছ থেকে ভারত বিভাগে সম্মতি আদায় করা মাউণ্টবেটনের পক্ষে শক্ত হল না।

মে মাসে মাউণ্টবেটন বিলাত যান—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। ২৮শে মে ফিরে আসেন এবং দোসরা জুন মাউণ্টবেটন পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। চার্চিলের সাহায্যে এটলীর মত পরিবর্তন করানো কঠিন হল না—বিশেষত যখন কংগ্রেসই বিভাগ (Partition) চাচ্ছে। ধীরে ধীরে এঁরা ভারত বিভাগের দিকে এগুচ্ছিলেন। একবার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে গান্ধীজী জওহরলাল ও বল্লভভাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন—তাঁকে না জানিয়েই এঁরা ভারত বিভাগে মত দিয়েছেন। জওহরলাল আমতা-আমতা করে জবাব দিয়েছিলেন—"ঠিক না জানিয়ে নয়—সব কথা ত পরিষ্কার করে নোয়াখালিতে লেখা যায় না—তাই সব জানানো হয়নি।" মোটের উপর গান্ধীজী বুঝলেন যে জওহরলাল, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী প্রভৃতি সবাই মনে মনে ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছেন;—আজ তিনি একা। দোসরা জুন কংগ্রেস ও ও লীগ প্রতিনিধিদের সামনে বড়লাট তাঁর প্রস্তাব রাখলেন (১) মুসলিম প্রধান প্রদেশ সমূহ যারা তৎকালীন সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) যোগ দিতে অনিচ্ছুক তারা পৃথক সংবিধান সভা গঠন করবে। (২) পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হবে; (৩) শ্রীহট্ট জেলায় ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে গণভোট নেওয়া হ'বে। (৪) আইন সভায় নির্ধারিত হবে কোন দিকে

সিন্ধুপ্রদেশ যাবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে লীগ ক্রমেই তার দাবি বাড়াচ্ছিল। এমন দাবিও তারা করেছিল—যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াতের জন্য ভারতের বুক চিরে ১০০০ মাইল লম্বা এক সংযোগ-পথ (Corridor) তাদের দিতে হবে। সম্পূর্ণ আসামও তারা দাবি করছিল।

ভারতের বিশেষ করে বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কিছু আলোচনা এখানে দরকার। কংগ্রেস এতদিন ভারত বিভাগে আপত্তি করে এসেছে; সে আপত্তি ক্রমে মৃদু হতে শুরু করেছিল। হিন্দু-মহাসভা বাংলা বিভাগ সমর্থন করেছিল; বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলা বিভাগের জন্য আন্দোলন করছিলেন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বরাবরই লীগের দাবি অর্থাৎ ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করার দাবি সমর্থন করেছে। বাংলাদেশে কংগ্রেসের মধ্যে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ বাংলা বিভাগের জন্য জোর আন্দোলন করছিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে পাঁচটি হিন্দুও যতদিন পূর্ব বাংলায় থাকবে, ততদিন তিনি পূর্ব বাংলায় থাকবেন। বাংলাদেশে কংগ্রেসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেস কর্মীরা বাংলা বিভাগের দাবি করছিলেন।

পূর্ববাংলার হিন্দু জনমত উগ্রভাবে বাংলাবিভাগ দাবি করছিল। তখন পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় যাবার প্রয়োজন এই লেখকের হয়েছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি বহু জেলা ঘুরেছি—নিজ জেলা বরিশালেও গিয়েছি। প্রায় সর্বত্র তিরস্কৃত হয়েছি হিন্দুদের দ্বারা,—বাংলা বিভাগ তখনও সমর্থন করিনি বলে। এমন অভিযোগও শুনতে হয়েছে যে লীগের টাকা খেয়ে আমরা বাংলা বিভাগে আপত্তি করছি। গান্ধীজীর নিকটও এই অভিযোগ গিয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকা জনমত (gallup poll) আহ্বান করেছিল। যতদূর মনে পড়ে তাতে শতকরা ৮০ জন মত দিয়েছিল বাংলা বিভাগের পক্ষে। দিল্লীতে আমাদের বাড়ীর সামনে দলবদ্ধভাবে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বাংলা বিভাগে মত দিইনি বলে। মাউণ্টবেটেন আসা পর্যন্ত—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ভারত বা বাংলা বিভাগ সমর্থন করেনি। তখন আর একটা মত ছিল—সুরাবর্দী তা প্রথমে তোলেন—পরে শরৎচন্দ্র বসুও সেই মত সমর্থন করেন। সেটা হল স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র স্থাপন করা। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা এতে রাজী ছিল না। সুরাবর্দী বা লীগ নেতাদের পরিচয় তখন বাংলা পূর্ণরূপেই পেয়েছে। বাংলার মুসলিম লীগও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা

করে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করল। কাজেই হিন্দু বা মুসলমান কেউ এ প্রস্তাব চাচ্ছিল না। গান্ধীজীর নিকট সুরাবর্দী এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে তখনও সুরাবর্দী আশা করেন বাংলার হিন্দুরা তাঁর সততা ও সদিচ্ছায় আস্থা স্থাপন করবে। খণ্ডিত ভারতের রাজনীতিতে স্থান হবে না—এই ভয় হল এ মতের উৎস—এটাই ছিল লোকের মনে সন্দেহ।

এ অবস্থায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির কার্যকরী সমিতি ৪ঠা এপ্রিল এক প্রস্তাব পাশ করে; তখন গান্ধীজী খাঁ সাহেব ও মৌলানা আজাদ ব্যতীত প্রায় আর সবাই ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে তখন আমাদের সংখ্যাধিক্য। অবশেষে আমরাও ভারত বিভাগ স্বীকার করলাম, ১৯৪৭ অব্দের ৪-ঠা এপ্রিল বর্তমান লেখক সেই প্রস্তাব সমিতির সামনে উপস্থিত করে। তাতে ভারতের ঐক্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে বলা হয়—যে ভারতবর্ষ ও বাংলার পক্ষে ভারতের ঐক্য বিশেষ দরকারী (of most fundamental necessity)। পরে ঐ প্রস্তাবে বলা হয়—"বর্তমান প্রদেশিক সরকার একটা সাম্প্রদায়িক দলের দ্বারা পরিচালিত এবং তারা বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। তবুও যদি ব্রিটিশ সরকার এই প্রাদেশিক সরকারের হাতেই তাদের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করতে চায়, তা হলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকতে ইচ্ছুক, সে অংশকে ভারতের মধ্যে থাকার অধিকার দিতে হবে; এবং সেই অংশ নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে (So this committee demands that if the H. M. G. contemplate handing over its power to the existing Goverment of Bengal which is determined to the formation of Bengal into a separate sovereign state and which by its composition is a communal party government, such portions of Bengal as are desirous of remaining within the Union of India, should be allowed to remain so and be formed into a separate province within the Union of India)।" কথিত আছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিসে তখন হাজার হাজার চিঠি ও টেলিগ্রাম আসছিল, বিশেষ করে পূর্ববাংলা হতে—বাংলা বিভাগ দাবি করে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এ প্রস্তাব পেয়ে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন—

একটা পথ পাওয়া গেল।

কি অবস্থায় পড়ে কংগ্রেস নেতারা ভারত বিভাগে মত দিতে বাধ্য হলেন এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকেও মত দিতে হয়, তা পাঠকদের বোঝা দরকার। মাউণ্টবেটনের প্রস্তাব নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা চলছে; আর গান্ধীজী প্রত্যহ প্রার্থনা সভায় প্রকাশ্য ভাষণে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন। তখনও পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে; দিল্লীর অবস্থাও থম্‌থমে। কলিকাতা তখনও শান্ত হয়নি। দিনের পর দিন পাঞ্জাবের লাঞ্ছিত মানুষ ও ধর্ষিতা-নারী গান্ধীজীর কাছে নিরাপত্তা চাইছে; কিন্তু কংগ্রেস তখন সরকারে থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী তাদের নিরাপত্তার কোন ভরসা দিতে পারছেন না। বরং তিনি দেখছেন—জওহরলাল, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি সবাই ভারত বিভাগকে অনিবার্য বলে গ্রহণ করছেন। গান্ধীজী অনুভব করেছেন—তাঁর পায়ের তলার মাটি সব ধ্বসে পড়ছে; কোথায় দাঁড়িয়ে তিনি জাতিকে সংগ্রামের জন্য আহ্বান দিবেন! তখনও তিনি বলেছিলেন—"কংগ্রেস যদি ভারত বিভাগ মেনে নেয়—তবে-তা-হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে (That will be over my dead body)।"

শেষ সিদ্ধান্ত এল; কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ভারত বিভাগ মেনে নিল। চার্চিলের দূত মাউণ্টবেটন তাঁর নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করলেন। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল—বিলাতের রক্ষণশীল দল ও তার নেতা চার্চিল এবং আমেরিকা। তাদের বিশ্ব-প্রতিরক্ষা কৌশল ও আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের (world strategy and economic imperialism) দিক থেকে এর প্রয়োজন ছিল—বলে তারা মনে করত। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব অনুমোদিত করাতে হবে; জওহরলাল গান্ধীজীর কাছে গেলেন;—বাপুজীর আশীর্বাদ দরকার, নইলে নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটি এ প্রস্তাব পাশ করবে কি না সন্দেহ। জওহরলালকে 'না' বলবার মতো মনের জোর গান্ধীজী পেলেন না। এই লেখক সেই সভায় উপস্থিত ছিল। বাইরের অবস্থা ছিল বিষাদজনক;—চারিদিকে আর্তের করুণ ক্রন্দন; কংগ্রেসের ভিতরে নিরাশা ও নিঃসহায়তাবোধ। গান্ধীজী এই পরিবেশের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। গান্ধীজীর কণ্ঠে ও ভাষায় কোন তেজ বা উদ্দীপনা ছিল না। যন্ত্রচালিতের মতো তিনি বলে গেলেন। সদস্যদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন,—এই বিষয়ে আমার মত সুবিদিত ও খুব পরিষ্কার; তবুও কার্যকরী সমিতি (Working

Committee) যে প্রস্তাব পাশ করেছে, তা প্রত্যাখ্যান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন হবে না।" তাঁর কথায় বিষাদ ও বেদনার সুর প্রকাশ পাচ্ছিল।

তিনি প্রায় ৪০ মিনিট বলেন; তাঁর বক্তৃতার মূল কথা ছিল—এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্যদের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করা এবং তার ফলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে (rejection or amendment of the resolution would mean back of confidence in the President and Working Committee and they must naturally resign)। এর পর গান্ধীজীর প্রশ্ন হল এক দল নূতন নেতা খুঁজে বের করা যারা কংগ্রেস ও সরকার চালাবার দায়িত্ব নিতে পারে (the finding of a new set of leaders who could constitute not only the Congress Working Committee but also to take charge of the Government)। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭ জন ও বিপক্ষে ১৫ জন ভোট দিল; প্রস্তাব গৃহীত হল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে বলা হল; "কোন আঞ্চলিক জনসমষ্টিকে তাদের মতের বিরুদ্ধে জোর করে ভারতের মধ্যে রাখা কংগ্রেসের নীতি বিরুদ্ধ। তাই ভারতের ঐক্যে বিশ্বাসী হয়েও, কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নিল।" প্রস্তাবে আরো বলা হল—"ভূগোল, পর্বতমালা ও সাগর ভারতবর্ষের বর্তমান রূপ দিয়েছে; মানুষের কারসাজি এর গঠনকে বদলাতে পারবে না, বা এর শেষ পরিণতিকে ব্যাহত করতে পারবে না। (Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny)।" কতকটা যেন আত্ম-প্রতারণার (self deception) ভাষা! যে আশায় জওহরলাল বা বল্লভভাই ভারত-বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন, তা যে পূর্ণ হয়নি—বা হবে না, তা তাঁদের জীবন-কালের মধ্যে উপলব্ধি করে গেছেন।

গান্ধীজীর মনের দুঃখ বুঝেছিলেন—বাদশা খান-খান আবদুল গফ্ফর খান এবং মৌলানা আজাদ। কংগ্রেস যখন দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিল, তখন ভারতে মৌলানা আজাদের স্থান কি? আর বাদশা খান তিনি দ্বিজাতি তত্ত্ব মানতে পারলেন না,—পাকিস্তানে তাঁর স্থান কোথায়! বাদশা খানকে গান্ধীজী এই সময় বলেছিলেন "যদি ভারত বিভক্ত হয়, তা-হলে আমি পাকিস্তানেই থাকব।"

তাঁর মৃত্যুর আট দশ দিন পূর্বে একদিন সন্ধ্যার পর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এই লেখক যায়। নৈশ আহার শেষ করে প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হচ্ছিল। গান্ধীজী বললেন—"আমি এখানে থাকব না; আমি নোয়াখালী যাব; সেখানে গিয়েই মরব।" এই লেখক তখন বলল, "মহাত্মাজী! আপনি ত' ১২৫ বছর বাঁচতে চান; তবে এখন মরার কথা বলছেন কেন?" বিষাদের সঙ্গে জবাব দিলেন "হ্যাঁ, আমি ত' বাঁচতে চাই; কিন্তু তোমরা যদি বাঁচতে দাও, তবে ত' বাঁচব।" (Provided you all allow me to live) —কিন্তু আমরা তাঁকে বাঁচতে দিলাম না। হয়ত ভারতের আত্মিক সত্তাকেও সেই সঙ্গে শেষ করেছি।

শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে

জয়প্রকাশ নারায়ণ

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বহুমুখী। গানার মাইরদল (Gunner Myrdal) বলেছেন যে, এ যেন এমন এক বহুধার বিশিষ্ট রত্ন যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের পক্ষেও সমগ্র গান্ধীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা দুরূহ। নিজে আমি তাঁর দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত এবং স্বয়ং আমি তাঁর এক নগণ্য সৈনিক ছিলাম বলে এখানে আমি তাঁর জীবনের কয়েকটি দিকের কথা বলার চেষ্টা করব।

সচরাচর একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের অধিকার অর্জনকে গান্ধীজী নিজের জীবনের ব্রত করলেও তাঁর বিচারধারা, সত্য নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাঁর গভীরতম আধ্যাত্মিক ও মানবীয় চেতনা এবং যেসব আয়ুধ ও পদ্ধতির তিনি আবিষ্কার করেন তার বিশ্বজনীন ও চিরকালীন তাৎপর্য আছে। এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত যেদেশ ভারতবর্ষ থেকে এত ভিন্ন ধরনের, লুই ফিশারের মতে সেখানেও 'গান্ধীজী অত্যন্ত সজীব।' তাঁর জবানিতেই কয়েকটি উদাহরণের কথা শুনুন :

"১৯৪২ ও ১৯৪৬ সনে গান্ধীজীর 'কুটীরের' অতিথি হবার পর আমেরিকার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমি তাঁর উপবাসের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আমার প্রয়াসের সচরাচর এই প্রতিক্রিয়া শুনেছি যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন কিছু নিয়ে উপবাস করা হাসির ব্যাপার হবে। আজ কিন্তু আমেরিকাতে শান্তির জন্য উপবাস করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ম্যাসাচুসেট-এর স্মিথ কলেজের ১২৭৭ জন ছাত্রী ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে তিনি দিন উপবাস করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াইশ' ছাত্র যাদের মধ্যে তাঁদের ফুটবলের দলের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ক্যাপ্টেনও ছিলেন, ১৯৬৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শান্তির জন্য উপবাস করেন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও কয়েক জায়গায় ভিয়েৎনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরোধী অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজও উপবাস করেছেন। তাঁরা গান্ধীজীর উদাহরণের প্রশস্তি গেয়েছেন।...ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে হাজার হাজার যুবক কারাবরণ করেছেন।...আমেরিকার বিমান বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন ভিয়েৎনামের যুদ্ধের জন্য বিমানের পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেবার হুকুম অগ্রাহ্য

করার অপরাধে এক বছরে জন্ম কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন।" আপনাদের মধ্যে যাঁরা ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের কর্মধারা ও আত্মজীবনীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে, আমেরিকার সেই মহান সন্তান গান্ধীজীর প্রতি তাঁর গভীর ঋণের কথা কেমন ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। অন্যান্য দেশ থেকেও এজাতীয় বহু উদাহরণ পেশ করা যায়।

কেবল অহিংস প্রতিরোধের ক্ষেত্রেই গান্ধীর জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য নেই, যদিও এইটাই গান্ধীজীর কৃতির সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অঙ্গ। সমগ্র মানবীয় ও সামাজিক জীবন ব্যেপে দেশ কালের উর্ধ্বে তাঁর জীবনী ও বাণীর আবেদন। এর কারণ হল এই যে, গান্ধীজীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় রাজনীতি বা সমাজের অন্যান্য অনুরূপ কার্যকলাপ ছিল না। মানবজাতি—প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সত্য-সন্ধানী এবং সত্যই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর। তবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্য তাঁর আরাধ্য ছিল না, তিনি যে সত্যের উপাসক ছিলেন তা হল জীবন-নির্ভর। এর অর্থ হল তাঁর সাথী প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণ সাধন। নূতন কোন সত্যের আবিষ্কার করেছেন বলে তিনি দাবি করেন নি, নম্র ভাবে তিনি বলে গেছেন যে, পুরাতন সত্যের উপর তিনি 'নূতন আলোক সম্পাত' করেছেন।

রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক ও বর্ণবিদ্বেষের সামনে ন্যায়বিচার পাবার জন্য গান্ধীজী যেসব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সেই সব আন্দোলন চলাকালীন অন্যায়কারীদের আক্রমণ করা বা তাঁদের বিরূপ সমালোচনা করার থেকে তিনি বহুল পরিমাণে জোর দিতেন অত্যাচারিতের শুদ্ধি ও সংস্কারের উপর। ইংলণ্ডের হাত থেকে ভারতের মুক্তি অর্জনের সমগ্র আন্দোলনে তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে একটি কটু কথাও বলেন নি ও তাঁদের বিরুদ্ধে কখনও ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করারও প্রয়াস পান নি। শাসক হিসাবে তাঁদের নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি তিনি কেবল তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁদের দমননীতির সামনে জনসাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মনিগ্রহবৃত্তি সংস্থাপন করে তিনি ইংরেজদের সুপ্ত মানবীয় সদ্‌গুণাবলী জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কারণেই আরনল্ড টয়েনবী লিখেছেন,"গান্ধী তাঁর স্বদেশের মত আমার দেশেরও মহদোপকার সাধন করেন। ইংরেজের পক্ষে ভারতের উপর শাসন চালিয়ে যাওয়া তিনি অসম্ভব করে তুলেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার আমাদের পক্ষে অসূয়া ও অসম্মান ছাড়াই শাসনক্ষমতা পরিত্যাগ করা সম্ভবপর করেছিলেন।…

ঔপনিবেশিক শাসনরূপী গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসার জন্ম ইংরেজদের সাহায্য করার সময় তিনি তাঁদের অভাবনীয় উপকার করেন। কারণ সাম্রাজ্য অর্জন করা সহজ ; কিন্তু তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন।"

তবে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে গান্ধীজী ছিলেন কঠোর সমালোচক ও অধ্যবসায়ী শিক্ষক। নিজ দেশবাসীর ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রতি তিনি ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এবং তাঁর 'গঠনমূলক কর্মসূচীর' অন্তর্ভুক্ত বহুবিধবাস্তব কার্যক্রমের সহায়তায় ক্রমাগত তাদের অধিকতর সমৃদ্ধ, নির্ভীক ও আত্মনির্ভর করার চেষ্টা করেন। ভারতবাসীকে সত্যাগ্রহে (বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যাগ্রহ অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধের রূপ নিত) প্রবৃত্ত করার সময় এর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত আত্মনিগ্রহকে মূলতঃ আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করা হত। এই ভাবে তাঁর তাবৎ সফল সংগ্রামে, 'বিজয়ী হত মানুষ নয়, নৈতিক বিধান'। তবে গান্ধীজী যে সর্বদাই সফলকাম হতেন তা নয়। কিন্তু এমন কি তাঁর ব্যর্থতাগুলিও সমাজের নৈতিক অগ্রগতির দিক্‌চিহ্ন স্বরূপ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সেগুলির মৌলিক অবদান আছে।

পূর্বোক্ত উক্তি থেকে একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন জীবনের মধ্যে গান্ধীজী কোন পার্থক্য করতেন না। তাঁর কাছে, 'নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি ও অনৈতিক সমাজ' ছিল সম্পূর্ণ ভাবে অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। মানবীয় আচরণের ক্ষেত্রে এজাতীয় দ্বৈত মানদণ্ডকে তিনি ধর্মবিরোধী এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। নিজের জীবিতকালে তিনি রাজনীতিকে শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করার অবিরল চেষ্টা করেন এবং এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেন। স্বাধীনতার পরও সেকাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তাঁর একান্ত সচিব ও জীবনীকার প্যারেলালজী লিখছেন, "আর কিছু দিন জীবিত থাকলে হাতের কাজ শেষ হওয়া মাত্র প্রথম সুযোগে তিনি রাজনীতির শুদ্ধিকরণের কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন।" প্যারেলালজী কর্তৃক উদ্ধৃত গান্ধীজীর নিম্নোক্ত উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, "এই অগ্নিপরীক্ষা (অর্থাৎ দেশ-বিভাগের পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) থেকে যদি আমি উত্তীর্ণ হই তাহলে আমার প্রথম কর্তব্য হবে রাজনীতির সংস্কার সাধন করা।" এছাড়া ছিল এক নূতন ভারতবর্ষ—তাঁর ধ্যানের ভারত গড়ার দুরূহ দায়িত্ব। তাঁর ধ্যানের এই ভারতের লক্ষ্য হবে সর্বোদয় অর্থাৎ নির্বিচারে সকলের কল্যাণ সাধন। সেই

ভারতের সমাজব্যবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে নেহাৎ যদি রাষ্ট্রবিহীন নাও হয় সেখানে উপর থেকে চাপান প্রশাসন হবে যথাসম্ভব কম এবং অধিকাংশ প্রশাসন পরিচালিত হবে জনসাধারণের দ্বারা। যে সমাজে সবাই বিকাশের সমান সুযোগ পাবে এবং কোন রকমের শোষণের অস্তিত্ব থাকবে না। সেই সমাজে স্বাধীনতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি প্রকট হবে এবং প্রত্যেকে সেখানে সবার জন্য ও সকলে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জীবন ধারণ করবেন। স্বয়ং তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের কাজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবার পরিবর্তে বরং শুরু হবার উপক্রম করেছিল। এবং যদিও তখন তাঁর বয়স ৭৮ বৎসর, তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যায় এক অনন্যসাধারণ সর্জনাত্মক জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল অধ্যায় হত।

গান্ধীজী যে তাঁর অভীপ্সিত কার্য সমাপন করে যেতে পারেন নি এ কেবল ভারতেরই চিরকালীন লোকসান নয়, মানবজাতির মহান ক্ষতি। তবে সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি কি ভাবে একার্য সম্পাদন করার কথা ভাবছিলেন তার কিছুটা আভাস তাঁর রচনা ও উক্তি থেকে পাওয়া যায়। পূর্বে সংক্ষেপে তাঁর এই কর্তব্যের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তার প্রকৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হবে যে নিঃসন্দেহে পূর্বেরই মত গান্ধীজীর লক্ষ্য-সাধনের ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়া হত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের এবং সেবা ও আত্মোৎসর্গভিত্তিক আত্মশুদ্ধির ব্যাপক কার্যসূচী হত এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার পরিণামে শেষ অবধি এক ধরনের প্রতিষ্ঠান-গত বা সামাজিক সংস্কার অথবা বিপ্লব সংসাধিত হত। স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে এজাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসের অপরাপর সকল বিপ্লবী নেতাদের মত গান্ধীজী স্বয়ং রাজ-নৈতিক ক্ষমতা হাতে নেন নি, যা তিনি ইচ্ছা করলেই পেতে পারতেন। রাজ-নৈতিক ক্ষমতাকে এক পাশে ফেলে রেখে গান্ধীজী কাজের অন্যবিধ প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে আমি এইসব অন্যবিধ প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্রের কথা মাত্র উল্লেখ করব। স্মরণ থাকতে পারে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজীর হাতে অনুগ্র জাতীয়তাবাদীদের একটি আবেদন নিবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে থেকে শান্তিময় গণ-অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর তিনি নূতন করে আর একবার এই প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর ঘটিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বদলে নিঃস্বার্থ লোকসেবকদের সঙ্ঘে

পরিণত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর পরলোকগমনের পর তাঁর 'শেষ ইচ্ছা ও নির্দেশনামা' প্রকাশের জন্য বিশ্ববাসী প্যারেলালজীর কাছে কৃতজ্ঞ। প্যারেলালজীর নিজের জবানিতেই তদানীন্তন পরিস্থিতির কথা শোনা যাক: "কংগ্রেসকর্মীরা তাঁদের অতীতের ত্যাগ তপস্যার প্রতিদান জোটাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের আচরণের মানও উল্লেখযোগ্য ভাবে নেমে গিয়েছিল। আনুগত্যের অবক্ষয় পর্ব চলছিল আর চলছিল ক্ষমতার জন্য কামড়া-কামড়ি।" প্যারেলালজী বলেছেন যে, গান্ধীজী তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা যেন, "স্বাধীনতাকে বিধৃত করে রাখেন ও উপলব্ধি করেন যে স্বাধীনতা মূর্তিমান হতে হলে স্বাধীনতা অর্জনেরই মত কঠোর পরিশ্রম, সেবা ও আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। তাই কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের এক স্বতঃ-আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। ক্ষমতা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু বর্জন করতে হবে এবং জনসাধাণের অহিংস শক্তি গড়ে তোলার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে যাতে রাজনীতির শুদ্ধিকরণ হয় ও রাজনীতি জনকয়েকের আধিপত্যলিপ্সা ও সমৃদ্ধির সাধন হবার পরিবর্তে যেন সেবার মাধ্যম হয়।" এই লক্ষ্য সাধনের জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া (তাঁর শেষ ইচ্ছা ও নির্দেশনামা) তিনি তৈরি করেন যা তাঁর পরলোকগমনের পর হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।..." গান্ধীজীর তিরোধানের পর এমন আর কেউ রইলেন না যিনি কংগ্রেসের এই জাতীয় রূপান্তর ঘটাবার যোগ্যতা রাখেন এবং তার ফলে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার কথা যাঁরা দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল তাঁদের সবার কাছেই স্পষ্ট।

গান্ধীজীর অতুলনীয় কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার জন্যই আমি প্যারেলালজীর প্রামাণ্য রচনা থেকে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছি। এইজন্যই ভিনসেণ্ট শীন লিখেছেন যে, গান্ধীজী ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বাইরে ছিলেন না—তিনি স্বয়ং ছিলেন ক্ষমতা। এসিয়া ও আফ্রিকার যাবতীয় উন্নয়নশীল দেশেই দেখা যায় যে, রাজনীতি সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। স্বয়ং রাজনীতিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হয় এবং জনসাধরণের নৈতিক সমর্থন ও অহিংস শক্তির বলে কি ভাবে এক নূতন সামাজিক বিধান রচনা করতে হয় জীবিত থাকলে গান্ধীজী তা করে দেখাতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে তাঁর উদাহরণ মূর্ত না হলেও এর ভাবধারা রয়েছে যা আমরা সকলে অনুসরণ করতে পারি।

রাজনীতির মত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও গান্ধীজীর কথা সত্য। গান্ধীজীর কাছে

অর্থশাস্ত্র নিছক ধনবিজ্ঞান নয়। এর একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং তিনি চাইতেন যে, অর্থনীতি যেন সমাজের সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সংসাধনের প্রয়াস করে। কেবল মুনাফাবৃত্তির দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালিত হলে চলবে না—সমাজের কল্যাণ ও ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তির সুখ স্বাধীনতা ও সর্জনশীল বৃত্তির পরিপূরক হবে অর্থনীতি। মানুষের ভৌতিক চাহিদা পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক আধ্যাত্মিক ও শিল্পরুচির (aesthetics) ক্ষেত্রস্থ চাহিদারও সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। সেইজন্ত ভৌতিক চাহিদাকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়ান চলবে না। কারণ এর ফলে মানবজীবনে ভারসাম্যের অভাব সূচিত হয় ও মানবীয় মূল্যবোধেরও বিকৃতি ঘটে। আর্থিক শোষণ ও অবিচার নীতিবিগর্হিত এবং শোষিত ও নিঃস্বদের মত শোষণকারী ও মালিক সম্প্রদায়েরও সমান ক্ষতি এর ফলে হয়। ইঞ্জিনিয়ার অথবা অদক্ষ শ্রমিক যারই শ্রম হোক না কেন, সব রকমের শ্রমের মূল্যই সমান। ত্রিশের দশকে আমাদের মধ্যে জন কয়েক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর একটি সমাজবাদী দল গঠন করার সময় আমাদের দলের কর্মসূচী আমি গান্ধীজীকে দেখিয়েছিলাম। তার ভিতর থেকে তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় একটি কর্মসূচীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেটি ছিল মার্কসের সেই বিখ্যাত নীতি—"প্রত্যেকের যোগ্যতার পরিবর্তে তার প্রয়োজন অনুসারে।"

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ বহুলাংশে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের অনুরূপ হলেও এর প্রয়োগ-পদ্ধতি ও তাঁর আদর্শের আর্থিক সংগঠন সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই মতবাদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যের কারণের মূল রয়েছে আবার যাবতীয় মানবীয় ও সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। গান্ধীজীর কাছে দরিদ্র ও নিপীড়িতের সেবাই ছিল ঈশ্বরের আরাধনা। তিনি মনে করতেন যে, অত্যাচারকারী ও ও শোষকেরও অত্যাচারী ও শোষিতের মতই সাহায্যের দরকার। তাঁর প্রক্রিয়া ছিল প্রেম ও সেবার দ্বারা এবং প্রয়োজন পড়লে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধের সহায়তায় প্রতিপক্ষের 'পরিবর্তন' সাধন করা।

স্বাধীন ভারতবর্ষে নিজ ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্ত গান্ধীজী জীবিত ছিলেন না। বর্তমান মুহূর্তে যখন যাবতীয় বিপ্লবী মতবাদ সম্বন্ধেই মানুষের এতটা মোহভঙ্গ হয়েছে সে সময় গান্ধীজীর অবদান সম্মুখের অন্ধকার পথকে আলোকিত করত।

ভারতবাসী হিসাবে আমাকে দুঃখ ও অনুশোচনাভরে স্বীকার করতেই হবে যে যদিও ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে জন্ম দেয় এবং তাঁকে জাতির জনকরূপে বন্দিত করে, এযাবৎ আমাদের স্বদেশ তাঁর উপদেশাবলীর প্রতি অতি অল্পই কর্ণপাত করেছে। এদেশের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল আরও বহু রকমের আদর্শ। তবে বিগত বিশ বছর যাবৎ সেসব আদর্শ অনুসরণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর আজ যেন আত্মানুসন্ধানের একটা বৃত্তি দেখা দিয়েছে এবং গান্ধী-শতবার্ষিকীর বছরে একটা আশা জেগেছে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অপরাপর ক্ষেত্রের নেতৃবর্গ সম্ভবতঃ অনতিবিলম্বে গান্ধীজীকে নূতন করে আবিষ্কার করবেন।

ক্রান্তি পুরুষ গান্ধীজী

ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী

কলেজে পড়বার সময় গান্ধীজীর প্রভাব প্রথম আমার উপরে পড়ে। সে সময়েই অভয় আশ্রমের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। এই সংস্থা গান্ধীজীর আদর্শে এবং তাঁরই প্রেরণায়, তাঁরই দেওয়া নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভয় আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ গান্ধীজীর আদর্শ এবং তাঁর কর্মধারাকে অধিকতর জানার জন্য আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। ১৯৩০ সাল। গান্ধীজীর ডাণ্ডিযাত্রা এবং লবণ সত্যাগ্রহ দেশব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী তখন ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুস্থান উথল-পাথল হয়ে উঠবে। প্রথম অবস্থায় অনেকে তা অবিশ্বাস করলেও পরিণামে লবণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ অভূতপূর্ব অনমনীয় গণ-সংগ্রাম হয়েছিল তার তুলনা নাই। কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হল। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাঁথির লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে আমারও গান্ধী-ভাবনায় প্রত্যক্ষভাবে হাতে খড়ি হল। কয়েকবার কারাবাসে গান্ধীবিচার গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ আসে। অন্তরের অন্তঃস্তলে অনুভব করলাম, গান্ধীজী শুধু ক্রান্তদর্শী নন। তিনি ক্রান্তিকারী। বিশ্বের আর্ত মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্য তাঁর আবির্ভাব এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে।

তিনি ক্রান্তদর্শী—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম শক্তির দ্বারা মানবীয় সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের তিনি হচ্ছেন মূর্ত প্রতীক। তাঁর কৃতি, তাঁর কর্মসূচী মানব-বিকাশের অন্তহীন যাত্রার পথে এক নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। দেহ, মন, আত্মার এক পরিপূর্ণ বিকাশের বীজ প্রকাশোন্মুখ হয়ে তার অন্তরে নিহিত রয়েছে। সৃষ্টির উষাকাল হতে অভিব্যক্তির তাড়নায় সে এগিয়ে চলেছে। বিংশ শতকের মানুষ এমন এক স্তরে এসে পৌছেছে যেখানে নবতর অভিব্যক্তির জন্য তার মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন অনিবার্য। এই মূল্যবোধের মূল কথা বিশ্ব মানবের ঐক্যবোধ। এই বোধ জাগ্রত করার জন্য স্বার্থ প্রেরণার পরিবর্তে আসবে পরার্থ প্রেরণা, হবে এক নব মানসের বিকাশ। শোষণ, অবিচার, অসাম্য এ সবের মূলে রয়েছে বিভেদ ও স্বার্থবুদ্ধি। এই সমস্যাগুলো পুরান মনেরই

সৃষ্টি। ক্রান্তদর্শী গান্ধী এই পুরান মন পরিবর্তন করে এক নব মানস সৃষ্টির সাধনা করে গেছেন। এই নব মানসের যোগ্য হাতিয়ার হল তাঁর সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের শব্দগত অর্থ হল সত্যের প্রতি আগ্রহ। 'সৎ'এর থেকে উৎপত্তি হল সত্যের। 'সৎ' মানে যা আছে, যা অবিনাশী। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁরই প্রকাশ অনন্ত বৈচিত্র্যে। সত্যাগ্রহী অনন্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশমান একেরই উপাসক। মানুষের মধ্যে যখন এই বোধ জাগ্রত হয়, তখন তার মধ্যে নির্বৈর, নিষ্পক্ষ ভূমিকা প্রকাশ পায়। তখন বৃহৎ মানব-পরিবারের মধ্যে যে সমস্যা রয়েছে, 'সর্বেষাম অবিরোধেন' নির্বৈর প্রতিকার সে খোঁজে। এই খোঁজার পথ সত্যিকার অর্থে ক্রান্তি, বিপ্লব বা মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। বৃহৎ সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে নির্বিরোধ প্রতিকারের পথে গান্ধীজীই বোধ হয় সর্বপ্রথম মহামানব যিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রত্যেক যুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। পাশ্চাত্য মনীষীরা অষ্টাদশ শতককে Age of Rationality যুক্তিবাদের বলে নামকরণ করেছেন। তৎকালীন ফরাসী মনীষীবৃন্দ রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেসকো, দি দেরো প্রভৃতি তাঁদের অনুপম যুক্তিবাদের দ্বারা প্রাচীন-পন্থীদের মতবাদকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এই যুক্তিবাদেরই এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। ঊনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান। এবং এই সময়কে বিজ্ঞানের যুগ বলা যায়। যুক্তি ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক। এই শতকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিকাশ দৃষ্ট হল। বিজ্ঞান-যুগের পর এই বিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য কি? বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতির ফলে অণুশক্তির আবির্ভাব। অণুশক্তি এক নূতন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। তার হাতে এল যুগপৎ সংহারশক্তি এবং রচনাশক্তি। বিজ্ঞান এক হাতে প্রলয়ের শক্তি নিয়ে বিশ্ব মানবের সামনে এক নূতন চ্যালেঞ্জ এনেছে। বিজ্ঞান যেন ডেকে বলছে হয় এই এক বিশ্ব রচনা কর, নয় সর্বাত্মক ধ্বংসকে বরণ কর। এ কথার তাৎপর্য হল যে, এ যুগে—বিংশ শতকে হিংসার স্থান নেই। তৃতীয় মহাযুদ্ধ আজকের পরিস্থিতিতে অভাবনীয়। ছোট ছোট হিংসা আরও কিছুদিন চলতে পারে। কিন্তু হিংসার স্বাভাবিক পরিণাম বিচারশীল মানুষের নিকট সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। হিংসার হাতিয়ার দিয়ে মানব-সমস্যার সমাধান আজকে সাধারণ মানুষের নিকটও অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণীয়। বহির্জগতে বিজ্ঞান যেমন দূরত্ব কমিয়ে রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিবেশীতে পরিণত করেছে, তেমনি মানুষের অন্তর্জগতেও ঐক্যবোধের ভূমিকা

সে দৃঢ়তর করেছে। বিংশ শতককে সেই দৃষ্টিতে প্রেমশক্তির যুগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গান্ধীজী তার পুরোহিত। বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সন্ধি-স্থলে তাঁর আবির্ভাব। যুগস্থিতির অনুকূলে তাঁর যুগবাণী। তাই তিনি যুগপুরুষ।

তিনি ক্রান্তিকারী। তাঁর কৃতি অসামান্য। তাঁর জীবন ক্রান্তিদর্শন এবং ক্রান্তি কার্যের অপূর্ব সমন্বয়। ইতিহাসে এ বিরল। কোন কোন মহাপুরুষের ক্রান্তিদর্শন ঘটে। উত্তরপুরুষ তাঁদের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে তাঁদের ভাবনা ও পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করেন। মহাপুরুষ কার্ল মার্কসের ক্রান্তিদর্শন ঘটেছিল। শিল্প-বিপ্লবের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। আর্ত নিপীড়িত মানবের বেদনা তাঁর হৃদয়কে উদ্বেল করেছিল। তাৎকালিক পরিস্থিতিতে তিনিও নিঃস্ব মানুষের মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন। মানুষের বিকাশ-পথে,তার চিন্তা-জগতে এই মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর জীবিতকালে তাঁর ভাবনার পথে সমাজরচনার ক্রান্তিকার্য সম্ভব হয় নি।

বিংশ শতকে গান্ধী ছিলেন একাধারে ক্রান্তদর্শী এবং ক্রান্তিকারী পুরুষ। অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভায় লোক সংগ্রহ করে তাঁর দর্শনের বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রাথমিক সূচনা তিনি করে গেছেন। এক অভিনব উপায়ে নির্বিরোধ প্রতিকারের পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথকে তিনি সুগম করেছেন। এই নির্বিরোধ প্রতিকারের সাফল্য পৃথিবীর অনেক পরাধীন রাষ্ট্রকে প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে গান্ধীজীর মত ও পথ আশানুযায়ী গৃহীত হয় নি। এটা দেশের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করি। যে পরিমাণে দেশ গান্ধীজীর মত ও পথ হতে দূরে সরে এসেছে, সেই পরিমাণে তার দুর্ভাগ্যের বোঝা বেড়েছে। গান্ধীজীর পৌরুষ ও পরাক্রম ছিল অপরিমেয়। তাঁর প্রেমশক্তির অভিযানে তিনি দেশবাসীকে সেই রঙে রাঙিয়েছিলেন। জনগণের আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য লক্ষ্য। তাঁর ভাবনাই ছিল রাষ্ট্র শক্তি হবে লোকশক্তির অনুসারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকনেতা তথা রাষ্ট্রনেতারা বাপু নির্দিষ্ট পথ হতে বিচ্যুত হয়েছেন। দেশবাসী কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি অন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল। স্বাধীনতা লাভের একুশ বছর পরেও দেশের আজ যে চিত্র এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গান্ধীজী বহু সময়ে নিজেকে জন্মগত নৈরাজ্যবাদী 'বরণ এনার্কিস্ট' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর নিকট রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল খুবই গৌণ। তাঁর কল্পনার ভাবী সমাজের রূপ ছিল এক শাসনশূন্য পরিস্থিতি। দেশ বর্তমানে গান্ধী-ভাবনার বিপরীত পথে চলেছে। দিনে দিনে রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্র-নেতাদেরও দৃষ্টিভঙ্গী তাই। তাঁরা মনে করেন,

সরকার হলো জনগণের মা, বাপ। রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনে জনগণ চলবে। ফল হয়েছে, লোক-মানসের দৈন্য, লোকশক্তির নির্বীর্যকরণ।

বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব, এই ঐতিহাতিহাসিক বিধান অনস্বীকার্য। দার্শনিক হেগেল বলে গেছেন, থিসিস্—এ্যান্টিথিসিস্—সিন্থেসিস্। ভারতবর্ষে এখন এ্যান্টিথিসিস্ বা প্রতি বিপ্লবের পালা চলেছে। এর থেকেই উদ্ভব হবে সিন্থেসিস্' এই বিশ্বাস করি।

গান্ধীজী ছিলেন বিশ্বমানব। ভারতের সৌভাগ্য এদেশে তাঁর জন্ম। এ নিয়ে ভারতবাসী গর্ব করতে পারে। কিন্তু এই মহামানব, এই মহাত্মা, এই বিশ্বাত্মা কোন কালের পরিধিতে সীমিত নন। তিনি সর্বকালের, সর্বমানবের অক্ষয় সম্পদ। গান্ধীজী অনেক সময়ে বলতেন, তিনি শুধু আদর্শবাদী নন, তিনি বাস্তববাদী। তিনি যেমন কালাতীত, তেমনি কালেরও। শাশ্বত এবং তাৎ-কালিক এই দুয়ের অপূর্ব সমন্বয় আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। প্রেমশক্তির উদ্গাতারূপে তিনি ছিলেন বিশ্বমানব। তাঁর সত্যাগ্রহ, নির্বৈর প্রতিরোধ আজ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশে অহিংসার পথে সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিবাদী সংস্থা গড়ে উঠেছে। যুদ্ধবিরোধী ভাবনা দৃঢ়তার সঙ্গে দানা বাঁধছে। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইংলণ্ডের 'কমিটি ফর নন ভায়োলেণ্ট এ্যাকশান্,' 'ওয়ার রেজিস্টারস ইণ্টারন্যাশনাল', আমেরিকার 'ন্যাশনাল কমিটি ফর সেন্ নিউক্লিয়ার পলিসি', আরও কত কি। গান্ধী-ভাবনা ক্রমে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। এই ধারণার মধ্যেই বিশ্ববাসীর পরিত্রাণ।

ভারতবর্ষে নব সমাজ রচনার জন্য গান্ধীজী তাৎকালিক রচনাত্মক কার্যসূচী দিয়েছিলেন। কালের গতির সঙ্গে তারও বিবর্তন চলছে, চলবেও। কিন্তু তার শাশ্বত দিক নিত্যকালের সমগ্র জনমানসে নিরন্তর প্রেরণা যোগাতে থাকবে। গান্ধীজী কত বড় শক্তির অধিকারী ছিলেন, তা এত অল্প সময়ের পরিধিতে পরিমাপ করা শক্ত। বাপুকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি, তাঁর দর্শন, স্পর্শন পেয়েছি। তিনি যেন ছিলেন আমাদের ঘরের মানুষ ও রাষ্ট্র তথা পরিবারের পিতা। তাঁর আবির্ভাবের মহিমা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এলবার্ট আইনস্টাইন যেভাবে অনুভব করেছেন তাঁর লেখা থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করছি। 'Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.'

নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীর প্রয়াস

সাধনা সোম

সব দেশেরই প্রকৃত সম্পদ মানুষ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথিকৃৎ গান্ধীজী তাই যেখানেই মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অবিচার, মনুষ্যত্বের অবমাননা-কারী নিয়মকানুন, সামাজিক শৃঙ্খল দেখেছেন সেখানেই অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ডাক দিয়েছেন অত্যাচারিত জনমানসকে। সকল রকম দাসত্ব থেকেই জীবনকে মুক্ত করার জন্য তিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গিয়েছেন। নারী-সমাজের সর্বাত্মক মুক্তি প্রয়াস ঐ সংগ্রামেরই এক বৃহৎ ও মহৎ অংশ।

নারী-সমাজ তথা মাতৃজাতির অবদমন জাতি গঠনের পরিপন্থী। সমাজের এক বৃহৎ ও প্রধান অংশ দমিত রেখে দেশ উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। শুধু আইনগত ভাবে নয়, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার কার্যতঃ স্বীকৃত না হলেও দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল অসম্ভব। অসংখ্য সমস্যা-জর্জরিত ভারতীয় নারী-সমাজের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি নারী ও পুরুষের সমমর্যাদার কথা ঘোষণা করেন এবং ব্রতী হন সমান অধিকার কার্যকরী করার কাজে।

"নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি অনমনীয়। আমার মতে আইনতঃ এমন কোন বাধা বা অসুবিধা থাকিতে পারে না, যাহা পুরুষের নাই। আমি কন্যা ও পুত্রকে সম্পূর্ণ সমপর্যায়ে গণ্য করিব"— গান্ধীজী লিখলেন হরিজন পত্রিকায়। এভাবে নিজস্ব ধারণা ও মতামত তিনি তুলে ধরতে শুরু করলেন দেশবাসীর সামনে। "নারীগণ পুরুষের অধীন অথবা পুরুষ হইতে নিম্নস্তরের, ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। সকল ভাষাতেই উচ্চকণ্ঠে বলা হইয়াছে, নারী পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তুর দুইটি সমান ভাগ। ইংরেজী ভাষা আরো অগ্রসর হইয়া নারীকে বলিয়াছে 'পুরুষের শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ'। পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের যতখানি অধিকার, তাহারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। তাহার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যে নারী সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারিণী, যেমন পুরুষ তাহার নিজ কর্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে। ইহাই হওয়া উচিত স্বাভাবিক অবস্থা, শুধু লেখাপড়া শিখিবার ফলরূপে নয়। কেবল কু-প্রথার বলে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ পুরুষগণও নারীদিগের উপর এরূপ প্রভুত্ব উপভোগ করিতেছে, যাহার যোগ্যতা তাহাদের

নাই এবং যাহা তাহাদের থাকাও উচিত নয়। আমাদের নারীগণের হীন অবস্থার জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলনের গতি মধ্যপথে থামিয়া যায়।"

জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে নারীকে সাফল্য অর্জন করতে দেখলে তিনি আনন্দ পেতেন সবচেয়ে বেশী। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নারীর নৈতিক বল যাতে না হারায় সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি। পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে পুরুষের বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাদের সহ্য করতে হয়েছে। বহুক্ষেত্রে পুরুষের অত্যাচারে নারীকে মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। সেজন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারে সেজন্য কুটিরশিল্পের দিকে মন দেবার জন্য তাদের উদ্‌বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেন সেজন্য কাটুনী সঙ্ঘ। সঙ্ঘের নারীকর্মীরা তাঁকে শুধু 'বাপু' নয়, মায়ের মতই মনে করতেন। নারীদের ভয় ও বাধানিষেধের সকল অন্তরায় দূর করে দিত গান্ধীজীর সর্বজনীন স্নেহ ও ভালবাসা। তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং নিজ কর্মধারা নির্দেশ কালেও নারীদের সম অধিকার দিয়েছেন। সবরমতী, সেবাগ্রাম বা অন্যান্যক্ষেত্রে, তাঁর তত্ত্বাবধানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব সুস্পষ্ট। তাঁর মতে নারী যদি তার অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করতে পারে তবে পুরুষের বা পৃথিবীর কোন শক্তির অধীনতা স্বীকার করবার প্রয়োজন হয় না। নারী স্বেচ্ছায় 'জোর যার মুলুক তার' একথা স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন গান্ধীজী,—"যদি নারীগণ নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার ধারণা একবার ভুলিতে পারে তবে তাহারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীর দাসী নয়, স্ত্রী স্বামীর সহযাত্রী ও সহকর্মী। স্বামীর সকল সুখ দুঃখের অংশভাগিনী। নিজের কর্তব্য বাছিয়া লইতে স্বামীর যতটুকু অধিকার আছে স্ত্রীর অধিকারও তাহা হইতে বিন্দুমাত্র কম নয়।"

পুরুষের আশ্রয় না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ এবং পুরুষের মুখে নারীর দেহসৌন্দর্যের তথা আকর্ষণী শক্তির উচ্চ প্রশংসা ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শ খর্ব করেছে। সমাজে যে অধিকার কায়েম থাকার কথা, নিজেকে ছোট করে ফেলে নারী নিজেও তা করেছে ক্ষুণ্ণ। জাতির সামনে গঠনমূলক কার্যপ্রণালী প্রসঙ্গে গান্ধীজী তাই বলেছিলেন যে, অহিংস-নীতিই স্বরাজ অর্জনের সুনির্দিষ্ট উপায় এবং তাতে নারীর অবদান সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। "আমার

সবচেয়ে বড় আশা নারীগণের উপর। তাহাদিগকে যে কূপে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার লোকের প্রয়োজন।”

তিনি চেয়েছিলেন সকল দিক দিয়েই নারী হোক স্বাবলম্বী। “নারীকে আশ্রয়ের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। পুরাকালের দ্রৌপদীর ন্যায় তাহাকে নিজের চরিত্রবল, নিজের শক্তি এবং সর্বোপরি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে হইবে।”

নারীর স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হলে পঙ্গুভাবের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথে নারীর স্বাধীন চিন্তার একান্ত প্রয়োজন। সে বিষয়ে তিনি বলেন: “অতি অল্প সংখ্যক নারীই রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাঁহারা নারীর অধিকারের জন্য চিৎকার করিতেছেন। এইরূপ না করিয়া নারীকর্মীগণ নারী-দিগকে ভোটদাত্রীর তালিকাভুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইবেন, জাতিবর্ণগত যে সব শৃঙ্খল তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবেন এবং এইভাবে নারীগণের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইবেন যাহা ত্যাগে এবং আত্মোৎসর্গে নারীর শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পুরুষকে বাধ্য করিবে; নারীকে তাঁহার সম্মানিত আসন দিতে তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। তাঁহারা এইরূপ করিতে পারিলে বর্তমান সামাজিক অপবিত্র পরিবেশ বিশুদ্ধ করিতে পারিবেন। নারীগণকে এইরূপ ভাবে উৎসাহিত করা কর্তব্য যেন তাঁহারা গৌরবে পুরুষকে নিষ্প্রভ করিতে পারেন।”

পুরুষের ক্রীড়নক হওয়া ব্যাপারে নারীদের ত্রুটি যথেষ্ট, একথা আগেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সমমর্যাদার অধিকারী হয়েও নারী পুরুষের অধীন। সহযোগিনী বা সঙ্গিনী হবার পূর্ণ মর্যাদা লাভ না করে অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পুরুষের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করাকে নারীধর্ম মেনে নিয়ে নিজ জীবনকেই নিষ্পেষিত করেছেন। গান্ধীজী অল্পবয়স থেকে বিমুখ ছিলেন অন্যায় ও অবিচারের প্রতি। কিন্তু ঐ ‘ক্রীড়নক’ শব্দের প্রকৃত অর্থ যেদিন বুঝতে পারলেন, যেদিন বুঝতে পারলেন নারীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার তিনিও করে চলেছেন পুরুষের অহমিকা নিয়ে, সেদিন থেকেই নিজের ঘরেই আত্মশুদ্ধির কাজ আরম্ভ

করেন এবং স্ত্রীর প্রতিও ঘটান ভাবের পরিবর্তন। ঐ প্রেরণাতেই সমগ্র নারীজাতিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজ-সংস্কারে হলেন সচেষ্ট। আইন, অতীত ইতিহাস, এমন কি ধর্মের নামেও নারীর প্রতি যত প্রকার অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, তিনি তার বিরুদ্ধে সবল লেখনী পরিচালনা করেছেন, সকল সভা সমিতিতে আদর্শ প্রচারে হয়েছেন ব্রতী। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, পর্দাপ্রথা, মন্দিরে দেবদাসীর আত্মবিলোপ, গণিকাবৃত্তি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নারীজাতির আর্থিক পরাধীনতা এবং বিবাহিত জীবনের দাসত্ব-বন্ধন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিনা দ্বিধায়, নির্ভয়ে প্রকাশ করেছেন আত্মমত: "আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন পশুশক্তি প্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময়ে আত্মত্যাগের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলীয়সী।"

যে শিক্ষার বলে পুরুষ নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং নারীদের বদ্ধ করেছে সংস্কারের নানা কু-বন্ধনে, সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন: "যে কোন প্রকারেই হোক যুগ যুগান্তর হইতে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে এবং সেজন্য নারীর মনে সর্বদাই এই সংস্কার দানা বাঁধিয়াছে যে, সে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, ক্ষীণশক্তি। এই স্বার্থপ্রণোদিত শিক্ষা যাহা পুরুষ নারীকে দিয়া আসিয়াছে, নারী তাহার সততায় বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইয়াছে সে পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে অপকৃষ্ট। কিন্তু মনীষিগণ পুরুষ এবং নারীর সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন।"

নিরক্ষরতার দোহাই দিয়ে নারীজাতির উপর হয় নানা রকম অবিচার। সে বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ভাষা ছিল তীব্র অথচ পরিচ্ছন্ন: "নিরক্ষরতার দোহাই দিয়া নারীগণকে সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন সঙ্গত যুক্তি পুরুষের নাই। কিন্তু তাহাদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার দাবি করিবার এবং সেগুলি বুদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালনা করিবার, সেগুলি আরও বাড়াইবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিক্ষালাভ করা অত্যাবশ্যক।"

স্মৃতিশাস্ত্রে তথা ধর্মশাস্ত্রে নারীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ও বিধান রয়েছে তাঁর মতে সেগুলো সমস্তই গোঁড়ামি। নারীজাতি সম্বন্ধে সকল অশোভন উক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন: "ধর্মশাস্ত্রের নামে যাহা কিছু ছাপা হয় তাহাই ভগবদ্‌বাণী বা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই।" যে সকল শাস্ত্রবাক্যের নৈতিক মূল্য নেই অথবা যেগুলি ধর্ম ও নীতির মূলতত্ত্ব-বিরোধী, সেগুলি বর্জনের উপদেশও তিনি দিতে দ্বিধা করেন নি।

লিখেছিলেন তাই, "স্মৃতিশাস্ত্রে নারীদের সম্বন্ধে এখানে সেখানে যে সকল অশ্রদ্ধের ইঙ্গিত রহিয়াছে সেগুলির জন্য আমরা লজ্জিত হইব এবং সমাজচিত্ত হইতে তাহা শীঘ্র মুছিয়া যাইবে।"

চরকা নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে সহায়ক হবে এই মত তিনি পোষণ করতেন। নারী-সমাজের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তাঁর কাম্য, চরকাকে তিনি ঐ স্বাধীনতার পূর্ণ সহায়ক মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন: "নারী ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাহাকে পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনে পরিণত করিয়া পশুরও অধম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র পুরুষজাতি সমূলে বিনাশ হউক, ইহাই বরং আমি দেখিতে চাই। পশুত্বেরও হীন অবস্থা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সুবুদ্ধিপরিচালিত সহজ জীবনযাত্রায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। সেইজন্যই আমি বর্তমান ইন্দ্রিয়ভোগসর্বস্ব অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতেছি এবং পুরুষ ও নারীগণকে সহজ ও সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেছি। চরকার ভিতর ইহার সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে। আমি নারীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তরের সহিত কামনা করি।"

বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে নারী-জীবনকে রক্ষা করার জন্য গান্ধীজীর প্রয়াস সর্বজনবিদিত বলা চলে। অনেকক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, শিশু-বধূর হত্যা বা আত্মঘাতী-হওয়ার নানা ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, "এইরূপ অবস্থার জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী।" সে সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীজাতির ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করে লিখলেন: "কিন্তু মেয়েরা কি সর্বদাই পুরুষের উপর দোষ অর্পণ করিয়া নিজেদের বিবেককে বাঁচাইতে পারেন? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে নারীজাতির প্রতি এবং যে পুরুষজাতির তাঁহারা মাতৃস্থানীয়া তাঁহাদের প্রতিও কি কর্তব্য নয় যে, তাঁহারা নিজেরা সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা যে শিক্ষালাভ করিতেছেন তাহার সার্থকতা কী থাকে, যদি বিবাহের পর তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের খেলার পুতুল হইয়া পড়েন এবং অপ্রাপ্ত বয়সেই ভবিষ্যৎ মানব নামধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে লালনপালন করিবার কাজে ব্যাপৃত হন? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে পারেন। ইহাতে সময়ও লাগে না এবং কষ্ট স্বীকারও করিতে হয় না। কিন্তু সেই সকল সৎসাহসী নারীগণ কোথায় যাঁহারা বালবধূ ও বালবিধবাগণের ভিতর কাজ করিবেন? প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্বে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকার প্রত্যেক বালিকার

রহিয়াছে, যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাকে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যতদিন প্রত্যেক বালিকা সেই অধিকার বজায় রাখিয়া চলিবার যথেষ্ট ক্ষমতা নিজের ভিতর অনুভব না করিবে এবং যতদিন বাল্যবিবাহ অসম্ভব করিয়া তুলিতে না পারা যাইবে, ততদিন নিজেদের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না এবং পুরুষদিগকেও বিশ্রাম দিবে না—এইরূপ বীরাঙ্গনাগণ কোথায়?"

বিবাহিতা বালিকাদের জন্য তাঁর অন্তরে দুশ্চিন্তা ছিল, সে বিষয়ে তিনি তীব্র মন্তব্য করেন: "যে পুরুষ একটি অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করেন তিনি কোন মহান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাহা করেন না—নিছক ভোগবৃত্তির বশীভূত হইয়াই করেন। এই সকল বালিকাদিগকে কে রক্ষা করিবে।...শিশুবিবাহে পিতা কন্যাকে দান করেন, কন্যা কি পিতার সম্পত্তি বিশেষ যে তিনি কন্যাকে ইচ্ছামত দান করিতে পারেন? পিতা সন্তানের রক্ষক মাত্র; পিতৃত্বে কোন মালিকানা সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি পিতা কন্যার স্বাধিকারের সম্মান রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর রক্ষক বলা যাইবে না।"

সম্পত্তির অধিকার নারীদেরও হোক, গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করতেন। পুরুষ নারীর উপর অত্যাচার করার সাহস রাখে সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়ার বলে। তিনি লেখেন: "পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্সু। সম্পত্তির পূর্ণাধিকার এই ক্ষমতা প্রদান করে। পুরুষ এই ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়া মৃত্যুর পর যশঃ আকাঙ্ক্ষা করে।"

বাল্যবিবাহের মতই বিপত্নীকের পুনঃ বিবাহও তিনি ঘৃণা করতেন অন্তরের সঙ্গে। "বালবিধবাকে দেখিলে আমি শিহরিয়া উঠি। সদ্য বিপত্নীক স্বামীকে নিষ্ঠুর নির্মমতার সহিত পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে আমি রাগে কাঁপিতে থাকি। যে সকল পিতামাতা তাঁহাদের কন্যাদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর কোন অবস্থাপন্ন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া নিষ্কৃতি লাভের জন্যই শুধু তাহাদিগকে লালনপালন করেন, আমি তাহাদের এই অমার্জনীয় উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করি। এই রাগ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমি সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করি।"

বিধবা নারীর অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন গান্ধীজী বলেছিলেন: "বিধবা-বিবাহে কোন পাপ নাই। পাপই যদি হইবে তাহা হইলে বিপত্নীকের বিবাহে যে পাপ ঘটে তাহার অপেক্ষা অধিক পাপ ইহাতে স্পর্শে না।"

পণপ্রথার উচ্ছেদ করা না গেলে বিবাহিত জীবনের গ্লানি দূর হওয়া অসম্ভব।

পণপ্রথা নারীজীবনের পক্ষে এক চরম অসম্মান একথা বুঝবার মত মন নারীদের হলে তবেই তারা আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়াসী হতে পারবে। তা না হলে সামাজিক অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে চিরবলি হয়ে আত্মসত্তাকে অবদমিত রাখবে। পণপ্রথা অতি ঘৃণ্য বেচাকেনার ব্যবস্থা। এ প্রথার অবসান হলেই নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়ার বাধা দূর হবে। সে সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখলেন: "পণপ্রথার উচ্ছেদ করিতে হইলে স্কুলে ও কলেজে এবং কন্যাদের পিতামাতাদের মধ্যে পণপ্রথা বিরোধী ভাবনার বহুল প্রচার ঘটানো প্রয়োজন। পিতামাতা কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দিবেন, তারা যেন পণ্যমূল্য দিয়া বিবাহিত হওয়ার গ্লানি বহন না করিয়া বরং চিরদিন অবিবাহিত থাকাই শ্রেয় মনে করে। বর ও বধূর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও স্বাধীন সম্মতি বিবাহের একমাত্র শর্ত বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।" পণ সহযোগে বিবাহকে 'আত্মবিক্রয়' এবং 'নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা' বলে বর্ণনা করেছেন। বিবাহের আগে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পণ এবং তারপরও বিশেষ বিশেষ সময়ে বহু পরিমাণে টাকা গ্রহণ করাকে যুবকদের পক্ষে 'কলঙ্ক' বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন: "কোন যুবক যখন পণকে বিবাহের শর্ত করে তখন সে তাহার শিক্ষাকে এবং তাহার দেশকে অধঃপাতিত করে এবং স্ত্রীজাতির অবমাননা করে।...অপমানজনক পণপ্রথা হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে এবং যে সকল যুবক এইরূপ অসদ্‌ভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা তাহাদের জীবন কলুষিত করে তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া উচিত। কন্যার পিতামাতাও বিলাতী উপাধির মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কন্যাদের জন্য সত্যপ্রিয় সৎসাহসী যুবক সংগ্রহ করিবার জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র বংশ ও প্রদেশের গণ্ডি অতিক্রম করিতে দ্বিধা করিবেন না।"

এমনি নানা সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্যই নারীর ভোটাধিকার এবং পুরুষের সমপর্যায়ে তাঁদের আইনগত অধিকার লাভের জন্য গান্ধীজী বিভিন্নভাবে চেষ্টিত ছিলেন: "যে সকল শৃঙ্খল নারীর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে, আমি সেগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে চাই।"

"পুরুষের সহিত সমান পর্যায়ে অংশীদার হইতে হইলে পুরুষের এমন কি স্বামীরও মনোরঞ্জনের জন্য নারীকে সাজসজ্জা হইতে বিরত হইতে হইবে। বাহিরের সাজসজ্জা দ্বারা রামের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য সীতা কখনও একটি মুহূর্ত নষ্ট করিবেন ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।"—গান্ধীজীর উক্ত

মতামত থেকেই বুঝতে পারা যায়, নারীদের অধিকারে নারীরা নিজেরাই প্রতিবন্ধক, কিন্তু তাঁর গভীর মমতাবোধ সেখানেও নারী-সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। নারী-জীবনের প্রতিটি দিকেই এভাবে তিনি করুণা ও কল্যাণ দৃষ্টি ফেলেছেন এবং সামাজিক অত্যাচারের কবল থেকে তাদের রক্ষা করে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী করার জন্য জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত চেষ্টা করে গিয়েছেন। এক কথায় বলা চলে বর্তমান ভারতে নারীর যে অগ্রগতি, বিভিন্ন দিকে ভারতীয় নারী যে আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন তার মূলে রয়েছে গান্ধীজীরই অবদান। চীনে নারীর পা জন্ম থেকে বিকৃত করে গতিহীন করে রাখা হত, আর ভারতীয় নারীর সমস্ত মনটাকেই সংস্কারের কুঠারে রুদ্ধগতি করে জীবন্মৃত করে রেখেছিল যুগ যুগান্তর। গার্গী মৈত্রেয়ীর যুগ থেকে বহু পিছিয়ে পড়েছিল পরবর্তী নারী-সমাজ। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারীর পায়ের শৃঙ্খল চূর্ণ করেছেন জাতির জনক বাপুজী—এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নির্ভীকতা, আত্মমর্যাদা রক্ষা, সুতাকাটা, ভোটের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পণপ্রথা বিলোপ, পতিতা বৃত্তির নিরসন, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, অনুগ্রহভিক্ষা না করা, নারী কর্মী গঠনে মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান, পর্দা প্রথার অবসান, অহিংস প্রতিরোধ, গ্রামীণ নারী-সমাজের প্রতি শিক্ষিতা নারীদের কর্তব্যবোধ জাগরিত করা, জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণে নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা, নারী স্বেচ্ছাসেবিকা গঠন, নারীদের জন্য পরামর্শ পরিষদ গঠন—এমনি হাজার দিক থেকে গান্ধীজীর সচেষ্ট আশীর্বাদ বর্ষিত হয়ে ভারতীয় নারীদের অধিকার ও জীবন রক্ষা করে এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর কূল পর্যন্ত। পৃথিবীর নারীজাতির কাছে বর্তমান ভারতীয় নারীর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা গান্ধীজীরই চিন্তা ও চেষ্টার ফল। তিনি পুনর্জীবন দিয়েছেন ভারতীয় নারীসমাজকেও।

"আমরা দেখিতে পাই যে, নারীকে ছোট করিয়া দেখা পুরুষের একটা অভ্যাসে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমান যোগ্যতা থাকিলে পুরুষকে মনোনীত না করিয়া নারীকে মনোনীত করিলে বিপরীত প্রথায় গিয়া পড়িতে হয়। শুধু পুরুষ কি নারী ইহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সত্য নির্বাচনই দরকার।"

অহিংস সংগ্রামে নারীদেরই তিনি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার মনে করে অপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করে গিয়েছেন। 'নারী নরকের দ্বার' বা 'পথি নারী বিবর্জিতা', ইত্যাদি কু-নীতিকে তিনি বলিষ্ঠ হাতে দূর করে ডাক দিয়েছেন মহিলাদের: "এই

অহিংস সংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের দান অনেক বেশী হইবে। নারীকে পুরুষ হইতে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করা মিথ্যা অপবাদ, ইহা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার। যদি শক্তি দ্বারা পশুবল বুঝিতে হয় তবে নারী পুরুষ হইতে বাস্তবিক কম শক্তিশালিনী, যদি শক্তি দ্বারা নৈতিক বল বুঝিতে হয় তবে পুরুষ হইতে নারী অপরিমেয় রূপে অধিক শক্তিশালিনী। তাহাদের স্বভাবজাত বুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারী ব্যতিরেকে পুরুষের অস্তিত্ব থাকে না। যদি অহিংসা আমাদের জীবনের মূলনীতি হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে।"

'দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে'—এতবড় সম্মান ও দায়িত্ব জাতির জনক দিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় নারী-জাতিকে। নারীই শান্তির দূত একথা মর্মে মর্মে সত্য। অবশ্য তাঁর তিরোধানের পর নারীর বিগত দুর্বলতা ইত্যাদি পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে।

গান্ধী শতবার্ষিকীর সূর্যোদয়ে আবার ভারতীয় নারী যেন গান্ধী-বাণীর সূর্যালোকে আত্মদর্শনে ব্যাপৃতা হন, না হলে লক্ষ লক্ষ নারী আবার অন্ধকূপের পথেই যাত্রা করে আত্মহত্যা করবে।

নারীদের প্রতি তাঁর উপদেশ স্মরণ ও উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধে সমাপ্তির রেখা টানবো আজ। "নারীদিগের প্রতি আমার উপদেশ এই—তাহারা শহর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে যাউক; সেখানে সেবার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাদের জন্য রহিয়াছে। তাহারা সহজ জীবন যাপন করিবে এবং গরীবদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। যদি তাহারা রেশমী শাড়ী এবং সাটিনে সজ্জিত হইয়া এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া তাহাদের ধনের গর্ব প্রদর্শন করে তাহা হইলে বিপদ এড়াইতে গিয়া তাহারা দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হইবে।"

নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক শতাব্দী ধরে যে সংগ্রাম তা যেন ক্রম-ক্ষুণ্ণ হয়ে সমাজকে আবার গ্রাস না করে। নারী-সমাজে আজ আবার যেন আদর্শহীনতা ছায়া ফেলে চলেছে, সেখানেই ভয়।

গান্ধীজীর আদর্শ ভারতীয় নারীকে যেন চিরদিন অনুপ্রাণিত করে।

বন্দে মাতরম্।

গান্ধীবাদ কি অচল?

অম্লান দত্ত

সত্যের যেমন স্তরভেদ আছে গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্বেরও তেমনই ছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে গান্ধীর শিক্ষা এ দেশের অধিকাংশ নেতা মেনে নিয়েছিলেন শুধু আংশিকভাবে ও কয়েকটি সহজ ব্যবহারিক কারণে।

এ শতাব্দীর গোড়ায় সন্ত্রাসবাদীদের আশা ছিল যে, তাঁরা বিদেশী শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানবেন। কিন্তু জার্মানি বা জাপান কারও কাছ থেকেই আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া গেল না। সে যুগে বিদেশী অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ও তাতে ক্রমাগত অসাফল্যের কথা মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে গভীর হতাশার সুরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্যের সম্ভাবনা ম্লান হয়ে এলো অন্যদিকে তেমনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেও সন্ত্রাসবাদী চিন্তাকে উৎসাহিত করবার মতো ফাটল দেখা গেল না।

এ অবস্থায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার চিন্তার অবাস্তবতা অস্বীকার করা কঠিন ছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সফল হবার সম্ভাবনা সে দেশেই বেশী যেখানে সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষমতাবান অংশের আনুগত্য থেকে দেশের সরকার বঞ্চিত, অথবা দেশের শাসনযন্ত্র কোনো বড় যুদ্ধের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ছে এবং বিপ্লবীরা যথেষ্ট অস্ত্রসংগ্রহের পথ তৈরী করে নিতে পেরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভারত যখন মোটামুটি অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে এলো তখন দূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ দেশের সন্ত্রাসবাদীদের বড় কোনো ভরসা অবশিষ্ট রইল না। এই অবস্থাতেই গান্ধী এলেন তাঁর অহিংস প্রতিরোধের প্রস্তাব নিয়ে। বাস্তব রাজনীতির বিচারে গান্ধীর সেই প্রস্তাবকে সেদিন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

সেদিনের পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের খানিকটা মিল আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী আজও সরকারের প্রতি অনুগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে আমাদের শাসনযন্ত্র এখনও মোটামুটি অটুট। অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় ভারতের শাসনযন্ত্রের কাঠামো শক্ত। এ দেশে অভিরাম

যে-সব রাজনীতিক দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অথবা গৃহযুদ্ধের পথে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করেন, সীমান্তে একটি বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে তাঁদের এখনও মনের আড়ালে লালন করতে হয়। নয়তো তাঁদের চিন্তা অবাস্তব। অরাজকতার পথে এ দেশে বিপ্লবী ও স্থায়ী সরকার গঠন করবার চিন্তায় তার বাস্তববুদ্ধির পরিচয় নেই, আছে শুধু দুর্মর বিপ্লববিলাস। গান্ধীনেতৃত্বের প্রথম যুগে যেমন নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতারা অহিংসাকে ধর্ম-হিসাবে গ্রহণ না-করেও গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আজও তেমনই হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ বর্জন করবার জন্য কোনো ধর্মনীতি প্রয়োজন হয় না, বাস্তব বুদ্ধির আলোতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

॥ ২ ॥

গান্ধীর রাজনীতিক চিন্তার আরও একটি স্তর ছিল। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক আন্দোলন ব্যর্থ হবে এই পরিসীমিত সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে তিনি তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেছিলেন। (প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, রাজনীতিক চিন্তাকে ছাড়িয়েও একটি তৃতীয় স্তর আছে যেখানে ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির শর্ত গান্ধী আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই শেষ স্তরের সমস্যা এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়।)

গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, অসৎ ব্যবহারে কোনো মহৎ কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। অথচ হিংসাত্মক আন্দোলনের উপায় হিসাবে অসত্যের ব্যবহার অনিবার্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কার্যক্রম, যথা প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও গণবিক্ষোভ পরিচালিত হয় দিবালোকে ও সর্বজনসমক্ষে। হিংসাত্মক আন্দোলনের একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে লোকচক্ষুর আড়ালে, অন্ধকার গোপন সুড়ঙ্গে। এই গোপন আন্দোলনে অসত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ মিথ্যাচরণই যেখানে আন্দোলনের ধর্মস্বরূপ সেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসে একদিন ফাটল দেখা দেবেই, কারণ সত্য ছাড়া পারস্পরিক বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। গান্ধী তাই তাঁর আন্দোলনে সত্যের প্রতি আগ্রহকে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। সত্যের প্রয়োজন শুধু পরকালের মুখ চেয়ে পুণ্যার্জনের জন্য নয়। সত্য ছাড়া সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস সম্ভব নয়। হিংসা থেকে যে মিথ্যার উদ্ভব এবং সেই জীবনবিপন্নকারী মিথ্যা থেকে আতঙ্কগ্রস্ত যে অবিশ্বাস, তার ভয়াবহ বিষাক্ত বাষ্প কোনো সংগঠনে বা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে যে অবস্থার সৃষ্টি

হয় তারই নাম সম্ভবত নরক। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নানাবিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও এই একটি প্রশ্নে মতৈক্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতি রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে তীক্ষ্ণ ভাষায় লক্ষ্য করেছেন: "মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক। হিংসাত্মক আন্দোলন কোনো কোনো অবস্থায় ক্ষমতালাভে বা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করার দ্বন্দ্বে সফল হতে পারে; কিন্তু সেই সাফল্যও ঝুটা সাফল্য। হিংসা ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে যে-সংগঠন গড়ে ওঠে তাতে অবিশ্বাস ও অত্যাচার এমনই অনিবার্য যে বিপ্লবের মহৎ আদর্শকে পাঁকের তলায় টেনে নামিয়ে তবে বিপ্লবীরা ক্ষমতায় আসীন হন। গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাক্ষ্যের অভাব নেই। রুশদেশে ক্ষমতালাভের জন্য লেনিন এমন একটি দল গড়ে তুলেছিলেন যার গতিবিধি ছিল গুপ্তঘাতকের মতোই গোপন এবং যার অভ্যন্তরে গণতন্ত্র রক্ষার চেয়েও গোপনীয়তা রক্ষা লেনিনের নির্দেশ অনুসারে প্রধান স্থান লাভ করেছিল। এই নতুন দলের চরিত্র সম্বন্ধে লেনিন তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে ("What Is To Be Done?") স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন:

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all other conditions must all be subordinated to it." লেনিন ঠিকই বুঝেছিলেন। হিংসাত্মক আন্দোলনের অন্য সব শর্তের উপর প্রধান শর্ত গোপনীয়তা রক্ষা। এর পরিণাম আজ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। লেনিনের দল রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু স্তালিনী যুগে যদি বিপ্লবের সমস্ত মহৎ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে পারস্পরিক অবিশ্বাস একটা বিভীষিকার মতো দল ও দেশকে গ্রাস করে থাকে তো গান্ধীবাদী বিচারে অন্তত সেটা অপ্রত্যাশিত নয়, বরং তার বিপরীত ঘটনাই হতো বিস্ময়ের কারণ।

গান্ধীর অহিংসাতত্ত্বকে 'অবাস্তব' বলে যাঁরা বাস্তব বুদ্ধির গৌরব দাবি করেন তাঁদের এই কথাগুলি ভেবে দেখা প্রয়োজন। সমালোচকেরা বলেছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন যদি-বা কিছু পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে থাকে হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে তাও সম্ভব হত না! অর্থাৎ শাসক-গোষ্ঠীর ভিতর ন্যায় ও গণতন্ত্রবোধ যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, হিংসার ব্যবহারে

প্রতিপক্ষ যেখানে সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত, সেখানে অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমালোচনার উত্তর আবারও সম্ভব দুটি ভিন্ন স্তরে।

অহিংস আন্দোলনের মূল কথা অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। শাসকের অন্যায় চেষ্টা যতই প্রচণ্ড হোক-না কেন সম্পূর্ণ অসহযোগের সম্মুখে শাসক অসহায়। কোনো অন্যায় ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না যদি আপামর জনসাধারণ মৃত্যুপণ করে সমস্ত সহযোগিতা থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন। আদর্শ অহিংসা সর্বজয়ী। যদি বলা হয় যে, আদর্শ অহিংসা সাধারণ মানুষের শক্তির অতীত, গান্ধীবাদী তা হলে তাঁর বক্তব্য রাখবেন একটি নিম্নতর স্তরে। গান্ধী বলেছেন অন্যায়ের বিরোধিতাই কর্তব্য; যদি অহিংস প্রতিরোধ সম্ভব না হয় তো অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েও অন্যায়ের বিরোধিতা করা শ্রেয়। কিন্তু একথাটা বিস্মৃত না হওয়াই ভালো যে, হিংসাত্মক প্রতিরোধের কতকগুলি কুফল আছে এবং শুধু উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে এই কুফল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এটাই বাস্তব কথা। এর বিপরীত চিন্তা খণ্ড দৃষ্টি বা সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে অবাস্তব। হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে তবু এই সাবধানবাণী মনে জাগ্রত রাখাই ভালো, যাতে যুদ্ধের ভিতরও শান্তির শর্ত আমরা সততার সঙ্গে বারবার উচ্চারণ করে যেতে পারি। এটা বিশুদ্ধ অহিংসাতত্ত্ব নয়, বরং অসম্পূর্ণ জগতে সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বের খণ্ডিত প্রতিফলন।

॥ ৩ ॥

দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্ব পরম অভীষ্ট। এই একটি অভীষ্টের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করে রাজনীতিক দলগুলি অবশেষে বিশ্বাস করে বসেন যে, সমাজের সকল মঙ্গল সাধনের জন্য প্রথম প্রয়োজন দলের পক্ষ থেকে শাসনযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন। এই কাজটি তাঁদের এমনই অত্যাবশ্যক মনে হয় যে, অন্য সকল নীতিকে বিপন্ন করে ক্ষমতার সংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠে। গান্ধী রাজনীতিতে ক্ষমতার সংগ্রামকে সংযত করতে চেয়েছেন গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করে।

যুদ্ধের সময় জাতি যেমন একটি নিঃসংশয় লক্ষ্য খুঁজে পায়, অর্থাৎ শত্রুর সংহারই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দেয়, সমাজকে ভাঙার নেশায় যাঁরা মাতেন

তাঁদেরও দৃষ্টিতে তেমনই একটি আপাতস্বচ্ছতা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। শেষ বিচারে এটি অবশ্য অলীক স্বচ্ছতা ভাঙবার উপায় উদ্ভাবনে যে বিপ্লবীরা শাণিত বুদ্ধির পরিচয় দেন, বিপ্লবের পরবর্তী সমাজ সম্বন্ধে তাঁদেরই চিন্তা আবার অবাস্তব কল্পনায় মোহাচ্ছন্ন। হিংসাত্মক বিপ্লবের শেষ ফলাফলের সঙ্গে তাই আদি প্রত্যাশার মিল থাকে না। তবু একথা স্বীকার্য যে, বিপ্লবীর কাছে যতদিন ভাঙবার কাজটাই প্রধান ততদিন তাঁর কর্মে ও বক্তব্যে এমন একটা দ্বিধাহীন ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায় গণতান্ত্রিকের পক্ষে যেটা অনায়াসলভ্য নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই দুর্বলতার প্রতিষেধক হিসাবে গঠনমূলক কর্মের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এরই ভিতর দিয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে যুক্ত হবার পথ খুঁজে পায়। তার নিজস্ব বক্তব্যটিও চেতনায় একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং বাস্তব ও আদর্শনিষ্ঠার ভিতর কর্মের সেতু স্থাপিত হয়। গান্ধীজী সমাজ সংগঠনে চরকাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছিলেন তার সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ ধারণা সম্ভবত অমূলক নয় যে, আমরা গঠনমূলক কাজকে যে পরিমাণে উপেক্ষা করেছি অবাস্তব বৈপ্লবিক কল্পনাও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে আমরা সমবায়ে অপটু, সাম্যবাদী আন্দোলনে উৎসাহী।

গান্ধীর গঠনমূলক পরিকল্পনায় গ্রামের প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। গান্ধী প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, দ্রুত শিল্পায়নের বিশেষত প্রথম যুগে আর্থিক সম্পদ ও রাজনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় নগরে নগরে। তিনি দেখেছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে মানুষ তৃষ্ণার জল ও সামান্য শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত, ক্ষুধায় অবসন্ন পাখীর মতো অসহায়। যে-সমাজে একদিকে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ আর অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষ আত্মবিশ্বাস ও সংগঠনশক্তি থেকে এমন সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত সেখানে স্বরাজ অথবা লোকরাজ সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্লবের পর প্রবল কয়েকটি দেশ যেমন দুর্বল দেশের উপর তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম করেছিল এবং এর একমাত্র স্বীকৃত প্রতিকার যেমন উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতির উদ্যোগ, গান্ধীও তেমনই বিশ্বাস করতেন যে, দেশের ভিতর কলকারখানার কেন্দ্রগুলির শাসন ও শোষণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার একমাত্র পথ গ্রামোদ্যোগ ও গ্রামরাজ। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় যে জাতের মানুষ সৃষ্টি হয় তিনি তাঁদের বোধ হয় একটু ভয়ের চোখেই দেখতেন। তাঁদের যুক্তিবাদী মন অর্থ ও

ক্ষমতাকেই জীবনে পরমলভ্য বলে সহজে গ্রহণ করে, আর যান্ত্রিক দক্ষতা ও ক্ষমতালিপ্সার যোগাযোগে সমাজের উপর তাঁদের একাধিপত্যও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। নগরভিত্তিক কোনো অর্থবান শ্রেণী অথবা প্রবল রাজনীতিক দলের পক্ষে সংগঠনশক্তিতে দুর্বল গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সহজ। এই বিপদের প্রতিকার সম্ভব গঠনমূলক কর্মের পথে। গ্রামে গ্রামে মানুষকে স্বায়ত্তশাসন ও আর্থিক স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত করলেই গণতন্ত্রের দেশজোড়া ভিত্তি স্থাপিত হবে। গান্ধীর উক্তিতে কখনও কখনও কলকারখানার প্রতি বিরূপতা অতিরিক্ত জোরের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর চিন্তা সমগ্রভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও একথা আজ আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট যে, গ্রামের অর্থনীতি সুস্থ না হলে দেশের অর্থনীতিও সুস্থ হবে না এবং গ্রামে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব থাকলে অতিস্ফীত আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণে অথবা ওপর থেকে চাপানো গণকমিটির অত্যাচারে দেশময় গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

॥ ৪ ॥

নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছাড়া গঠনমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। গান্ধী নিয়মের ভক্ত ছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের মহান নেতা। নিয়ম পালন ও নিয়ম ভঙ্গের ভিতর সামঞ্জস্যবিধান গান্ধীর চিন্তার একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক।

নিয়ম পালনকে গান্ধী কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও মতবাদে তা সুস্পষ্ট। প্রশ্নটি একটি নৈতিক সমস্যার আকারে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু অতীতের কোনো প্রতিশ্রুতি যদি আজ আমার স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা বলে আমি অনুভব করি তবে সেখানে আমার কর্তব্য কি ? এই প্রশ্নের দু-দিক থেকে উত্তর সম্ভব। কেউ বলবেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে নানা অপ্রত্যাশিত পথে ; অতীতের কোনো অন্ধ প্রতিশ্রুতিকে জীবনে অগ্রগতির পথে অটল বাধা বলে মেনে নেওয়া যায় না। আবার কেউ বলবেন যে, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা যদি রক্ষিত না হয় তো মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, সমাজে সহযোগিতার ভিত্তি দুর্বল হয়। চিন্তা না করে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়া ভুল, কিন্তু একবার প্রতিশ্রুতি দানের পর আপন বাক্যের

প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কর্তব্য। প্রথম মতের সমর্থনেও দু-একজন মহাপুরুষের নাম করা সম্ভব। কিন্তু গান্ধী ছিলেন ঐ দ্বিতীয় মতের মানুষ।* বাক্‌সংযম ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, সাংগঠনিক নিয়ম পালন—এই সবই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ সত্যনিষ্ঠ জীবনের অঙ্গ। নিজের আশ্রমে তিনি নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিয়েছেন ; নিয়ম ভঙ্গ হলে পুত্রকেও অব্যাহতি দেন নি।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা আশ্রমে নিয়ম পালনের মতোই বৃহত্তর সমাজে আইনের প্রতি আনুগত্যও একটি মৌল নৈতিক প্রশ্ন। নিয়মের জোরে যে-সমাজ শাসিত হয় না গায়ের জোরেই তাতে পারস্পরিক দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি হয়। নিয়মের রাজত্ব চূর্ণ হলে প্রতিষ্ঠিত হয় গুণ্ডার রাজত্ব। আইন অনেক সময় অন্যায় হয় ; কিন্তু গুণ্ডার রাজত্বে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পায় না। অতএব প্রশ্ন, যে-আইনকে আমি অন্যায় মনে করি তার প্রতি আমার কর্তব্য কি ? এই প্রশ্নটিরও দু-রকম উত্তর সহজেই মনে আসে। বলা যেতে পারে যে, যে-আইনকে আমি অন্যায় মনে করি সে আইন ভঙ্গ করাই নিঃশর্ত কর্তব্য। কিন্তু এই মতের বিপদ আছে। সাধারণ মানুষ বহু পরিমাণে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। যে-হেতু আত্মপ্রবঞ্চনায় আমরা অনেকেই অল্পবেশী অভ্যস্ত, অতএব যে-আইন আমাদের স্বার্থের বিরোধী তাকেই অন্যায় ভেবে নিতে আমাদের খুব বিলম্ব হবার কথা নয়। স্বার্থ ছাড়াও আছে নানা অন্ধ বিশ্বাস। প্রতিটি ব্যক্তিই যদি তাঁর স্বার্থ অথবা অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনের বিরোধ দেখা দিলেই আইন অমান্য শুরু করেন, তা হলে অনিয়মের রাজত্ব এবং তার ফলে আরও বহুগুণে বৃহত্তর অন্যায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। অতএব দ্বিতীয় মত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, আইন মেনে চলাই কর্তব্য যদিও আইনের পরিবর্তনও আমরা আইনসঙ্গত উপায়ে দাবি করতে পারি। কিন্তু সর্বাংশে বা সর্বাবস্থায় এই মতও গ্রহণ করা কঠিন। যে-নিয়মকে আমি সর্বান্তঃকরণে অন্যায় বলে জানি সে নিয়ম ভঙ্গ করবার কোনো নৈতিক অধিকারই কি আমার নেই ? যে-সমাজে আইন পরিবর্তনের আইনসঙ্গত পথ খোলা নেই সেখানে কি কর্তব্য ?

অর্থাৎ, ব্যক্তিকে আইনভঙ্গের নিঃশর্ত অধিকার দেওয়া নীতির দিক থেকে নিরাপদ নয়, আবার আইন মেনে চলবার নিঃশর্ত কর্তব্যও স্বীকার করা যায় না। এই নৈতিক সমস্যার সমাধান সহজ নয়। কিন্তু গান্ধীর সমাধান স্পষ্ট। তিনি

* শ্রীমতী মীরা চৌধুরীর খাতায় স্বাক্ষর করে গান্ধী লিখেছিলেন : "Never make a promise in haste. Having once made it fulfil it at the cost of your life."

বলেছেন যে যিনি আইনভঙ্গ করতে চান আইনভঙ্গের দণ্ডও তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হবে। এই একটি শর্তেই শুধু ব্যক্তি আইনভঙ্গের নৈতিক অধিকার দাবি করতে পারেন। রাষ্ট্রের রচিত আইন যিনি ভঙ্গ করতে চান তাঁকে নিজের বিবেক ও সমাজের কাছে এই প্রমাণ রেখে যেতে হবে যে, তিনি কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে নয়, বরং দশের কল্যাণের জন্যই আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রেমের পরিচয় যেমন দুঃখবরণে, আইনভঙ্গকারীর কল্যাণবুদ্ধির প্রমাণও তেমনই স্বেচ্ছায় দণ্ডগ্রহণে। এই সূক্ষ্ম অথচ সরল সিদ্ধান্তটি বর্তমান যুগের রাজনীতিক চিন্তায় গান্ধীবাদী বিচারের একটি মহৎ অবদান।

মার্কসীয় বিচারে অবশ্য এই গান্ধীবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে না হওয়া সম্ভব। মার্কসবাদী বলবেন যে রাষ্ট্রের বিধান শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব মৌলিক ও অনিবার্য। ধনতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র চালিত হয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে। সর্বপ্রকারে এই আইনের বিরোধিতা করা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক অধিকার। শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক অধিকারের উপর কোনো শর্ত আরোপ করা প্রকারান্তরে ধনিক-শ্রেণীকে সমর্থনেরই তুল্য।

এই শব্দগুলির একটা মাদকতা আছে ; কিন্তু মার্কসীয় মত সর্বাংশে সত্য নয়। সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যা-কিছুতে এক শ্রেণীর লাভ তাতেই অন্য শ্রেণীর ক্ষতি নয়। এমন কাজও আছে যাতে সারা সমাজই লাভবান হয়, আবার এমনও কিছু আছে যাতে সারা সমাজের অর্থাৎ সমাজের অংশ হিসাবে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই ক্ষতি। বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতিতে শুধু শ্রেণীবিশেষ লাভবান হয় নি। আজ থেকে এক শত বৎসর আগে এক নতুন যুগের প্রভাতে জাপানের সম্রাট মেইজি শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে তাঁর দেশকে উন্নত করা হবে। তারপর জাপানী সরকারের অদম্য চেষ্টায় বিশ শতকের শুরুতেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়, কৃষি ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল দ্রুত প্রয়োগ হতে থাকে। উনিশ শ' ত্রিশের যুগের জাপানী জঙ্গী নেতাদের ক্ষমা না করেও সম্রাট মেইজির সিংহাসনারোহণের শতবর্ষ পরে আজ বলা যায় যে, শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারে জাপান তাঁর শপথ রক্ষা করেছে। জাপানী সরকার বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের জন্য যা করেছেন তাতে উন্নতি হয়েছে শুধু শ্রেণী বিশেষের নয় বরং সারা জাতির।

যে-কথাটা সম্ভবত আরও স্পষ্ট তা হল এই যে এমন বিপদও আছে যাতে বিপন্ন হয় সমাজের অংশ বিশেষ নয় বরং সারা সমাজ। এই আণবিক যুগে দাঁড়িয়ে এ কথাটা বিস্মৃত হবার মতো বড় ভুল আর নেই। ছোট ছোট যুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর অংবিশেষ কখনও লাভবান হয়েছে; কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয় তাতে লাভ কার? ক্ষতি নয় কার? কাজেই পৃথিবীকে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করা শ্রেণী এবং জাতি নির্বিশেষে সকলের কর্তব্য। মজুরকে শুধুই মজুর হিসাবে দেখা তাঁকে ছোটো করা। তিনি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, এক কথায় মানুষ। এমন কিছু আদর্শ আছে যা শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি নয়। শ্রেণীর পরিচয়ে নয় বরং মানুষ বলেই তাকে আমরা মূল্য দিই, মানুষের উত্তরাধিকার বলেই তাকে বাঁচাতে চাই। এ কথাটা তথ্য হিসাবেও সত্য নয় যে হিটলারী শাসনে লাভ অথবা ক্ষতি হয়েছিল শুধু ধনিকের অথবা শ্রমিকের। নাৎসীবাদের বীভৎসতাকে আমরা ঘৃণা করি মনুষ্যত্বের বিচারে।

গান্ধী অন্যায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। শ্রেণী বিশেষের অন্যায়কে তিনি মেনে নিতেও বলেন নি। বরং অন্যায়ের প্রতিরোধ না-করাটাই তিনি অন্যায় মনে করেছেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের এটা মূল কথা। কিন্তু দ্বন্দ্ব যদি অনিবার্য হয় তবু সেই দ্বন্দ্বের ভিতরও আমাদের উপায় সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন কি না সেটাই প্রশ্ন। সমাজকে সামগ্রিক বিনাশ থেকে বাঁচাতে হলে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে, বিপক্ষের প্রতি হিংসাই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে না। গান্ধী দ্বন্দ্ব অস্বীকার করেন নি; তিনি দ্বন্দ্বকে নীতি দিয়ে বাঁধতে চেয়েছেন। এ চেষ্টাকে যদি অবাস্তব বলা হয় তো আবারও স্মরণ করা ভালো যে নীতিহীন দ্বন্দ্বে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে এ আশাও কাল্পনিক।

॥ ৫ ॥

গান্ধী যুগধর্ম মেনে চলেন নি। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোক বোঝেন নি যে এ যুগে শিল্পের দ্রুত প্রসার অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষ যে সামাজিক ও আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করাই তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করেছেন। যে-সুরে তিনি তাঁর কথা বেঁধেছেন তাতে যুক্তিবাদী মননশীলতা উৎসাহিত হয় না। যে-পৃথিবীতে একদিকে মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন

শিথিল হবে আর অন্যদিকে বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দেবে অপরিমিত শক্তি- সেই পৃথিবী সম্বন্ধে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। যে-যুগকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি বহু সংকটের ভিতর দিয়ে সে-যুগ যেদিন অতীত হবে সভ্যতা যদি তখনও বাঁচে তবে গান্ধীর "অরণ্যে রোদন" আজকের বহু নাগরিক কোলাহলকে অতিক্রম করে সেদিনও মানুষের মর্মে একটি শাশ্বত বাণীর মতো ধ্বনিত হতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে গান্ধীর দু'য়েকটি নীতি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা রক্ষা করলে সমাজের কল্যাণবৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

পরিশিষ্ট

আমাদের সেযুগের সন্ত্রাসবাদীরা শ্রদ্ধেয়। তাঁদের অনেকেরই চরিত্রে এমন কিছু গুণ ছিল যাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

রুশদেশেও উনিশ শতকে এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। লেনিন নিজে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছিলেন। কিন্তু দলগঠনের প্রশ্নে জার্মান মার্ক্সীয়দের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য ছিল—এ বিষয়ে তাঁর চিন্তায় রুশদেশের সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লেনিনী দলসংগঠন গণতান্ত্রিক ছিল না। লেনিনের সমকালীন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এই সমালোচনা উচ্চারণ করে গেছেন। এদেশের কম্যুনিস্টরাও লেনিনেরই মতো পূর্বতন সন্ত্রাসবাদীদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এ কথা আমি কারও প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধা থেকে বলছি না। বিশেষত বাম কম্যুনিস্টরা লেনিন ও মাওয়ের কাছ থেকেই দল সংগঠন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা লাভ করেছেন।

কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূর্ণ না-হলে গণসমর্থন সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবে না একথা এঙ্গেলস নিজেই শেষ জীবনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছিলেন। আবার বিশেষ কিছু শর্ত পূর্ণ হলে অধিকাংশের সমর্থন ছাড়াও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ক্ষমতালাভ সম্ভব এ কথা লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন। এদেশে লেনিনী মতের এক অথবা একাধিক দল আছে কিন্তু বিপ্লব সফল হবার শর্তগুলি অপূর্ণ।

লেনিনী দলের একাংশ গোপনীয়তা রক্ষাকে সংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়

শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখা থেকে আমার প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত 'Lenin : Selected Works' গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়। সম্পূর্ণ বাক্যটি এই :

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all the other conditions (number and selection of members, functions, etc.) must all be subordinated to it."

বন্ধনীর ভিতরের খুঁটিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকার কথা নয় বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করিনি। এই খুঁটিনাটির ভিতর functions শব্দটি উল্লেখযোগ্য। লেনিনের উদ্ধৃতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনেকেই হয়তো কিছু কিছু জানেন। দলের কার্যাকার্য শুধু যে দল বহির্ভূত লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নানা বিষয়ে পারস্পরিক গোপনতা রক্ষার বিধান আছে।

গোপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে দু'য়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাকি। সেই নীরবতা অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথা সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা দ্বারা গোপনতা রক্ষা হয় না, বরং একটি সত্য গোপন করার জন্য প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্দে ঘোষণা করতে হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথ্যা জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে থাকে। মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না; কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে আসে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

গোপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। উদাহরণত গুপ্ত পুলিশবাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ রকম একটি দল যখন সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

হিংসা অথবা মিথ্যা দ্বারা কখনও কিছু করা যায় না এমন নয়। হিংসা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্তু হিংসার সাফল্যেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সত্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে

সত্য ও অহিংসাকেই আমরা আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে হিংসাকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। মিথ্যা দ্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চায়। কিন্তু হিংসা ও অহিংসা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও অহিংসা এমন বস্তু যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও মিথ্যার সাময়িক সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি। হিংসা, মিথ্যা অথবা অবিশ্বাসের সেই শক্তি নেই যে তাকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দাঁড়াতে পারে। কাজেই হিংসা যেখানে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাফল্যজনিত প্রসারের বিপদ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা-তত্ত্বের প্রধান মূল্য।

দয়া, প্রেম ইত্যাদিকে আমরা অনেকে ভাবালুতা বলি। কিন্তু হিংসার মতো মাদকতা কম বস্তুতেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাব এ বিপদ তত নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা যত। তাই মাত্রারক্ষার জন্য অহিংসাতত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীষিকাকে কেউ কেউ সমর্থন করছেন এই বলে যে সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্তালিন ক্ষমতায় আসবার পর কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম।

গান্ধীজী আজ আমাদের নিন্দা স্তুতির উর্ধ্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয় তাঁর প্রয়োজনে নয়, আমাদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে। তাঁর সকল উক্তিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখা থেকে আমার প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত 'Lenin : Selected Works' গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়। সম্পূর্ণ বাক্যটি এই :

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all the other conditions (number and selection of members, functions, etc.) must all be subordinated to it."

বন্ধনীর ভিতরের খুঁটিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকার কথা নয় বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করিনি। এই খুঁটিনাটির ভিতর functions শব্দটি উল্লেখযোগ্য। লেনিনের উদ্ধৃতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনেকেই হয়তো কিছু কিছু জানেন। দলের কার্যাকার্য শুধু যে দল বহির্ভূত লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নানা বিষয়ে পারস্পরিক গোপনতা রক্ষার বিধান আছে।

গোপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে দু'য়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাকি। সেই নীরবতা অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথা সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা দ্বারা গোপনতা রক্ষা হয় না, বরং একটি সত্য গোপন করার জন্য প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্দে ঘোষণা করতে হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথ্যা জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে থাকে। মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না; কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে আসে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

গোপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। উদাহরণত গুপ্ত পুলিশবাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ রকম একটি দল যখন সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

হিংসা অথবা মিথ্যা দ্বারা কখনও কিছু করা যায় না এমন নয়। হিংসা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্তু হিংসার সাফল্যেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সত্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে

সত্য ও অহিংসাকেই আমরা আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে হিংসাকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। মিথ্যা দ্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চায়। কিন্তু হিংসা ও অহিংসা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও অহিংসা এমন বস্তু যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও মিথ্যার সাময়িক সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি। হিংসা, মিথ্যা অথবা অবিশ্বাসের সেই শক্তি নেই যে তাকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দাঁড়াতে পারে। কাজেই হিংসা যেখানে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাফল্যজনিত প্রসারের বিপদ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা-তত্ত্বের প্রধান মূল্য।

দয়া, প্রেম ইত্যাদিকে আমরা অনেকে ভাবালুতা বলি। কিন্তু হিংসার মতো মাদকতা কম বস্তুতেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাব এ বিপদ তত নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা যত। তাই মাত্রারক্ষার জন্য অহিংসাতত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীষিকাকে কেউ কেউ সমর্থন করছেন এই বলে যে সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্তালিন ক্ষমতায় আসবার পর কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম।

গান্ধীজী আজ আমাদের নিন্দা স্তুতির উর্ধ্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয় তাঁর প্রয়োজনে নয়, আমাদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে। তাঁর সকল উক্তিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে লেনিনের লেখা থেকে আমার প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত 'Lenin : Selected Works' গ্রন্থের প্রথম ভল্যুমে ১৯৪৭ সালের সংস্করণে ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠায়। সম্পূর্ণ বাক্যটি এই :

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all the other conditions (number and selection of members, functions, etc.) must all be subordinated to it."

বন্ধনীর ভিতরের খুঁটিনাটিতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল থাকার কথা নয় বলে মূল প্রবন্ধে সেটা উদ্ধৃত করিনি। এই খুঁটিনাটির ভিতর functions শব্দটি উল্লেখযোগ্য। লেনিনের উদ্ধৃতি ছাড়াও এই ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনেকেই হয়তো কিছু কিছু জানেন। দলের কার্যাকার্য শুধু যে দল বহির্ভূত লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা হয় তাই নয়, দলের কর্মীদের ভিতরও নানা বিষয়ে পারস্পরিক গোপনতা রক্ষার বিধান আছে।

গোপনতা রক্ষার সঙ্গে অসত্য ভাষণের সম্পর্ক নিয়ে দু'য়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিষয়ে আমরা নীরব থাকি। সেই নীরবতা অনেক সময়ে সঙ্গত। যে-কথা শুধু আমারই সে-কথা সবাইকে শোনাবার চেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ও অপরের প্রতি অত্যাচার। কিন্তু যেখানে দশজনকে নিয়ে আমাদের কাজ সেখানে কেবল নীরবতা দ্বারা গোপনতা রক্ষা হয় না, বরং একটি সত্য গোপন করার জন্য প্রায়ই অপর একটি মিথ্যা সশব্দে ঘোষণা করতে হয়। তারপর এক মিথ্যার পিঠে আর এক মিথ্যা জুড়ে মিথ্যার বন্ধন বিস্তৃত হতে থাকে। মিথ্যাও একেবারে গোপন থাকে না ; কাজেই মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে আসে পারস্পরিক অবিশ্বাস।

গোপনতায় অতি অভ্যস্ত একটি সংগঠনও তত বিপদের কারণ হয় না যতক্ষণ সমাজের মূল জীবনধারা থেকে তাকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। উদাহরণত গুপ্ত পুলিশবাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ রকম একটি দল যখন সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

হিংসা অথবা মিথ্যা দ্বারা কখনও কিছু করা যায় না এমন নয়। হিংসা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে। কিন্তু হিংসার সাফল্যেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা-কিছু সফল হয় তারই উপর আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়ে। সত্য ও অহিংসা একবার জয়ী হলে

সত্য ও অহিংসাকেই আমরা আবারও গ্রহণ করতে চাই। হিংসা দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে হিংসাকেই আমরা আবারও আশ্রয় করতে চাই। মিথ্যা দ্বারা একের জয় হলে মিথ্যাকেই অপরেও অবলম্বন করতে চায়। কিন্তু হিংসা ও অহিংসা, মিথ্যা ও সত্যের ভিতর একটি মূল প্রভেদ আছে। সত্য ও অহিংসা এমন বস্তু যার প্রসারে সমাজের মঙ্গল। হিংসা ও মিথ্যার সাময়িক সাফল্য সম্ভব, কিন্তু তার প্রসারে সমাজের ক্ষতি। হিংসা, মিথ্যা অথবা অবিশ্বাসের সেই শক্তি নেই যে তাকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ দাঁড়াতে পারে। কাজেই হিংসা যেখানে সাময়িকভাবে সফল সেখানে তার সাফল্যজনিত প্রসারের বিপদ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই সতর্কবাণী উচ্চারণেই অহিংসা-তত্ত্বের প্রধান মূল্য।

দয়া, প্রেম ইত্যাদিকে আমরা অনেকে ভাবালুতা বলি। কিন্তু হিংসার মতো মাদকতা কম বস্তুতেই আছে। দয়ায় আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাব এ বিপদ তত নয় হিংসার উন্মাদনায় মাত্রা অতিক্রম করবার সম্ভাবনা যত। তাই মাত্রারক্ষার জন্য অহিংসাতত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞান ও সহযোগিতা সুস্থ সমাজের ভিত্তি। স্তালিনী বিভীষিকাকে কেউ কেউ সমর্থন করছেন এই বলে যে সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্তালিন ক্ষমতায় আসবার পর কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত দেশের উন্নতির জন্য এই মিথ্যার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিবেশী দেশ জার্মানির মতোই সোভিয়েত দেশেরও উন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান ও শ্রম।

গান্ধীজী আজ আমাদের নিন্দা স্তুতির উর্ধ্বে। তাঁকে আমাদের স্মরণ করতে হয় তাঁর প্রয়োজনে নয়, আমাদেরই আজকের জীবনের প্রয়োজনে। তাঁর সকল উক্তিই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গঠনমূলক দৃষ্টি ও কর্ম ছাড়া বাংলার আজ কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

গান্ধীবাদের বিবর্তন

মনমোহন চৌধুরী

গান্ধীজীর তিরোধানের পর প্রথম নিখিল ভারতীয় গঠনমূলক সম্মেলন ১২ই মার্চ ১৯৪৮ সনে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পণ্ডিত নেহেরু ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসের নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। অতঃপর গান্ধীজীর বিচার ধারা ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের সংগঠনের স্বরূপ কি হবে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই সেই স্থানে সমবেত কর্মী ও জননায়কদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই সময় বিনোবাজীর পরামর্শ অনুসারে এই সম্পর্কে দুইটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা গান্ধী-প্রবর্তিত চিন্তা ও কর্মধারায় পরবর্তী বিকাশের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তাঁর অনুগামীরা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং যেহেতু ব্যাপক সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে অহিংস কর্মপন্থার প্রবর্তন গান্ধীজীই করেছিলেন ও সত্যাগ্রহ শাস্ত্রেরও তিনিই জন্মদাতা ছিলেন, সেহেতু অহিংস কর্মপন্থায় বিশেষজ্ঞ ও চালক হিসাবে গান্ধীজীর অবশ্যই অদ্বিতীয় স্থান ছিল। তাই তাঁর বর্তমানে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাওয়ার পিছনে অবশ্য যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল—তাঁর অবর্তমানে এই ধরনের প্রামাণিক পরামর্শ বা নির্দেশ কে দেবেন ?

কারো কারো কাছ থেকে এই ধরনের একটা প্রস্তাব এসেছিল যে, গান্ধী-বাদের প্রামাণিক ব্যাখ্যা করার জন্য গান্ধীজীর নিকটতম শিষ্যদের নিয়ে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের মণ্ডলী গঠিত হোক। বিনোবাজী কিন্তু গান্ধীজীর একমেব প্রামাণিক ব্যাখ্যা করার অধিকার কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীকে দেওয়ার সপক্ষে ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিমতই অন্য সকলে গ্রহণ করেন ও এইরূপ মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে এক সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের রূপ দেওয়ার বিপদ কেটে যায়। সত্যের উপলব্ধি বা নিরূপণ কখনো কারো একচেটিয়া হতে পারে না এবং বিশেষ করে কারো উপরে এই অধিকার প্রস্তাবের দ্বারা ন্যস্ত করা যায় না বা উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতে পারে না। সত্যের কোন এক অংশ যে কোনো ব্যক্তির চক্ষে উদ্ভাসিত হতে পারে এবং মুক্ত বিচার বিনিময়, আলোচনা ও বিতর্ক সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে থাকে—আধুনিক যুগের বিশ্বজনীন বিচার-প্রবাহের মূলে নিহিত উপরোক্ত

মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহের পটভূমিকায় গান্ধীজীর স্বকীয় চিন্তা ও কর্মকেও অতিক্রম করে সর্বোদয়ের বিচারধারা ব্যাপকতররূপে বিকশিত হওয়ার দ্বার এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উন্মুক্ত রাখা হল।

এইভাবে যখন সর্বোদয় সমাজ গঠনের কথা উঠল তখন 'সাচ্চা' বিশ্বাসীদের যাচাই ও বাছাই করার প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হল। স্থির হল যে, যিনিই নিজেকে সর্বোদয়ের আদর্শে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করবেন তিনিই এতে স্থান পাবেন। ইনি সর্বোদয়ে বিশ্বাসী আর উনি নন, এইরকম বাছাই করার ভার বা অধিকার কারও উপর ন্যস্ত থাকল না। আজ যেমন ধর্ম সম্প্রদায় বা পার্টির সদস্যতা, মালা, তিলক, টিকি, ঝাণ্ডা বা ব্যাজের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে অথচ সম্প্রদায় বা পার্টিভুক্ত ব্যক্তির আচরণে সেই সম্প্রদায় বা পার্টির মৌলিক নীতিগুলি আত্মপ্রকাশ করার আবশ্যকতা রাখে না, সে জাতীয় বিড়ম্বনা থেকে গান্ধীজীর পরম্পরা বা ঐতিহ্য এর ফলে মুক্তি পেল। সত্য ও অহিংসার পথের পথিকদের সফলতার মূল্যায়ন করবে সমাজ ও ইতিহাস তাদের চিন্তা ও আচরণ দেখে, তাদের লেবেল বা সার্টিফিকেট দেখে নয়। এর দুবছর পরে গান্ধীজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চরকা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, গোসেবা সঙ্ঘ আদিকে একত্র করে সর্বসেবা সঙ্ঘ গঠন করা হয়। এই পরামর্শ গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই দিয়ে গিয়েছিলেন। এই সঙ্ঘগুলি স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজের বিশিষ্ট কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গান্ধীজী সর্বোদয় আন্দোলনকে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে বলশালী করার জন্য সামগ্রিক চিন্তা ও কর্মের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও সেইজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও খণ্ড খণ্ড ভাবে আলাদা আলাদা কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা ও কাজ না করে সম্মিলিত ভাবে চলতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মতে ১৯৫০ সনে সর্বসেবা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। গান্ধীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা এর লক্ষ্য, তবে এ সঙ্ঘ কখনো নিজেকে গান্ধীজীর চিন্তাধারার একক বা অনন্য উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে নি। সত্য ও অহিংসায় আস্থাবান বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যোগসূত্র ও সংহতি রক্ষা করা ও পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া (understanding) ও মৈত্রী বৃদ্ধি করায় সাহায্য করা সঙ্ঘ নিজের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। গান্ধী স্মারক নিধি, কস্তুরবা গান্ধী স্মারক নিধি, হরিজন সেবক সঙ্ঘ—এই কয়টি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও অগণিত স্থানীয় বা রাজ্যস্তরীয় প্রতিষ্ঠান সর্বসেবা সঙ্ঘের সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে যুক্ত না হলেও সবাই মোটামুটি একযোগে পরস্পর আলাপ

আলোচনার মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। এই সর্বসেবা সঙ্ঘ এক অত্যন্ত শিথিল সংগঠন। যে কয়েক সহস্র লোকসেবককে নিয়ে এই সঙ্ঘ গঠিত, দেশের যে শত শত সংখ্যক গঠনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠান এর নীতিগত পরামর্শ গ্রহণ করেন, সঙ্ঘের পরামর্শ বা নির্দেশ মেনে চলতে তাদের বাধ্য করার বা কেউ তা গ্রহণ না করে নিজের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি অনুসারে অন্যভাবে কাজ করলে তার প্রতি কোনো শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো বৈধানিক অধিকার এই সঙ্ঘের নেই। শুদ্ধ আদর্শ ও বিচারের যোগসূত্রই এই সঙ্ঘের সঙ্গে সকলকে বেঁধে রাখে এবং সঙ্ঘের সিদ্ধান্তসমূহের শুদ্ধ যৌক্তিকতার আবেদনই তাঁদের তা মেনে নিতে অনুপ্রেরিত করে। সঙ্ঘের সভা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ভোটাধিক্যের প্রচলিত রীতি অনুসৃত হয় না, সর্বসম্মতি বা সর্বানুমতির নীতি চলে। অর্থাৎ সংখ্যা লঘিষ্ঠদের উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোনো প্রস্তাব গৃহীত করিয়ে নেওয়ার উদ্ধত মনোভাবের পরিবর্তে সবার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া ও সবার পক্ষে গ্রহণীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছবার নম্র মনোভাবের বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বশে গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনকর্মগুলি স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার অনন্য আধার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেসকে লোকসেবক সঙ্ঘে পরিবর্তিত করে জনশিক্ষা ও সংগঠনের কাজে লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ গান্ধীজী দিয়ে যান। কিন্তু কংগ্রেস এই পরামর্শ গ্রহণ না করে রাজনৈতিক দল হিসাবে ক্ষমতা হাতে নেওয়া নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। এর ফলে তার প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের অনন্যত্ব বিনষ্ট হয়। বহু রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে অন্যতম ভাবে তার ভবিষ্যতের ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েও গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পর তার থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে ও যাবে। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে একক ভাবে জড়িত থাকা এমত অবস্থায় বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচনা করে ১৯৫২-এর নির্বাচনের পূর্বে সর্বসেবা সঙ্ঘ নির্বাচনের রাজনীতিতে নিরপেক্ষ থাকবার নীতি গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে কংগ্রেসের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা রুষ্ট হন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা এখন দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গাঁট-

ছড়া বাঁধা অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া ও রাজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার ফলে সর্বোদয় আন্দোলনকে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে বলশালী করতে সর্বসেবা সঙ্ঘ সাহায্য করেছে। এখন দেশের বহু সংখ্যক সর্বোদয় কর্মী এই রাজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকা স্বীকার করে থাকেন।

রাজনীতিতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে দেশের কল্যাণার্থ কোনো ন্যূনতম কার্যক্রমে একমত করা ও তার সফলতার জন্য একযোগে কাজ করতে সম্মত করার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করা হয়। ১৯৫৭ সনে এলওয়াল সম্মেলনে গ্রামদান আন্দোলনের প্রতি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়, যদিও এ সমর্থন ব্যাপক সক্রিয় সহযোগে রূপায়িত হয় নি। তবে যে যে ক্ষেত্রে গ্রামদান আন্দোলন সঘন (intensive) ভাবে চলতে থাকে সেখানে দল নির্বিশেষে সবার সমর্থন ও সহযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ঘটছে। বিভিন্ন দলকে কোনো ন্যূনতম কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে একমত করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হয় নি ; জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে তা এখনো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্বাধীনতার পরে গঠনমূলক কর্মের ক্ষেত্রে দুইটি বিশিষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। একটি হল সরকারী সাহায্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ও অপরটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্রিয়াকলাপের প্রতি নৈরাশ্য ও অসন্তোষের ক্রমিক বৃদ্ধি। এই দুইটি ঝোঁকই বাহ্য পরিস্থিতির প্রবাহের সংঘাতের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে গঠনমূলক কার্যক্রমগুলিকে সরকারী মহলে সন্দেহের চক্ষে দেখা হত। সরকার থেকে কোনো রকম সাহায্য পাওয়া তো ছিল দুরাশা। স্বাধীনতার পরে স্বভাবতঃই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারেরা সর্ববিধ গঠনমূলক কার্যকে যথাশক্তি সাহায্য করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। যে পরিমাণ অর্থ-সাহায্য তাঁরা পূর্বে কখনো পান নি তাই পেয়ে দেশের অগণিত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হল। এতে অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে মনে করলেন যে, গঠনকার্য বুঝি এই ভাবেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করে সারাদেশে ছেয়ে যাবে এবং তাঁরা সরকারী সাহায্য উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে পাওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

অপরপক্ষে দেখা গেল যে, গঠনকর্মের প্রচেষ্টাকে বেশ উদার ভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারেরা শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, মাদকদ্রব্য বর্জন, ভূমি সমস্যার সমাধান ইত্যাদির ব্যাপারে এমন সব নীতি অনুসরণ

করছেন যা গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যের সম্পূর্ণ-বিরোধী। তাই যাঁরা অবস্থাটাকে তলিয়ে দেখলেন তাঁরা অনুভব করলেন যে, এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতন হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁরা আরও লক্ষ্য করলেন যে, জনসাধারণের স্বার্থকে যে সমস্ত কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী পর্যুদস্ত করে আসছে তাদের বাগে আনার সাধ্য তো সরকারের নেই-ই বরং তারা যেন আরও বেশী করে সেই গোষ্ঠীদের প্রভাবে চলে যাচ্ছে। এর ফলে একটা তীব্র অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। কিন্তু কেবল সরকারের উপর দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় কেউ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সরকারী সহায়তায় সন্তুষ্ট ও মৌলিক সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রশাসন যন্ত্রের অক্ষমতায় অসন্তুষ্ট—উভয়বিধ প্রতিক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্যস্থল কিন্তু শাসনব্যবস্থাই ছিল। উভয় গোষ্ঠীই প্রশাসন যন্ত্রের চূড়ান্ত শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলেন।

বিনোবাজী ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত করে আবার সকলের দৃষ্টি জনশক্তির সার্বভৌম গুরুত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই আন্দোলনের ফলে গঠনকর্মীমহলে নূতন উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা দেখা দেয়। শাসন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সর্বোদয় সমাজের ভিত গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তার জন্য জনসাধারণের সংগঠন ও শক্তির ভিত্তিতে স্বতন্ত্ররূপে আন্দোলনকে দাঁড় করাতে হবে, একথা গঠনকর্মীরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। এই ষোলো বছরের ভূদান আন্দোলনের গর্ভজাত গ্রামদান আন্দোলন প্রথমোক্তটির স্থান পুরোপুরি গ্রহণ করেছে ও সারা ভারতের পঁয়ষট্টি হাজারেরও অধিক গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে ও এই সংখ্যা নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই আন্দোলন আজ এদেশের বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসীকে যেভাবে স্পর্শ করেছে, তাদের প্রাণে যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে, তাদের কর্মশক্তিকে যে-ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে এবং নেতৃত্বশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছে তার তুলনা নেই।

গান্ধীজী তাঁর জীবনের শেষ দিনে লিখিত শেষ রচনাটিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো পাওয়া গেছে কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন-পর্ব এখনও বাকী। গান্ধীজী দ্বারা পরিকল্পিত জনসাধারণের এই ত্রিবিধ স্বাধীনতার স্বরূপ পরবর্তীকালে গ্রামস্বরাজ্য নামে অভিহিত হয় এবং গ্রামদানের ভিত্তিতে কি ভাবে সমগ্র দেশে গ্রামস্বরাজ্যের আদর্শ রূপায়িত করা যেতে পারে তার একটা ধারণা এই কয়েক বছরে ক্রমশঃ

স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গ্রামদান থেকে ব্লকদান (একটা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক গ্রাম, অন্যূন ৮৫% গ্রামদান হওয়া চাই) ও জেলাদানের (একটি জেলার প্রত্যেকটি ব্লক ব্লকদানের আওতায় আসা) পর্যায়ে আন্দোলন উন্নীত হওয়ার ফলে এই গ্রামস্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

১৯৪৫ সনে জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধীজী খাদি গ্রামোদ্যোগের কার্যক্রমকে অধিক বলশালী ও সফল করার জন্য চরকা সঙ্ঘের নবসংস্করণের পরিকল্পনা গঠন কর্মীদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু কর্ম-প্রচেষ্টাও আরম্ভ করা হয়। কিন্তু দেশের খাদি গ্রামোদ্যোগের কাজের উপর তা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বিশ বছর আগে খাদির কাজ মুখ্যতঃ যে রকম ব্যবসায়ের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন এর ফলে হয় নি। স্বাধীনতার পরে সরকারের তরফ থেকে খাদি গ্রামোদ্যোগের কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সাহায্যের পথ খুলে যায় ও এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সনে নিখিল ভারত খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষৎ স্থাপিত হয়। এর পরে দেশে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের অভূতপূর্ব প্রসার হয়। উৎপাদন প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি (সাবসিডি) ইত্যাদির সহায়তাও ছিল। এর দ্বারা খাদির বিক্রয়মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এতাবৎ অনুসৃত এই কার্যপ্রণালীর দ্বারা খাদি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন লক্ষ্যের দিকে আর বেশী এগোতে পারবে না। তাই ১৯৫৮ সনে বিনোবাজীর প্রেরণায় 'নয়ামোড়' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ও আবার ১৯৬৩ সনে খাদিকে গ্রামাভিমুখী করার লক্ষ্য রায়পুরে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনে স্বীকৃত হয়।

এই সমস্ত নূতন পরিকল্পনার পিছনে একটি গুরুতর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সমস্ত বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারত ও তাদৃশ অন্যান্য অনগ্রসর দেশের জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি বিধানের জন্য তাদের শ্রম কাজে লাগাতে হবে ও তার জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রয়োগ বিদ্যা বা যন্ত্র কৌশলের সাহায্য নিতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, প্রয়োগ বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্ন পর্যায়ের এই সব শিল্পকে উন্নততর শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ হয়তো কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই সংরক্ষণ পাওয়া গেলে তবেই এই শিল্পগুলি

ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে পারবে। তার জন্য গ্রামবাসী জনসাধারণের এই বিকেন্দ্রিত শিল্পগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা চাই ও সে সবের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে নেওয়া চাই। নবসংস্করণ থেকে শুরু করে 'গ্রামাভিমুখ খাদি' পর্যন্ত সমস্ত নূতন প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল গ্রামবাসী জনসাধারণকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে উদ্‌বুদ্ধ করা। এখনো পর্যন্ত এই লক্ষ্য বহুদূরেই আছে, তবে গ্রামদানের ফলে গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে যে নূতন কর্মপ্রেরণা ও নেতৃত্বশক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বারা এর পথ পূর্বাপেক্ষা ঢের বেশী সুগম হবে বলে আশা করা যায়। এদিক দিয়ে কিছু কিছু নূতন কর্মোদ্যমের সূচনাও স্থানে স্থানে হচ্ছে।

খাদি গ্রামোদ্যোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল একদিকে যেমন গ্রাম ও গ্রামবাসীদের আজকের বাস্তব অনগ্রসর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য এমন সব শিল্পোদ্যোগের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে অপেক্ষাকৃত অল্প পুঁজি ও অধিক শ্রম আবশ্যক, তেমনি অপরদিকে তাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এইসব শিল্পের উৎপাদিকা শক্তিরও দ্রুত বিকাশ সাধন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বাষ্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার বিকেন্দ্রিত গ্রামশিল্পের ক্ষেত্রে বিধেয় কিনা এই নিয়ে একসময় প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। গোড়ার দিকে মনুষ্য বা পশু শক্তি ছাড়া আর কোনো রকমের শক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয় বলেই ব্যাপক অভিমত ছিল। কিন্তু বিনোবাজী যান্ত্রিক শক্তির বিবেচনাযুক্ত ব্যবহারের সপক্ষে মত দেন ও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকেও স্বাগত জানান। গান্ধীজীর অন্যতম বিশিষ্ট সহকর্মী আন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধেও বিদ্যুৎ বাষ্প ইত্যাদি শক্তির ব্যবহার সমর্থন করেন। এ ছাড়া জয়প্রকাশজীও মধ্যবর্তী প্রয়োগবিদ্যার বিকাশের আবশ্যকতার উপর জোর দেন। এসবের ফলে অম্বর চরকা, 'টেক্‌সটুল' চরকা, উন্নত ধরনের তাঁত ও টানা তৈরি করার যন্ত্র আদির উদ্ভাবন ও ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে খাদি ও বিবিধ গ্রামোদ্যোগের কতক কতক প্রক্রিয়ায় শক্তির ব্যবহার স্বীকৃত ও আরম্ভ হয়ে গেছে। এ ছাড়া সনাতন কুটিরশিল্পগুলির সঙ্গে আধুনিক ধরনের ছোটো ছোটো শিল্পেরও প্রসার ও বিকাশের আবশ্যকতা সর্বোদয়ের কর্মীমহলে স্বীকৃত হয়েছে। অপর দিকে দেশের পরিকল্পনা রচনাকারীরাও এই কয় বছরের মধ্যে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে তাঁদের পূর্বের ভাসা ভাসা আশাবাদ খানিকটা হারিয়েছেন এবং বিকেন্দ্রিত গ্রাম্যশিল্পের ব্যাপক বিকাশের

আবশ্যকতা পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। সর্বোদয় কর্মী ও পরিকল্পনা রচনাকারী এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কিছু পরিমাণে কম হয়েছে।

গান্ধীজী প্রথমে ১৯৩৭-৩৮ সনে দেশের সামনে একটি শান্তিসেনা গঠনের প্রস্তাব রাখেন। সে সময় দু'এক জায়গায় শান্তিসেনা সংগঠনের কিছু উদ্যোগ হয়ে থাকলেও বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীই একক শান্তিসৈনিকরূপে দেশে প্রজ্বলিত সাম্প্রদায়িকতার বহ্নিকে নির্বাপিত করতে প্রাণপণ প্রয়াস করেন ও অবশেষে আত্মবলি দেন।

গান্ধীজীর পরবর্তী যুগে বিনোবাজী আবার ১৯৫৭ সনে শান্তিসেনার কার্যক্রমকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার জন্য আবেদন জানান ও কেরলে এর বিধিবদ্ধ সংগঠনের সূত্রপাত করেন। তারপরে এই কয় বৎসরে শান্তিসেনার এই সংগঠন সারা দেশে ব্যাপক হয়েছে ও বহু সাম্প্রদায়িক ও অন্যবিধ অশান্তি উপলক্ষে সফলতা সহকারে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামদানী গ্রামগুলিতে 'গ্রাম শান্তিসেনা' সংগঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ও কোনো কোনো প্রদেশে এর কাজ বেশ এগিয়ে গেছে। ছাত্রদের মধ্যে তরুণ শান্তিসেনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক প্রচেষ্টার দিকে ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছল প্রাণশক্তিকে চালনা করার উদ্যমও শান্তিসেনার কর্মসূচীর অন্তর্গত। এ কাজেও আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রামদান, সমস্ত গ্রামোদ্যোগের প্রতীকস্বরূপ গ্রামাভিমুখ খাদি ও শান্তিসেনা এই তিনটি কার্যক্রমকে সামগ্রিক ভাবে ত্রিবিধ কার্যক্রম নামে অভিহিত করা হয়। এইগুলি বর্তমান সময়ে সর্বোদয়ের সর্বপ্রধান কর্মসূচীরূপে সাধারণ ভাবে পরিচিত। ত্রিবিধ কার্যক্রমকে বিনোবাজী তিনটি আলাদা আলাদা কার্যক্রমের সমষ্টি মনে না করে গ্রামস্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বের একই, সমগ্র কার্যক্রমের তিনটি অঙ্গ রূপে, ত্রিমূর্তির তিনটি মুখের মত মনে করার উপর জোর দেন। এবং প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গীই যথার্থ।

অন্যায়ের প্রতিরোধ ও সমাজ পরিবর্তনের হিংসাপূর্ণ উপায়ের বিকল্পরূপে সত্যাগ্রহের অস্ত্রের উদ্ভাবন মানব-সমাজের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। স্বাধীনতার পরে সত্যাগ্রহের প্রকৃতি ও ভূমিকা কি রকম হবে এই নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে দেশে অসন্তোষ ও তার সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহ নামে অভিহিত আন্দোলন ব্যাপ্ত হতে থাকে। কেউ কেউ, বিশেষ

করে ক্ষমতাধিরূঢ় নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে কিছুসংখ্যক মনে করেন যে, স্বাধীনতা লাভ ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে সত্যাগ্রহের আর কোনো আবশ্যকতা থাকে না। কেননা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কোনো দাবি হাসিল করার সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক পন্থা খোলাই রয়েছে এবং সেই পন্থাই সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। আবার অন্য অনেকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন। এই বিতর্কে বিনোবাজী নূতন আলোকপাত করেছেন। গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতেও সত্যাগ্রহের আবশ্যতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু সে সত্যাগ্রহের স্বরূপ কি হবে সে সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মৌলিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অবর্তমানে সত্যাগ্রহ প্রধানতঃ নেতিবাচক বা 'নেগেটিভ' ছিল। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার স্বরূপকে বিধায়ক বা 'পজিটিভ' হতে হবে। নেতিবাচক ও বিধায়ক এই দুই বিশেষণের মোটামুটি ব্যাখ্যা তিনি এইরূপে করেন যে, নেতিবাচক সত্যাগ্রহে কোনো অন্যায় আইন, নিয়ম বা ব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার না করার উপর বেশী ঝোঁক থাকে। বিধায়ক সত্যাগ্রহে অপর পক্ষের বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করা ও তাকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করার উপর ঝোঁক থাকে বেশী। সত্যাগ্রহের এই বিধায়ক রূপকে বোঝাতে গিয়ে তিনি এই কথার উপর জোর দেন যে, সত্যাগ্রহের প্রধান সাধনই হল persuasion বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মনের পরিবর্তন। অপরপক্ষকে নিজের দৃষ্টিকোণ বা অভিমত বোঝাতে গিয়ে সত্যাগ্রহীর কখনও ক্লান্তি বোধ করা বা ধৈর্য হারানো পোষায় না। এই যুক্তির সমর্থনে তিনি শঙ্করাচার্যের একটি উক্তি বারবার উদ্ধৃত করেছেন যাতে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, প্রতিপক্ষ যদি তাঁর কথা না বোঝেন তবে তিনি তাঁকে আবার বোঝাবেন। তবুও না বুঝলে তৃতীয়বার বোঝাবেন ও যতক্ষণ না বোঝেন বোঝাতেই থাকবেন।

ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকে তিনি এইরূপ বিধায়ক সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রূপে উপস্থাপিত করেন। এতে সন্দেহ নেই যে, সত্যাগ্রহের বিনোবাজীকৃত এই ব্যাখ্যা গান্ধীজীর পরবর্তী যুগের সর্বোদয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় বিদেশী সরকারের অন্যায়মূলক আইন ও শাসন ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে নিজের স্বাধীন ও নির্ভীক আচরণ প্রকট করা ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সাব্যস্ত করাই ছিল অধিকাংশ সত্যাগ্রহী কর্মীর নিকট সত্যাগ্রহের প্রধান তাৎপর্য। প্রতিপক্ষকে বোঝান-সোঝানর ব্যাপারে চিন্তা করতেন স্বয়ং গান্ধীজীই। অন্য কাউকে তাই নিয়ে খুব একটা মাথা

ঘামাতে হত না। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে তাই অনেকেই কথাটিকে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা না করে বিক্ষোভ প্রদর্শনটাকেই মোটামুটি সত্যাগ্রহ বলে ধরে নিচ্ছিলেন। বিধায়ক সত্যাগ্রহের ধারণা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে বিনোবাজী সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য ও শক্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকর্ষিত করেন এবং বাস্তবিক এই পনেরো ষোলো বছরে ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলনে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে যে বিপুল সফলতা লাভ করা গেছে, তা এর পূর্বে কল্পনারও অতীত ছিল।

এই সময় বিনোবাজী সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার উত্তরোত্তর বিকাশের ক্রমকে সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌমতমরূপে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, যেমন হিংসাত্মক সংগ্রামের প্রক্রিয়া তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে থাকে, লাঠি দিয়ে কাজ না হলে বন্দুক ব্যবহার করা হয়, সত্যাগ্রহে ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার ঘটে। সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া সৌম্যই হয়, কিন্তু যদি তা সাফল্য-লাভ না করে তবে আরও সৌম্য, সৌম্যতর উপায় খুঁজে কাজে লাগাতে হয়। সত্যাগ্রহের লক্ষ্য অপর পক্ষের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া নয়। হিংসাত্মক সংগ্রামই এই লক্ষ্য নিয়ে চালিত হয়ে থাকে। সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হল অপরের হৃদয় ও বুদ্ধির সহজ প্রবাহ উন্মুক্ত করা, যাতে করে তার সদ্‌ভাবনা ও সদ্‌বিচার-সমূহ ক্রিয়াশীল হতে পারে। সেইজন্য একটি চাবি-কাঠিতে কাজ না হলে তার চেয়ে আরও সূক্ষ্ম চাবিকাঠি খুঁজতে হবে, হাতুড়ি দিয়ে তালা ভাঙ্গা যাবে না। গান্ধীজীর যুগে সত্যাগ্রহের স্বরূপ মুখ্যতঃ প্রতিরোধমূলক হওয়ার দরুন 'অহিংস প্রতিরোধ' সত্যাগ্রহের সম অর্থবোধক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনোবাজী সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে অহিংস প্রতিরোধের পরিবর্তে 'অহিংস সহায়তা' শব্দাবলী অধিক উপযুক্ত বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে সত্যাগ্রহীকে সত্যাগ্রাহীও হতে হবে। তার যে শুধু সত্যের জন্য আগ্রহ থাকবে তা নয়, সে তার প্রতিপক্ষের কথায় ও কাজে যেটুকু সত্য আছে তা গ্রহণ করার জন্যও নিজের বুদ্ধি ও হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখবে।

গান্ধীর পরবর্তী যুগে যে কোনো প্রকারের উগ্র আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ আখ্যা দিয়ে এই শব্দের অপপ্রয়োগ করা হয় সত্য, কিন্তু তবুও একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে, এ সবই জেনেশুনে ধোঁকা দেওয়ার অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় নি। গান্ধীজীর প্রদর্শিত অভিনব পন্থায় সামর্থ্যের স্বীকৃতি ও হিংসার পরিবর্তে

অহিংস না হোক অন্ততঃ শান্তিপূর্ণ পন্থা খোঁজার তাগিদ ছিল বা আছে। গান্ধীজীর প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেয়েছে বলে মনে হলেও, যাঁরা তাঁর পন্থা ত্যাগ করেছেন বা জ্ঞাতসারে অনুসরণ করেন না তাঁদের চিন্তা ও কর্মকেও গান্ধী-প্রভাব কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থা প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি যে পরিমাণ হিংসা, অন্যায়, শোষণ, স্বৈরতান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ তাতে গান্ধীজীর প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে থাকলে সে সবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের অভিব্যক্তি আরও ভয়ঙ্কর ও হিংস্র রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

বিনোবাজী সত্যাগ্রহের বিধায়ক স্বরূপের উপর পুরামাত্রায় জোর দিলেও ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ধরনের সত্যকার সত্যাগ্রহ পদ-বাচ্য কয়েকটি প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়েছে ও সফলতাও লাভ করেছে। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামিল নাড়ুর মাদুরাই জেলার মন্দিরের ভূমি কর্ষণের অধিকারের জন্য সত্যাগ্রহ, উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে মদের দোকান তুলে দেওয়ার জন্য ও আসামের আঙ্গারকাটি অঞ্চলে উদ্‌বাস্তুদের জমি থেকে বেদখল করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই তিনটি প্রসঙ্গেই গ্রামদান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে প্রচেষ্টাগুলি ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে শক্তিশালী ও সফল হতে পেরেছে।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ভারতের বাইরেও সত্যাগ্রহের পন্থা আদৃত হয়েছে। পরলোকগত ডঃ মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার লাভের জন্য সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগ করেন এবং সে দেশের নিগ্রো জাগরণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। 'ইটালীর গান্ধী' নামে অভিহিত দানিলো দোলচিও সত্যাগ্রহের অভিনব ও সফল প্রয়োগকর্তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেলের পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী সংহারের পরিণাম ও পার-মাণবিক অস্ত্রের আতঙ্কজনক সম্ভাবনা লক্ষ্য করে যুদ্ধের পরবর্তী দশকে দুনিয়ার সমাজ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে প্রেম ও দ্বেষ, সহযোগ ও সংঘর্ষ, সংকীর্ণতা ও উদারতা আদি গুণাগুণের মূল, উৎপত্তি ও বিকাশের রহস্য-ভেদের মৌলিক সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে গত বিশ বছরে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব সমস্যা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে

এবং কয়েকটি স্থানে 'শান্তি গবেষণার' জন্ম স্বতন্ত্র বিভাগও খোলা হয়েছে। এ সবের ফলে মানব-জাতির এই জীবন-মরণ প্রশ্নের উপর নূতন আলোকপাত করতে পারে এমন বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান ইতিমধ্যে একত্রিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে সর্বোদয়ের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে যুক্ত করার আবশ্যকতা প্রথমে জয়প্রকাশ নারায়ণ, শঙ্কররাও দেও ও নবকৃষ্ণ চৌধুরী অনুভব করেন। তাঁরা মনে করেন যে, নূতন সমাজ গঠনের উদ্যমকে সফল করতে হলে মানব-সমাজ ও সংস্কৃতি-প্রবাহের বাস্তবিক স্বরূপ ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলিকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন এবং এতে বিজ্ঞানের বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা-পদ্ধতি সহায়ক হতে পারে। তাই এঁদের প্রচেষ্টায় কাশীতে গান্ধী বিদ্যাস্থান (Gandhian Institute of Studies) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান এই কয় বছরের মধ্যে রাজনীতি শাস্ত্র, অর্থবিদ্যা, সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবিধ গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের এই সহায়তায় সুফলও পাওয়া যেতে আরম্ভ হয়েছে। গান্ধী বিদ্যাস্থান ইতিমধ্যে দেশের ও বিদেশের অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্র ও জ্ঞানীদের সঙ্গেও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ দেশের কিছু গবেষণা কেন্দ্রকে গান্ধী-আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা ও গবেষণায় আগ্রহান্বিত করতে পেরেছে।

বিনোবজী সর্বোদয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক সাধনার উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন যে, আধ্যাত্মিকতার গোড়ার বস্তু হল আত্ম-জ্ঞান—অপরের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করা এবং এই আত্মজ্ঞানই নূতন সমাজের ভিত্তি হবে। এর বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয়টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদের মধ্যে প্রধান হল ওয়ার্ধার নিকটস্থ পওনারে অবস্থিত ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির। এখানে প্রধানতঃ মহিলারা থাকেন।

বিনোবাজীর মতে আত্মজ্ঞান + বিজ্ঞান = সর্বোদয়, এবং আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের সূত্র ধরে যে সাধনা ও গবেষণার সূত্রপাত গান্ধীজীর পরে এদেশে ও পৃথিবীর অন্যত্র হয়েছে তার মধ্যেই মানব-সমাজের অগ্রগতির সর্বোত্তম সম্ভাবনা নিহিত আছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত

নির্মলকুমার বসু

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কথাটা খুব সোজা। মানুষের ইতিহাসে যখনই কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যখনই এক শ্রেণীর আয়ত্ত হইতে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অপর কোন শ্রেণীর হাতে গিয়াছে, তখনই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম দেখা গিয়াছে। অতীতে ক্ষমতা হস্তান্তর দ্বন্দ্বের ফলে সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসলব্ধ এই অভিজ্ঞতার ফলে মার্ক্স সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত জগতের শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকারে সমাজের সমস্ত পরিচালন ক্ষমতা আসিয়া না পড়ে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রাকৃতিক কারণ বশে একদিন যাহা ঘটিতে বাধ্য, মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে সেই পরিণতিকে অল্পকালের মধ্যে সংঘটিত করিয়া শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মুক্তির দিন আরও নিকটে আনিয়া দিতে পারে। অতএব শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থকে যাহারা নিজ স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করে সেই বিপ্লবী ব্যক্তিগণের সতত চেষ্টা হওয়া উচিত যে, অগ্নি জ্বলিবেই, যাহা হয়তো ভাল বাতাসের অভাবে এখন শুধু ধূমায়িত হইতেছে, সম্যক্ বায়ুচালনার দ্বারা তাহাকে ধূম হইতে মুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করা। অতএব যাহারা শ্রেণী সংগ্রামকে বিলম্বিত করে, শোষক-শ্রেণীর সহিত শোষিতের সম্পর্ককে সু-বহ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সদিচ্ছা প্রণোদিত হইলেও কার্যতঃ জগৎ হইতে শোষণ প্রথার সমূহ উচ্ছেদকে আরও পিছাইয়া দেয়। অতএব তাহারা আসলে শ্রমিকের স্বার্থের শত্রু, শ্রমজীবীর মুক্তির অন্তরায় ভিন্ন অপর কিছু নহে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মার্ক্সপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোন কোন মার্ক্সীয় দল গান্ধীজী সম্পর্কে উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও আবার সময় বিশেষে তাঁহাকে শ্রমজীবীর স্বার্থের অতদূর বিরুদ্ধ মনে করেন নাই ; তাঁহাদের ধারণা, গান্ধীজী কার্যতঃ কখনও কখনও শ্রমিকের স্বার্থকে পোষণ করিয়াছেন, কখনও বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। উল্লিখিত মার্ক্সীয় সম্প্রদায় গান্ধীজীকে সজ্জন বলিয়া বিবেচনা করিলেও ভ্রান্ত বা বিমূঢ়চিত্ত বলিয়া মনে করেন। গান্ধীজীর প্রভাব জন-সাধারণের উপরে অতিশয় প্রগাঢ় দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিতও হন। ভারতবর্ষের

অতিশিক্ষিত জনসাধারণ ধর্ম-সংস্কারের মোহে পড়িয়া গান্ধীজীর মত একজন ফকিরের ভেকধারী মানুষকে অনুসরণ করে, ইহাই তাঁহাদের লজ্জা ও দুঃখের কারণ; অথচ বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ ফেলিতেও পারেন না। ফলে উল্লিখিত কর্মিগণ গান্ধীকে মার্জিত এবং সংশোধিত করিয়া পুরা বিপ্লবীতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলিয়া, জনসাধারণকে ধর্মবুদ্ধির মোহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ভারতের বিভিন্ন মার্ক্সীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ মতের ইতরবিশেষ দেখা যায়; তাহাদের মধ্যে কে খাঁটি মার্ক্সীয় এই লইয়া আবার বাগ্‌বিতণ্ডাও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সে সকল তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বস্তু বিচার করাই কর্তব্য। গান্ধীজী ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা ইহা প্রথমে জানা দরকার। যদি করেন তবে তিনি ভবিষ্যতে তাহার জন্য অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর সর্ববিধ মুক্তি চান? দরিদ্র, শোষিত, শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তি চাহিলে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি তীব্রতর না করিয়া ধনী এবং শ্রমিকের সম্পর্ককে মধুরতর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস কেন করিয়া থাকেন? সংগ্রাম ভিন্ন, শত্রু নিপাতের পথকে পরিষ্কার করিয়া শ্রমজীবীর পক্ষে মুক্তি কি কখনও সম্ভব? এই সকল প্রশ্নের বিচার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্নগুলি একে একে অনেকগুলি হইয়া পড়িল, এবং সকলগুলির সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধের গণ্ডির মধ্যে আলোচনা সম্ভব নয়, উচিতও হইবে না। সেই জন্য অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা হইল, গান্ধীজী স্বীকার করেন যে, জগতের সর্বত্র শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম চলিতেছে এবং তাহার ফলে মন বিদ্বেষ এবং ভয় অথবা নিষ্ঠুরতার কলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাতে শোষকই হউক বা শোষিতই হউক কাহারও মনুষ্যত্ব পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। অতএব সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলা চলে ইহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়া শোষণবিহীন সমসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কাহারও মঙ্গল নাই। কি উপায়ে সেই অবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহা লইয়াই গান্ধীজীর সহিত মার্ক্সবাদিগণের প্রধান প্রভেদ।

আজ সমাজের মধ্যে যে শোষণযন্ত্র কায়েম রহিয়াছে তাহা যে শুধু শোষকদের অধিকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা শাসনশক্তি থাকার ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহা নয়।

শোষকদের লোভ এবং নিষ্ঠুরতা ছাড়া শোষিতদের সহযোগিতাও ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। দারিদ্র্য এবং ভয়ের বশে, কখনও বা লোভের প্রভাবে পড়িয়া, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগিতার দ্বারা শ্রমজীবিগণও উপরোক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তৎসহ শোষণের সম্ভাবনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অতএব মুক্তির সোপান হইল, বর্তমান শোষণযন্ত্রের সহিত অ-সহযোগ।

কিন্তু 'অসহযোগ কর' বলিলেই তো করা যায় না। আজ ধনতন্ত্রের যন্ত্র শ্রমজীবীকে শোষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু গৃহপালিত পশুকে গৃহস্থ যেমন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও খাইতে দেয়, ধনতন্ত্রও তেমনি আজ প্রসাদ দিয়া শ্রমজীবীর জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মার্ক্সীয় কর্মিগণ বলেন, ধনতন্ত্রের অধীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপ্লবের দ্বারা শ্রমজীবীর আয়ত্তে আনিতে হইবে। গান্ধীজীর দৃঢ় মত এই যে, হিংসার পথে সেই বিপ্লব সংসাধিত হইলে সকল শ্রমজীবীর পক্ষে ক্ষমতা লাভ সম্ভব হইবে না; উহা আসিবে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিরূপ অল্প কিছু লোকের হাতে। যদি সেই প্রতিনিধিদল সমাজের কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শ্রমজীবীর স্বার্থ পুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে, তবে ভাল; কিন্তু যদি না করে তবে তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিবার শক্তি শ্রমজীবীদের হাতে আর থাকে না। কারণ তাহাদের মরাবাঁচা সব তখন নির্ভর করে কেন্দ্রগত শক্তির উপরে।

সেই জন্য গান্ধীজীর বিশ্বাস মুক্তির উপায় হইল কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তিকে বিকেন্দ্রীকরণের রসের দ্বারা জীর্ণ করা। আঠার দফা গঠনকর্মের সাহায্যে ভারতবর্ষে গান্ধীজী সেই বিকেন্দ্রীকরণ সাধিত করিতে চান। প্রতি দেশে, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিকেন্দ্রীকরণের কর্মধারায় বিশেষত্ব দেখা দিবে। সে-কথা বাদ দিলেও বলা চলে যে, সকল দেশেই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমাজের উৎপাদন এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিয়া সাধারণ শ্রমজীবীর আয়ত্তে আনিয়া, জগতের কেন্দ্রীকৃত শোষণ শক্তিকে উদাসীনতার দ্বারা পরাস্ত করা। গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা, সম্যক্ উৎসাহ ও কর্মপটুতার দ্বারা গঠনকর্ম পরিচালিত করিলে সাধারণ মানুষের চেষ্টায় জগতের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে বৃহত্তম বিপ্লব সংসাধিত করা সম্ভব হইবে। গঠনকর্মের দ্বারা ধনতন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যেমন অসহযোগ করা হইবে, তেমনই আবার বিচ্ছিন্নস্বার্থ শ্রমজীবিগণের মধ্যে এই উপায়ে নূতন সহযোগিতার বন্ধনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যে অন্নের নূতন বন্ধনই শুধু সৃষ্টি হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে উৎপাদন-

ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া সামাজিক সম্পর্ক এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেখানে কেহ অপরের চেয়ে বেশী অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পায় না, সকলে স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে ভোগের সামগ্রী লাভ করে এবং স্বীয় ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সর্বজনের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিযুক্ত করে। গান্ধীজীর আর্থিক সমতা ও ন্যাসীবাদের ইহাই হইল তাৎপর্য।

এখন প্রশ্ন হইল, যাহারা আজ শোষণ করিতেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে থাকার ফলে পরের শ্রমের উপরে যাহারা সুখের আসন রচনা করিয়াছে, তাহারা নির্বিবাদে শ্রমজীবীর স্বার্থ পুষ্টির জন্য গঠনকর্ম চলিতে দিবে কেন? গান্ধীজী জানেন, শোষক সম্প্রদায় অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না, নিপীড়ন অথবা সংহার-কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন, সহজ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শোষককে হিংসার দ্বারা পরাস্ত করিবার যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহার দ্বারা সত্যই হিংসাকে পরাস্ত করা যায় না। আজিকার শোষণযন্ত্র ভাঙিলে নূতনরূপে তাহা আবার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিবে। হিংসার দ্বারা হিংসা নির্মূল করিবার চেষ্টা বহুবার সংসারে হইয়াছে; আজ পর্যন্ত সফল হয় নাই। হিংসার দ্বারা বর্তমান কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থাকে শ্রমজীবীর একান্ত আয়ত্তে আনিয়া, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া, সমাজে শোষণবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রণয়ন করার আদর্শ আজও জগতে সুদূর লক্ষ্যের মতই রহিয়াছে; কবে সেই সুদিন আসিবে কেহ বলিতে পারে না। হিংসা প্রয়োগের ফলে যে সকল নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলি এড়াইয়া শোষণবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা সৃজনের উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী অহিংস সাধন পন্থার কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রথম সোপান-স্বরূপ গঠনকর্মের সাহায্যে সমসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথা বলিয়াছি। এখন গঠন-কর্মের বিরুদ্ধে শোষকের প্রবর্তিত ধ্বংসচেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্য অহিংস উপায় কি? এই উপায়ের মধ্যে গান্ধীজীর মৌলিক দান নিহিত আছে। যথাবিহিত গঠনকর্মের দ্বারা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইতিপূর্বে ওয়েনের মত কোন কোন সমাজতান্ত্রিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়েনের চেষ্টা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার আঘাতকে সহিতে পারে নাই। সেই উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া গান্ধীজী সর্বদেশের মানব-সমাজের জন্য একটি বিশিষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রমজীবী যখন ধনতন্ত্রের সহিত অসহযোগ করে তখন বর্তমান ধনতন্ত্রের অধিকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্য অসহযোগী সমাজশক্তির উপর আঘাত করিতে থাকে।

যদি সত্যাগ্রহীর ধৈর্য নিপীড়নের মধ্যেও অটুট থাকে, যদি তাহারা ক্ষণেকের

অন্তত শোষকের বিরুদ্ধে আঘাতের খড়্গ উত্তোলন না করে, এমন কি শোষক অনাহারে ক্লিষ্ট হইলে তাহাকে নূতন সমসমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে মর্যাদার আসন দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে প্রতিরোধ সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীর অন্তরে শোষকের মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিশ্বাস অটল রহিয়াছে, তাহার প্রভাবে শোষকের হৃদয় টলিয়া যায়। মার্ক্সপন্থী যেখানে শাসনের দ্বারা, ভয়প্রয়োগের পথে তাহাকে দমিত করিতে চান, গান্ধী সেখানে ভালোবাসার বশে, সম্মানের অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহার আগাছায় পূর্ণ চিত্তভূমিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্যত্বের কুসুম প্রস্ফুটিত করিতে চান।

কিন্তু ভালবাসার অর্থ ইহা নয় যে, শোষকের অবলম্বিত শোষণ-ব্যবস্থাকে সত্যাগ্রহী স্বীকার করিবেন। সে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে ভাঙিতেই হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহের দ্বারা সে কার্য সিদ্ধ হইলে শোষকের অন্তর পরিবর্তিত হওয়ার ফলে হয়তো সে নূতন সমসমাজ গঠনের ব্যাপারে শোষকের সহিত সমধর্মী হইয়া সহযোগিতা করিবে। অন্তত এই পরিণতি সার্থক করাই সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য বলিয়া গান্ধীজী বিবেচনা করেন। প্রকৃত সত্যাগ্রহের ফলে শোষকের অন্তরকে যত দ্রুত রূপান্তরিত করা যাইবে, সমসমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও তত দ্রুত সম্ভব হইবে। হিংসার আঘাতে শোষককে ধ্বংস করিলে, সেই হিংসার তমসা পরে বিজয়ী শ্রমজীবীকেও পাইয়া বসে। অন্তরবাসী হিংসার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। বিজয়ী শ্রমজীবী নূতন উৎপাদন ব্যবস্থাকেও অন্তরস্থিত হিংসার সংস্কারের বশে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করিতে পারিবে বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন না। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকিলেও অন্য কোন প্রচ্ছন্ন আকারে অ-সমতা সমাজে দেখা দিয়া আবার মানবের অকল্যাণ সাধন করিতে পারে।

তাই আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ মনে হইলেও শোষকের অন্তরকে মঙ্গল আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করিয়া, তাহার নবলব্ধ সহযোগিতার সাহায্যে শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থার চেষ্টাকে দূরাহত মনে হইলেও গান্ধীজী এই পথই আশ্রয় করিয়া চলেন। কারণ হিংসার পথে ফলের নিশ্চয়তা নাই; অহিংসার ফল আপাতত বিলম্বিত হইলেও সুস্থির ও স্থায়ী লাভ হয় বলিয়া ইহাই আশ্রয় করা উচিত। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" গান্ধীজী বলিয়াছিলেন:

অহিংসার প্রক্রিয়া ধীরগতি ও বিলম্বিত পদ্ধতি—এই আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। জগতে ইহার অপেক্ষা দ্রুততর পন্থা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কারণ ইহা সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পথ। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০. ৪. ১৯২৫, পৃ. ১৫৩)

ইহাই হইল গান্ধীজীর প্রবর্তিত শোষণবিহীন নূতন সমাজ রচনার কর্মধারা। শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া নয়, ভয়ের দ্বারা শোষককে পরাস্ত করিয়া নয়, তৎপরিবর্তে গঠনপদ্ধতির সহায়তায়, দৃঢ়সংকল্পের দ্বারা এবং বর্তমান শোষণযন্ত্রের সহিত অসহযোগের কালে তিতিক্ষার দ্বারা শোষকের চিত্তকে পরিবর্তিত করিয়া সত্যাগ্রহী বিপ্লব সংসাধনের চেষ্টা করেন।

শোষকের অন্তরকে যে ভয়ের পরিবর্তে সত্যাগ্রহের দ্বারা কল্যাণের পথে চালিত করা যায়, রাষ্ট্রীয় শক্তি আয়ত্ত হইবার পূর্বেও যে গঠনকর্মের সুকৌশল পরিচালনার দ্বারা নূতন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, এই দুই বিষয়ে গান্ধীজী মার্ক্স-প্রবর্তিত মত হইতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলেন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত non-resistance-এর অর্থ nonviolent resistance; ইহার মধ্যে ভিক্ষা বা নিবেদনমাত্রের স্থান নাই, ক্লীবত্বের স্থান আদৌ নাই।

গান্ধীজীর প্রদর্শিত শ্রেণীবিলোপের পন্থা মার্ক্স-প্রদর্শিত পন্থা হইতে ভাল অথবা মন্দ, কার্যকরী অথবা নয়, ইহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মার্ক্সীয় পন্থার সহিত ইহার মৌলিক প্রভেদ কোথায় তাহা জ্ঞাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়টি অতি সংক্ষেপ করিতে গিয়া কতদূর স্পষ্ট হইয়াছে জানি না। আরও একটু স্পষ্ট হইবে এই আশায় গান্ধীজীর দু তিনটি ক্ষুদ্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

আমি মূলতঃ একজন অহিংস ব্যক্তি এবং আমি হিংসার সর্বপ্রকার সম্বন্ধবিবর্জিত যুদ্ধে বিশ্বাস করি। (হরিজন, ১৪. ৫. ১৯৩৮)

সমাজবাদীদের সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য সুবিদিত। আমি মানব-প্রকৃতির রূপান্তর এবং তাহার জন্য কাজ করায় বিশ্বাসী। তাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন না। (হরিজন, ২৭. ৫. ১৯৩৯, পৃ. ১৩৭)

পৃথিবী আজ বিদ্বেষ-বিষে ক্লান্ত। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে এই ক্লান্তি-জর্জরতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। আমরা দেখিয়াছি যে, এই বিদ্বেষ-ভাবনার দ্বারা মানব-সমাজ উপকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ যেন এক নব অধ্যায়ের সূত্রপাত করার সৌভাগ্য লাভ করে ও জগতে যেন এক দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়।

(গান্ধীজী ইন ইণ্ডিয়ান ভিলেজেস, পৃ. ১৬৬)

গান্ধীজীবনে আস্তিক্য

সুবোধ ঘোষ

এই বিশ শতকের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ঘটনাটি কী? বিশ্বজীবনের ভাল-মন্দ পরিণামের নানা আলোচনা ও প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কৌতূহলের প্রশ্ন বটে; কিন্তু এই প্রশ্ন বহু বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের চিন্তাকেও আলোড়িত করে থাকে। এবং জিজ্ঞাসার এক-একটি সদুত্তরও আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। কেউ বলেন, দুটি মহাযুদ্ধ; কেউ বা বলেন আণবিক শক্তির আবিষ্কার। কারও কারও অভিমতে নারীসমাজের অবরোধের অবসান ও স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠাই এই বিশ শতকের সব চেয়ে বড় ঘটনা। খুব স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে অভিমতের ও ধারণার অজস্র বিভিন্নতা থাকবে। বড় ঘটনা বলতে যে যেমনটি বোঝেন, তাঁর বিচারও তেমনটি হবে। কিন্তু যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, তাই হলো সব চেয়ে বড় ঘটনা, যে-ঘটনা বিশ্বজীবনের আন্তরিক প্রকৃতির উপর সব চেয়ে বড় প্রভাব সম্ভব করে, তবে ওই জিজ্ঞাসা একটি সরল ও সুস্পষ্ট সদুত্তর সহজেই পেতে পারে। সত্যই, কোন কোন মনীষীর অভিমতের কথাতে এই সদুত্তর ধ্বনিত হতে দেখা গিয়েছে। ভারতের মহাত্মা গান্ধীর জীবনই হলো বিশ শতকের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ঘটনা। হাজার হাজার বছর ধরে যে অমোঘ নিয়মের সত্য, অথবা সত্যের নিয়ম মানবিক মহত্ত্বের সংগঠন সম্ভব করে এসেছে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন তারই একটি পূর্ণতর পরীক্ষা ব্যাখ্যা ও প্রকাশ। বিদেশী মনীষী মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে বলেছেন—তিনি হলেন 'প্রফেট অব রিডিসকভারিজ'—তিনি পুনরাবিষ্কারের কৃতী মহাপুরুষ। বলা বাহুল্য, এই পুনরাবিষ্কার অবশ্যই পুরাতন ও সাধারণ বৈষয়িক তত্ত্বের নূতন আবিষ্কার নয়। সেই চিরকালীন তত্ত্বের আত্মিক সত্যেরই পুনরাবিষ্কার, যার মান মূল্য ও গুরুত্ব এই বিংশ শতাব্দীর অজস্র উদ্‌ভ্রান্তি ও চিন্তাবিক্ষেপের কারণে সমূহ উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। সেই উপেক্ষার প্রকোপ আজও চলেছে। কিন্তু অনুমান করলে ভুল হবে না যে, ধূলির ঝড় ও কুয়াশার ঘোরের মধ্যেও একটি দীপ্তির প্রকাশ সঙ্কেতিত হয়েছে। সেই দীপ্তি আমাদের ভারতের মহাত্মা গান্ধীরই জীবনের দীপ্তি। মানবিক প্রগতির ইতিহাস যে সত্যকে অনুসরণ করবার কৃতিত্বে ও সাফল্যে আলোকিত হয়েছে, মহাত্মা গান্ধী সেই সত্যেরই পরিচয় নতুন করে,

এবং একটি সমগ্রতার সৌষ্ঠব দিয়ে রূপায়িত করে আধুনিক মানবজীবনের কাছে উপস্থিত করেছেন। ভুলে যাওয়া সত্যকে তিনি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সে কোন্ সত্য? কেমন সত্য? গান্ধীজীর প্রচারিত অহিংসার বাণী, লক্ষ্য ও উপায়ের নৈতিক সম্বন্ধ, এবং আরও এমন অনেক সত্যের কথা তিনি প্রচার করেছেন, যা ঠিক তাঁর মত করে এবং আগে কেউ বলেন নি। সবই ঠিক। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে জীবনসত্যের সব চেয়ে বড় অবলম্বন হলো একটি খুবই পুরাতন এবং অতিপরিচিত তত্ত্ব—ঈশ্বরবিশ্বাস। গান্ধীজীর জীবনের সকল কর্ম চিন্তা ও প্রয়াসকে একটি পূর্ণ মহত্ত্বে সুসংবদ্ধ করেছে ওই তত্ত্ব, যার নাম ঈশ্বর-বিশ্বাস। এই বিংশ শতকের বিপুল নাস্তিক্যের ঘনঘটার মধ্যে তিনিই সব চেয়ে স্পষ্ট এক জ্যোতিষ্কের মত সেই আলোক বিচ্ছুরিত করেছেন, যার নাম ঈশ্বর-বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানুষের ইতিহাসে নতুন কোন আগ্রহের ব্যাপার নয়। বহু লোকগুরু, মহাপুরুষ, দার্শনিক ও সাধক যুগে যুগে ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রেরণা জাগিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রেরণা যে অপঘাতে বিব্রত হয়েছে, তেমন কঠোর অপঘাত বিগত কোন শতাব্দীতে হয় নি। পুরাতন ফরাসী বিপ্লবের কথা স্মরণ করা চলে, সেই সঙ্গে এই বিশ শতকের রুশীয় বিপ্লবের কথা। দেখা যায়, এইসব বিপ্লব এবং এই ধরনের বিপ্লব প্রচলিত আর্থনীতিক অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভ্যুদয় হতে গিয়ে ঈশ্বরবিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অভ্যুদিত করেছে। এবং অনেক সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত ধরে নিয়েছেন যে, আর্থনীতিক অধর্ম ও সামাজিক বৈষম্য এবং স্বার্থপুষ্ট শ্রেণীর অনাচারের সার্থক প্রতিকার সম্ভব করতে হলে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও একটা আঘাত দিয়ে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। কোন সন্দেহ নাই, বিশ্বের বহু ঘটনাতে দেখা গিয়েছে যে, শোষণের ও নিপীড়নের রাজশক্তি চার্চের সাহায্য ও সহায়তা পেয়েছে। কিন্তু চার্চ ভুল করেছে বলে ঈশ্বরবিশ্বাসই একটা হীনতাময় ভুল, এমন ধারণা বস্তুত একটা অন্ধ ক্রোধ অথবা কঠিন অভিমানের যুক্তি, অর্থাৎ অপযুক্তি। গান্ধীজীর মতে, বুদ্ধ খৃষ্ট ও একজন শ্রীচৈতন্যই হলেন প্রকৃত বিপ্লবী। এবং মানুষের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত বস্তুত এই সত্যেরই স্বীকৃতি যে, মানুষের আত্মিক প্রকৃতিকে একটি দিব্য বিশ্বাসে দীক্ষিত করে তাঁরা মানবীয় জীবনের সব চেয়ে শুভকর এক-একটি নূতন সংগঠন সম্ভব করেছিলেন। এবং ঐতিহাসিক অর্থে, তার চেয়ে বড় বিপ্লব আর-কিছু হতে পারে না।

"কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যে নিক্ষেপিলে ?"

জলের তিলক কারও কপালে বেশিক্ষণ থাকে না। আর, শূন্যে ঢিল নিক্ষেপ করলেও সেখানে সে ঢিল থাকে না, মাটিতেই পড়ে যায়। কবির উক্তিকে একটি যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যদি নৈতিক শুদ্ধতা ও সৌষ্ঠবের কোন প্রতি-শ্রুতি না থাকে, তবে কোন পরিবর্তনের সাময়িক চমৎকারী কৃতিত্বও স্থায়ী হতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন জ্ঞান ও কর্মের বিপুল কীর্তি হয়ে উঠলেও একথা মনে করা চলে না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকার ফলেই সেই কীর্তি সম্ভব হয়েছে। গান্ধীজী বলতে চান, ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকলে ব্যক্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বও অপূর্ণ। যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনই জাতির জীবনে, এবং এই বিশ্বজনতার জীবনেও ঈশ্বরবিশ্বাস বস্তুত সব চেয়ে বড় সম্বল।

গান্ধীজীর জীবনের ঐতিহাসিক সফলতার যে কথাটি সবার আগে সবারই মনে পড়ে, সে সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নেই। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ, যার কঠোর প্রতাপ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জাতির অদৃষ্টকে কঠোরতর শাসনিক প্রভুত্বের অধীন করে রেখেছিল, এই বিংশ শতকেই তার অন্তর্ধান অনেকখানি সম্পন্ন হয়েছে। এবং দেখতে পাওয়া যায়, সেই অন্তর্ধানের প্রক্রিয়া এখনও থামে নি। একে একে বহু পরাধীন দেশ ও জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই অপসারণের প্রথম ঘটনাতে যে দেশকে দেখতে পাওয়া যায় ; সে দেশ হলো আমাদের এই ভারত ; নিরস্ত্র পরাধীন ভারত, গান্ধীজীর ভারত। তার পর একে একে অনেক দেশের ও জাতির রাজনীতিক মুক্তি। তর্ক ও সন্দেহের কোন ছায়া এখানে নেই ; নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক স্বীকার না করে পারবেন না যে, গান্ধীজীর জীবনেরই বিপুল প্রভাবে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের অবসান সূচিত হয়েছে।

এইবার বলতে পারা যায়, এর চেয়ে বিপুলতর কোন রাজনীতিক কৃতিত্বের ঘটনা কি অতীতের ও আধুনিক কালের অন্য কোন রাজনীতিক মহানায়কের জীবনে সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে ? এবং বিশ্ব-ইতিহাসে এমনতর একটি সুবৃহৎ রাজনীতিক ঘটনার স্রষ্টা তিনিই হয়েছেন, যাঁর সমগ্র সত্তা ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসে দীক্ষিত। এই অভিজ্ঞাত সত্যটিই আধুনিক বিশ্বজীবনের পক্ষে একটি বিরাট শিক্ষা, এবং প্রভাবও নিশ্চয়।

এক কথায় বলা যায়, ভারতের গান্ধী মানবীয় জীবনের ললাটে জলের তিলক

এঁকে দিতে চেষ্টা করেন নি ; এবং তাঁর নীতিও শূন্যে নিক্ষেপিত লোষ্ট্রের মত একটা ক্ষণিক উর্ধ্বগামিতার চমক সম্ভব করতে চায় নি। তিনি চিরকালীন সত্যেরই প্রসন্ন অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, সততাময় ইচ্ছার কাজই একটি স্বয়ংসিদ্ধ পূর্ণতার অনুষ্ঠান, সে কাজ সফল হোক বা না হোক। মানুষের আন্তরিক সংগঠনের পথে এর চেয়ে বড় বৈপ্লবিক (?) শিক্ষা আর কী হতে পারে? বুঝতে অসুবিধা নেই, এই নীতি বস্তুত মানবীয় জীবনে এক অপরাহত মহত্ত্বের শক্তি ও অধিকারের অঙ্গীকার। পরিণামও যেন মানবীয় জীবনের কাছে একটা মোহময় বন্ধন না হয়ে ওঠে, গান্ধীজীর প্রচারিত জীবন-দর্শনের কথা তারই একটি উদাত্ত প্রমাণ। ফরাসী মনীষী আলবেয়ার কাম্যু, কয়েক বৎসর আগে যাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁর অভিমত আধুনিক কালের বিপ্লব-চিন্তক শিক্ষিত জনসমাজের কাছে খুবই প্রিয়। এহেন কাম্যুর একটি মন্তব্য—মানুষে আমার বিশ্বাস নেই ; কিন্তু মনুষ্যত্বে আমার বিশ্বাস আছে। মন্তব্যটিকে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। তবু বুঝে নিতে পারা যায়, তিনি কী বলতে চেয়েছেন। মানুষ ভুল করে, কিন্তু মনুষ্যত্ব যেন একটি চিরন্তন সত্য। তার মধ্যে কোন ভুল নেই। কিন্তু মনুষ্যত্বে কেন ভুল নেই, এই প্রশ্নের নিখুঁত জবাব কাম্যুর জীবনবাদের কথাতে নেই। বলতে পারি, এই প্রশ্নের সদুত্তর আছে মহাত্মা গান্ধীর জীবনবাদের মধ্যে। মনুষ্যত্ব মানুষের আত্মিক তথা স্পিরিচুয়াল পরিপ্রকাশ। মানুষ প্রেম স্নেহ ত্যাগ মমতা ও করুণার শিল্পী হয়ে যে জীবন যাপন করে, সেই জীবনই হলো মনুষ্যত্বের পরিপ্রকাশে সুপ্রসন্ন আত্মিক জীবন। এই মনুষ্যত্ব, গান্ধীজীর মতে, ঈশ্বরবিশ্বাসের সম্বল ছাড়া কখনই রূপায়িত হতে পারে না। নিরেট বস্তুবাদী সমালোচকের পক্ষেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আজ পর্যন্ত বিশ্বজীবনের সর্ববিধ সাংস্কৃতিক রম্যতার সৃষ্টিতে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রভাই হলো সব চেয়ে বড় প্রভাব। সাহিত্য শিল্পকলা নৃত্য সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক রম্যতার সব সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বাসময় মনীষা ও প্রতিভার ঐতিহাসিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অবিশ্বাসের জগৎ আজও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির কোন সুস্থায়ী ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারে নি।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি গ্রন্থের নাম—গীতায় ঈশ্বরবাদ। রসিক অমৃতলাল বসু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, গীতায় সত্যই কি ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া হয়েছে? গান্ধীবাদ কাকে বলে জানি না। গান্ধীজী নিজেই বলেছেন, গান্ধীবাদ কথাটির কোন অর্থ হয় না। তবু বলতে পারা যায় ; ঈশ্বরবিশ্বাসের কথাটি বাদ

খাতাটা ড্রয়ার থেকে বের করেন। এই ভগ্নাংশগুলিই জীবনের প্রকৃত চরিত্রের আসল উপাদান; এইখানেই মানুষের মূল সুরটি নিহিত এবং এই সুরের উৎস ধরে অগ্রসর হলেই সেই মানুষটির আসল রূপের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কখনও কখনও এমনও হতে পারে, বাইরের পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত রূপের সঙ্গে এই রূপের পার্থক্য ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে এই অন্তরঙ্গ ও অন্তরতম নিঃসঙ্গ রূপটিই তার আসল পরিচয়।

জীবনের ক্ষেত্রে এই শিল্পবোধের পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এই মানদণ্ড দিয়েই বিচার করা যায়, সেই মানুষটি তাঁর জীবনের পোড়ো জমির কতটুকু অংশ আবাদযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর Personality গ্রন্থের What is Art প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলছেন, "Art is like the spread of vegetation, to show how far man has reclaimed the desert for his own." গান্ধীজী যদি কেবল রাজনীতির মানুষ হতেন এবং যে রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে কেবল সংগ্রাম আর কূটনীতির খেলা, তা হলে আমাদের পরিচিত গান্ধীজীর জীবনের একটা বিরাট অংশকে অনুর্বর পোড়ো জমির মতই মনে হত। অর্থাৎ গান্ধীজী বলতে যে মানুষটির কাছে আমরা নত হই, যে মানুষটিকে আমাদের নীরব শ্রদ্ধা জানাই, যে মানুষটিকে কোনো নির্জনতম মুহূর্তে মনে করি, সেই গান্ধীজী আমাদের কাছে হারিয়ে যেতেন নিঃশেষ হয়ে যেতেন। আমরা বড়জোর তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে সংবাদপত্রে ব্যবসায়িক প্রবন্ধ লিখতাম। তারপর সারা বছর তিনি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে পড়ে থাকুন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতার দুর্ভিক্ষত আজো ঘটে নি!

তাই আমাদের অন্তরের কাছে গান্ধীজী কেবল রাজনৈতিক নেতা নন। তিনি এর চেয়েও বেশ কিছু বেশি, এবং বলতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক রূপটাই আমাদের কাছে গৌণ, তাঁর জীবনটাই আসল। তাঁর জীবনটাই আমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার, যে জীবন সত্য অহিংসা, সংযম এবং সৌন্দর্যবোধের উপাদান দিয়ে নির্মিত। এবং এই উপাদানগুলি যে কোন পরিপূর্ণ জীবনের অবিভাজ্য অংশ। এই উপাদানগুলির মিলিত রূপই পরিপূর্ণ জীবনের সংগীত রচনা করে, এইগুলির মিলিত মূল্যবোধই মানুষের জীবনের ঐক্যরূপ। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীর শিল্পচেতনা-তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং দৈনন্দিন জীবনের যত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ জুড়ে থাকুকই না কেন, সেই সীমিত পরিধিই

তাঁর জীবনের ঐক্যকে নিরূপণ করেছে। কারণ 'আর্ট' এর কাজই তাই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "The principle of art is the principle of Unity."

একটি প্রশ্ন এখানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই উঠতে পারে। কেউ কেউ বলতে পারেন, গান্ধীজী কি কবিতা লিখতেন? তিনি কি সাহিত্য রচনা করতেন? গান গাইতেন? তিনি কি কখনও রঙের তুলি হাতে নিয়েছেন?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সবক্ষেত্রেই শুধু নেতিবাচক নয় বরং কখনও কখনও প্রশ্নের পরিপন্থী। যেমন, ছবি আঁকা তো দূরের কথা, তাঁর হাতের লেখা ছিল বেশ বিশ্রী। জীবনে এক লাইনও তিনি কবিতা লেখেন নি। গানের চর্চা তিনি করেন নি। শুধু ব্যারিস্টারী পড়ার সময় একবার বার্নাড শ'কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় গেলে নাচ শেখা যায়!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই, গান্ধীজীর ইংরেজী বহু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের হাত দিয়েও বেরোনো কঠিন। একমাত্র বাইবেলের ইংরেজীর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য। তাঁর ইংরেজী অনাড়ম্বর, সহজ এবং সুন্দর। গান তিনি গাইতেন না। কিন্তু গানের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা, অর্থাৎ কান—সুরের কান, তা গান্ধীজীর ছিল। নতুবা এত সুন্দর ইংরেজী তিনি লিখতে পারতেন না। ইংরেজী, সংস্কৃত বা বাংলা ভাষা অত্যন্ত সংগীতময়, 'মিউজিক্যাল'। শব্দের মধ্যেই সংগীতের সুর বাজে। এজন্য শব্দ শোনার কান চাই। যার এই কান যত বেশি প্রখর, যত বেশি পরিশীলিত, তাঁর ভাষা, তাঁর শব্দ প্রয়োগ তত বেশি সুন্দর হতে বাধ্য।

আমার যুক্তির সমর্থনে আর দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করব। একটি হল, 'আর্ট' এর মূল উদ্দেশ্য, তার চরম এবং পরম লক্ষ্য কি, তার দৃষ্টির আলো কোন মূল লক্ষ্যভূমির উদ্দেশ্যে প্রসারিত অথবা এক কথায় 'আর্ট' এর মূল ও চরম কথাটা কি? দ্বিতীয়টি হল, 'আর্ট' কোন জীবনের পাত্রে নিজেকে সব চেয়ে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে এবং সব চেয়ে বেশি সুন্দর করে প্রকাশ করে। গান্ধীজীর জীবনের পাত্র কি সেই পরম প্রকাশের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল!

'আর্ট'-এর নানান সংজ্ঞা, নানান মত। এর মধ্যে টলস্টয়ের মতটিকে আমরা প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ বলতে চাই। টলস্টয়ের মতে, প্রকৃত আর্ট, সে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প যাই হোক্ না কেন, তার তিনটি মূল উদ্দেশ্য থাকবে, 'ফাংশান' থাকবে। সেগুলি হল:

(১) A perfect work of art will be one in which the content is important and significant to all men and therefore moral.

(২) The expression will be quite clear, intelligible to all and therefore beautiful.

(৩) The author's relation to his work will be altogether sincere and therefore true.

অর্থাৎ মহৎ শিল্পের যে তিনটি চরিত্র আমরা পেলাম, তা হল নৈতিকতা, সৌন্দর্য এবং সত্য। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই তিনটি মানদণ্ডের কোনটি বেশি কোনটি কম থাকে। কখনও কখনও হয়ত একটি মানদণ্ড অনুপস্থিত রয়েছে এমনও হতে পারে। যেমন বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পলেখক মোপাসাঁর সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য ছিল, সত্যও ছিল, কিন্তু নৈতিকতা ছিল না। টলস্টয় বলছেন, মোপাসাঁর মধ্যে জীবনের শেষের দিনগুলিতে এই অসম্পূর্ণতা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মধ্যে প্রাক্ আধ্যাত্মিক জন্মের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল— "Pangs of spiritual birth had already began in him." মৃত্যু নিকটতর না হলে মোপাসাঁও তাঁর মহৎ প্রতিভা থেকে আরো নতুনতর ও মহত্তর কিছু দিয়ে যেতে পারতেন!

এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর যদি গান্ধীজীর জীবনের চালচিত্রকে আমরা দাঁড় করাই তবে দেখতে পাব, নৈতিকতা, সৌন্দর্য এবং সত্যের পবিত্র আলোকে তাঁর সারা দিনের কর্মশালা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছবি হয়ে উঠেছে। জীবন যদি বাণী হয়, তবে ছবি হবে না কেন! এবং এই ছবি এক গভীর মৌন সুন্দর নিভৃত প্রদেশের দিকে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বলছে, সত্য সুন্দর ও প্রেমের দিকে জীবনকে নত করো। গান্ধীজীর যে ছবি আমাদের মনে অপার্থিব সুর সৃষ্টি করে, সে ছবি কোন মতেই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নয়, বরং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বলা যায়। প্রকৃত 'আর্ট'এর মূল কথাটাই তাই। সত্য সুন্দর ও প্রেমের গভীর নৈঃশব্দ্যের দিকে আমাদের নত হতে বলছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "In Art the Person in us is sending its answers to the Supreme person who reveals Himself to us in a world of endless beauty across the lightless world of facts" (What is Art Personality. p. 38) তখনি গান্ধীজীর একটি প্রিয় গানের কথা মনে পড়ে—

"একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে"। এখানে নমস্কারের অর্থ অভিবাদন নয়, তার অর্থ সমর্পণ, 'সারেণ্ডার'। গান্ধীজীর সারা জীবনের সমস্ত সুকৃতির সুফল একটি নিঃশেষ এবং নিঃশঙ্ক সমর্পণের ছন্দে বেজে উঠেছে!

দ্বিতীয় বিষয়, 'আর্ট' কোন জীবনের পাত্রে নিজেকে সব চেয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তার রচয়িতাদের জীবন থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে, সহজ, সরল ও পবিত্র জীবনই 'আর্ট'-এর প্রকাশের পক্ষে সব চেয়ে উর্বর। ঋগ্বেদের কাল থেকে যে সব মহান সৃষ্টি মহাকালের ঝড়কে, ধ্বংসকে উপেক্ষা করে আজও উজ্জ্বলতার মধ্যে বেঁচে আছে, সেগুলি সহজ সরল অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনেরই মহৎ ফসল। সত্যকে, সুন্দরকে, প্রেমকে উপলব্ধি করার জন্য এই জীবনই সব চেয়ে প্রযোজ্য। "We in the East know that Truth, Power, Beauty lie in simplicity where it is transparent, where things do not obstruct the inner vision." (Rabindranath, What is Art)

এই সহজ, সরল জীবনের ক্ষুধা একদিন ধনী টলস্টয়কে বিলাসের উচ্ছলতা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছিল। টলস্টয়ের এই জীবনকে গান্ধীজী গভীর-ভাবে শ্রদ্ধা করেছিলেন। গান্ধীজীর মতে এই সময়েই টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা রচিত। এই বইটির নাম 'What is Art'। জুতো সেলাই করার এবং চাষ করার ফাঁকে ফাঁকে টলস্টয় এই বইটি লিখেছিলেন।

এই আলোকে আমরা দেখতে পাই, গান্ধীজীর জীবন শিল্পের শস্যের পক্ষে সব চেয়ে উর্বর মৃত্তিকার মত। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন এবং জীবন-যাত্রার মধ্যে পবিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে।

গান্ধীজী আর্ট বা শিল্পকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। আর্টকে তিনি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মনে করতেন। 'আর্ট' তাঁর কাছে, একটি মহত্তর উত্তরণের উপায় মাত্র। তা 'Means', 'End' নয়। "There is a place for Art in life. But Art can only be a means to the end which we must all of us achieve."

'End'-টি তা হলে কি? গান্ধীজী তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলছেন, "All true Art is thus expression of the Soul"—সমস্ত প্রকৃত 'আর্ট' আত্মার অনাবিল প্রকাশের জন্যেই। "All true Art must help the soul to

realize its inner-Self"—অন্তরতমকে উপলব্ধি করতে, প্রকাশ করতে, সাহায্য করাই আর্ট-এর কাজ। তারপর বলছেন,—আমার ঘরের ছাদটা যদি না থাকত তবে আমি এই বিস্তীর্ণ নক্ষত্রালোকিত আকাশটা দেখতে পেতাম, যে আকাশ অসীম সৌন্দর্যে প্রসারিত। যখন কোনদিন এই আকাশের দিকে আমি তাকাই, তখন মনে হয়, কোন সচেতন শিল্পীর সৃষ্টি আমাকে এই আকাশ দেখার আনন্দ দিতে পারত না। কাজেই মানুষের শিল্পসৃষ্টি অসম্পূর্ণ। তার কাজ শুধু, আত্মাকে এই উপলব্ধির যাত্রাপথে চলতে সাহায্য করা। "I may even dispense with the roof, so that I may gaze out upon the starry heavens overhead that stretch in an unending expanse of beauty. What conscious art of man can give me the panoramic scenes that open out before me, when I look up to the sky above with all its shining stars ?" তাই বলে 'আর্ট'-এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। তবে এই 'আর্ট' অসম্পূর্ণ বিশেষ করে প্রকৃতির কবিতার, প্রকৃতির চিত্রাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। এর প্রয়োজনীয়তা সেইখানে যেখানে—"As they help the soul onward towards self-realization." (Selections from Gandhi—Nirmal Kumar Bose.)। তিনি-ই মহৎ শিল্পী, কবি, যিনি বলতে পারেন, "দেবস্য পশ্য কাব্যং—ন মমার ন জীর্যতি" দেবতার নিজের হাতে আঁকা যে অপার্থিব কবিতা প্রকৃতির অসীম ক্যানভাসে আঁকা হয়ে ওঠে, তাই দেখ। এ কবিতা কখনও ম্লান হয় না কখনও জীর্ণ হয় না। গান্ধীজী এই দেবতার কবিতা দেখার চোখের অধিকারী ছিলেন।

কোন্ জীবনের পাত্রে শিল্পের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে—সে কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের কথা আগেই বলা হয়েছে। গান্ধীজী সেই কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলছেন। অনেকের ধারণা, শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গান্ধীজীর মতে পবিত্র জীবনই প্রকৃত আর্ট। মহৎ শিল্পী পাওয়া যায়, কিন্তু মহৎ জীবন-শিল্পী পৃথিবীতে দুর্লভ। "We have somehow accustomed ourselves to the belief that art is independent of the purity of private life. I can say with all the experience at my command that nothing could be more untrue. As I am nearing the end of my earthly life I can say that purity of life is the highest and truest art.

The art of producing good music from the cultivated voice can be achieved by many, but the art of producing that music from the harmony of a pure life is achieved very rarely. (Selections from Gandhi—Nirmal Kumar Bose)

অর্থাৎ আমরা গান্ধীজীর নিজের কথা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম, প্রকৃত 'আর্ট' অন্তরের অন্তরতমকে উপলব্ধির উপায় মাত্র, 'আর্ট' আমাদের সেই শান্ত, নির্জন গভীরতার দিকে নিয়ে যায় যেখানে জীবন এক নতুন অর্থের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, এবং প্রকৃত জীবন-শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীত পরিবেশক বা চিত্রশিল্পী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ।

॥ ২ ॥

গান্ধীজীর জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই ঘটনাগুলি থেকে, গান্ধীজীর জীবনে শিল্পের স্থান কী গভীর ছিল, তা আমরা জানতে পারব। এই ঘটনার ভগ্নাংশগুলি তাঁর জীবন-কাব্যের এক একটি অমূল্য শ্লোক। এই দিয়েই তাঁকে আমরা শিল্প দৃষ্টির নতুন আলোকে বিচার করতে পারি।

১৯২৫ সাল। গ্রীষ্মকাল। গান্ধীজী তখন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান সফর করছেন। লঞ্চে চলেছেন পদ্মার ওপর দিয়ে। এমন সময় প্রবল ঝড় উঠল। লঞ্চ ডুবে যায় যায়। গান্ধীজী বললেন, "আমি ঝড় খুব ভালোবাসি।"

ঝড়ের সময় চারদিকের আকাশের চেহারা কেমন হয় তা দেখার জন্য সেবার চাঁদপুর যাওয়ার পথে লঞ্চের ছাদে উঠে এলেন গান্ধীজী।

ঢাকায় আছেন গান্ধীজী। সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে উদ্যোক্তারা স্থির করলেন, একদিন বিখ্যাত শ্রীভগবান দাস সেতারীর বাজনা শোনাবেন।

সেদিনও প্রচুর প্রোগ্রাম। গান্ধীজী বললেন, মাত্র পনের মিনিট সময় দিতে পারি।

সেতারী তন্ময় হয়ে সেতার বাজাচ্ছেন। আর গান্ধীজীও পাশে বসে তন্ময় হয়ে শুনছেন।

যখন সেতারী থামলেন, তখনও গান্ধীজী বসে আছেন, যেন ধ্যান করছেন। ইতিমধ্যে পৌনে এক ঘণ্টা কখন কেটে গেছে। ঘড়ির কাঁটার মত সময়নিষ্ঠ

গান্ধীজীর জীবনে এই একটি স্মরণীয় সুন্দর ব্যতিক্রম।

আরও একটি ঘটনা। ১৯৪০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী কস্তুরবাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। তাঁর নিজের কথায় "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me." শান্তিনিকেতন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—যেখানেই শিল্পকথা সেখানেই জীবন।

গান্ধীজীর সম্মানে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চণ্ডালিকা অভিনয় হল। গভীর আগ্রহ নিয়ে গান্ধীজী সারা অভিনয়টি দেখলেন। তাঁর এই মনোভাবের কথা একজন সাংবাদিক তুলে ধরেছিলেন তাঁর মন্তব্যে। 'হরিজন' পত্রিকায় এই সাংবাদিক লিখেছিলেন—'গান্ধীজীকে এমন গভীর তন্ময়তার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠান শুনতে আর কখনও দেখা যায় নি।'

সংগীত গান্ধীজীর কাছে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ছন্দ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুশীলন। শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "I think that our boys and girls should know how to walk how to march how to sit how to eat, in short how to perform every function of life. That is my idea of music. So far as I know Gurudev stood for all this in his own person." (Mahatma—by D. G. Tendulkar Volume Vll. p. **27**)

জীবনের সব কাজ গান্ধীজী সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবেই করতেন। একে যদি জীবন-শিল্প বলা যায়, তবে তা প্রকৃতই অত্যুক্তি নয়। নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা, "আপনারা যাকে ললিত কলা বলেন, তার কোন নিদর্শন আমার আশে-পাশে না থাকলেও আমার জীবন বস্তুতঃ কলাময় এ কথা বলতে পারি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩. ১১. ২৪)

৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮। দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য গান্ধীজী গভীর দুঃখিত। ভোরের স্তব্ধ মুহূর্তে প্রার্থনা সংগীতের শেষে বিষণ্ণ গান্ধীজী একটি গুজরাটী গান শুনতে চাইলেন। গানটির অর্থ, 'যাত্রী তুমি যত ক্লান্ত হও না কেন, তোমার দেরি করা চলবে না, থামলে চলবে না। নিঃসঙ্গ যাত্রী একা হলেও তোমায় এগিয়ে চলতে হবে।"

দীর্ঘ অনশনের ফলে ক্লান্ত গান্ধীজীও থামেন নি। যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থেমে যায়, গান্ধীজীর মৃত্যু তা নয়। তিনি মৃত্যুর মধ্যেও সঞ্জীবিত। যে জীবন তাঁকে এই অমৃতত্বে পৌঁছে দিয়েছে, সে জীবন নিপুণ শিল্পের সুরে ছন্দে

রূপে গাঁথা উন্মুক্ত প্রসারিত দীপ্ত আকাশের মত যে নিঃসীম নীল এবং নিরাভরণ। এই জীবনের জন্য কোন কারুকার্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই হল দেবতার কবিতা, যে কবিতা জীর্ণ হয় না, মরে না।

একটি মানুষের সমগ্র রাজনৈতিক জীবন, শিল্পের মূল সম্পদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত আমাদের জীবন-কালের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীর মধ্যেই আমরা দেখলাম। বিংশ শতাব্দীর সমস্ত অন্ধকারের আক্রমণের মধ্যেও এই আলোক রশ্মি অম্লান আছে, অম্লান থাকবে। কারণ সত্যের মৃত্যু নেই, এবং সত্য মানেই সৌন্দর্য। "সৌন্দর্য দেখি আমি সত্যে, এবং পাই আমি সত্যে। এবং সত্য সর্বতঃ সুন্দর।" গান্ধীজীর জীবনে শিল্পের অন্তরতম বাণী এমনি করেই প্রকাশিত হয়েছিল!

শ্রমিক আন্দোলন ও গান্ধীজী

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রমিক আন্দোলন উৎপাদনের সহিত সম্বন্ধিত। সুতরাং উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে ইহা জড়িত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন বাষ্প শক্তি, তড়িৎ শক্তি ইত্যাদি) আবিষ্কারের পরে উৎপাদন-পদ্ধতি কেন্দ্রীভূত হয়। এবং এই সকল কেন্দ্রে যে সব শ্রমিক আসিয়া কাজ করে তাহাদের সমস্যা সমাধান করার নামই শ্রমিক আন্দোলন। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব হইতেই সমাজে উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল, তবে তাহা হইত বিকেন্দ্রিত প্রথায়। তখনকার উৎপাদন-কর্মীদের সমস্যাও ছিল ভিন্ন প্রকারের। সর্ব অবস্থায়ই উৎপাদন করিতে শক্তির প্রয়োজন। প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে শক্তির উৎস ছিল পশু ও মানুষের দেহ-শক্তি। এই দুইয়ের মধ্যে মানবের দেহ-শক্তিই উৎকৃষ্টতর। কারণ মানুষের বিবেচনা আছে, বুদ্ধি আছে, এবং বিচারের সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আছে।

শক্তি যে ধরনেরই হউক সমাজের প্রয়োজনে শিল্পকে সুসংহত রাখিতে সেই শক্তিকে সমাজের কর্তৃত্বাধীনে রাখা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই মনে হয় আদিকালে দাস প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। শিল্পোদ্যোগের পরিচালক-বর্গ দাসদের সুযোগমত কাজে লাগাইবার অধিকারী হইতেন। ভারতবর্ষে কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা সুসংহত রাখিতে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই বর্ণাশ্রম প্রথায় শক্তির উৎস হিসাবে শূদ্রকে কাজে লাগান হইত। আমাদের দেশে শূদ্রদেরও সামাজিক স্বীকৃতি এবং কতগুলি অধিকার দেওয়া ছিল। দাসপ্রথার প্রথম উদ্ভব হয় সম্ভবতঃ মিশর ও তৎসংলগ্ন দেশসমূহে। দাসদের সামাজিক কোন অধিকার ছিল না। ক্রমে উচ্চস্তরের লোকেরা মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করিয়া এই প্রথাকে শোষণের কাজে লাগাইতে আরম্ভ করে। তখনকার শ্রমিকদের অর্থাৎ দাসদের যে সকল সমস্যা তাহার সমাধানের চেষ্টা চলে দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে। আইনতঃ অনেক দিন দাসপ্রথার উচ্ছেদ হইলেও বহু দেশে কার্যতঃ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহার উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। এখনও যে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা চলে না।

এই মনোবৃত্তি তিরোহিত হইবার বহু পূর্বেই নূতন আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হইল। এই পরিবর্তিত শিল্পোদ্যোগ ব্যবস্থায়ও উৎপাদন ব্যবস্থার

পরিচালকদের দাসদের সহিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীয় মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং এই সকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দাসেদের মতই শোষণের মনোবৃত্তি কাজ করিতে লাগিল। আমরা জানি, যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের প্রথম যুগে শ্রমিকদের ১৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নেহাত যতটুকু খরচ না করিলেই নয়, শিল্পপতিরা তাহাদের পিছনে তাহার বেশী খরচ করিত না। তখনই বর্তমান যুগের শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রমিকদের কার্যকাল হ্রাস করা বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য আন্দোলন শুরু হইল। তখনকার দিনে এই আন্দোলনের নেতাদের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়াছে তাহার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। সরকারও ছিল শিল্পপতিদের সহায়ক। কিন্তু সর্বপ্রকার অত্যাচারের ফলেও যখন আন্দোলন বন্ধ হইল না তখন শিল্পপতিরা এবং সরকার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে লাগিল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শ্রমিকদেরই অত্যধিক শ্রম ও আত্মবলি দিতে হইত। এই কালের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করা এবং ইহা কেবল মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই সীমিত ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপে কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করিলেন যে, প্রতিপদে এই শ্রম ও আত্মত্যাগ স্বীকার না করিয়া সমাজ ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করা হউক যাহাতে একে অন্যকে শোষণ করিতে না পারে। সেই সময়ে ইহার অনুকূল বহু সমাজ-দর্শনের উদ্ভব হয়—বহু প্রকারের সমাজবাদ, নৈরাজ্যবাদ, সিন্ডিক্যালিজম্, সাম্যবাদ ইত্যাদি।

আজ আমরা কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদ ছাড়া অন্য কোন সমাজ-দর্শনের আলোচনা বা প্রয়োগ চেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ শুনিতে পাই না। তাহার কারণ আছে। সেই কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সেই সময়কার অপর এক সামাজিক বিপ্লবের কথা উল্লেখ প্রয়োজন।

য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে মধ্যযুগে সমাজ-ব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক ছিল। ধর্মের নির্দেশের বাহিরে কোন কাজ সহজে করা সম্ভব হইত না। ধর্মের এই নির্দেশ দিবার অধিকার ছিল ধর্মগুরুদের হাতে। তাঁহাদের আদেশ বা উপদেশের বাহিরে কেহ কোন কাজ করিলে এমন কি চিন্তা করিলেও শাস্তি পাইতে হইত। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ হইতে য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হইলে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘাত শুরু হয়। বিজ্ঞান-আধারিত সত্যকে ধর্মগুরুরা স্বীকার করিতে রাজী নন। সমাজ-বিধানের বলে ধর্মগুরুদের হাতে

এই সব বিজ্ঞান-সন্ধানীদের নির্যাতিত হইতে হয়। ব্রুনো প্রাণ দেন, গ্যালিলিওকে আজীবন নজরবন্দী থাকিতে হয়। এই ভাবে বহু নব সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকদের নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। ক্রমে বিজ্ঞানের জয় হয়। বিজ্ঞান-আধারিত সত্য মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিউটনের পরবর্তী কাল হইতে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বিজ্ঞানযুগ সত্যই গ্রহণযোগ্য, অন্য কিছু নয়।

ইহার কিছুকাল পরে শোষণ রহিত সমাজ-দর্শন সমূহের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে কার্ল মার্কস্‌ই কেবল তাঁহার দর্শনকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞান আধারিত সমাজে কার্ল মার্কস্-এর কমিউনিজমই অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্রমে অন্যান্য সমাজ-দর্শন মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া যুক্তিবাদের (Rationalism) উপর প্রতিষ্ঠিত। একই অবস্থায় প্রকৃতিতে ঘটনা (Events) একইভাবে সম্পাদিত হয়—বিভিন্নভাবে কাজ করে না। প্রস্তরখণ্ড উপরে নিক্ষিপ্ত হইলে সর্বদাই পৃথিবী-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষ অবস্থায় মিলিত হইলে জলে রূপান্তরিত হয়—সকল সময়েই ইহা ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির অন্তর্গত এই যুক্তিবাদের জন্যই প্রাকৃতিক সূত্র বা Law-এর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। মার্কস্‌ও তাঁহার দর্শন বিশ্লেষণে প্রকৃতির এই ধারা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমাজে পরিবর্তন আসে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক ধারায়। তাঁহার Surplus Value, Synthesis ও Antithesis প্রভৃতির বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান যেমন সূত্রের (Law) সাহায্যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে, মার্কস্‌ও সমাজ-বিবর্তনে কতকগুলি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে জার্মানী ও ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম কমিউনিজম-এর আবির্ভাব হইবে। তাঁহার বিশ্লেষণের ভিত্তি নিম্নরূপ : কোন দেশের বিবর্তনে প্রথমে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিবে, ফলে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হইবে, এবং ক্রমে তাহা প্রবলতর ও জঙ্গী মনোভাবাপন্ন (Militant) হইয়া বিপ্লব আনিবে। মার্কস্-এর সমসাময়িক কালে জার্মানী ও ইংলণ্ড যন্ত্রশিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও উভয় দেশে প্রবল হইয়াছিল। তাই তাঁহার সমাজ-বিবর্তনের সূত্রগত ধারা অনুসারে এই দুই দেশেই সকলের আগে বিপ্লব আসিবে এবং কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ছিল তাঁহার

ভবিষ্যদ্‌বাণী। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা অন্যরূপ ঘটিল। বিপ্লব প্রথমে আসিল রাশিয়ায়। রাশিয়া যন্ত্রশিল্পে য়ুরোপের সকল দেশ হইতেই পিছাইয়া ছিল। শ্রমিক আন্দোলন সে দেশে ছিল না বলিলেই চলে। তাহা সত্ত্বেও বিপ্লব আসিল রাশিয়ায়—ইংলণ্ড বা জার্মানীতে নহে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যখনই দেখেন যে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী বিফল হইয়াছে, তখনই তাঁহারা ধরিয়া লন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সূত্র বা Law-তে কোনরূপ ভ্রান্তি আছে। বৈজ্ঞানিকরা নূতন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং আবার নূতন সূত্র আবিষ্কার করেন। নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণের সূত্রগুলি খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সূক্ষ্মতর গবেষণার ফলে দেখা গেল যে এই মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছে না তখনই বিজ্ঞানী আবার নূতন সূত্র সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকবাদ (Relativty) আবিষ্কৃত হইল। এই নূতন সূত্র সেই সকল অব্যাখ্যাত ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইল এবং আপেক্ষিকবাদ গৃহীত হইল—নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিত্যক্ত হইল।

আমারা যখন দেখিতেছি যে মার্কস্‌-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয় নাই তখন আমাদের ধরিয়া লওয়া উচিত যে, তাঁহার বিশ্লেষণে ভুল আছে। প্রকৃতি কেবল যুক্তিবাদ (Rationalism) অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু মানুষ বা মানবসমাজ কেবল যুক্তিবাদ দ্বারা চালিত হয় না—যুক্তিবাদ এবং ভাবপ্রবণতা এই দুই-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। একই অবস্থার পরিবেশে একই ভাবে অনুপ্রেরণা পায় না বা ক্রিয়াশীল হয় না। তাহার ভাবাবেগও (Emotion) কার্যকরী হয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবাবেগ একই অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে কাজ করিতে পারে। সেই দিক হইতে দেখিতে গেলে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর সক্রিয় হইলেও সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনে একটা ধাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনের ধারার উপর সেখানকার শ্রমিকদের একটা ভাবগত আকর্ষণ (emotional attachment) গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং মার্ক্‌স্‌-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জানিবার পরেও তাঁহাদের এই ভাবগত আকর্ষণের জন্য তাঁহাদের নিজস্ব ধারা ত্যাগ করিয়া নূতন পথ অবলম্বনে আগ্রহী করিতে পারে নাই। কিন্তু রাশিয়ায় জারের আমলে প্রজা সাধারণের দুর্দশা ছিল প্রবল কিন্তু সেখানকার জনগণের মধ্যে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার সময় পায় নাই। কাজেই

কোন আন্দোলন ধারার উপর ভাবাবেগ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানকার লোকের দুর্দশা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই পরিবেশে লেনিন যখন দেশে আসিয়া এক পথের সন্ধান দিলেন, জনগণ সেই পথে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিপ্লব সেখানে সফল হইল।

আমাদের ভারতবর্ষেও এই ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলা হিংসক পন্থায় স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। এই চেষ্টায় তাঁহারা জনসাধারণের প্রভূত সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হন। অতি সাধারণ গ্রাম্য নারীও তাঁহাদের কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছেন। হিংসাত্মক আন্দোলনের সপক্ষে এই তিন প্রদেশের জনগণের একটা ভাবগত আকর্ষণ গড়িয়া উঠে। পরে যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস আন্দোলনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, তখন এই তিন প্রদেশের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই বলা চলে। কিন্তু যে সব প্রদেশের লোকের মধ্যে হিংসাত্মক আন্দোলনের কারণ সেই ভাবে কোন ভাবাবেগ গড়িয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, তাহারা সামগ্রিকভাবে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে-অধিকতর অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

সুতরাং বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে চিন্তা করিতে গেলে ধরিয়া লইতে হয় যে কার্ল মার্ক্‌স-এর বিশ্লেষণে ভুল আছে এবং আমাদের নূতন রাস্তার সন্ধান করিতে হইবে —যাহার সাহায্যে আমরা নূতনভাবে শোষণহীন সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিক আন্দোলন দুই খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। (১) ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের অবলম্বিত ধারা। (২) রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে পৃথিবীর অপরাপর দেশে তাহার অনুকরণে বিপ্লবের সাহায্যে অনুরূপ সরকার স্থাপনের চেষ্টায় শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাগান। ভারতবর্ষে ঠিক সেই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন এক সংগঠিত আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া উঠে। সুতরাং এদেশে এই দুই ধারার আন্দোলনই প্রচলিত হয়। কেবল মালিকদের সঙ্গে লড়াই করিয়া এবং দেশের আইনকে সংশোধিত করিয়া শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নততর করার জন্য ইংলণ্ডের পদ্ধতিতে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনকারীরা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর চেষ্টা হইল দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে বিপ্লব আনিয়া সমাজ-ব্যবস্থাতেই পরিবর্তন আনা এবং বিপ্লব সফল করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের মনোভাব বিপ্লবমুখী করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে

শ্রমিকদের উপস্থিত লাভের দিকে বিশেষ নজর না দিয়া মালিকদের এবং অন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা এই গোষ্ঠীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর আন্দোলন-ই ছিল দ্বন্দ্ব-আশ্রিত।

ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। আহমেদাবাদে ১৯১৮ সনের বস্ত্র কল ধর্মঘটের সময় পরামর্শ-দাতারূপে নেতৃত্ব কতকটা তাঁহার উপরই আসিয়া পড়িল। তিনি নূতন ধারায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। এই ধারার মূল ভিত্তি দ্বন্দ্ব নহে, পরস্পর সহযোগিতা। তিনি বলিলেন শিল্প সংস্থায় মালিক ও শ্রমিক দুই অঙ্গ। একে অন্যকে ভিন্ন চলিতে পারে না। পারস্পরিক এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে কেহই উচ্চ বা নীচ নহে। দুই-ই সমান অংশীদার এবং উভয়কেই অংশীদার হিসাবে পরস্পরের সহযোগিতায় শিল্পের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেই অনুসারে তিনি এক নূতন সূত্র মালিক ও শ্রমিকের সম্মুখে রাখিলেন। সূত্রটি এই যে মালিক মনে করিবে যে তাঁহারা শ্রমিকের অছি (Trustee)। শ্রমিকের ভাল মন্দের দায়িত্ব মালিকদেরই। অন্যদিকে শ্রমিকরা মনে করিবে যে, তাঁহারা মালিকদের অছি। মালিক শ্রমিকদের হাতে তাঁহার কারখানা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রমিক ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময়ে কারখানা ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। তাহা ছাড়া কারখানার উৎপাদনে অনর্থক ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। অছি যেমন তাঁহার মক্কেলের (Client) সম্পত্তি ভালভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নেন, শ্রমিকদেরও তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত। ইহাই সর্ব-শেষ কথা নহে। শ্রমিক ও মালিক ইচ্ছা করিলে একযোগে সমগ্র সমাজকে শোষণ করিতে পারেন। তাহা রোধের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, কেবল মালিক ও শ্রমিক যে নিজেদের পরস্পরের অছি হিসাবে কাজ করিবে তাহাই নহে, মালিক ও শ্রমিক উভয়ে মিলিয়া সমাজের অছি হিসাবে কাজ করিবেন। তাঁহারা এই কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, এখানে কাজ করিতেছেন তাহা কেবল নিজের স্বার্থেই নহে, সমাজের ব্যবহারোপোযোগী সামগ্রী উৎপাদনের দায়িত্বও তাঁহারা লইয়াছেন। সুতরাং সমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণের ভারও তাঁহাদের বলিয়া মনে করিতে হইবে। শিল্পকে সুসজ্জিত করিবার পক্ষে এই তৃতীয় পর্যায়ের অছিত্বের (Trusteeship) ভাবনা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না হইলে মালিক ও শ্রমিক নিজেদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব সমাধানের উদ্দেশ্যে মিলিত ভাবে সমগ্র

সমাজকে শোষণ করা আরম্ভ করিতে পারেন। বর্তমানে এই ধরনের শোষণ বৃত্তিকে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। বেতন বোর্ড ও কমিশনের কাছে মালিকরা প্রস্তাব আনিতেছেন যে, তাঁহাদের উৎপাদিত মালের মূল্য বৃদ্ধি করিলে শ্রমিকদের-উন্নতি প্রকল্পের দাবি বা সুপারিশ তাঁহারা মানিয়া লইতে রাজী আছেন। বোর্ড বা কমিশনের কাছে তাঁহারা দাবি করেন যে, মূল্য বৃদ্ধির সুপারিশ বোর্ডকে করিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থে সেই শর্ত মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহার ফলে সমাজকে শোষণ করা হয় কিনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দূরদর্শী মহাত্মা গান্ধী এইভাবে সমাজের শোষণ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পর্যায়ের অছিত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

কিন্তু মালিক যদি ন্যায় পথে চলিতে রাজী না হন? সেক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রস্তাব এই যে, উভয়পক্ষকে কোন সালিসীর উপর দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উভয়পক্ষই সেই সালিসীর রায় মানিয়া লইতে রাজী থাকিবেন। কিন্তু মালিক যদি তাহাতেও রাজী না হন, তাহা হইলে গান্ধীজী স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের শরণ লইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

কিন্তু গান্ধীজীর শ্রমিক আন্দোলনের বুনিয়াদ দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও প্রয়োজন বোধে দ্বন্দ্বকে পরিহার বা এড়াইয়া যাইবার প্রচেষ্টা তাঁহার নাই। বিপক্ষ যখন ন্যায়বিচার করিতে অথবা দাবির যৌক্তিকতা বিচারের ভার কোন তৃতীয় পক্ষের উপর ছাড়িয়া দিতে এবং সেই সালিসীর রায়কে স্বীকার করিয়া লইতে অস্বীকৃত হয় তখন তাঁহাকে ন্যায়ের পথে আনিবার জন্য গান্ধীজী দৃঢ়ভাবেই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং সংগ্রামের পন্থা গ্রহণের পক্ষে উপদেশ দিয়াছেন। ১৯১৮ সনে আহমেদাবাদের ধর্মঘটের সময়, মালিকপক্ষ যখন বিবাদ সালিসীর নিকট পাঠাইতে রাজী হইলেন না তখন তিনি সেখানে ধর্মঘট পরিচালনার ভার লইলেন। কিছুদিন ধর্মঘট চলিবার পরে শ্রমিকদের মধ্য হইতে পূর্ব-সংকল্প ছাড়িয়া কাজে যোগ দিবার ইচ্ছা দেখা দিলে গান্ধীজী স্বয়ং উপবাস করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। পরে মালিকপক্ষ সালিসী মানিয়া লইলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় এগার মাস ধর্মঘট চলিবার পরে, ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় টিনপ্লেট কোম্পানী যখন সুভাষবাবু, জওহরলালজী, রাজেন্দ্রবাবু এবং অন্যান্য নেতাদের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া কোন প্রকার মীমাংসা বা সালিসীর

প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, তখন শ্রমিকদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর কাছে পরামর্শের জন্য লোক পাঠান হইল। শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এই অবস্থায় ইউনিয়ন হইতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত হইবে কিনা তাহার পরামর্শ চাওয়া হইল। গান্ধীজী বলিলেন যে, কোম্পানী যখন ন্যায়বিচার করিতে অনিচ্ছুক এবং এমন কি সালিসীর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিতেছে তখন ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। এমন কি মাত্র একজন শ্রমিকও যদি কর্মবিরতি পালন করেন তবে শ্রমিকরা মনে করিবে যে ধর্মঘট চলিতেছে এবং যখনই পুনরায় সুযোগ আসিবে কর্তৃপক্ষকে ন্যায়ের রাস্তায় আনিবার চেষ্টা করিবে।

ধর্মঘটের অধিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী এতই দৃঢ় ছিলেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে করিতেন যে, ধর্মঘট যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। কোন প্রকার দ্বেষ বা অন্যায়ের উপর যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত না হয়। ধর্মঘট চলা কালীন শ্রমিকগণ কোন প্রকারে আত্মসম্মান বিসর্জন দিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি যেমন সত্য অহিংসা ও সামাজিক ন্যায়-ভিত্তিক এবং বিদ্বেষ-রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই সব মূলনীতি পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রমিকদের মধ্যে এই নৈতিক বলের অভাব ঘটিলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ন্যায়ের পথে আনা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

এই অছিবাদের উদ্ভাবন করিয়া মহাত্মা গান্ধী মানুষের ভাবাবেগ (Emotional Factor) জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি সর্বদাই 'হৃদয় পরিবর্তন' (Change of heart)-এর কথা বলিয়া আসিয়াছেন। এই মনোবৃত্তি জাগ্রত হইলে অনেক সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও 'মুক্তধারা', 'রক্ত করবী' ইত্যাদি নাটকের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিরুদ্ধপক্ষের ভাবাবেগ জাগ্রত করিয়া কত সহজে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ভাবাবেগ মানব-সমাজের এক প্রধান কর্মপ্রেরণা। মার্ক্‌স্ ইহা উপেক্ষা করিলেও মহাত্মা গান্ধী তাঁহার মতবাদে সেই ভুল সংশোধন করিয়াছেন।

তবে কি তিনি প্রকারান্তরে সমাজের যুক্তিবাদ প্রবণতাকে (Rational Factor) উপেক্ষা করিয়াছেন? না, তাহা করেন নাই। সমাজে যাহাতে শোষণ সম্ভবপর না হয় এমন সামাজিক ব্যবস্থার কথাও তিনি আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমানের উৎপাদন-ব্যবস্থায় সমাজ তিনটি স্বার্থ সংবলিত তিন

ভাগে বিভক্ত। মালিক শ্রমশিল্পে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করেন ও তাহার পরিচালনা করেন। তাঁহার স্বার্থ হইল যথাসম্ভব অধিক লাভ করা। শ্রমিক শরীর শ্রম দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করেন। তাঁহার স্বার্থ তাঁহার শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করা। তৃতীয় গোষ্ঠী হইল তাঁহাদের এই ভাবে উৎপাদিত পণ্য যাঁহারা ব্যবহার করেন। যথাসম্ভব কম মূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য ক্রয় করাই হইল তাঁহাদের স্বার্থ। এই তিন গোষ্ঠীর স্বার্থ পৃথক পৃথক এবং পরস্পরবিরোধী। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সকল দ্বন্দ্ব তাহার মূল কারণ ইহাই। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করার ফলেই এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব। মহাত্মা গান্ধীর নীতি অনুসারে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীত করিয়া লইলে দ্বন্দ্বের এই মূল কারণগুলি অপসারিত হইয়া যাইবে। তাঁহার চরকাকেন্দ্রীক শিল্প ব্যবস্থায় বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী তিন গোষ্ঠীই একে সমাবিষ্ট হইবে। দ্বন্দ্বের মূল কারণও অপসারিত হইবে। এই জন্যই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ একম্-এর কল্পনা করিয়াছিলেন।

তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় সমাজ দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার একটি হইল যাঁহারা কায়িক শ্রমের সাহায্যে উৎপাদন করেন এবং দ্বিতীয় দল হইল উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ ও ব্যবস্থাকারী ব্যবস্থাপক শ্রেণী। দ্বিতীয়োক্তরা কোন রকম কায়িক শ্রম করেন না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অংশ না নিলেও সমাজে তাঁহাদের অধিকতর প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা। সুতরাং উৎপাদক শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যবস্থাপক শ্রেণীতে যাইবার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রয়োজনের অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রের উৎকর্ষতা এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ক্রমোন্নতির ফলে উৎপাদক শ্রেণীতেই কর্মীর সংখ্যা প্রবল ভাবে উদ্বৃত্ত হইতেছে। আমেরিকায় উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের বাজার আজ পৃথিবীব্যাপী। তাহা সত্ত্বেও আজ সেখানে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িতেছে। অন্যসব জনসংখ্যাবহুল দেশের তো কথাই নাই। ফলে উভয় শ্রেণীর ভিতরই সমস্যার উদ্ভব হইতেছে এবং তাহার সমাধান ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে বলিয়া সকল শ্রেণীর মধ্যেই অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই দিক হইতেও মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে গান্ধীজীর প্রস্তাবে সমাজের ভাবাবেগ ও যুক্তিবাদ কোনটাকেই বাদ দেওয়া হয় নাই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছিলেন যে, সংঘর্ষ ভিন্ন সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব নহে। তাঁহার সময়ে সেই সংঘর্ষ যে এখনকার মত এমন সর্বাত্মক ধ্বংসকারী রূপ লইতে পারে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। বিজ্ঞান এই এক শত, সোয়া শত বৎসরে এতটা অগ্রসর হইতে পারে তাহা মার্কসের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের সর্বাত্মক বিধ্বংসকারী শক্তির যুগে আমাদের পুনরায় ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা কি একশত সোয়া শত বৎসর পূর্বেকার সংঘর্ষের পথই আঁকড়াইয়া থাকিব? বর্তমান যুগে সংঘর্ষ তো কাহাকেও রেহাই দিবে না—বিজ্ঞানাশ্রিত শ্রেণীসংগ্রাম শোষক শোষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীকেই ধ্বংস করিবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনেও সংঘর্ষমূলক পথ পরিবর্তনের দিন আসিয়াছে। শ্রেণী-বৈষম্য নিরাকরণে ও সামাজিক শোষণরহিত সমাজ গঠনে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ বলিয়া মনে হয়। উপভোক্তা গ্রাহকের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনকে কেবল মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পর্যবসিত রাখিলে শ্রমিক আন্দোলনেরই সমূহ বিপদের আশঙ্কা—এ কথা ভুলিলে চলিবে না। শিল্প-শ্রমিকের বহুবিধ সুযোগ থাকার দরুন মালিক ও সরকারের উপর চাপ দিবার সুযোগ আছে এবং শ্রমিক নেতারা তাহা দিয়াও আসিয়াছেন। ফলে শিল্প শ্রমিক আর্থিক উন্নতি করিবেন, এবং তাহার খরচ যোগাইতে ক্রেতাদের আর্থিক দুর্গতি ঘটিবে। কর ও খাজনা বৃদ্ধি এবং ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে শ্রম শিল্প ও তথায় কর্মরত শ্রমিকদের সাহায্য অনুদান অথবা ভর্তুকি হিসাবে যাহা দিবেন সে সবই আসিবে জনসাধারণের তহবিল হইতে। সুতরাং উপভোক্তা ও ক্রেতাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শিল্প শ্রমিকদের বর্ধিত দাবি পূরণ করিতে থাকিলে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। তখন তাহার প্রভাব হইতে শিল্প ও সমগ্র অর্থব্যবস্থা পরিত্রাণ পাইবে না। ক্রমে শিল্পে উৎপন্ন জিনিস জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার অভাবে দৃশ্যতঃ উদ্বৃত্ত হইবে। ১৯৫৪ সনে বস্ত্রশিল্পে এই অবস্থা আসিয়াছিল। কাপড়ের কলসমূহে বাহ্যতঃ সুতিবস্ত্র অত্যধিক জমা হইবার ফলে কারখানার কর্মবন্ধ, কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই ইত্যাদি ঘটিতে লাগিল। শ্রমিকরা সরকারের কাছে আবেদন করিলেন যেন এই সব বন্ধ কারখানার পরিচালন-ভার সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে শ্রমিকেরা এই আশ্বাস দিলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাঁহারা কম বেতনে কাজ করিবেন এবং তাহাই

করিয়াছিলেন। বর্তমানে সারা দেশের শিল্পে যে মন্দা আসিয়াছে তাহার প্রধান কারণও ইহাই যে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত হইয়া গিয়াছে। খাদ্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ক্রেতার অধিকাংশ অর্থ-ই তাহাতে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ক্রেতাদের অন্য শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছে।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের মোড় ফিরাইবার সময় আসিয়াছে। শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়াও ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা না হইলে শ্রমিক আন্দোলনের সমূহ বিপদ। এবং এই বিপদ সম্ভবতঃ আসিয়াই পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে বিদেশের শ্রমিক নেতারাও সজাগ হইয়াছেন। যাঁহারা বর্তমানের শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, য়ুরোপ আমেরিকার মত অগ্রণী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমানে সমাজের সকল স্তরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। তাঁহারাও বুঝিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া পথ নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের শক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত যন্ত্রের উত্তরোত্তর কর্মকুশলতা বৃদ্ধি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবির্ভাব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করিলে ভবিষ্যৎ সমাজকে গান্ধীজীর দর্শন ও কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। শ্রমিক আন্দোলনও বাদ যাইবে না।

সবদিক হইতে বিবেচনা করিলে একথা স্পষ্ট যে, শ্রমিক আন্দোলন ও উৎপাদন ব্যবস্থায় সংঘর্ষের পন্থা পরিহার করিয়া সহযোগ বা অছিবাদের প্রবর্তন করিতে পারিলে শ্রমিক লাভবান হইবেন। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থায় সমাজের সকল অঙ্গই লাভবান হইবে।

অনেকের মতে দেশের সকল শিল্পের জাতীয়করণ করিলে এই সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও আমলাতন্ত্র ও শ্রমিকের বিরোধ থাকিয়াই যায়। তাহা ভিন্ন মূলধন বিনিয়োগকারী শিল্পের মালিক অপসারিত হইলেও বর্তমানের অন্যান্য সমস্যা থাকিয়াই যায়। তাহা ছাড়া দেখা যাইতেছে, যে সব শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছে সেখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ কোনক্রমেই কম নহে। শুধু যে আমাদের দেশেই এরূপ ঘটে তাহা নহে। কমিউনিস্ট এক-নায়কত্বের ফলে যে সকল দেশে স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও কার্য করিবার স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ হয় নাই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দেশে এ সমস্যা থাকিয়াই যায়। অতএব সবদিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর প্রবর্তিত পথই একমাত্র পথ।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত শ্রমিক আন্দোলনের মূল কথাগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করা চলে—

(১) শ্রমিক আন্দোলন সত্য অহিংসা ও সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রমিকের পক্ষ হইতে কোন মিথ্যা কেস অথবা অন্যায় ও অতিরঞ্জিত দাবি পেশ করা উচিত নহে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময়েও ব্যক্তি বা সমষ্টির উপর বিদ্বেষ পোষণ না করার উপদেশ গান্ধীজী দিয়াছেন। শ্রমিকের কলহ ব্যক্তিগত ভাবে মালিকের সঙ্গে নহে, তাহাদের কৃত অবিচারের বিরুদ্ধে।

(২) মালিক ও শ্রমিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমান অংশীদার হইবেন এবং একে অন্যের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজেকে অন্যের অছিরূপে ভাবিবেন। এই ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলে একের অন্যের উপর বিশ্বাসের ভাব জন্মিবে। এই বিশ্বাস পরস্পরের অছিরূপে কাজ করিবার সহায়ক হইবে।

শ্রমিক এই ভাবে চলিতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও মালিক যদি প্রস্তুত না হন সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে ন্যায়ের রাস্তায় আনিতে বাধ্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম এড়াইয়া যাওয়া হইবে না। অবশ্য সর্ব অবস্থায় ও সর্ব পর্যায়ে সে সংগ্রাম হইবে অহিংস।

(৩) উভয়ের মধ্যে অছি ভাবনা প্রবর্তিত হইলে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিক-মালিক যুগ্মভাবে সমাজের অছিরূপে কাজ করিতে পারেন। যুগ্মভাবে তাঁহাদের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আর্থিক দিক হইতে যাঁহারা নিম্নস্তরে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

শ্রমিক যদি কুটীর-শিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এই কাজে অনেক সহায়তা মিলিবে।

শ্রমিক মালিক এই মূল কথাগুলি মানিয়া লইলে পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি যেমন শ্রমিকের দাবির মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েতের রায়ের উপর নির্ভর করা, কারখানা পরিচালনে পরস্পর সহযোগিতা করা, লভ্যাংশের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা আর সর্বোপরি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে আপনিই আসিয়া যাইবে।

বাস্তববাদী গান্ধী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে গান্ধীজীকে আমরা যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি। 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়েছি, আপিসে-আদালতে তাঁর ছবি টাঙিয়ে রাখার সুপারিশ করেছি, প্রায় প্রতি শহরেই তাঁর নামে বড় বড় রাস্তা বানিয়েছি, ব্রোঞ্জ কংক্রীট-পাথরের মূর্তি স্থাপন করেছি—এবং ডাকটিকিট ছাপিয়েছি। তাতেই আমাদের কর্তব্য মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। এতদিনের সৈনাপত্যের ঋণ, জনকত্বের ঋণ এইটুকুই। শোধ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আরও একটু করেছি অবশ্য, যখনই দেখেছি বেগতিক, হালে পানি পাওয়া কঠিন—তখনই একবার করে তাঁর দোহাই পেড়েছি—লোকসভায় ময়দানে সর্বত্র, প্রয়োজন পড়লেই। হয়ত তেমনি এক হতাশার সামনে দাঁড়িয়েই আজ তাঁর শতবার্ষিকী পালন করছি। যদি কিছু সুরাহা হয়।

কথিত আছে, যক্ষরূপী ধর্ম নাকি যুধিষ্ঠিরকে একটা হেঁয়ালি প্রশ্ন করেছিলেন যে, কলিতে একটা পুষ্করিণী থেকে চারটে পুষ্করিণী ভরবে কিন্তু পরে সেই চারটে ভরা পুকুরের জলেও আগের পুষ্করিণী ভরানো যাবে না। এর অর্থ কি? যুধিষ্ঠির নাকি উত্তর দিয়েছিলেন যে, কলিতে বাবা চারটে ছেলেকে মানুষ করবেন কিন্তু সেই চারটে ছেলের একজনও বুড়ো বাপকে খেতে দেবে না। কথাটা হয়ত গল্প-কথাই—কিন্তু মূলে একটা সত্য আছে বৈকি। সে সত্য আত্মজ সম্বন্ধেও যেমন—পালিত এমন কি মানসপুত্র সম্বন্ধেও তেমনি। নেহেরুজী নাকি গান্ধীজীর মানসপুত্র, রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী,—হয়ত সেই জন্যেই, নেহেরুজী যখন ভারতরাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরলেন, তখন প্রথমেই তিনি গান্ধীজীর চিন্তা ও আদর্শকে নবরাষ্ট্র-গঠন-ভাবনা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন—অবাস্তব বলে, সময়োপযোগী নয় বলে। হ্যাঁ, কুটির-শিল্প গ্রামোদ্যোগ এসব রইল বৈকি, তাদের কিছু কিছু দয়ার দান মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাও হল—কিন্তু তার পায়ের তলার মাটিটা গেল সরে, তাকে যন্ত্র-দানবের অসম প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা রইল না, আমরা প্রাণপণে সর্বপ্রচেষ্টা-প্রয়োগে সেই যন্ত্র-দানবেরই উপাসনায় মেতে উঠলুম।

নেহেরুজীর এই অত্যধিক পাশ্চাত্যচিন্তা-প্রীতি ও অনুসরণ দেখে—গান্ধী-

আদর্শকে সযত্নে পিছনের তাকে shelving করা দেখে, আমাদের বহুদিন আগেকার একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র মনে পড়েছিল। তখনকার দিনের পাঞ্চ্-এর ছবি, এখনও কারও-কারও মনে আছে নিশ্চয়। বৃদ্ধদের মনে থাকবার কথা—এখন যারা তরুণ তারা রাজনীতি করে কিন্তু ইতিহাসের খবর রাখে না, তাদের বললেও ছবিটার মর্মার্থ বুঝবে কিনা সন্দেহ—কাইজার উইলহেল্ম্ যখন জার্মান সাম্রাজ্যের স্রষ্টা বিসমার্কের হাত থেকে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরলেন, তখন পাঞ্চ-এ ঐ ব্যঙ্গচিত্রটি বেরিয়েছিল—বিসমার্ক জার্মানীরূপ জাহাজ থেকে ধীরে ধীরে পাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন, ওপরে দাঁড়িয়ে উইলহেল্ম্ বিজয়গর্বমিশ্রিত কৌতুকের দৃষ্টিতে তাই লক্ষ্য করছেন। ছবিটার নিচে ক্যাপশ্যান ছিল—"জার্মানী ড্রপ্স্ হার পাইলট"—জার্মানী তার কর্ণধারকে বিদায় দিচ্ছে। অথও জার্মানী, শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বিসমার্কেরই সৃষ্টি, এবং হয়ত আরও কিছুকাল তাঁর শক্ত হাতে থাকলে ক্ষমতামদ-গর্বিত কাইজার এত শীঘ্র বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে জার্মানীর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারতেন না।

আসলে নেহেরুজী—গান্ধীকে জাতির জনক হিসেবে মানলেও—নিজেকে 'নবভারতের স্রষ্টা' বলে ভাবীকালে চিহ্নিত ও স্বীকৃত দেখতে চেয়েছিলেন। এই লোভটুকু জয় করার মতো মনের জোর তাঁর ছিল না। আরও একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর—কাছের মানুষ বলেই বোধ হয়—গান্ধীজীকে তিনি পুরোটা চিনতে পারেন নি, তাঁর মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন নি। গান্ধীজীকে অবাস্তব-স্বপ্নদ্রষ্টা ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন তিনি যে রামরাজ্য তথা এক কল্পিত ইউ-টোপিয়ার স্বপ্ন দেখছেন—তা কল্পনাতেই ভাল; বাস্তব পৃথিবীতে তার কোন স্থান নেই। তাঁর জীবদ্দশায় সে কথা স্পষ্ট বলবার সাহস হয় নি—মরার পরও মুখে বলেন নি; বুড়ো বাপের ভীমরতি দেখলে—ভদ্র ও শিক্ষিত সন্তানরা কেউ সে কথাটা তাঁর মুখের সামনে বলে না। জেদ বা খেয়াল প্রকাশ করলে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দেয়। আমরাও তাই দিয়েছি। আমরা—মানে আমরা সকলেই। কারণ আজ যদি শুধুই নেহেরুজীকে দোষ দিই—তা হলে একটু হয়ত অবিচারই করা হবে। সেদিন যাঁরা ভারত-রাষ্ট্রতরণী নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছিলেন—তাঁরা কি কেউই গান্ধীজীকে খুব বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন মনে করতেন? তাহলে তো তাঁরা নেহেরুজীকে সে কথা মনে করিয়ে দিতেন—তাঁর মত ও পথের কথা; নেহেরুজীর

পরিকল্পনা সংশোধনের কি পরিবর্তনের চেষ্টা করতেন।...তবে নেহেরুজীর দায়িত্বই সমধিক—তার কারণ তিনি নিজের হাতেই সব ব্যবস্থাটা তুলে নিয়েছিলেন, একক নবভারতের স্রষ্টা হবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর গান্ধীজী প্রস্তাব করেছিলেন, 'কংগ্রেস দল ভেঙ্গে দাও, এর কাজ ফুরিয়ে গেছে।' কথাটাতে কেউই কর্ণপাত করেন নি। বুড়োর উদ্ভট খেয়াল ভেবেছিলেন। কিন্তু করলে কি ভাল করতেন না? তখনকার ঐ 'স্টলওয়ার্টরা' যদি কর্মক্ষম ও সুস্থ থাকতে থাকতে এক বা একাধিক যথার্থ গণতান্ত্রিক-নীতি-সম্পন্ন রাজনীতিকদল গড়ে যেতে পারতেন তো কংগ্রেসের নামের জাদুটা আজও থেকে যেত, এমন ভাবে তার মহিমা পাঁকে নেমে আসত না।

তবু, এ অতি তুচ্ছ কথা। জাতি গঠন ও দেশশাসন সম্বন্ধে গান্ধীজীর যে চিন্তা ছিল—তা তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফসল। এদেশকে তাঁর মতো কেউ চিনত না। এদেশের লোকের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ ছিল। তাদের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার পরিমাণও যেমন তাঁর থেকে কারও বেশী জানা ছিল না—তেমনি তাদের ঔদার্য ও মহত্ত্বেরও না। তাই এদেশ সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাই অধিকতর বাস্তববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সেটা জওয়াহরলাল নেহেরু বুঝতে পারেন নি। নেহেরুজী পাশ্চাত্যের হাতে গড়া মানুষ—তাঁর দৃষ্টি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে এদেশকে দেখেছিল। তাছাড়া তাঁর একটা হীনমন্যতাও ছিল। কেবলই ভয় হত—পাছে পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশ—বিশেষ ইয়োরোপ ও আমেরিকার কাছে আমরা হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ি, যথেষ্ট বাহবা আমরা তথা তিনি না পাই। তাই তিনি দেশ-গঠন বলতে বেশির ভাগ সমস্ত শিল্পের যন্ত্রীকরণ বা ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজেশ্যান্‌ই বুঝলেন। বাইরে থেকে বিপুল ঋণ নিয়ে ভিক্ষা করে সর্বপ্রকল্পে সেই কাজেই সমস্ত শক্তি ও উদ্যম প্রয়োগ করলেন। দেশগঠনের আগে যে জাতিগঠন দরকার, আর দেশগঠন মানেই যে শুধু খাওয়া-পরার সংস্থান নয়—একথাও তাঁর মনে রইল না। এই প্রাথমিক শর্তটাই তাঁর অতিরিক্ত পাশ্চাত্য-ঘেঁষা উৎসাহের বন্যায় ভেসে তলিয়ে গেল।

নেহেরুজী কথায় কথায় ইতিহাসের নজীর তুলতেন। তিনি বলতেন খুব ভাল—শুনতে শুনতে মনে হত সত্যিই সমস্ত পৃথিবীটা 'করতলামলকবৎ' তাঁর হাতের তেলোয় রয়েছে, একসঙ্গে সমস্ত ইতিহাসটাকে ইতিহাসে পরিণত হতে

দেখছেন তিনি। কিন্তু সত্যিই কি তিনি ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে পেরেছিলেন? তাহলে দেখতেন যে, শিল্পোদ্যোগ-প্রসারে পৃথিবীতে সাময়িক ভাবে যদি বা কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে—কিছুদিন পরেই অধিকতর ও বিপুলতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্যার ফলেই দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে এবং তার পরেও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আব্‌হাওয়া টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণই হল ইংরেজ ও ফরাসীর বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধাভোগ। 'ইংরেজ ও ফরাসীরা পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে রেখেছে, সেখানে নিজেদের মাল কিনতে বাধ্য করছে, আমাদের মাল বেচতে দিচ্ছে না' এই গাত্রদাহ থেকেই মূলত ঐ রক্তক্ষয়ী প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের উৎপত্তি নয় কি? শিল্প যতক্ষণ মানুষের হাতের জোর ও কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততক্ষণ প্রতিযোগিতার এ বীভৎসরূপ প্রকাশ পায় নি, ভারতের মাল সুদূর রোমে এবং চীনের মাল মিশরে গিয়ে বিক্রী হতে কোন বাধা ছিল না, তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। উৎপাদন যন্ত্রগত হলেই তা একটা বিপুল রূপ নিতে বাধ্য, আর তাহলেই নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর উদ্‌বৃত্ত হবে এবং তখনই সে উদ্‌বৃত্ত পণ্য বিক্রীর জন্য পাগল হয়ে উঠতে হবে। কারণ বিক্রী না হলে এই সব বিরাট বিরাট কারখানা অচল হয়ে উঠবে, শ্রমিকরা হবে বেকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রয়োজনের জন্যে উৎপাদন বা উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমেরিকার কি অবস্থা হয়েছিল, ইতিহাসের ছাত্ররা তা জানেন। সেই ভয়াবহ 'ডিপ্রেশন' ও বেকারত্বের প্যাঁচে আর না পড়তে হয়—কতকটা সেই কারণেই এবার তাঁরা হঠাৎ উৎপাদন কমাতে যান নি, বরং পৃথিবীর অন্যত্র তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।

গান্ধীজী তাঁর দেশগঠনের চিন্তায় প্রথমে নাগরিক গঠনের কথাই ভেবেছিলেন। তাঁর যে প্রাথমিক শিক্ষার কল্পনা তাতে তথাকথিত লেখাপড়ার থেকে সদভ্যাস শেখানোর দিকেই ঝোঁক বেশি ছিল। শিক্ষার বড় লক্ষ্য হল সুনাগরিক তৈরী করা। কারণ আজ যারা ছাত্র তারাই বড় হয়ে এদেশের চালক হবে, শাসনভার হাতে নেবে—দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বাধীন ভারত সরকার তাঁর সে শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল মর্মটাই উপলব্ধি করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়—শিক্ষা-ব্যবস্থাটার দিকটাতেই যে আগে নজর দেওয়া দরকার, সে কথাটাও তাঁদের বাক্যে বা কাজেকর্মে কোথাও প্রকাশ পেল না। বস্তুত নেহেরু সরকার এটাকেই সব চেয়ে অবহেলা করেছেন—দুয়ো রাণীর সন্তানের মতো, আশ্রিত

কুটুম্বের মতো। এই দিকেই যে যোগ্যতম ব্যক্তি দেবার কথা—দপ্তর বাঁটবার সময় প্রধান মন্ত্রীর বোধ করি কখনও সে কথা মনে পড়ে নি। ফলে, সেই দুর্বলতার সুযোগেই—অনাচারের রন্ধ্রপথে যেমন শ্রীবৎস রাজার দেহে কলি প্রবেশ করেছিলেন—কংগ্রেস-রাজের দেহে তার সর্বনাশ প্রবেশ করেছে। শিক্ষা বিভাগে অসন্তোষ, তা থেকে অযোগ্যতা ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। মতলববাজরা এটাকে তাদের Breeding ground হিসেবে ব্যবহার করেছেন—ছাত্ররাও আর যাই হোক আদর্শ নাগরিকে পরিণত হতে পারেন নি।

অর্থাৎ—দিকে দিকে যখন যন্ত্রীকরণের জয়যাত্রা চলেছে তখন মানুষ গড়ার যন্ত্রটার কথা কেউ ভাবল না, সেটা অবহেলায় অনাদরে অসংস্কারে আরও বিগড়ে বসে রইল। এদেশের শিক্ষাশালায় কী নাগরিক তৈরী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তা তো সুপ্রত্যক্ষ। অধিক আলোচনার প্রয়োজন কি? শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসভ্যতার কথাই বলছি না, আজ যারা তরুণ কর্মী, যারা সবে জীবনে প্রবেশ করছে—তাদের সততা বা আদর্শানুরাগের অভাব, তাদের জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্কীর্ণতা, তাদের দৃষ্টির আবিলতা, বুদ্ধির জড়তা—এবং সর্বোপরি তাদের আরামপ্রিয়তা, কর্মবিমুখতা ও অর্থলোভ নিয়ে তো দেখি আজ বিলাপের অন্ত নেই—কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? যাঁদের মানুষ করার কথা ছিল এই ছেলেমেয়েদের—তাঁরা যদি সে দায়িত্ব পালন না করে থাকেন তো সে অপরাধ কার? তাঁদেরই আগে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।···

যারা কাজ করবে তারা ঠিকমতো না করলে কাজ পণ্ড হবে—এইটেই স্বাভাবিক। সুবৃহৎ যন্ত্রও সামান্য একটি যন্ত্রাংশ—একটি স্ক্রু কি একটি নাট্‌এর ত্রুটিতে অচল হয়ে ভেঙে পড়ে। নবভারত-গঠন-প্রচেষ্টারূপ যন্ত্রও আজ যদি অসংখ্য বৈকল্যে অচল হয়ে উঠে থাকে তো সে দোষ দেব কাকে?

গান্ধীজীর কল্পনা ছিল শাসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন। গ্রামগুলিকে স্বয়ম্ভর ও স্বয়ং-শাসিত এক একটি ইউনিটে পরিণত করা। উন্নত কৃষিব্যবস্থায় ও কুটির-শিল্পের মাধ্যমেই তা হওয়া সম্ভব। কিন্তু—আমরা বললুম, 'সর্বনাশ, এসব আড়াই হাজার বছর আগে চলত, চাষী ধান দেবে তার বদলে জোলা তাঁতী কাপড় দেবে, কলু তেল দেবে, মুচি জুতো দেবে—এসব এই বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব নয়। এরোপ্লেনের যুগে পাগল ছাড়া কেউ বলদে টানা ঘানি-গাছের কথা ভাবে না।' যা সম্ভব যা যুগোপযোগী আমরা তাই করতে গেছি, তাতে কতটা কি হয়েছে, কোন্ কোন্ সমস্যার কতটা সমাধান হয়েছে, তা

আপনারা সবাই জানেন। সরকারী উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিল্পোদ্যোগ-গুলির শোচনীয় পরিণতিও সর্বজনবিদিত। তবু সেটাও বড় কথা নয়। ধার করে ভিক্ষা করে টাকা এনেছি প্রচুর—সে অঙ্ক ভয়াবহ রকমের বিপুল—তাতেও এমন ভাবে কাজ গড়ে তোলা যায় নি, যাতে দেশের অধিকাংশ বেকারের কর্মসংস্থান হয় কিংবা প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এতদূর দেউলিয়া হয়েছে যে শিল্পায়নের এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়া সত্ত্বেও আমরা অন্ধের মত গতানুগতিক পথেই চলেছি।

কিন্তু যদি এ উদ্যম সার্থকও হত—কতখানি সমস্যা মেটাতে পারা যেত তাতে? বরং আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হত। বড় বড় কারখানায় অনেক অনেক মাল উৎপন্ন হলে একদিন সে উৎপাদন আমাদের প্রয়োজন ও ভোগ-ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই, এদেশের এই সামান্য প্রচেষ্টার মধ্যেও দু'একটি এমন অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে গেছে, সংবাদপত্রের পাঠকরা তা নিশ্চয় জানেন। উৎপাদন আমাদের ভোগক্ষমতা অতিক্রম করলে তা অপরদেশে বিক্রী করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আর তখনই দেখা দেবে সেই সর্বকালীন প্রশ্ন, কোথায় বেচব, কিনবে কে? বাইরে বেচতে গেলেই কম্পিটিশান বা প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়াতে হবে, মূল্য ও মানের কথা উঠবে। পণ্যের মূল্য ও মূল্যমান ঠিক থাকলেও সব সময়ে সোজা পথে কারবার করা যায় না, অন্য অনেক বাধা এসে দাঁড়ায়। প্রভাব প্রতিপত্তি ও স্বার্থ-সংঘাত দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে। তখনই সাম্রাজ্যের প্রশ্ন ওঠে, যেখানে এসব কোন অসুবিধাই নেই, যেখানকার মানুষ আমার মাল কিনতে বাধ্য। সাম্রাজ্যের প্রশ্ন এর আগেও উঠেছে, উঠতে বাধ্য। হয়ত তার বাহ্যিক চেহারায় কিছু বর্ণান্তর ঘটেছে কিন্তু কাঠামোর বদল হয় নি। ইংরেজ ওলন্দাজ বা ফরাসীদের সাম্রাজ্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের' দিন শেষ হয়ে যায় নি। আজ যে সোভিয়েৎ রাশ্যাকে চক্ষুলজ্জা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে নির্মমভাবে রূঢ় হস্তে হাঙ্গারী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছাকে দমন করে, আশ্রিত করদরাজ্য হিসাবে রেখে দিতে হয়েছে—তার মূলেও এই কথাই। অন্যথায় তাদের কাঁচামাল নিয়ে ফিনিশ্‌ড্‌ গুডস্‌ কিনতে বাধ্য করার এতটা সুযোগ মিলবে না। এ পথের এই দস্তুর, এই পরিণতি।

সারা পৃথিবীতে আজ এটা উপলব্ধি করার দিন এসেছে, আজ না হোক একদিন কঠিন আঘাতে উপলব্ধি করতে হবে—বস্তু-তান্ত্রিকতার দেবতা হলেন সেই

প্রাচীনকালের ইহুদীদের সম্ভোগদেবতার মতো—তার সেবকদের পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য। মহাভারতের মুষল পর্বও ব্যাসদেব অনর্থক রচনা করেন নি। যারা এই আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের দ্বারা ধনী হয়ে উঠেছে—যাদের অন্তত কোন ঐহিক অভাব নেই, মানে সম্ভোগবস্তু যাদের ইচ্ছামাত্র করায়ত্ত হয়ে থাকে—তাদেরই কি শান্তি আছে? আমেরিকা, সুইডেন, ডেনমার্ক—এদের তরুণ-তরুণীরা জীবন নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে, এক রকম সর্বনাশের নেশাতেই মেতে উঠেছে।

ভারত সরকার অবশ্য গান্ধীজী বা কংগ্রেসের প্রাচীন আদর্শকে একেবারে উড়িয়ে দিতে সাহস করেন নি। আগেই বলেছি—কুটির-শিল্প হস্তচালিত শিল্পকে তাঁরা রিবেট ও অপরাপর আনুকূল্যের মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল যেটা দরকার—যান্ত্রিক উৎপাদনের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা করা—সে চেষ্টাই কেউ করেন নি। তাঁরা বহু টাকা ব্যয় করে, বহু চেষ্টাচরিত্র করে একটি গঞ্জ বা শহরের কাছাকাছি হয়তো চৌদ্দ পনেরটি কলু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন; ঘানিগাছ বলদ প্রভৃতি কিনে দিয়ে তাদের বাসের ঘর, ঘানি বসাবার চালা তুলে দিয়ে তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়ে হিসেব করেছেন যে, স্থানীয় বাজারে এদের সকলেরই তেল বিক্রী হতে পারবে। আবার সেই গঞ্জ বা শহরেই কেউ যখন এসে বিরাট তেলের কল বসিয়েছে তখনও তাকে বাণিজ্যিক ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। এই নীতিতে না হয়েছে কুটির-শিল্পের যথার্থ কোন উন্নতি, না হয়েছে গ্রামগুলির স্বয়ম্ভরতা। গান্ধীজী যা করতে চেয়েছিলেন তার কিছুই হয় নি—কুটির-শিল্প ও খাদি-চর্চাকে যেটুকু অনুগ্রহ করেছেন ভারতসরকার—তাতে করে বরং তাঁকে ব্যঙ্গই করা হয়েছে। আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ হয়েছে।

আজ অশান্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে—আজকের কালের এই দংষ্ট্রা-করাল স্বার্থসংঘাত, বস্তুতান্ত্রিকতা ভোগসর্বস্বতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—অভাব ও প্রাচুর্য দুইয়েরই পরিণাম প্রত্যক্ষ করে যদি কোন unbiassed লোক ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখেন তো বুঝবেন যে গান্ধীজীর পথই আজকের এই সমস্যা জর্জর মানুষের একমাত্র পথ; এবং আজ সেটা না বুঝলেও একদিন সারা পৃথিবীর লোকই বহু দুঃখের মূল্যে বুঝবে ও স্বীকার করবে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

মহাজীবন—সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৬৯ : গুজরাতের পোরবন্দরে দোসরা অক্টোবর (সংবত ১৯২৫ ভাদ্র বদ ১২ বা কৃষ্ণা দ্বাদশী) জন্ম হয়।

১৮৭৬ : রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি হন।

১৮৮০ : কাথিয়াওয়াড়ের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৮২ : কস্তুরবার সঙ্গে বিবাহ।

১৮৮৭ : ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮৮ : চৌঠা সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত রওনা হন।

১৮৯১ : ১০ই জুন ব্যারিস্টারি পাশ করে ১২ই জুন স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন।

১৮৯৩ : এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হন পোরবন্দরের জনৈক ব্যবসায়ীর একটি দেওয়ানী মামলায় বড় আইনজীবীর সহায়কের কাজ করার জন্য। মে মাসের শেষ ভাগে নাতাল উপস্থিত হন এবং আদালত রেলগাড়ী ও পথে-ঘাটে বর্ণবৈষম্যের শিকার হন ও অপমানিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৯৪ : আইনজীবী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নানা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতীয়দের ভোটের অধিকার হরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেন। ২২শে মে নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৬ : ছয় মাসের জন্য ভারতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সপক্ষে জনমত তৈরি করেন ও ফেরার সময় স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে আসেন।

১৮৯৯ : বুয়র যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করে আহতদের সেবা করেন।

১৯০১ : ভারতে ফিরে কলিকাতা কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারপর বোম্বাই-এ সাফল্য সহকারে ব্যারিস্টারি করতে থাকেন।

১৯০২ : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জরুরী আহ্বান পেয়ে বছরের শেষ ভাগে

সেদেশে উপস্থিত হন ও ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন।

১৯০৪ : রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" পড়ে গভীর ভাবে প্রভাবিত হন ও সেই আদর্শে কৃষক ও শ্রমিকদের মত জীবন যাপনের জন্ম ফিনিক্স আশ্রম স্থাপনা করেন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার প্রকাশ করেন।

১৯০৬ : জুলু বিদ্রোহের সময় অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করে সেবা করেন এবং জনসেবামূলক কাজের সহায়ক হবে বিবেচনা করে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন।

১৯০৭ : কালা কানুনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অহিংস প্রতিরোধ—সত্যাগ্রহ শুরু করেন। জনসেবায় পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গের জন্ম আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

১৯০৮ : আইন অমান্তের অভিযোগে ১০ই জানুয়ারি দুই মাসের কারাদণ্ড হয়। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী স্মাটস একটি রফা করেন। গান্ধীজীসহ সকলে মুক্ত হন। আপোসে অসন্তুষ্ট মীর আলম ও অন্যান্যের আক্রমণে ৮ই ফেব্রুয়ারি মৃতপ্রায় হন। গান্ধীজী আক্রমণকারীদের শাস্তি দিতে নিষেধ করেন। স্মাটস প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৬ই আগস্ট আবার আন্দোলন শুরু হয় ও ১৫ই অক্টোবর গান্ধীজী দুই মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৯ : ভারতীয়দের দাবি সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম ইংলণ্ডে যান। জাহাজে "হিন্দ স্বরাজ" লেখেন।

১৯১০ : টলস্টয় ফার্ম স্থাপনা করেন।

১৯১২ : দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে গোখলের মধ্যস্থতার প্রয়াস ব্যর্থ হল। ইউরোপীয় পোশাক ত্যাগ করেন।

১৯১৩ : ভারতীয় নারী ও খনি শ্রমিকরাও সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারাবরণ করেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে ২২২১ জন ভারতীয় নরনারী ও শিশুসহ পদযাত্রা করে সত্যাগ্রহীরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন ও গান্ধীজী সহ অনেকে গ্রেপ্তার হন।

১৯১৪ : ভারত ও বিশ্বের অন্যত্র ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের সপক্ষে জনমত তৈরি হওয়ায় সরকার এক কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জুন মাসে সত্যাগ্রহীদের দাবি মেনে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ হওয়ায় গান্ধীজী লণ্ডন হয়ে ভারতে রওনা হন।

১৯১৫ : ৯ই জানুয়ারি বোম্বাই-এ পৌছান। ২৫শে মে সত্যাগ্রহ আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেন। গোখলের পরামর্শে ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দেশ ঘুরে দেখেন ও বীরমগাঁও-এর কাস্টমস কেন্দ্রের জুলুম বন্ধ করেন।

১৯১৬ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদ ও দেশবাসীর একাংশের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার নিন্দা করেন। লখনউ কংগ্রেসে যোগ দেন ও বিহারের চম্পারণের কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দূর করার জন্য আহূত হন।

১৯১৭ : ৯ই এপ্রিল কলিকাতা থেকে পাটনা হয়ে চম্পারণ রওনা হন। গান্ধীজী ও তাঁর বিহারের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে চম্পারণের নীল চাষীদের মধ্যে জাগৃতি আসে। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা প্রথমে তাঁর বিরোধ করলেও এবং বহিষ্কারের আদেশ অমান্যের জন্য আদালতে অভিযুক্ত করলেও পরে ছোট ছোট চাষীদের দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার আইন করেন।

১৯১৮ : আহমেদাবাদের শ্রমিক-ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন ও শ্রমিকদের মনোবল বজায় রাখা ও হিংসার অভিব্যক্তি বন্ধ করার জন্য অনশন করেন। গুজরাতের খেড়া জেলায় অজন্মাপীড়িত কৃষকদের কর মকুবের আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৯১৯ : ৩০শে মার্চ দিল্লীতে ও ৬ই এপ্রিল দেশের অন্যত্র উপবাস ও হরতালের মাধ্যমে রাউলাট বিলের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্বকারী বিধানের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকারের দমননীতি শুরু হয় এবং দিল্লী পাঞ্জাব ও আহমেদাবাদে জনসাধারণের তরফ থেকেও হিংসার অনুষ্ঠান হয়। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। গান্ধীজীর পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধীজী সরকারী পদক ফেরত দেন। জনসাধারণকে অহিংসাচরণের জন্য প্রস্তুত না করে আইন অমান্যের জন্য নির্দেশ দেওয়া হিমালয় প্রমাণ ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেন ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৪ই এপ্রিল থেকে তিন দিনের জন্য অনশন করেন। অক্টোবরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন" পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। নভেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ কমিটির সভায় সর্বপ্রথম অসহযোগের কথা বলেন।

১৯২০ : প্রথমে গুজরাতের প্রাদেশিক সম্মেলনে পরে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে ও ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের

সাধারণ অধিবেশনে তাঁর উদ্যোগে পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে অসহযোগ ও বিলাতী পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারত সফরের সময় দেশের ভীষণ দারিদ্র্য দেখে টুপি ও জামা বাদ দিয়ে কেবল হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরার সিদ্ধান্ত করেন।

১৯২১: অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের ঢেউ দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড সংগ্রহ করা ও ২০ লক্ষ চরকা প্রবর্তনের কার্যসূচী গ্রহণ করেন।

১৯২২: ৮ই ফেব্রুয়ারি চৌরীচৌরাতে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মীসহ জনসাধারণ কর্তৃক হিংসানুষ্ঠানের জন্য অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার ডাক দেন। ১০ই মার্চ গ্রেপ্তার ও ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২৪: ৫ই মার্চ মুক্তি পান। সেপ্টেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য ২১ দিন উপবাস করেন। ডিসেম্বরে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৫: গঠনকর্মের সপক্ষে জনমত তৈরির জন্য ভারত ভ্রমণ করেন ও ভাইকমে হরিজনদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সত্যাগ্রহের পথপ্রদর্শন করেন। ২৪শে ডিসেম্বর চরকা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন।

১৯২৭: সিংহল ভ্রমণ।

১৯২৮: ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পরামর্শে ও সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদৌলীর কৃষক-সত্যাগ্রহ হয়। ডিসেম্বরে কলিকাতা কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এক বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হবে।

১৯২৯: তাঁরই নির্দেশে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩০: ১২ই মার্চ সাবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল দূরস্থ সমুদ্রোপকূলবর্তী দাণ্ডীতে পদব্রজে রওনা হন ৭৯ জন সহকর্মী সহ। পথে আইন অমান্যের কথা প্রচার করতে করতে দাণ্ডীতে পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ও গান্ধীজীসহ প্রায় এক লক্ষ দেশবাসী গ্রেপ্তার হন।

১৯৩১: জানুয়ারি মাসে মুক্তি পান ও বড়লাট আরউইনের সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি

হিসাবে ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে আড়াই মাস লণ্ডনের ব্যর্থ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ফেরেন।

১৯৩২ : সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে আবার আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও ৪ঠা জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে হরিজনদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করার সরকারী প্রয়াসের বিরুদ্ধে ২০শে সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করেন ও বর্ণ হিন্দু ও হরিজনদের প্রতিনিধিদের আলোচনার ফলে বাঁটোয়ারা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ২৬শে সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩ : হরিজন পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। জুলাই মাসে আবার গ্রেপ্তার হন। সাবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দেন এবং নভেম্বরে হরিজনদের উন্নয়নের জন্য ভারত সফর কালে একাজের জন্য আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।

১৯৩৪ : বিহারের ভূমিকম্প-পীড়িতদের মধ্যে সফর ও তাঁদের সেবা। ২৫শে জুন হরিজনদের সমানাধিকার দেবার দাবির বিরোধীরা পুণাতে তাঁকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি রক্ষা পান। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ ত্যাগ করে গঠনকর্মকেই প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের জন্য গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও ওয়ার্ধাকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করেন।

১৯৩৬ : সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৭ : ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বলেন।

১৯৩৮ : রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ও বড়লাটের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করেন। সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রদেশে ঘুরে অহিংস খুদা-ই-খিদমৎগারদের কার্যকলাপ দেখেন।

১৯৩৯ : দেশীয় রাজ্য রাজকোটের শাসনকর্তার শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে উপবাস করেন।

১৯৪০ : ইংরেজ ভারতকে পরাধীন রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জোর করে তার সহায়তা নেবার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা দেন। এনড্রুজের স্মৃতি-রক্ষার্থ ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বিশ্বভারতীকে দেন।

১৯৪১ : "গঠনমূলক কার্যক্রম" পুস্তিকা লেখেন। কংগ্রেস অহিংসা নীতি অনুসারে চলতে সম্মত নয় দেখে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চান এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হয়।

১৯৪২ : যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ক্রিপসের সঙ্গে ভারতের

স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ইংরেজ যথার্থ ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত না থাকায় আলোচনা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের ক্রমাগত বিজয় ও ভারতের দিকে অগ্রগতি এবং ভারতীয়দের হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেন যে, আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাঁচতে হলে অবিলম্বে ইংরেজের ভারত ছাড়া প্রয়োজন। তাঁর প্রভাবে অ: ভঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ৮ই আগস্ট "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও ৯ই ভোরে বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার হন। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ববিহীন জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

১৯৪৩ : ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিনের জন্য উপবাস করেন।

১৯৪৪ : ২২শে ফেব্রুয়ারি কস্তুরবার মৃত্যু হয়। ৬ই মে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করেন। গ্রামের নারী ও শিশুদের জন্য স্থাপিত কস্তুরবা ট্রাস্টের প্রথম সভাপতি হন। সেপ্টেম্বরে বোম্বাই-এ মুসলীম লীগের সঙ্গে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বোঝা-পড়া করার জন্য জিন্নার সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনা হয়।

১৯৪৫ : ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহুত সিমলা সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। বাঙলা দেশের বন্যাপীড়িত অঞ্চল ও শান্তিনিকেতন সফর করেন।

১৯৪৬ : ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ও আলোচনাকারী কংগ্রেস নেতৃবর্গকে পরামর্শ দেন। অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস যোগ দিলে তার প্রতিবাদে মুসলীম লীগ ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ফলে একে একে কলিকাতা বিহার নোয়াখালি পাঞ্জাব ও দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা থামান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী সর্বত্র প্রাণপণ প্রয়াস করেন। ২৯শে অক্টোবর কলকাতা ও সেখান থেকে ৭ই নভেম্বর নোয়াখালির চৌমুহনী পৌঁছান।

১৯৪৭ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ১লা মার্চ পর্যন্ত নোয়াখালি পরিক্রমা করে একই উদ্দেশ্যে বিহারে যান। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে কলিকাতায় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এই উদ্দেশ্যে ১লা সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৪ঠা পর্যন্ত উপবাস করেন। ৭ই দাঙ্গাপীড়িত ও উদ্‌বাস্তু অধ্যুষিত দিল্লী রওনা হন ও সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজ করতে থাকেন।

১৯৪৮ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ১৩ই থেকে ১৮ই জানুয়ারি উপবাস করেন। ২০শে জানুয়ারি তাঁকে হত্যার জন্য প্রার্থনা সভায় বোমা ফেলা হয়। ৩০শে জানুয়ারি "হে রাম!"